আজকের বিশ্ব

অনিল বিশ্বাস

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

প্রতিদিন গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সঙ্কটের পরিবর্তনে এই ঘটনাগুলি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আধিপত্যকারী ভূমিকা বজায় রেখেছে। ১৯৮০'র দশকে বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের মতাদর্শগত আক্রমণ যেমন তীব্রতর হয়েছে তেমনই প্রগতিশীল শক্তি তার প্রতিরোধেরও চেষ্টা করেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও দেশে দেশে অনেক ফারাক দেখা যাচ্ছে। জার্মানী ও জাপান সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। ও ই সি ডি দেশগুলিতে বেকারীর হার বাড়ছে। বহু মানুষ কাজ হারাচ্ছে, দারিদ্র্যের মুখে পড়ছে। এই সব বিষয় নিয়ে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছে। এর পাশাপাশি বিশ্ব পুঁজিবাদের অন্যতম সংকটের ফল হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সংকট। আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যে অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে বলে যে দেশগুলির কথা বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হত সেই থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস্‌ এ দক্ষিন কোরিয়া এখন অত্যন্ত সংকটের মধ্যে। অপরদিকে ইন্দোনেশিয়াতে জঙ্গী ছাত্র বিক্ষোভ সুহার্তোর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গনজাগরণ সৃষ্টি করে ও তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার হুকুমদারি ভূমিকা বহাল রাখতে চেষ্টা করছে। বিভিন্ন জায়গায় সামরিক হস্তক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, গনতান্ত্রিক কোরিয়া সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ উপনিবেশ থাকলেও হংকং চীনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও মানুষ আবার নতুন করে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। এই বিষয়গুলি ও তাকে জড়িয়ে ঘটনাগুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৯৯৩ সালে গনশক্তির সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের লেখা "এক দশক : দুই বিশ্ব" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়ে। এই বিষয়ে লেখাগুলি অনিল বিশ্বাস ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী শিরেনামে মার্কসবাদী পত্র পত্রিকায় লিখে চলেছেন। বেশ বছর ধরে প্রকাশিত সেই সব লেখাগুলিকে সংকলিত করে ও প্রয়োজন অনুসারে সম্পাদনা করে এই নতুন বইটি লেখা হয়েছে। বইটির নাম "আজকের বিশ্ব"। লেখক ১৯৮১ সাল থেকে প্রায় সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ঘটনাগুলিকে নির্বাচন করেছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তনের দিকনির্দেশ হিসাবে। এই সঙ্গে বিশ্বের দেশগুলির সম্পর্কে নানা তথ্যও দেওয়া হয়েছে পাঠকদের সুবিধার জন্যে। আমি আশা করি এই বইটি ছাত্র, গবেষক, রাজনৈতিক কর্মী এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজনে লাগবে।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

শৈলেন দাশগুপ্ত

আমার কন্যা অজন্তাকে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

এশিয়া

অতি সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের অস্থিব চালচিত্রটিব দিকে তাকালে কয়েকটি সাধারণ, বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়বে।

প্রথমত ঃ কূটনৈতিক দিক থেকে একের পর এক ব্যর্থতা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি-নির্ধারক কাঠামোকে বাধ্য করেছে নগ্ন নির্লজ্জতায় দ্রুত, অতি-দক্ষিণ ঝোঁকের কাছে লাগাতার আত্মসমর্পণ করতে। বিল ক্লিন্টনের বাৎসরিক 'স্টেট অব্ দ্য ইউনিয়ন' বক্তৃতায় তার প্রমান আমরা পেয়েছি।

দ্বিতীয়ত ঃ বিশ্বের এক বিরাট অংশ জুড়ে যে সংঘাত-সংঘর্ষ-দ্বন্দ্ব ক্রমশ পরিব্যাপ্তরূপ ধারণ করেছে, তার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে জটিলতর করে তুলছে আঞ্চলিকতা, জাতি-সত্বা, ধর্ম এবং অবশ্যই মৌল দ্বন্দ্ব উদ্ভুত, বিবর্তিত পরিস্থিতির নতুন পর্যায়। বসনিয়ার ভেলিকা ক্লাদুসা থেকে উত্তর আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি আরমাঘ্; স্পেনের আন্দোরা থেকে তুর্কির দিয়ারবকির; আলজেরিয়ার ত্যাঁফুশি থেকে রোয়ান্ডার কিগালি; কলম্বিযার মেদেইন্ থেকে আর্জেন্টিনার পুন্তা আরেনাস্ — সর্বত্রই এই দ্বন্দ্ব, এই সংঘর্ষ, এই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে।

তৃতীয়ত ঃ এই অস্থির পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, একদিকে যখন কল্যাণমুখী রাষ্ট্রকাঠামো বিপর্যয়ের মুখোমুখি অসহায়, তখনই দেশে দেশে বামপন্থী শক্তিবিন্যাসের মধ্যে জোরালো অগ্রগমন ঘটছে — কি সংসদীয় নির্বাচনের গণ্ডির মধ্যে, কি তার বাইরে গণ-আন্দোলনের বৃহত্তর, মহত্তর আঙ্গিনায়। পাঁচটি মহাদেশেই এই আশা-জাগানো পরিবর্তন আমরা দেখছি। কি মতাদর্শের দিক থেকে, কি প্রয়োগ কুশলতার হাতিয়ার হিসাবে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা নতুনতর সাংগাঠনিক শক্তি অর্জন করে চলেছে। পুঁজিবাদই শেষতম বিকাশের লক্ষ্য — এই অনৈতিহাসিক 'তত্ত্বে'র প্রবল সমর্থক-কূলও পায়ের তলায় বিশেষ মাটি পাচ্ছেন না — ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং এই ভাবনার যে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে, এমন কোনো ইঙ্গিত দৃষ্টিগোচর হচ্ছেনা কারুরই!

এক ভীতিপ্রদ অস্থিরতা গ্রাস করেছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল রঙ্গমঞ্চকে। ভ্রাতৃঘাতী জাতিদাঙ্গা চলছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, তুর্কী, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু অংশ ঘিরে। 'এক-মেরু' বিশ্ব ঘোষণা করার অব্যবহিত পরেই পৃথিবীর মানুষের স্বঘোষিত মুক্তিদাতা (ওটা নাকি দৈবাদেশ!) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোটামুটি হাল ছেড়ে, ঘূর্ণাবর্তের

মধ্যে ঠেলে দিয়েছে বিশ্ববাসীকে। সর্বত্র অবিশ্বাস, ঘৃণা, হিংসা এবং উগ্রজাতীয়তাবাদ তথা মৌলবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে। খেলতে গিয়ে খেলার নিয়মেই কাত হয়েছেন ক্লিন্টন অ্যান্ড কোম্পানি। পরিস্থিতির অনেকটাই তাঁর হাতের বাইরে। কেবল সামরিক একচ্ছত্রতা থাকলেই যে কাজ সিদ্ধ হয় না, 'ফিনান্স্ পুঁজির' ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণটাও যে অতীব প্রয়োজনীয়, তা কি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের আনন্দে ভুলেই গিয়েছিলেন মার্কিনী দস্যুর দল? একথা স্পষ্ট যে, অনেক চিৎকার, অনেক আস্ফালনের পশ্চাৎপটে, ঘনায়মান সঙ্কট থেকেই আসলে প্রাণপণে বাঁচতে চাইছে পুঁজিবাদ। 'নতুন চিন্তা'র দিগ্‌গজদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে ঃ মশাইরা, 'প্রযুক্তি-বিপ্লবে'র তাহলে হলোটা কি? কে জবাব দেবেন? কি-ই বা জবাব দেবেন?

১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে সিন্ধু প্রদেশে ব্যাপক বন্যার প্রকোপ থেকে আর্ত মানুষকে বাঁচাতে যথেষ্ট সংখ্যায় সেনা নিয়োগের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে দেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জনৈক আধিকারিক মোহাম্মদ রমজান বালোচ, 'আজাঁস ফ্রঁস প্রেস' (A.F.P.) সংবাদসংস্থাকে যখন বলেন যে, করাচীর দাঙ্গা থামাতেই সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশকেই নিয়োগ করতে হয়েছে, তখন পাকিস্তানের রাজনীতির দীর্ণ চেহারাটাই আবার ফুটে ওঠে। জাতিদাঙ্গার সঙ্গে মিশেছে ভাষাগত বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। 'রয়টার' সংবাদসংস্থার দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান পিটার গ্রেস্ট্ জুলাই ১৯৯৫-এ লিখেছেন যে, করাচী শহরে চলছে পুরোপুরি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। একদিকে সেনা-রেঞ্জার-পুলিস, অপরদিকে মোহাজীর কোয়ামি আন্দোলনের নেতৃত্বে করাচীর নিম্নবিত্ত জনসাধারণ। এদিকে পরিস্থিতির দুর্বৃত্তায়নের সুযোগ নিয়ে শহরের বিস্তীর্ণ বস্তী এলাকার অলি-গলিতে মেশিন-পিস্তল আর 'ম্যাগনাম' রিভলবার নিয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে কিশোর-তরুণ 'ডনের' দল। এঁরা 'বন্দুক-সংস্কৃতি'র একনিষ্ঠ প্রবক্তা; এঁদের পছন্দ যথেচ্ছ খুন-গুম-ডাকাতি আর ডজন ডজন 'পণবন্দী' কব্‌জা করা। এঁদের সবাই যে মোহাজির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তা নয়। এঁদের একটা বড় অংশ কেবল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিশৃঙ্খলার স্রোতে ভাসমান হয়ে শোষিত মানুষের 'লুম্‌পেনীকরণের' পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন। এদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং সন্ত্রাসের পর্যন্ত বলি হয়েছেন ২০০০-এরও বেশি মানুষ। "পুরোদস্তুর যুদ্ধ চলছে, মশাই", বলছেন সিনিয়র পুলিস সুপার, ওয়াজেদ আলি খাঁ, "আর এখানে আমাদের শত্রু হলো মোহাজীরগুলো যাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করছে ওই ডাকাত-সর্দারটা।"

এদিকে 'ওই ডাকাত সর্দারটা', মোহাজীদের অবিসংবাদী নেতা আলতাফ হোসেন, লন্ডন থেকে প্রকাশিত এক ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্রে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১-৭২ পর্যন্ত আগত উপমহাদেশের অন্য অংশের মানুষদের 'হিন্দুদের চর' আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের সরকার যে অবহেলা, সন্দেহ, অত্যাচার, নিগ্রহের বাতাবরণে তাদের নিক্ষেপ করেছিলেন, তারই বিষময় প্রতিক্রিয়ায় আজ করাচী উত্তাল। আলতাফ সাহেবের আঙ্গুল দোষী সাব্যস্ত করার জন্য উত্থিত হয় বেনজির ভুট্টো সরকারের পাঞ্জাবী-পাঠান-পাখ্‌তুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি। "না, করাচীর দাঙ্গা আমরা শুরু করিনি; আসলে দাঙ্গাটা এতদিন একতরফা হচ্ছিল তো, তাই বাইরের জগতের কাছে তার 'সংবাদ-মূল্য' প্রায় ছিলই না বলা চলে; এবার যখন পালটা মার দিচ্ছে সাধারণ মানুষ — তখনই পাকিস্তানী সরকার চিৎকার শুরু করেন 'দেশদ্রোহিতা' আর 'বিচ্ছিন্নতাবাদের' কথা তুলে", বলেছেন আলতাফ

হোসেন। চাপে পড়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় রাজী হন বেনজির সরকার। বিশেষ করে যখন দেখা গেল, 'হাকিকী' উপজাতির লোকজনের সাহায্যে মোহাজির আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করা গেল না, তখন জুলাই মাসের (১৯৯৫) প্রথম সপ্তাহে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় রাজী হলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। এই আলোচনা দু-রাউন্ড হয়, যদিও নীট ফল শূন্য। আসলে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হলো পারস্পরিক দোষারোপের তরজায়। আজমল দেহ্‌লভী এবং শেখ লিয়াকত হোসেনের নেতৃত্বাধীন মোহাজীর প্রতিনিধিদল যেসব দাবি তুলেছেলেন তার মধ্যে ছিল ঃ মোহাজীরদের ওপর চাপানো অগণতান্ত্রিক বিধিনিষেধ প্রত্যাহার; সব বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি; মোহাজীর আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে রুজু করা সমস্ত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার; জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মসেবাগুলিতে মোহাজীরদের জন্য সংরক্ষণ; এবং মোহাজীর কোয়ামি আন্দোলনের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। সর্বোপরি, আলতাফ হোসেন লন্ডন থেকে জানান যে, মোহাজীরদের জন্য স্বতন্ত্র, স্বশাসিত অঞ্চলের অধিকারও বেনজির সরকারকে মানতে হবে। এদিকে, তৎকালীন আইনমন্ত্রী নবীদাদ্ খাঁর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানীর আমলারা মোহাজীর কোয়ামি আন্দোলনের নেতাদের বলেছেন যে, "ওঁদের অবিলম্বে অস্ত্র-শস্ত্র জমা দিতে হবে; সব ধরনের 'অপরাধপ্রবণ উদ্যোগ' বন্ধ করতে হবে; ধর্মঘট ডাকা থেকে বিরত থাকতে হবে; এবং 'দাগী আসামীদের' পুলিসের হাতে তুলে দিতে হবে। বুঝতে অসুবিধা হয়না কেন আলোচনা আর এগোতে পারে নি। এদিকে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বেনজির সংবাদ-মাধ্যমগুলির মুখ বন্ধ করতে গিয়েছিলেন। এক প্রত্যাদেশ জারী করে উনি করাচী থেকে প্রকাশিত ছ-টি সংবাদপত্রকে দু'মাসের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, যদিও ওনার সাগরপারের 'গডফাদার' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে (এ ব্যাপারে ১৯৯৫ সালের ৪ঠা জুলাইয়ের ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত আধপাতার 'অপ্-এড'এ একটি লেখাই যথেষ্ট ছিল) অতি দ্রুত ওই সিদ্ধান্ত তাঁকে পালটাতে হয়েছিল। তবুও, সামরিক জোটের মদতপ্রাপ্ত পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী দিকটি নিয়ে আবার দেওয়ালের লিখন পড়া গেল, সন্দেহ নেই। এদিকে করাচীর রাস্তায় দাঙ্গা অব্যাহত — বিশেষত কোরাঙ্গীর মতো মিশ্র অঞ্চলে সারা দিন-রাত বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ আর কালাসনিকভ্ স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের ধাতব আওয়াজ মানুষের দিন গুজরানের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। পরিস্থিতি বিস্ফোরক।

গত ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে সরকার গঠন করে চন্দ্রিকা বন্দরনায়েকে কুমারতুঙ্গা ঘোষণা করেছিলেন যে, দ্বিপাক্ষিক শান্তি-আলোচনার মাধ্যমে 'লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম'-এর সঙ্গে যে রক্তাক্ত সংঘর্ষে শ্রীলঙ্কার সরকার বিগত একদশক ধরে জড়িয়ে পড়েছিল, তার অবসানে তিনি আগ্রহী। তারপর থেকে জাফনা অঞ্চলের নদ-নদী দিয়ে অনেক রক্ত ধুয়ে যেতে আমরা দেখেছি। যতদিন গেছে তামিল 'এল টি টি ই' জঙ্গীদের দাপট বেড়েছে বই কমেনি। অবশেষে পরিস্থিতি যথাপূর্বং। শহরে-শহরে জঙ্গীরা হামলা চালাচ্ছে। আত্মঘাতী 'ব্ল্যাক টাইগার'রা নিজেদের শরীরে বিস্ফোরক বেঁধে টার্গেটের ওপর অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। 'আর ডি এক্স' আর অত্যাধুনিক প্লাসটিক বিস্ফোরকের ভয়াবহতার সামনে মাথা নোয়াচ্ছে ইস্পাত-কংক্রিটের সেনা-'বাঙ্কার'। জাফনা, অনুরাধাপুরম আর বাত্তিকালোয়ার চতুর্দিকের রাস্তায় বিধ্বংসী 'মাইন' পাতা। যুযুধান দু-পক্ষই সমান নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছে বন্দীদের প্রতি। সাধারণ মানুষের

চোখে ঘুম নেই। সিংহলী-বনাম-তামিল লড়াইকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ, মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যে জাতিদাঙ্গার সম্ভাবনা প্রকটতর হয়ে উঠছে। ভাবুনিয়া-আমপারাই-পালালি থেকে শ্রীলঙ্কার সেনা পিছু হঠছে। মিসাইল ব্যবহার করে সরকারী সেনাছাউনিগুলিকে দারুণভাবে বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে প্রভাকরণের বাহিনী। দুটি সরকারী জঙ্গী বিমান ও দুটি রণতরীকেও তারা ধ্বংস করেছে। তামিল জঙ্গীরা তাদের স্বাধীনতার যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধে'র রূপ দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে 'প্রকলম্' (বা যুদ্ধ-সম্পর্কিত আলোচনাচক্র) চালায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছে যে একাধিক সিংহলী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভারতের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত চাইবার কথা তোলে অথচ 'আই পি কে এফ' ছিল একসময় গোটা শ্রীলঙ্কার মানুষজনের অকৃত্রিম ঘৃণার বস্তু। কুমারতুঙ্গ সরকার তামিল প্রধান উত্তরাঞ্চলে এক ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ার প্রস্তাব দিতে বলেন তামিল জঙ্গীদের — অবশ্য কোন বিস্তারিত রূপরেখা সরকারের তরফে এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

যত দিন যাচ্ছে, সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে, বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল ভারত-বিরোধী বক্তব্য ক্রমশ স্পষ্টভাষায় তাঁদের বক্তৃতা ইশতেহারে রাখতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগ-ও পেছিয়ে নেই। জল-বণ্টন এবং ভারত বাংলাদেশ চুক্তি — এই দুটি ইস্যুই এঁদের বক্তব্যে বারবার উঠে আসছে। এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বাম-গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলি। এঁরা সবধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন যাতে নির্বাচনী প্রচারে কোনভাবে কোন সাম্প্রদায়িক ছায়া না পড়ে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বি এন পি এবং জাতীয় পার্টি। রওশান এরশাদের সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশটা খুব শান্তিপূর্ণ হয়নি। গত ৬ই জুলাই (১৯৯৫) যখন তিনি ঢাকা থেকে ২০০ কিমি দূরে ময়মনসিংহ শহরে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন তখন তার গাড়ির ওপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি বর্ষণ করা হয়। রওশান এরশাদ বেঁচে গেলেও তাঁর দলের যুবশাখার এক সদস্য নিহত হন। এই আক্রমণের জন্য রওশান, খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি-কে দায়ী করেন। এদিকে, রাজনৈতিক মুনাফা তোলার উদ্দেশ্যে সরকার হঠাৎ করে জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে একটি হত্যার মামলা এনেছেন। মেজর জেনারেল আবুল মনজুর-কে হত্যার অভিযোগে এরশাদের বিরুদ্ধে মামলাটি রুজু করা হয়েছে এক বিশেষ আদালতের সামনে। উল্লেখ্য, মনজুর এক সামরিক অভ্যুত্থানে বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান খালেদা জিয়ার স্বামী জেনারেল জিয়া-উর-রহমানকে হত্যা করেছিলেন। বিরোধী জোট ও সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন এদিকে সমানেই চলেছে। বেগম জিয়ার পদত্যাগ ও নতুন নির্বাচনের দাবিতে ১৪৭ জন বিরোধী সংসদ পদত্যাগ করেছিলেন ৩৩০ সদস্য সংবলিত পার্লামেন্ট থেকে। স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলি অবশ্য ওই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি। সংবিধান অনুসারে, এই ধরনের বয়কটের ৯০ দিনের মধ্যে সরকারকে হয় উপ-নির্বাচন ডাকতে হবে কিংবা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। এই দাবীর ভিত্তিতে দেশজোড়া আন্দোলন চলে। অবশ্য নির্বাচনের আগে বিরোধী জোট তাঁদের দাবী থেকে কিছুটা সরে আসেন বলা যায়। আগে, বিরোধী দলের বক্তব্য ছিল যে, খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। পরে বলেন যে, নির্বাচনের ৯০ দিন আগে তাকে গদী ছাড়তে হবে। খালেদা জিয়া অবশ্য তাঁর বক্তব্যে অনড় ছিলেন ঃ তাঁর মত ছিল, নির্বাচনের একমাসের আগে তিনি পদত্যাগ করবেন — তার আগে বা পরে নয়।

১৯৯৫ সালের আগের নির্বাচনে, ২০৫ সদস্যের নেপালী সংসদে সর্ববৃহৎ দল, নেপালী কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি) জিতেছিলেন ৮৭টি আসন। অন্যদিকে তিন প্রধান বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে পেয়েছিল ১০৪টি আসন। এদের মধ্যে ছিল নেপালী কংগ্রেস (৮২টি আসন), রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি (১৯), নেপাল সদ্‌ভাবনা পার্টি (তিন)। মতবিরোধের মধ্যে ১৯৯৫ সালের জুন মাসে এঁরা সমবেতভাবে রাজা বীরেন্দ্রকে বলেন যে, সরকারের ওপর থেকে তাঁরা সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এবং তাঁরা সরকার গড়ার দাবী রাখেন। রাজা বীরেন্দ্র অবশ্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন অধিকারীর সুপারিশ গ্রহণ করে সংসদ ভেঙে দেন এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৯-৯০ সালে পশ্চিমী মদতপুষ্ট 'অরাজনৈতিক' 'গণতান্ত্রিক' মঞ্চে, তাণ্ডব নৃত্য হতে আমরা দেখেছিলাম মায়ানমারের বুকে। সামরিক 'জুন্‌তা'র জনপ্রিয়তাহীনতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চাইছিল মুক্তবাজার অর্থনীতি মায়ানমারের ওপর চাপিয়ে দিতে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এবং পূর্ব এশিয়ার মাদক উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র মায়ানমার কব্‌জা করা বড়ই দরকারী ছিল তাদের কাজে। 'ছাত্র আন্দোলনে'র বিপুল স্রোতের তরঙ্গ শীর্ষে জন্ম নিল আউঙ সান সু কী-র নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি' বা এন এল ডি। তড়িঘড়ি ডাকা নির্বাচনে ৯০% ভোটে পেয়ে এন এল ডি সরকার গঠনের দাবি জানালো। ততদিনে ধূর্ত সামরিক 'জুন্‌তা', যার পোশাকী নাম হলো 'স্টেট ল্য অ্যান্ড রেস্‌টোরেশন কাউন্সিল' (বা, এস এল ও আর সি), বুঝে গিয়েছিল ভোটের বাক্সের ফল যাই বলুক না কেন, এন এল টি-র প্রকৃত কোন গণভিত্তি ছিল না। তাই, অনায়াসে তারা আউঙ সান সু কী-কে পরবর্তী ছয়-ছয়টি বছর 'কারারুদ্ধ' করে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। অবশ্য তাঁকে কোন অত্যাচারের শিকার কখনোই হতে হয়নি। মায়ানমারের সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশ আরামেই তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন। পশ্চিমী রাজনীতিবিদদের আনুকূল্যে তাঁকে ১৯৯১ সালে 'নোবেল' পুরস্কারেও সম্মানিত করা হলো। এদিকে ইরাবতী নদী দিয়ে জল গড়িয়েছে অনেক। এস এল ও আর সি-র নেতৃত্বে মায়ানমারের অর্থনৈতিক প্রগতি হয়েছে। বাৎসরিক বিকাশের হার এখন ৭.৭%। বহু পশ্চিমী সংস্থা বেসরকারী ভিত্তিতে মায়ানমারের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ-এর নেতৃত্বে এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল মায়ানমার সফর করেন। গড়ে ওঠে চীন-মায়ানমার বাণিজ্য সম্পর্ক। যেহেতু 'বন্দিনী নেত্রী' হিসাবে আউঙ্ সান সু কী-কে পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশসমূহ তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছিল, তাই মূলত চীনের পরামর্শেই সম্ভবত মায়ানমারের শাসককুল আউঙ সান সু কী-কে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত করেন। এর ফলে মায়ানমারের সঙ্গে একাধিক বৈদেশিক সংস্থা যৌথ উদ্যোগ এবং রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন এবং এর জন্য গণতন্ত্রের বুলি তাঁদের শুনতে হবে না পশ্চিমী দেশসমূহের কাছ থেকে। জাপান ততদিনে মায়ানমারকে বাণিজ্য সাহায্য দেবার কথা ঘোষণা করেছিল। বিশ্বব্যাঙ্ক, আসিয়ান, আপেক, এবং এ ডি বি-র কাছ থেকেও মায়ানমার সদর্থক প্রতিক্রিয়া আশা করে। এদিকে, নিজের সমর্থকদের বেশ হতাশ করেই আউঙ্ সান সু কী তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মায়ানমারের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে কোন

সংঘাতেই যাবেন না। আপাতত 'গণতান্ত্রিক' আন্দোলন শিকেয় তোলা থাকলো মনে হচ্ছে।

১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে তথাকথিত 'অবাধ' নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল রামোস আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছিল গোটা ভোটপর্ব জুড়ে, বিশেষ করে ফিলিপাইনস্-এর মিনডানা ও অন্যান্য দক্ষিণী জেলাগুলিতে। বিরোধী পক্ষের হিসেবমতো নির্বাচনী দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক ব্যক্তি। নির্বাচনের পর রামোস অবশেষে দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে রাজী হয়। কমিউনিস্টদের পক্ষে আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লুইস জালানদোনী। সরকারী মুখপাত্র হাওয়ার্ড ডি' সংবাদসংস্থা 'রয়টার'-কে জানিয়েছেন যে, আলোচনার মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিগত ২৬ বছর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো।

১৯৯৫ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় থাইল্যান্ডে। নির্বাচনী প্রচারপর্বে বিরোধী 'চার্ট থাই' (থাই জাতীয়তাবাদী) পার্টি তাঁদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাট পার্টির ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত কেলেঙ্কারি এবং ব্যক্তিগত আর্থিক ও নৈতিক দুর্নীতির জন্য। ১৯৯৫ সালের ২রা জুলাই যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তাকে নিশ্চিতভাবেই অবাধ বলা যায় না। ৬২.০৪% ভোট পড়েছিল। তার মধ্যে সর্বাধিক আসন পায় 'চার্ট থাই' মোট ৯৩টি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চু-আন লিকপাই-র দল লাভ করে ৮৬টি আসন। থাই সংসদে মোট আসনসংখ্যা ৩৯১। 'চার্ট থাই'-এর নেতা বানহার্ন সিলপ্-আর্চা সরকার গড়েছেন সহযোগী নিউ অ্যাসপিরেশন, পালাঙ্ ধর্মা (নৈতিক শক্তি), 'প্রাচীকরণ থাই' (নাগরিক কমিটি), সু অন্-চন (গণদল), ও সোস্যাল অ্যাকশন পার্টিদের সাহায্যে। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রীপদ নিয়ে মনান্তর চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে। 'চার্ট থাই' দলের মধ্যেই তিনটি উপদল দেখা দিয়েছে। এদিকে মন্ত্রিসভার দু'জন সম্ভাব্য সদস্যদের নামে 'ব্যাঙ্কক পোস্ট' কাগজে মাদক-চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। বহুল প্রচারিত দৈনিক 'নেশন' সম্পাদকীয় কলমে মন্তব্য করেছে যে, বর্তমান সরকারের আমলে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে বই তো কমবে না।

কাম্বোডিয়াতে এখনও সুস্থিতি ফেরেনি। খামের রুজ এখনও দেশের পশ্চিমে বাট্টাম্বাঙ্ প্রদেশে নিজেদের দখলদারি বজায় রেখেছে যদিও তাদের দুই প্রধান ঘাঁটি পায়লিন ও আনলঙ্ ভেঙ্ সরকারী সেনারা দখল করতে সমর্থ হয়েছে। ইন্দোনেশিয়াতে মৃত্ে মাথা চাড়া দেয় ধর্মীয় মৌলবাদ। জাকার্তার মত শহরেও মৌলবাদীদের তৎপরতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে, ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক সরকার পরিস্থিতির 'সদ্ব্যবহার' করে জনবিরোধী কার্যকলাপের পরিধি বিস্তৃত করেই চলেছে। ১৯৯৪ সালের, গোটা নভেম্বর মাস জুড়ে ধরপাকড় করা হয়েছে বামপন্থী দলের কর্মী, ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং খ্যাতনামা শিল্পীদের। একাধিক সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করাও চলেছে। এ রকমই একটি নিষিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদক গুণাওয়ান মহম্মদ সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর তথাকথিত 'গণতন্ত্রীকরণ' প্রক্রিয়ারই এটি একটি চমৎকার নমুনা। এদিকে খ্যাতনামা শ্রমিক সংগঠক এবং দেশের অন্যতম বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন 'এস বি এস আই'র সাধারণ সম্পাদক, মোখতার পাকপাহান বিনাবিচারে কারারুদ্ধ অবস্থায় দিন গুণছিলেন। পূর্ব

তিমোর অঞ্চলের 'ফ্রেটেলিন' আন্দোলনকারীদের ওপরও অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ ও অপহরণ অব্যাহত রাখে ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনী। সুহার্তো সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত গণ-আন্দোলনও ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলে, মেডেন শহরে, পরপর কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে।

জাপানের অর্থনীতি আবার সঙ্কটের মুখে পড়ে। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারী এবং ব্যাপক অর্থকরী কেলেঙ্কারি গোটা জাপানী সমাজকেই অস্থিরতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর পরপর প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তনটা এখন জাপানীদের অনেকটাই 'গা-সওয়া' হয়ে গেছে বলা চলে। তাই, বিগত জুন মাসে (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী তোমিচি মুরায়ামার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসার পরিপ্রেক্ষিতে যখন নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো বিগত ২২শে জুলাই ১৯৯৫, মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছিল যে শাসক দলের ভোট কমবে। ঘটনাও তাই। নিচের সারণি দেখলে দলগত অবস্থান বোঝা যাবে ঃ

সারণি

দল	আসন
লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	৪৬
সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	১৬
সাকিগাকে (নতুন দিগন্ত) পার্টি	০৩
শিন্-শিন্তো (নতুন সীমানা) পার্টি	৪০
ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম পার্টি	০২
জাপান কমিউনিস্ট পার্টি	০৮
সিটিজেন্স্ পিস	০১
নির্দল	১০
মোট	**১২৬**

নির্বাচনে হেরেও কিন্তু মারায়ামা গদী ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, হাউস অব কাউন্সিল বা উচ্চতর কক্ষে হেরে গেলেও তাঁর পক্ষে সরকার চালাতে কোনই অসুবিধা হবে না। এদিকে, প্রায় সমস্ত জাপানী সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, কমিউনিস্টরা গতবারের নির্বাচনে জেতা তিনটি আসন তো ধরে রেখেছেনই, উপরন্তু অতিরিক্ত পাঁচটি আসনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জিতেছেন। শিন্-শিন্তো দলের অন্যতম মুখপাত্র, ব্যবসায়ী ইচিরো ওজাওয়া বলেছেন, যে নির্বাচনী ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে আর্থিক কেলেঙ্কারি, আমলাতান্ত্রিক অপশাসন, ও অর্থনৈতিক সংস্কারের অতি দ্রুতগতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনমত। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে এই ফলাফলের সূত্র ধরে জাপানে আর্থিক বিকাশ আরো শ্লথ হয়ে পড়বে। ততদিনে শেয়ার বাজারের 'নিকেই' সূচকে প্রতিদিন নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়।

১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেন, জাপানের রাজনৈতিক মহলের একাংশ এখনও যেভাবে জাপানী আগ্রাসন নীতিকে 'বৈধ ভিত্তি' দানের চেষ্টা করে চলেছেন তা নিন্দনীয়। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র তথা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শেন গুয়ো ফাং 'বেইজিঙ রিভিয়্যুর' সাম্প্রতিকতম সংখ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ জাপানী সামরিকতন্ত্রের সুপ্ত বীজকে জাগিয়ে তোলার এক ধরনের অসি-ঝন্‌ঝনা-র নীতি কিছু কিছু জাপানী রাজনৈতিক দল তথা মঞ্চ যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত

করে যাচ্ছেন তাতে অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতার ক্ষেত্রের বৃদ্ধি আশঙ্কা করাটা অমূলক নয়। উল্লেখ্য, জাপানী সংবাদপত্র 'টোকিও শিম্‌বুম্‌' সম্পাদকীয় কলামে প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছে। লন্ডন 'টাইমস' তো সরাসরি বলেছে যে, কুকীর্তির জন্য জাপানের সরকারীভাবে দুঃখপ্রকাশে প্রবল অনীহা আন্তর্জাতিক স্তরে দুর্ভাবনার সৃষ্টি করবে।

চীনের তরফে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় তথাকথিত 'তাইওয়ানি রাষ্ট্রপ্রধান' লী-তেঙ-হুই-র মার্কিনী সফর সম্পর্কে। এক বিবৃতিতে চীনের বিদেশ দপ্তরের অন্যতম প্রধান রেন ঝিন্‌ বলেন যে, লী-তেঙ্‌-হুই বেশ কিছুদিন ধরেই 'নমনীয় কূটনীতির' কথা বলে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছিলেন। মার্কিন সফরকালে তাঁর বক্তৃতা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতে তাইওয়ানের 'রাষ্ট্রপ্রধান' আবার নতুন করে 'দুই চীন' বা 'এক চীন' 'আর এক তাইওয়ান' তত্ত্বের কথা খুঁচিয়ে তুলছেন। গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সার্বভৌমিকতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে লী বলেছেন যে, 'এক দেশ-দুই সরকার', এই তত্ত্বের বাস্তবতা পরীক্ষা করার দিন আগত। রেন্‌ ঝিন্‌ বলেছেন ঃ "আমরা মনে করি এ ধরনের ইতিহাস-বিরোধী কথা বলে লী সমগ্র চীনা জনসাধারণের কাছে একজন জঘন্য বিশ্বাসঘাতক বলেই কুখ্যাতি লাভ করবেন, কারণ চীনা জনগণ চিরদিনই ঐক্যের পক্ষে এবং বিভাজনের বিরুদ্ধে।

সামগ্রিকভাবে, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এখনও উত্তেজনাপূর্ণ। অবরোধের প্রকোপে ইরাকের নাভিশ্বাস উঠছে। মৌল পরিষেবা ভেঙে পড়ছে সম্পূর্ণভাবে। ওষুধের অভাবে বিশেষ করে শিশু-মৃত্যুর হার বহুগুণ বেড়ে গেছে। কাগজ-বই-খাতা-কলমের অভাবে একের পর এক বিদ্যালয় যাচ্ছে বন্ধ হয়ে। তেল উৎপাদন/পরিশোধনের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি বছরের পর বছর অব্যবহারের ফলে অকেজো হয়ে পড়েছে। এতৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের সাহসী নেতৃত্বদায়ী ভূমিকার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা ও আস্থা জ্ঞাপন করে ইরাকের জনগণ দাঁতে দাঁত চেপে দিনের পর দিন অসম সাহসে, বিপুল আত্মত্যাগের আগুনে নিশঙ্কচিত্তে ঝাঁপ দিচ্ছেন। ফ্রান্স ও রাশিয়া, ইরাকের ওপর থেকে অবরোধ তোলার পক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব রাখলে তার তীব্র বিরোধিতা করে মার্কিনী প্রতিনিধি ম্যাডেলাইন অলব্রাইট মন্তব্য করেছেন ঃ 'হ্যাঁ, আমরা মানছি যে, অবরোধ এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র — কিন্তু অবরোধের বিকল্পের কথা উঠলে আমি আমার দেশের হয়ে কেবল সামরিক হস্তক্ষেপের কথাই ভাবতে পারি।' অলব্রাইটকে সমর্থন করেন ব্রিটেনের প্রতিনিধি ডেভিড হ্যানে — এবং ফরাসী-রুশ প্রস্তাবে 'ভেটো' পড়ে। ইরাক কিন্তু নতি স্বীকারের কোন লক্ষণই দেখাচ্ছে না — এবং এটাই ক্লিন্টন-মেজর-কোল কে ভাবাচ্ছে রাতদিন। গায়ের জোরে বিশ্বজনমতকে কতদিন ঠেকানো যাবে, কে জানে!

পশ্চিমী-ধাঁচের 'গণতন্ত্রীকৃত', 'বাজারমুখী' সরকারের উৎকৃষ্ট নমুনা হিসাবে দেখানো হয় কেতাদুরস্ত মহিলা প্রধানমন্ত্রী তানসু চিলিয়ের-র তুর্কিকে। কিন্তু বাজারীকরণের 'শক থেরাপীর' ধাক্কায় দেশের অর্থনীতি তখন চরম বেহাল অবস্থায় পড়ে। একের পর এক অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারির খবর বেরোচ্ছে ও'দেশের গণমাধ্যমগুলোয়। নামজাদা 'কলম'-লিখিয়ে চেঙ্গিজ খান্‌দার-এর ভাষায় ঃ "দেশের লোকের ঘেন্না ধরে গেছে বর্তমান সরকারের মাফিয়া-ধাঁচের কাজকর্মে — গোটা সামাজিক ব্যবস্থাটাকেই মনে হয় চিলিয়ের-সরকার একেবারে ধ্বসিয়ে দিয়ে তবে যাবে!" এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব তুর্কিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দ

জাতিগোষ্ঠীর সশস্ত্র সংগ্রাম ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছে। চিলিয়ের সরকার আধুনিকতম কামান-বোমা-গানশিপ্ ব্যবহার করেও ওই দুর্দমনীয় পাহাড়িয়া উপজাতিদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। এদিকে তুর্কির ওয়ার্কার্স পার্টি তাদের প্রভাব বাড়িয়েই চলেছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, রাজধানী আঙ্কারা ছাড়াও, পশ্চিমী বালিকেসির, ইজমির, আয়াদিন প্রভৃতি শহরে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রভাব বেড়েছে। এবং এই পরিস্থিতিতেই বিগত ৩০শে জানুয়ারি ১৯৯৫, চিলিয়ের সরকারের অন্যতম শরিক সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল, ওয়ার্কার্স পার্টি-সহ অন্যান্য বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

আফগানিস্তানে সংঘর্ষ আজও অব্যাহত আছে যদিও বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপদলের মধ্যে যেমন ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে যুদ্ধের আন্তর্জাতিকীকরণের দিকটি। বর্তমানে লড়াই চলছে রাষ্ট্রপ্রধান বুরহান-উদ্দীন রব্বাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য। পাকিস্তান মদতপুষ্ট 'তালিবান' গোষ্ঠীর ব্যর্থতার পরবর্তীতে, রব্বানী কালক্ষেপ না করে বিগত ২৪ জুন ১৯৯৫, 'তালিবান' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে অস্ত্রসংবরণে রাজী হয়েছেন। বিশেষ করে সোভিয়েত-নির্মিত 'সুখোই এস ইউ-২২' জঙ্গী বিমানাক্রমণের সামনে অসহায় 'তালিবান' গোষ্ঠী পাকিস্তানী ধর্মীয় নেতা তথা উলামা' মহম্মদ খাঁ শেরওয়ানির মধ্যস্থতা মেনে রব্বানি সরকারের শর্তেই যুদ্ধ বন্ধ করেছে। এখন রব্বানিকে লড়তে সরকার-বিরোধী এক জোটের বিরুদ্ধে। এই জোটের গোষ্ঠীগুলিকে কোন না কোন আঞ্চলিক শক্তি মদত যোগাচ্ছে। যেমন, গুলবুদ্দীন হেকমাতিয়ারের 'হিজব্-ই-ইসলামী'কে সমর্থন করছে পাকিস্তান; আবদুল রশিদ দোস্তামের জামবুশ-ই মেলী-ইসলামীর' মদতদাতা উজবেকিস্তান; এদিকে ইরাণের মদত পাচ্ছে মৌলানা মাঝহারির 'হিজ্ব-ই-ওয়াহ্দাতে'। এই ক্ষমতার লড়াই-এর পশ্চাৎপটে কাজ করছে বার্ষিক সাড়ে তিন কোটি ডলার মূল্যের মাদক ব্যবসা—যার কেন্দ্রভূমি আফগানিস্তান। কাবুলের ওপর বিমান-নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র এবং 'আর পি জি-৭' ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী রকেট আক্রমণ অব্যাহত আছে। কাবুল শহর ছেয়ে গেছে পদাতিক-সেনা বিরোধী 'ল্যান্ড মাইনে'। যাতে আহত-নিহত হচ্ছেন অসংখ্য বেসামরিক ব্যক্তি। বিগত ১৪ বছরের লড়াই চলাকালে গোটা আফগানিস্তানে পোঁতা হয়েছে দেড় কোটির বেশি নানা মাপের ও শক্তির মাইন। গোটা পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলেছে দেশে ১৫০টিরও বেশি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যাদের অনেকেরই মূল জীবিকা ডাকাতি, রাহাজানি ও পণবন্দী আটক করা। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি মেহমুদ মেস্তিরি-র মতে আফগানিস্তানের দুঃস্বপ্নের রাত কাটার কোন সম্ভাবনাই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না।

মার্কিন মধ্যস্থতায় মধ্য এশিয়ায় 'শান্তি প্রতিষ্ঠা'র যে প্রচেষ্টা চলছে তা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে দাঁড়িয়েছে। এর প্রত্যক্ষ কারণ অবশ্যই পশ্চিমী মদতপ্রাপ্ত ইজরায়েলের অনাকাঙ্ক্ষিত, যদিও প্রত্যাশিত, অবিমৃষ্যকারিতা। ইজরায়েল কোনমতেই গাজার-পশ্চিমাংশে নতুন নতুন অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য কায়েমের চিহ্ন হিসাবে ইহুদী উপনিবেশ তৈরি থেকে বিরত হচ্ছে না। অসংখ্যবার এই ইস্যুকে ঘিরে রক্তপাত-হয়েছে। বহু আরব নেতার বারবার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ইজরায়েল জমি দখল করেই চলেছে। দক্ষিণপন্থী 'লিখুদ' পার্টির নেতা বেনজামিন নেতানিয়াহু সি এন এন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই অবিবেচক উদ্যোগকে 'মাতৃভূমি'র লড়াই বলে বৈধতা দেবার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়ত, ঘন্টার পর ঘন্টা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরেও

ইজরায়েলেব বিদেশমন্ত্রী শিমন পেরেস গাজা ও জেরিকোতে পি এল ও-র নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসন গড়ে উঠতে দেবার ব্যাপারে অযথা দীর্ঘসূত্রতা দেখাচ্ছেন। পি এল ও নেতা ফায়সল হুসেইনি মন্তব্য করেছেন যে, যত দেরী হচ্ছে, ততোই হাত শক্ত হবে দু'পক্ষের উগ্রপন্থীদের। 'নিরাপত্তা' ও 'আববদেব' বেদখলী জমি ফিরিয়ে দেওয়া' — এই দুটি ক্ষেত্রেই আলোচনা থমকে গেছে বলে মনে কবেন অপর পি এল ও মধ্যস্থতাকাবী নাবিল শাথ্। তৃতীয়ত, জলবণ্টনের ক্ষেত্রেও ইজরায়েল দেখাচ্ছে এমন এক ধরনের অনমনীয় মনোভাব যা মূল চুক্তির বিরোধিতারই সমান। ইজরায়েলের কৃষিমন্ত্রী ইয়াকভ্ ঝুব 'আজাঁস ফ্রঁস্ প্রেস' সংবাদসংস্থার কাছে ১৯শে জুলাই ১৯৯৫-তে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, জলবণ্টনের ইস্যুটিতে কোন সমঝোতায় ইজবায়েল যাবে না — এবং, তাতে "যদি আলোচনা ভেঙে যায় তো যাক।" এদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পূর্ব জেরুজালেম অঞ্চলে ইজরায়েলের জমি দখলকে নিন্দা করে এক প্রস্তাব পেশ হবার মুখে তাতে মার্কিন প্রতিনিধি ম্যাডেলিন্ অলব্রাইট্ 'ভেটো' প্রয়োগ করার পর বিক্ষুব্ধ আরাফাত গাজা শহরে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, গোটা পরিস্থিতির ওপর একটা বিশ্বাসহীনতার ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে 'ইসলামীয় রেজিস্টান্স মুভমেন্ট' বা 'হামাসে'র দৈনিক সংবাদপত্র আল্-ওয়াতান্-এর সম্পাদক ইমাদী ফালুজী সম্প্রতি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, "স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমিকতা অর্জনের যে প্রতিশ্রুতির ফানুস আরাফাত উড়িয়েছিলেন মার্কিনী মদতে, তা ফেটে গেছে — একথা পরিষ্কার যে, সশস্ত্র আক্রমণ এবং অবশ্যই 'ইন্তিফাদাহ্' ছাড়া ইজরায়েলী উগ্রপন্থীদের আলোচনার টেবিলে টেনে আনা অসম্ভব।" এবং এরপর থেকেই দু'পক্ষের সশস্ত্র হানাদাররা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পয়লা জুলাই ১৯৯৫, থেকে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিহত হয়েছেন ২০০-র বেশি মানুষ। ২৪শে জুলাই ১৯৯৫ এক আত্মঘাতী আততায়ীর শরীরে-বাঁধা-বোমায় ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভের বুকেই নিহত হয়েছেন পাঁচ ব্যক্তি — আহত হয়েছেন আরো বিশ জন যাঁদের অনেকেরই অবস্থাই আশঙ্কাজনক। ইতোমধ্যে, তেল আভিভ-দামাস্কাসের মধ্যেকার আলোচনাও ভেঙে পড়ার মুখে — এখানে মুখ্য বাধা 'গোলান হাইট্স' থেকে ইজরায়েলের সরে আসার প্রশ্নটি। ইজরায়েলী মুখপাত্র ইউরী ড্রোমী বলেছেন, "নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন আপসে তাঁর সরকার রাজী নন।" এদিকে, অতর্কিত এক কম্যান্ডো হানায় ইজরায়েলী সংস্থা 'মোসাদে'র এক রেজিমেন্ট দক্ষিণে লেবাননে হামলা চালিয়ে শতাধিক ব্যক্তিকে হতাহত করেছে — এবং এরা সবাই বেসামরিক ব্যক্তি যাঁদের একমাত্র দোষ এইমাত্র যে তাঁরা আরবজাতিভুক্ত। মধ্য এশিয়ার অপর মার্কিন তাঁবেদার শাসক, মিশরের হোস্‌ন্-ই মুবারকের ওপর ঐসলামীয় মৌলবাদীদের হানা, তাও আবার সুদানের রাজধানী খারতুম শহরের বুকে। প্রকৃতপক্ষে, মার্কিনী কূটনৈতিক ব্যর্থতা গোটা মধ্য পশ্চিম এশিয়ায় মৌলবাদকে নতুন করে মদত দিচ্ছে।

নেপাল

হিমালয়ের কোলে ছোট্ট দেশ নেপাল। ১৯৮৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা' নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (একীকৃৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক মদন ভাণ্ডারী

ঘোষণা করেছিলেন, সেদিন আর বেশি দেরি নেই, যখন সাগরমাথা বা এভাবেস্টে লাল পতাকা উড়বে। সমাজতন্ত্রের প্রতি এবং মার্কসবাদের প্রতি অবিচল আস্থা সি পি এ্ন (ইউ এম এল) ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তার মাত্র কয়েকদিন বাদেই তিনি নেপালের দাসধুঙ্গায় এক জিপ দুর্ঘটনায় নিহত হন। সহযাত্রী এবং পার্টির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য জীবরাজ আশ্রিতও একই দুর্ঘটনায় নিহত হন। কিন্তু জিপের চালক অমর লামা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকার ফলে এই দুর্ঘটনা নিয়ে সংশয় দেখা দেয় — এটা কী নিছক দুর্ঘটনা, না কী হত্যাকাণ্ড?

এরপব নেপালেব সরকার সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রচণ্ড রাজ অনিলের নেতৃত্বে এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করে। অন্যদিকে পার্টিও একটা তদন্ত কমিশন গঠন করে। এছাড়া নেপালের মানবাধিকার সমিতি এবং বুদ্ধিজীবী পরিষদ মিলিতভাবে এক তদন্ত কমিশন গঠন করে।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (এ মা লে) দেশের প্রধান বিরোধী দল এবং দেশের ৭৫টি জেলায় তাদের প্রভাবও বিরাট। নেতারাও খুব জনপ্রিয়। ৩০ বছর ধরে রাজার স্বৈরশাসনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের মধ্যে কাজ করে গোপনে। অনেক অত্যাচার-নিপীড়ন গোটা পার্টিকে সইতে হয়। অনেক কর্মী নিহত হন। অনেক নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ ছিলেন। আত্মগোপন অবস্থায় তাঁরা কঠোর জীবনযাপন করেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসেবে পৃথিবীর প্রথম দশটি দরিদ্র দেশের মধ্যে নেপাল অন্যতম। এই গরিব মানুষের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি খুবই শক্তিশালী। ১৯৮৯ সালে গণতন্ত্রের দাবিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলে। তাতে বুর্জোয়া দল নেপালী কংগ্রেস এবং কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল পুরোভাগে। প্রচণ্ড দমনপীড়ন চালিয়েও এই আন্দোলন দমন করা যায় নি। আন্দোলনের চাপে নতিস্বীকার করতে হয় রাজাকে এবং গঠিত হয়. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তাতে নেপালী কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য আন্দোলনকারী দল এই সরকারে অংশ নেয়। রাজার দলহীন পঞ্চায়েত শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নতুন সংবিধান তৈরি করে যেখানে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন সুনিশ্চিত করা যায়। পুলিস, প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর ওপর রাজার কতৃত্ব তখনও যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় সংবিধানে রাজতন্ত্রের চিহ্ন পুরোপুরি মুছে দেওয়া যায়নি। রাজাই রাষ্ট্রের প্রধান থাকে। একই কারণে সংবিধানে আরও কিছু দুর্বলতা থেকে যায় যদিও রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতাকে সংবিধানে খর্ব করা হয়েছে। বন্দী রাজনৈতিক নেতারা মুক্তি পান। আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসেন কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। জনগণের কাছ থেকে তাঁরা পান বীরের সংবর্ধনা।

এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহুদলীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির তিনটি অংশ মিলে বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (ইউনিফায়েড মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট) গঠিত হয়। যে তিনটি দল মিলে এই পার্টি গঠিত হয় তা হলো ঃ কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মার্কিস্ট), কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট) এবং নেপাল পেজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স কাউন্সিল বা সি পি এন পার্টি (ইউনিটি)।

সংসদীয় নির্বাচনের অভিজ্ঞতা কমিউনিস্ট পার্টির ছিল না বললেই চলে। নেপালী কংগ্রেসের তা আছে এবং ছয়ের দশকের গোড়ায় তারা সরকারও গঠন করেছিল। যদিও রাজা সেই সরকার উচ্ছেদ করে দিয়ে রাজতন্ত্র কায়েম করেছিলেন।

নির্বাচনে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট জয় হয়। ২০৩টি সংসদ

(প্রতিনিধি সভা) আসনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি (এ মা লে) পায় ৬৯টি আসন এবং তাদের নির্বাচনী বামপন্থী সহযোগীসহ পায় ৮২টি আসন। অল্প ভোটের ব্যবধানে অনেকগুলি আসন কমিউনিস্ট পার্টিকে হারাতে হয়। কমিউনিস্টদের এই সংসদীয় অনভিজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নেপালী কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং প্রধানমন্ত্রী হন গিরিজাপ্রসাদ কৈরালা।

কিন্তু এই দল গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে সম্মুখ সারিতে থাকলেও সরকারে আসার পব জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে নজরই দেয়নি। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে ওঠে বিভিন্ন ইস্যুতে। এই বিরোধ ক্রমশঃ যখন বাড়ছিল, তখনই বিচারপতি রাজ অনিলের রিপোর্ট আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে চালক অমর লামার অসতর্কতার জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এটা হত্যাকাণ্ড নয়। এর ফলে দেশজুড়ে বিক্ষোভের দাবানল জ্বলে ওঠে। লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেমে পড়েন এবং পুলিসের নির্বিচার গুলিতে নিহত হয় প্রায় ৩০ জন। এর মধ্যে মাত্র ১৮ জনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এর বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। দাবি ওঠে প্রধানমন্ত্রী গিরিজাপ্রসাদ কৈরালাকে পদত্যাগ করতে হবে এবং সর্বদলীয় তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে। অভিযোগ ওঠে, মদন ভাণ্ডারী ও জীবরাজ আশ্রিতের হত্যাকাণ্ডের পেছনে সরকারেরও হাত আছে।

আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন সি পি এন (ইউ এম এল)-র নতুন সাধারণ সম্পাদক মাধব নেপাল। অন্যান্য কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী দলও এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। এদের শক্তি যদিও তুলনামূলকভাবে কম। ১০ দফা দাবিতে এই আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল আগস্ট মাসে তিনদিনের নেপাল বন্ধ এবং রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে দশ লক্ষ লোকের জমায়েত। এই আন্দোলনের শক্তিকে তুলনা করা যায় ১৯৮৯ সালে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে।

এই আন্দোলনের আভাস মিলেছিল দশরথ স্টেডিয়ামে দুই প্রয়াত নেতার প্রতি নেপালের সব প্রান্ত থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। শোকযাত্রায় নেপাল ভেঙ্গে পড়ে কাঠমাণ্ডুতে কয়েকলক্ষ মানুষ তাতে অংশ নেন। শুধু পার্টির অনুগামী নন, অগণিত সাধারণ মানুষও যোগ দেন শোকমিছিলে। পার্টির জনপ্রিয়তা তাতে আরেকবার সপ্রমাণিত। এই মৃত্যুকে মানুষ সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। কমিশনের রায় বেরুতেই তার বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ ফেটে পড়ে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পৃথক দেশ হিসাবে নেপাল আত্মপ্রকাশ করলেও সেখানে রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৯ সালে। এর মাত্র ২৩ বছর পর ১৭৯২ সালে নেপাল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের কবলে চলে যায়। আর এই ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো পরিচালিত হয় রাজতন্ত্রের মাধ্যমে। ব্রিটিশ উপনিবেশিকদের সাহায্যে রানা পরিবার সেখানে ১৮৪৩ থেকে ১৯৫১ অর্থাৎ একশ' বছরের বেশি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। ব্রিটিশ উপনিবেশিকদের স্বার্থে ও তাদের ইচ্ছা অনুযায়ীই রানা পরিবার নেপালকে বহির্বিশ্ব থেকে

বিচ্ছিন্ন করে রাখে। শুধু তাই নয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার নেপালের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। সেই চুক্তির মধ্যে মূল কথা হলো, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নেপাল থেকে সৈন্য নিয়োগ করতে পারবে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে আটটি নেপালী ব্যাটেলিয়ান রয়েছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ৭ হাজার নেপালী সৈন্য রয়েছে। আর তাঁরা অবস্থান কবছেন ব্রিটেন, এবং ব্রুনেইতে।

১৯৫১ সালে রানা রাজতন্ত্রেব বিরুদ্ধে রাজা ত্রিভুবনের সপক্ষে গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঐ বছরের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ত্রিভূবন নেপালের শাসনক্ষমতায় আসীন হন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। ১৯৫৫ সালে রাজা ত্রিভূবন মারা যান। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্‌ নেপালের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি নেপালের রুদ্ধদ্বার বর্হিবিশ্বের সামনে খুলে দেন। এ বছরেই নেপাল রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ অর্জন করে। রাজা মহেন্দ্র'র সামনে দেশে বেশ কয়েকটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নেপালে আধুনিকীকরণের শুরু হয়, বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে ১৯৬০ সালে নেপালে সীমান্ত সমস্যা শুরু হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। রাজা মহেন্দ্র দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৬২ সালে দেশে নতুন সংবিধান তৈরি হয়। সেই সংবিধানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আরো বিকাশ ঘটানোর কথা বলা হয়। ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি রাজা মহেন্দ্র'র জীবনাবসান ঘটে। তাঁর সময়েই বর্হিবিশ্বের সাথে নেপালের প্রকৃত অর্থে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পঞ্চাশটি দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি মহেন্দ্র'র পুত্র বীরেন্দ্র বীর বিক্রমশাহ্‌ দেব নেপালের রাজার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েই নেপাল প্রথম বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

এদিকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানে গণ-অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। অসন্তোষ বিক্ষোভে রূপ নেয়। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে কাঠমাণ্ডুতে বিশাল বিশাল বিক্ষোভ-সমাবেশ সংঘটিত হয়। ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে দাঁড়িয়ে রাজা বীরেন্দ্র দেশের শাসন কাঠামোর প্রশ্নে গণ-ভোটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে গণ-ভোট গৃহীত হয়। ৫৫ শতাংশ নর-নারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সপক্ষে ভোট দেন, বাকি ৪২ শতাংশ নর-নারী ভোট দেন বহুদল ব্যবস্থার পক্ষে। নেপালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মর্মার্থ হলো, দেশের সমস্ত নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় পঞ্চায়েত বা সংসদের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

রাজনৈতিক অস্থিরতার আর্বতে নেপাল

নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেকার আঁতাতের সমীকরণও বদলে গেছে। নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (একীকৃৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), সংক্ষেপে নেকপা-এমালে'র সংখ্যালঘু সরকার নয় মাসের মধ্যেই ক্ষমতাচ্যুত হয়। ক্ষমতায় আসে নেপালী কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার। ১৯৯৪ সালের ১৫ই নভেম্বর মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচনে নেকপা-এমালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। নেপালের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। ১৯৮৯-৯০ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবিতে নেপালী কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের দেশব্যাপী উত্তাল আন্দোলনে রাজতন্ত্রে ধস নামে

এবং ১৯৯১ সালে মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম স্বাধীন সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচন পরিচালনা কবে নেপালী কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মিলিত অস্থায়ী সরকার। সংগ্রামে যারা ছিল এককাট্রা, নির্বাচনে একে অপরেব পবম শত্রু হয়ে যায়। তখন বাজতন্ত্রের অনুগামী রাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক পার্টি কিংবা আর পি পি, নেপালী কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের কাছে অচ্ছুত হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শোচনীয় ফলের সম্মুখীন হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন সমাজতন্ত্রের চরম বিপর্যয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা, তখন নেপালে একপা-এমালে সংখ্যাগবিষ্ঠতাব কাছাকাছি পৌছে গোটা পৃথিবীতে হিমালযেব এই ছোট্ট দরিদ্র পার্বত্যরাষ্ট্র আলোড়ন তোলে। নেপালী কংগ্রেস সরকার গঠন করলেও তাদেব জনবিরোধী ভূমিকা প্রকট হয়ে ওঠে এবং দলের মধ্যেও অর্ন্তদ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। ১৯৯৪ সালের জুন মাসে অর্ন্তদলীয় বিরোধে এই সরকারের পতন ঘটে। তখন নেকপা-এমালে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানায়, এ জন্যে মামলাও করেন। কিন্তু রাজা বীবেন্দ্র নেপালী কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে ভেঙে দেন ২০৫ সদসস্যের নিম্নকক্ষের সংসদ-প্রতিনিধিসভা এবং সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। সুপ্রিম কোর্টও রাজার আদেশকে বহাল বাখেন।

এই নির্বাচনে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। নেকপা-এমালে পায় ৮৭টি আসন, নেপালী কংগ্রেস ৮১টি, আর পি পি ১৯, আঞ্চলিক দল সম্ভাবনা ৩টি। দুটি বামপন্থী কমিউনিস্ট দল পাঁচটি আসন পায়। এছাড়া নির্দলরা কয়েকটি আসন পায়। আর পি পি তাদের শক্তি এই নির্বাচনে যথেষ্ট বাড়িয়ে নেয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নেপালী কংগ্রেস সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কার আর পি পি এবং সম্ভাবনা পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়তে সাহস করেনি। ফলে নেকপা-এমালে-র কাছে সংখ্যালঘু সরকার গঠনের সুযোগ আসে। নেপালী কংগ্রেস, আর পি পি এবং সম্ভাবনা পার্টি ও নির্দলরা এমালে সরকারকে সমর্থন না করলেও বিরোধিতা করবে না বলে ঘোষণা করেছিল।

নেকপা-এমালে সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন অধিকারী সকলের পরামর্শ নিয়ে সরকার চালানোর নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু বিরোধীরা সহযোগিতার বদলে সুযোগ বুঝে আঘাত করার জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল। সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয়বিদ্ধ এমালে সরকার দ্রুতলয়ে জনমুখী অনেকগুলি কর্মসূচী রূপায়ণে হাত দেয় যেখানে মানুষেরও বিপুল সাড়া মেলে। নেপালে নির্বাচিত গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পর, ৭৫টি জেলায় উন্নয়ন কমিটি, তারপরই প্রতিনিধিসভা বা সংসদ। গ্রামোন্নয়নে কোন সরকারই ইতোপুর্বে নজর দেয়নি। এমালে সরকার গ্রামোন্নয়ন কমিটিগুলির হাতে সরাসরি ৩ লক্ষ টাকা করে দেয় গ্রামোন্নয়ন, পানীয় জল, ইত্যাদির জন্য। মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার দেয়, ভূমিসংস্কারে উদ্যোগ নেয়, বন্যা, ধস ও ভূমিকম্পে গৃহহীন আশ্রয়হীন, কয়েকলক্ষ মানুষ যাদের বলা হয় (সুখুমবাসী) এবং খেতমজুরদের মিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষকে বাস্তুভিটা দেয়। খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাও বিকেন্দ্রিত করে সরাসরি গ্রামে খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা পৌছানোর ব্যবস্থা করে। রাজনৈতিক কারণে বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্বহাল করে। গণতান্ত্রিক অধিকারও সুনিশ্চিত হয়। এছাড়া ভারত-নেপাল সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন, নাগরিকত্বের অধিকার, ভাষা ও জাতি সমস্যা লাঘব করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতেও হাত দেয়। দুর্বলতার দিকও আছে। মন্ত্রিসভার মধ্যেই কিছু বিরোধ দেখা দেয়, সেটা দলের মধ্যেও চলে আসে। সি পি মৈনালীর মতো জনপ্রিয় নেতাকে মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণ করা হয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে নেপাল খুবই দুর্বল এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচারে সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অন্যতম নেপাল। জগদ্দল পাথরের মতো এই সমস্যা দূর করা দীর্ঘমেয়াদী কাজ। যখন এমালে সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়ছে, তখন তাতে পূর্ণচ্ছেদ টানার জন্য নেপালী কংগ্রেস, আর পি পি এবং সম্ভাবনা পার্টি প্রতিনিধিসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের জন্য রাজার কাছে সুপারিশ করে। বিগত বছরের দৃষ্টান্ত অনুসারে রাজা প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ মেনে নিয়ে ১৩ই নভেম্বর, ১৯৯৫ সংসদ বাতিল করেন, ২৩ শে নভেম্বর, ১৯৯৫, মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন এবং পরবর্তী সরকার না হওয়া পর্যন্ত অধিকারী সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে কাজ চালানোর নির্দেশ দেন।

নেপালী কংগ্রেসের জোট এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায়। গতবছর একই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট রাজার আদেশ বহাল রাখলেও এবার রাজার আদেশ ও ঘোষণার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে ২৮শে আগষ্ট, ১৯৯৫, সংসদ বা প্রতিনিধিসভা পুনর্বহাল করে। এর বিরুদ্ধে এমালে সরকার ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৫, সাধারণ ধর্মঘটসহ বিক্ষোভ আন্দোলন করে এবং সুপ্রিম কোর্টের "পক্ষপাতমূলক' ভূমিকার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে রাজা ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, প্রতিনিধিসভার অধিবেশন ডেকে অধিকারী সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব বিবেচনার নির্দেশ জারি করেন। আর পি পি-র সঙ্গে এমালে নেতৃবৃন্দ আলোচনা শুরু করেন সরকারকে রক্ষার জন্য। কিন্তু তাতে এমালে দলের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় এই প্রক্রিয়া আর এগোয়নি এবং যথারীতি নেপালী কংগ্রেসের শের বাহাদুর দেওয়া-র নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই সুবিধাবাদী আঁতাত রক্ষা করতে রাজতন্ত্রের অনুগামী আর পি পি-র ১৯ সদস্যের মধ্যে ১৩ জনকে মন্ত্রী করা হয়। অন্যদিকে নেপালী কংগ্রেসের মন্ত্রী হয় মাত্র ১৪ জন।

নেপালী কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চিরন্তন। দলের প্রবীণ নেতা কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টরাই এবং গণেশ মান সিং গিরিজাপ্রসাদ কৈরালার বিরুদ্ধে। এ কারণে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে দেওরাকে, যদিও নেপালী কংগ্রেসের সাংসদদের মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ কৈরালার অনুগামী। নেপালী কংগ্রেসের অনুগামীরাও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিল এবং আর পি পি সেদিনও ছিল চরম শত্রু। এই দুয়ের সুবিধাবাদী জোটও ক্ষণভঙ্গুর। ফলে স্থায়িত্ব নিয়ে সবসময় এই সরকারও সঙ্কটে। নেকপা-এমালে এবং অন্যান্য ছোট ছোট বামপন্থী কমিউনিস্ট দল ও গোষ্ঠীগুলি এই সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার মেঘ নেপালের আকাশ থেকে সহজে কাটবার নয়।

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি ১৯৮৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে আরো অবনতি ঘটে। শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা এই দু'দেশের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কেরও পূর্বের তুলনায় অবনতি ঘটে।

শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েক সেখানকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে

এবং ভারতের হাইকমিশনার জে এন দীক্ষিতের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই বৈঠকের পর তিনি এক বিবৃতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, দেশের অভ্যন্তরে যে ধরনের হত্যাকাণ্ড চলছে তা অব্যাহত থাকলে শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের মধ্যে যে ধরনের বৈবিতা সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান না হলে দেশের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ডও বন্ধ হবে না।

প্রকৃতপক্ষে এইসময় শ্রীলঙ্কার বুকে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাতে সিরিমাভো বন্দরনায়েকের আশঙ্কাই প্রমাণিত হয়েছে। ২১শে এপ্রিল (১৯৮৭) কলম্বোর সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের ফলে দেড় শতাধিক বাসযাত্রী নিহত হন। কমপক্ষে ৩০ জন বাসযাত্রী ঘটনাস্থলেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। নিহত ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন সিংহলীজ। আর হত্যাকাণ্ডের পিছনে তামিল উগ্রপন্থীদের হাত রয়েছে বলে সরকার থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

এই মর্মন্তুদ ঘটনার ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হতে না হতেই শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে জাফনায় তামিল গেরিলাদের ঘাঁটিগুলিতে শ্রীলঙ্কার স্থল ও বিমান বাহিনী ২২শে এপ্রিল (১৯৮৭) ব্যাপক আক্রমণ চালায়। বিমান থেকে বোমা ও হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ করা হয়। এছাড়া স্থলবাহিনীর সেনারা কামান থেকে একের পর এক গোলাও নিক্ষেপ করে। অপরদিকে তামিল গেরিলারাও শ্রীলঙ্কার সেনা ছাউনিগুলিতে পাল্টা আঘাত হানে। এদিনের সংঘর্ষে দু'শ জনের বেশি ব্যক্তি নিহত হন। এরপরও ৪৮ ঘণ্টা ধরে জাফনায় সরকারী সৈন্যদলের বোমাবর্ষণ চলে এবং শতাধিক ব্যক্তি নিহত হন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসের গোটা তৃতীয় সপ্তাহ ধরে শ্রীলঙ্কার বুকে চলে রক্তাক্ত অভিযান।

শ্রীলঙ্কায় তামিল এবং সিংহলীজ জনগণের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ বন্ধের কোন পথই সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলি খুঁজে এখনও বের করতে পারছে না। অথচ সেখানকার শাসক এবং বিরোধী দলগুলি ভালো করেই জানে যে, শ্রীলঙ্কার বুকে তামিলদের বিরুদ্ধে কার্যতঃ যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে তা কারো পক্ষেই বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দেশের অভ্যন্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে যদি এই সংঘাত বেশিদিন চলে তবে দেশের অর্থনীতি আরো বেশি করে পশ্চিমী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। অন্ততঃ ঐ দেশের দেশপ্রেমিক শক্তি এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করেছে।

একথা সকলেরই জানা যে, শ্রীলঙ্কায় ইজরায়েল, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাড়াটে সৈন্য রয়েছে। তারা তামিলদের বিরুদ্ধে অভিযানে সরকারের পক্ষে কাজ করছে। তা ছাড়া পাকিস্তানের সৈন্য আবার কীভাবে তামিল উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে সিংহলীজ সৈন্যদের তালিম দিচ্ছে। এক কথায় শ্রীলঙ্কার বুকে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সমাবেশ ঘটেছে। এই প্রতিক্রিয়ার শক্তির সাহায্যে শ্রীলঙ্কা সরকার দেশের নিজ জাতিদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত অভিযানে নেমেছে।

সেখানে যে মার্কিনী ভাড়াটে সৈন্য থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কেননা ত্রিঙ্কোমালির প্রতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের শকুনির দৃষ্টি দীর্ঘদিনের। ত্রিঙ্কোমালির বুকে ঘাঁটি করে তারা সমগ্র শ্রীলঙ্কায় তার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। দীর্ঘদিনের সংঘাত এবং অস্থিরতা কেবল যে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে তাই নয় — এই সংঘাত শ্রীলঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশের দ্বার আরো উন্মুক্ত করেছে। শ্রীলঙ্কা

সরকারের অনেক মন্ত্রীই এই সত্য জানেন। তাঁরা দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধানও চান। কিন্তু সরকারের অভ্যন্তরের প্রতিক্রিয়ার চক্র সব সময়ই দেশের অভ্যন্তরে সিংহলীজ এবং তামিলদের মধ্যে বিরোধ জীইয়ে রেখে চলেছে।

এটা দুঃখের বিষয় যে, সেখানকার সমস্ত বিরোধী দল এই বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না। এদের অনেকেই তামিল উগ্রপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করে সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী। তাবা প্রকৃতপক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যই হাসিল করছে। এমন কি সিরিমাভো বন্দরনায়েকও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তিনিও দোদুল্যমানতার শিকার হচ্ছেন।

শ্রীলঙ্কার বামপন্থী দলগুলি বিশেষ করে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য এ ব্যাপারে খুবই সচেতন এবং সতর্ক। তারা সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের বিপদ সম্পর্কেও সচেতন। তারা সঠিকভাবেই মনে করে তামিল উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা সম্ভব এবং অভ্যন্তরীণ সমস্যার নিষ্পত্তি সম্ভব।

রক্তস্নাত জাফনা

দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বহু রক্তাক্ত যুদ্ধ আর হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৯৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার জাতীয় পতাকা জাফনার বুকে উত্তোলিত হয়। দেশের তিন সেনা প্রধানের উপস্থিতিতে ঘোষিত হয় যে জাফনা মুক্ত, জাফনা শ্রীলঙ্কার এক অঙ্গ প্রদেশ। প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারতুঙ্গ । আরও ঘোষণা করেন যে, যে সমস্ত তামিল উগ্রপন্থী অস্ত্র সংবরণ করবে, যারা সরকারী সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে তাদের সকলকেই সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে। প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই এল টি টি ই-র সর্বাধিনায়ক প্রভাকরণ তার নিহত এল টি টি ই উগ্রপন্থীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে বার্তা প্রেরণ করেন সেই বার্তায় তিনি বলেন, চন্দ্রিকা শান্তি সংকেত প্রেরণ করতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে, যতদিন পর্যন্ত সিংহলী সেনাবাহিনী জাফনা দখল করে থাকবে ততদিন পর্যন্ত শান্তির দরজাটিও বন্ধ থাকবে। বন্দুকের নলের ডগায় দাঁড়িয়ে এল টি টি ই কোন শান্তি আলোচনায় বসবে না। প্রভাকরণের এল টি টি ই পরিচালিত বেতার ভাষণের প্রত্যুত্তরে প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা পাঁচ দফা প্রস্তাব দেন। এই পাঁচ দফা প্রস্তাবের মূল কথা হলো (১) জাফনা সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আলোচনার প্রয়োজন, (২) স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজনৈতিক প্যাকেজের ভিত্তিতে উভয়পক্ষের সম উদ্যোগ প্রয়োজন, (৩) যে সমস্ত এল টি টি ই সদস্য অস্ত্র সংবরণ করবে তাদের সকলকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব নেবে সরকার (৫) জাফনার অধিবাসীরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এলে তাদের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে সরকার। এই প্রস্তাবও এল টি টি ই-র মুখপাত্র লরেন্স থিলোকন প্রত্যাখ্যান করেন।

শ্রীলঙ্কার সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী যখন জাফনার বিদ্রোহীদের সব থেকে শক্তিশালী ঘাঁটি বলে পরিচিত অঞ্চলে হেলিকপ্টারে 'নিরাপদে' অবতরণ করেন তখন বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হয় যে তামিল বিদ্রোহীদের অবরোধ চূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি তামিল বিদ্রোহীদের অবরোধ চূর্ণ হয়েছিল? জাফনা শহরে প্রবেশ করতে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীকে কি বেগটাই না পেতে হয়েছিল? জাফনার নিকটবর্তী শ্রীলঙ্কার সেনা ঘাঁটির নাম পালালি। পালালি থেকে

জাফনার দূরত্ব মাত্র কয়েক কিলোমিটার। কিন্তু কয়েক কিলোমিটার পথ এগুতে সেনাবাহিনীব সময় লাগে পাঁচ সপ্তাহ। আর জাফনা শহরের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে সেনাবাহিনীর আরও দু-সপ্তাহ সময় লাগে। সরকারী হিসেব মতই এই অভিযানের সময দু-হাজার তামিল বিদ্রোহী নিহত হন। অন্যদিকে পাঁচ হাজারের বেশি সবকারী সৈন্য নিহত হন এবং দু'টি যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত হয়। জাফনার পতনের পর যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়। ১৯৯০ সালে সেখান থেকে ভারতীয় শান্তিসেনা প্রত্যাহৃত হবার পর উত্তর শ্রীলঙ্কার এই ক্ষুদ্র তামিল রাজ্য সেখানকার স্বায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়। কলম্বো সরকার সেখানকাব সরকারী কর্তাব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রশাসকদের জন্য যেমন ঢালাও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে ঠিক তেমনি তামিল উগ্রপন্থীরা পালটা প্রশাসন চালাতে থাকে, পালটা অর্থনৈতিক ও আইন ব্যবস্থা প্রর্বতন করে। জাফনা দখলের পরও আমরা আশা করতে পারিনি যে সেখানে স্বাধীন তামিলরাষ্ট্রের দাবিতে গত বার বছর ধরে যে যুদ্ধ চলছিল তার অবসান ঘটবে। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী তখন সমগ্র জাফনা উপদ্বীপের মাত্র এক তৃতীয়াংশ দখল করেছে। তামিল টাইগাররা উপদ্বীপের উত্তবাংশেব গ্রাম, শহর এবং জঙ্গলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও নিজেদের দখলে রেখেছে। উভয়পক্ষই নিজ নিজ বাহিনীতে নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করেছে। সেখানে সে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার নিরসন ঘটিয়ে ঐক্য স্থাপন করাটাই সব থেকে বড় সমস্যা। যে সমস্ত তামিল জনসাধারণ উগ্রপন্থীদের সমর্থন করেন না তাঁরাও আজ অপমানিতবোধ করছেন। এই সময় প্রায় দু'লক্ষ তামিল নাগরিক জাফনা ত্যাগ করেছেন। তাঁরা টাইগারদের নতুন সদর দপ্তর ভান্নির কিলিনোচ্ছিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। টাইগাররাও তাঁদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ না হবার জন্য।

যুদ্ধের নিরসন না ঘটলেও ১৯৯৫ সালের ৫ই ডিসেম্বরের ঘটনার পর শান্তি প্রয়াসের এক নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী আকস্মিকভাবে জাফনা দখল করেনি। ১৯৯৫ সালের ১৯শে এপ্রিল টাইগার গেরিলারা যখন জাফনা শহরের দখল নেয় তখন সেখানে শ্রীলঙ্কার কোন সৈন্যদল উপস্থিত ছিল না। জাফনা দখলের প্রশ্নে এল টি টি ই সশস্ত্র অভিযানের সূত্রপাত ঘটায়। তারাই একতরফাভাবে আলোচনার পরিবেশ নষ্ট করে এবং যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের মধ্যদিয়ে শ্রীলঙ্কার বুকে প্রজ্জ্বলিত জাতি সমস্যার সমাধানের যে কল্পনা এল টি টি ই করেছিল ১৯৯৫ সালের ৫ই ডিসেম্বরের ঘটনার মধ্যদিয়ে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সামরিক শক্তির সাহায্যে তারা পৃথক তামিল রাষ্ট্র স্থাপনেব লক্ষ্য নিয়ে যে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছিল তা অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এল টি টি ই-র করণীয় ছিল শ্রীলঙ্কাকে বিভাজন করার নীতি পরিত্যাগ করা, তামিল জনগণের জন্য পৃথক জাতি সত্তার স্বীকৃতির জন্য অবিলম্বে আলোচনায় বসা, শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরেই সায়ত্বশাসনের দাবিতে সোচ্চার হওয়া। প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা যে পাঁচদফা প্রস্তাব দিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারতো।

বাংলাদেশ

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ রাতে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। আর এবার এই সামরিক অভুত্থান হয় বিনা রক্তপাতে। দেশের সংবিধান, জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে

যায়। রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন। সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এরশাদের হাতে। যথারীতি দেশে সামরিক আইন জারি হয়। সমস্ত রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার করা হয় রাজনৈতিক নেতাদের। এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের অধিকাংশ কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ হয় গ্রেপ্তার হন নতুবা গৃহবন্দী হন। প্রাক্তন মন্ত্রীদের কেউ কেউ পলাতক, কেউ কেউ বন্দী।

স্বাধীনতা লাভের পরে এই নিয়ে বাংলাদেশে চার বার সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হলো। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠিত হয়। মাত্র চার বছর এই সরকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবর রহমন এবং তাঁর পরিবারের লোকজন নিহত হন। ঐ বছরেরই ৩রা নভেম্বর আর একটি মিনি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সেই অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর প্রধান জিয়াউর রহমান বন্দী হন। মাত্র চারদিনের ব্যবধানে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান দেশের শ্যাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে জিয়াউর রহমান নিহত হন। অবশ্য সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপ রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহন করেন। এর কয়েকমাস পরে নির্বাচন হয় এবং বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। বিরোধী পক্ষ এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তোলে।

২৪শে মার্চ (১৯৮২) রাতে বাংলাদেশে যে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তা কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল না। জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর বিশেষ করে বাংলাদেশে নির্বাচনের পর সেখানে যে রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে এই ধরনের সামরিক অভ্যুত্থান যে ঘটবে তা অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন। এই অভ্যুত্থানের পূর্বেই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুস সত্তার কার্যতঃ সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী বহু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, আব্দুস সত্তারকে তাঁর মন্ত্রিসভা বাতিল করতে হয়। দুর্নীতির অভিযোগে এই মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়। মন্ত্রিসভা বাতিল হবার পর ২৪ ঘণ্টা পূর্বেও সাত্তার জানতেন না যে তাঁকে এই ভাবে মন্ত্রিসভা বাতিল করতে হবে। ১১ই ফেব্রুয়ারি (১৯৮২) বিকালে সেনাবাহিনীর প্রধান এইচ এম এরশাদ তাঁর সাতজন সহকর্মীকে নিয়ে বঙ্গভবনে যান। তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে বলেন, হয় আপনি নিজে পদত্যাগ করুন, নতুবা মন্ত্রিসভা বাতিল করুন। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সাথে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানদের চারঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়। বৈঠকে মন্ত্রিসভা বাতিল করে ছোট একটি মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি সাত্তার মেনে নেন। এরপর সেনাবাহিনীর অফিসারেরা চলে গেলে সন্ধ্যার সাত্তার বেতার ও টেলিভিশন মারফত মন্ত্রিসভা বাতিলের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু সাত্তার যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন সেই মন্ত্রিসভা তাঁর দল জাতীয়তাবাদী দলের একটি গোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে গঠন করা হয়। যাঁদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় তাঁরা কেউই দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণের উর্দ্ধে ছিলেন না। দলের অভ্যন্তরে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি সাহস হারিয়ে ফেলেন। একজন মন্ত্রী তাঁর বাড়িতে

সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিলে দেশব্যাপী সেই মন্ত্রীব বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু সেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা আব্দুস সাত্তার গ্রহণ করতে পারেন না। পরে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের পব ঐ মন্ত্রীকে বাতিল করা হয়।

দেশের এই জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ একের পর এক বিবৃতি দিতে থাকেন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এই সমস্ত বিবৃতি ছিল খুবই আপত্তিকর। কিন্তু অসহায় সাত্তার সেই সমস্ত বিবৃতির প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেন নি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল অসহায় সাত্তারকে আরো বেশি অসহায় করে তোলে। দেশে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকাব ধারণ করে। বিশেষ করে খাদ্য পরিস্থিতিকে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে।

আব্দুস সাত্তার সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সব রকমের ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনি একটি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল পর্যন্ত গঠন করেন। এই নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনেব বিরুদ্ধে বিরোধীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এক কথায়, একের পর এক ঘটনা সাত্তারকে সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল করে তোলে। তিনি কার্যতঃ সেনাবাহিনীব কাছে আত্ম সমর্পণ করেন। এর পরিপূর্ণ সুযোগ এরশাদ গ্রহণ করেন। তিনি পুরো শাসন ক্ষমতা দখল করেন।

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন

১৯৮৭ সালের ২২শে জুলাই থেকে ২৪শে জুলাই পর্যন্ত ঢাকা শহরের রাস্তার চলেছে প্রধান দুটো রঙের গাড়ি। সাদা আর কালো। সাদা অ্যামবুলান্স — যারা মানুষকে বাঁচিয়েছে। আর, কালো পুলিসভ্যান—যারা মানুষকে মেরেছে।

শহরের রাস্তায় বেগে ছুটতে থাকা ওই বিপরীত রঙের গাড়িগুলি এখন বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক চমৎকার প্রতীক। এইভাবে বাংলাদেশের মানুষও তখন সুস্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদল—যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—তাঁরা চান স্বৈরতন্ত্রের পতন, সামরিক সরকারের উৎখাত, গণতন্ত্র। অপররদল—যাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ—তাঁরা চান খাকি উর্দি আর মেশিনগানের উপর ভর করে ক্ষমতার মসনদটাকে কুক্ষিগত করে থাকতে। স্বভাবতই, প্রথম দল—যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁরাই জনগণ।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে সামরিক শাসন কোনো নতুন ঘটনা নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সময়ে ইস্কান্দারশাহী আইয়ুবশাহী বা ইয়াহিয়াশাহীর তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাঁদের আছে। মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের কয়বছর বাদ দিলে সামরিক নায়কদের একঘেয়ে উত্থান ও পতন দেখতেও তাঁরা অভ্যস্ত। কিন্তু, শাসক হুসেন মহম্মদ এরশাদের ধরনটা একটু ভিন্ন।

এরশাদ ছিলেন সেনা ছাউনিতে। সেখান থেকে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করতে চাইলেন। সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো। এরশাদ তাই ঘটান। লেফটেনান্ট জেনারেল এরশাদের নামের আগে 'প্রেসিডেন্ট' শব্দটির সংযোজন ঘটল। কিন্তু, শুধু ক্ষমতা দখল নয়, এরশাদ ক্ষমতায় টিকে থাকতেও চাইলেন। তিনি জানতেন, বাংলাদেশে সামরিক নায়করা বেশদিন ক্ষমতায় থাকেন না। থাকতে চাইলেও হয় দুর্বার গণ আন্দোলন,

নয় কোন সহকর্মীর ঠাণ্ডা লোভী রিভলবারের নল তাকে ক্ষমতায় থাকতে দেয় না। তবু, এরশাদ ক্ষমতায় থাকতে চাইছিলেন। সুতরাং, তিনি একটা ফন্দী আঁটলেন।

এরশাদ জানতেন সেই পুরোনো প্রবাদ। যে বাঘ একবার মানুষ খেয়েছে সে বারে বারেই মানুষ খাবে। আর, যে মানুষ একবার গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছে সে চরম মূল্য দিতে হলেও গণতন্তেরর জন্য লড়বে। এরশাদ জানতেন, বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য বুভুক্ষু। বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য তৃষ্ণার্ত। সে দেশে গল্পের বইয়ের নাম "নদীর নাম গণতন্ত্র"। সে দেশে কবিতার বইয়ের শিরোনাম হয়, "তার আগে চাই সমাজতন্ত্র।" এরশাদ জানতেন, এই দেশে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেয় হাজার হাজার তরুণ। এরশাদ জানতেন যে ইতিমধ্যেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে বিরোধী দলগুলি। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জমাট বাঁধছে ৮ পার্টির জোট। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে শক্তি ফিরে পাচ্ছে ৭ পার্টির জোট। ধীরে ধীরে মাথা তুলছে বামপন্থী দলগুলো।

সুতরাং এরশাদ খুলে ফেললেন তারকাচিহ্নিত খাকি গ্রেটকোট। পরে নিলেন গণতান্ত্রিক সাফারি স্যুট। জাতীয় পার্টি নামে একটি দল গঠন করলেন। তারপর ডাক দিলেন সাধারণ নির্বাচনের। মার্জার কি তবে নিরামিশাষী হয়ে গেলো? না। নির্বাচনের সাফল্য সম্পর্কে আসলে এরশাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন। কেননা, সামরিক গ্রেট কোট খুলে রাখলেও তিনি খোলেননি তার কোমরবন্ধ। আর, তাতে অক্ষতই ছিলো তার খাপ ও পিস্তল। উপরন্তু, তিনি শুধু সামরিক একনায়ক ছিলেন না, একটি রাজনৈতিক দলের নেতাও বটে। অর্থাৎ এবার তার সঙ্গে ছিল একটি অসামরিক ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীও।

নির্বাচন হল। এরশাদ জিতলেন। রিগিং হলো। এরশাদ স্বীকার করলেন না। বুথ দখল হলো। এরশাদ স্বীকার করলেন না। বাংলাদেশের "নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি" হলেন এরশাদ। লক্ষণীয়, তিনি কিন্তু তাঁর সামরিক উপাধিটি পরিত্যাগ করলেন না। অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতার উৎস সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তিনি আগের মতই যোগাযোগ রেখে চললেন। শুধু হলো বাংলাদেশের এক নতুন "হাঁসজারু গণতন্ত্র"।

এবার পরে পর্যায়। নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের ভূমিকাটি আইনসম্মত করে নিয়েছেন এরশাদ। এবার প্রস্তুত হলেন তাঁর সামরিক স্যাঙাৎদের একটা আইনসঙ্গত পরিচয় দিতে। এটা খুবই প্রয়োজন কেননা ক্ষমতার মধু নির্বিবাদে তিনি একাই চাখবেন এটা তো হতে পারে না। এবং কি গণ আন্দোলনের ধীক্কার কি সহকর্মীদের বুলেটের ভয়ে কোনভাবেই এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে চান না। সুতরাং ১৯৮৭তে একটি আইন করে এরশাদ বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর এক্তিয়ারও নির্দিষ্ট করলেন।

বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানও সুনজরে দেখেনি। 'নকল' নির্বাচনের সময়েও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল গণ-চেতনা। এবং, এই আইনের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ালেন বাংলাদেশের জনগণ। প্রতিটি গণ-বিক্ষোভের উপরেই লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এরশাদের পুলিস। গ্রেপ্তার করল আব্দুল মান্নান, অব্দুস সামাদ আজাদ, কামাল হোসেন প্রমুখ বিরোধী নেতাদের। প্রতিক্রিয়ার বিক্ষোভ আরও জোরদার হলো। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা জানালেন, "সরকার সামরিকীকরণের কর্মসূচী কার্যকর করতে চাইছে। আমরা বিনা বাধায় এটা মেনে নিতে পারি না।" বিরোধী ছাত্র-সংগঠনগুলি পালন করল 'কালাদিবস'। প্রতিবাদ তীক্ষ্ণতর হয়ে ৩২ ঘণ্টার সর্বাত্মক বন্ধ পালিত হলো

বাংলাদেশে। সম্পূর্ণ সফল হলো এই বন্ধ। পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় এরশাদ রইলেন হতচকিত।

৩২ ঘণ্টার বন্ধের সাফল্যে এইবার এরশাদের অপসারণের দাবীতে জোটবদ্ধ হলেন বিরোধীরা। ২২শে জুলাই ১৯৮৭ থেকে ৫৪ ঘণ্টার বন্ধের ডাক দেওয়া হল। ডাক দিলেন ২১ টি বিরোধী দল। এর মধ্যে ছিলেন শেখ হাসিনার ৮ পার্টির জোট। বেগম খালেদা জিয়ার ৭ পার্টির জোট। ৫টি বামপন্থী দল ও মৌলবাদী জামাৎ-এ-ইসলামী। সর্বশক্তিতে বন্ধকে সফল করার শপথ নিলেন তাঁরা। ওদিক প্রমাদ গুণে এরশাদাও মরিয়া হয়ে বন্ধ ভাঙতে নামলেন। জড় করা হলো পুলিস, আধা সামরিক বাহিনী ও জাতীয় পার্টির ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে। বন্ধের আগের সন্ধ্যায় পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ল বিরোধী নেতাদের বাড়ীতে। গ্রেপ্তার করল আওয়ামী লীগের শওকৎ আলি সহ অন্তত ৫০ জনকে। জাতীয় পার্টির এক নেতা জানালেন, "এবার আর বিরোধীরা পার পাবে না।" জাতীয় পার্টির কর্মীরা বনধ্ বিরোধী শ্লোগানে গলা ভেঙে ফেলল। দোকনদার ও ব্যবসাদারদের দোকান খুলতে চাপ দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হলো। ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকদের সামনে রাখা হলো লোভনীয় ক্ষতিপুরণের টোপ, যাতে তারা বন্ধের কয়দিন গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরোন। অবশেষে তলব করা হলো বাংলাদেশে রাইফেলস্-এর কয়েকটি রেজিমেন্টকেও।

তা সত্ত্বেও বন্ধ হয়েছে সম্পূর্ণ সফল ও সর্বাত্মক। পুলিস উন্মত্তের মতো আক্রমণ করেছে বিরোধীদের। খুন করেছে অন্তত দশজনকে। নিহতদের দেহ সরিয়ে ফেলেছে অজ্ঞাতস্থানে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪৫০ জন।

এতদুর বর্বর ও অগণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল এই আক্রমণ যে ২৩শে জুলাই একটি আক্রমণস্থলে ছবি তুলতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন ৭ জন চিত্রসাংবাদিক। তবু বন্ধ সর্বাত্মক, বন্ধ সফল। বাংলাদেশের জনগর এরশাদের বিরুদ্ধে তাদের রায় এইভাবে জানিয়েছেন।

এদিকে এরশাদ বলেছেন যে তিনি কিছুতেই ক্ষমতা ছাড়বেন না। কেননা তিনি জনগণের রায়ে নির্বাচিত। এবং, সেই জনগণেরই ৪৫০ জনকে জখম করেছে পুলিস। সেই জনগণেরই ১০ জনকে হত্যা করেছে পুলিস। এরশাদ বলেছেন, এ ধরনের বন্ধকে তিনি কেয়ার করেন না ওদিকে তার নাকের উপর দিয়েই তা সর্বাত্মক ও সফল।

শেখ হাসিনা বলেছিলেন, অবিলম্বেই এই উদ্ধত, ক্ষমতালিপ্সু সেনানায়ককে জনআদালতে ছুঁড়ে ফেলা দরকার। জনগণই তার বিচার করবে। বেগম জিয়া বলেছিলেন, এরশাদ যদি ক্ষমতা ত্যাগ করতে দেরী করেন তবে তাকে যেতে হবে চুড়ান্ত অসম্মানের মধ্য দিয়ে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

এরশাদের সামরিক শাসনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারাটা কি দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পরও ৭৮ শতাংশ নর-নারী নিরক্ষর। প্রতি বছরই সেখানে কলেরায় কয়েক হাজার নর-নারী মারা যান। বিনা চিকিৎসায় এবং অনাহারে মৃত্যুর হার এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশেই সব চেয়ে বেশি। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে আজ কৃষক ও খেতমজুরদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সব চেয়ে বেশি। বছরের অধিকাংশ সময়ই খেতমজুরদের কাজ থাকে না। কিন্তু যখন তাঁদের

কাজ থাকে তখনও তাঁরা দৈনিক পনেরো টাকার বেশি মজুরি পান না। গ্রামের গরিব কৃষক এবং খেতমজুরদের বর্তমানে মাসিক গড় আয় হলো ১৮০ টাকার মতো। কিন্তু সেখানে এক কেজি চালের দামই আট টাকা। একটি মোটা কাপড়ের দাম ৫০ টাকা। বাংলাদেশের গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের একটা বড় অংশই এখন নতুন জামাকাপড় কিনতে পারেন না। তাঁরা পুরানো জামা কাপড় কিনে লজ্জা নিবারণ করেন। দারিদ্র্য আজ মাঝারি কৃষককেও বিপন্ন করে তুলেছে। চাষের সরঞ্জামের খরচ-খরচা অর্থাৎ সার, সেচ ইত্যাদির ব্যয় মাঝারি কৃষকেরও নাগালের বাইরে চলে গেছে। স্বভাবতঃই চাষের মরসুমে কৃষকদের ধার করতে হয়। ফসল ওঠার পর তাঁদের আয়ের বড় অংশই মহাজনের ঘরে চলে যায়। ব্যাঙ্ক থেকে কৃষি ঋণ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেখানেও সুদের হার কম নয়—আঠারো শতাংশ। এই অর্থনৈতিক সংকটের চাপ শিল্প কারখানার উপরও পড়েছে মারাত্মকভাবে। ছোট ও মাঝারি শিল্প কারখানাগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে পড়ছে। কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। যে মজুরি তাঁরা পান তা একেবারেই নগণ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারখানা মালিকেরা ক্যাজুয়াল শ্রমিক দিয়ে কাজ করান। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুসারে কোনো শ্রমিককে ছয় মাসের বেশি ক্যাজুয়াল রাখা যায় না। পর পর ছয় মাস ধরে কেউ যদি কোনো কারখানায় কাজ করেন তবে তাঁকে সেই কারখানার স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করতে হবে। এ জন্য কারখানা মালিকেরা ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের কোন রেকর্ড রাখেন না। আবার কোথাও রেকর্ড রাখা হলে সেই রেকর্ডের পরিবর্তন ঘটানো হয়। ফলে ক্যাজুয়াল শ্রমিকেরা কোন সময়ই স্থায়ী হন না, পরন্তু তাঁরা যে কোনো সময় কর্মচ্যুত হন। যাঁরা স্থায়ী শ্রমিক নন, তাঁরা চিকিৎসা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পান না। এমন কি যাঁরা স্থায়ী শ্রমিক তাঁরা যদি কারখানার অভ্যন্তরে আহত হন, তবুও তাঁরা কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ পাবেন না। যে ক্যাজুয়াল শ্রমিক শিল্প কারখানায় এখন কার্যতঃ প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন সেই শ্রমিকেরা কিন্তু মাসে ১৫০ টাকার বেশি বেতন পান না।

এই দুর্বিষহ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বত্র গণ সংগ্রামের বিস্তার ঘটছে। আর সেখানে গণ সংগ্রামের যতো বিকাশ ঘটছে, এরশাদের সামরিক শাসনের খড়্গ সেই সমস্ত আন্দোলন-সংগ্রামের উপর ততো বেশি করে নেমে আসছে। এরশাদ কিন্তু সব সময়ই মুখে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন : আমি নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এরশাদের নয়া গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি? সেখানে জনগণের কোনো বাক্-স্বাধীনতা নেই, তাঁদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার নেই, শ্রমিকদের কোনো অধিকার নেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করার। মুখ্যত নর-নারীর কান্নার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে এরশাদের নয়া গণতন্ত্রে।

এরশাদের বিদায়

দীর্ঘ ন'বছর ধরে একচ্ছত্র শাসন পরিচালনা করার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদকে বিদায় নিতে হয়েছে। সেখানকার অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক আন্দোলন ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯০ এরশাদকে বাধ্য করেছে পদত্যাগ করতে। তিনটি রাজনৈতিক জোটের

সর্বসম্মত প্রস্তাবমত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্‌মেদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তিনি বিদায় নেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে সংসদের তিনশ আসনের জন্য সেখানে একশ'টি রাজনৈতিক দলের দু'হাজার আটশ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বৈরশাসনেব কবলমুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের পথে পদার্পন করে।

যে আন্দোলনের তরঙ্গে জেনারেল এরশাদকে বিদায় নিতে হয় সেই আন্দোলন শুরু হয় ১০ই অক্টোবর, ১৯৯০। শুরু হয় বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলির 'এরশাদ হঠাও' আন্দোলন। গড়ে ওঠে তিনটি জোট। মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আটটি দলকে নিয়ে আওয়ামি লিগ গড়ে তোলে আট পার্টির জোট। এই জোটে যোগ দেয় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি এন পি) নেতৃত্বে সাতদলের অপর একটি জোট গঠিত হয়। এই জোটের নেত্রী জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নী বেগম খালেদা জিয়া। পাঁচটি বামপন্থী দলকে নিয়ে গঠিত মোর্চার নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন।

তিন বিরোধী জোটের নেতৃত্বে গণবিক্ষোভের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের সর্বত্র। ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম বানচাল করার জন্য বিরোধীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা, দালাল ঢুকিয়ে সন্ত্রাস করা, সাম্প্রদায়িক জিগির সৃষ্টি করা ইত্যাদি সব ধরনের অপকৌশল ব্যবহার করেও এরশাদ ব্যর্থ হন। আন্দোলন যখন নতুন নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়, ঠিক তখনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দেশজুড়ে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের দাবানল সৃষ্টি হয়। এই প্রথম সমস্ত বিরোধী দলের জোট এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অঙ্গীকার করে। জেনারেল এরশাদ গদি রক্ষার শেষ মরীয়া চেষ্টায় দেশে জরুরী অবস্থা জারি করে জনগণের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে জরুরী অবস্থা প্রতিরোধ, এরশাদ জমানা উৎখাতে জনগণের সংগ্রাম আরো উত্তাল হয়ে ওঠে। হাজার হাজার মানুষ বেয়নেটের মুখে এসে দাঁড়ান। শহীদ হন অনেকে। তবু সংগ্রাম দমন করতে পারে না এরশাদ সরকার। প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিন জোটের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণা করা হয়। এই রূপরেখায় সরকার অপসারণের পথ, পদ্ধতি, অন্তর্বর্তী সরকারের করণীয় ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার কায়েমের লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ বিবৃত করা হয়। তিন জোটের এই রূপরেখা ঘোষণা এরশাদ সরকারের কাছে একটা বড় আঘাত হিসেবে হাজির হয়। তিন জোটের কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি গণসংগ্রামের তীব্রতাও বাড়তে থাকে। শ্রমিকেরা রেল লাইন উপড়ে দেন। সেতু উড়িয়ে দিয়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। অফিস, আদালত, বাণিজ্যকেন্দ্র একেবারে অচল হয়ে যায়। আর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তো অনেক আগে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, বিক্ষোভ দমনকারী পুলিসকে পিছু হঠতে হয়। পিছু হঠতে হয় এরশাদ সরকারকে। প্রথমেই সংবাদপত্রের উপর থেকে সেন্সরশিপ ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়। এরপরই এরশাদ দ্রুততার সাথে নতিস্বীকার করতে থাকেন। তিনি একজন উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন। বিরোধীরা নিছক একজন উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন না। তখন এরশাদকে আরো পিছু হঠতে হয়। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৯০) তিনি একজন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ এবং তাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার কথা ঘোষণা করেন।

কোন্ পরিস্থিতিতে এরশাদকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হয়? তখন দেশজুড়ে চলছে ধর্মঘট। বিরোধী জোট দেশব্যাপী ৭২ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। সরকারী অফিসার এবং মন্ত্রীদের বাড়ি ঘেরাও হয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি এরশাদকে বিদায় নিতে বাধ্য করল।

এরশাদের বিদায়কে বাংলাদেশের জনগণ দ্বিতীয় বিজয় হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁরা প্রথম বিজয় অর্জন করেন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশে এতবড় জঙ্গী আন্দোলন এরপূর্বে সংঘটিত হয় নি। আর এই আন্দোলনে সমস্ত বিরোধীদল মোটামুটিভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

রাজনৈতিক পালাবদল

স্বৈরতান্ত্রিক শাসক এরশাদের বিদায়ের পর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন হয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও কয়েকটি সহযোগী দল। কিন্তু প্রায় তিন বছর ক্ষমতায় থাকার পর শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধী দলগুলির মতভেদ সমানে বাড়তেই থাকে। দু'পক্ষের মধ্যে, সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত হয় পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের বিষয়টি। সাধারণ নির্বাচনের আগে তদারকি সরকার গঠনের দাবিকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সঙ্গে বিরোধীদের মতভেদের জেরে সাংবিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ ও অন্যান্য সব ক'টি বিরোধী দল আট মাস ধরে সংসদ বয়কট করে। সরকারের মিত্র জামাতে ইসলামীও বিরোধী পক্ষে অর্থাৎ সংসদ বয়কটে সামিল হয়। অচলাবস্থা কাটাতে কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি নিনিয়ান স্টিফেনের মধ্যস্থতায় দু'পক্ষের সমঝোতা বৈঠক চলছিল এক সপ্তাহ ধরে। কিন্তু বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফের উত্তপ্ত অবস্থায়ই ফিরে যায়।

সংসদ বয়কট ও কমনওয়েলেথের হস্তক্ষেপে সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে সমঝোতা-আলোচনা নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোরালো বিতর্ক চলেছিল। বিতর্কের বিষয় ছিলঃ (১) সংসদ বয়কট প্রশ্নে জামাতে-ইসলামীর সঙ্গে আওয়ামি লিগের মাখামাখি। (২) সংসদ বয়কট-কে ঘিরে রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটাতে সরকার ও বিরোধীপক্ষের আলোচনায় কমনওয়েলথের মধ্যস্থতা। এর আগে মাগুরা জেলার একটি সংসদীয় কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই আসনটি ছিল আওয়ামি লিগের। উপ-নির্বাচনে বি এন পি জয়ী হয়। নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপি হয়েছে — এই অভিযোগে সমস্ত বিরোধী দল সংসদ বয়কট শুরু করে। বিরোধী দলগুলি দাবি জানায়, তদারকি সরকার গঠনের। (৩) যেমনটি গঠিত হয়েছিল এরশাদের পতনের পর ১৯৯০ সালে। বি এন পি বিরোধীপক্ষের এই দাবি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এই পটভূমিতে আওয়ামী লিগের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলি আন্দোলনের পথে অবতীর্ণ হয়। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আওয়ামি লিগের বিশ্বস্ত সঙ্গী হয় জামাতে-ইসলামী। সঙ্গী হয় এরশাদের জাতীয় পার্টিও। জামাতে ইসলামীর সঙ্গে একসাথে বসে আওয়ামি লিগ-নেত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক বৈঠকেও বক্তব্য রাখেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির নেতারাও। এই ঘটনায় হতবাক হয়ে যায়

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তি। এই প্রথম বাংলাদেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখলো, আওয়ামি লিগও জামাতে-ইসলামীর সমর্থন পেতে তাদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে গোপনেও যোগাযোগ করছে। জামাতে ইসলামীর সঙ্গে মাখামাখিকে কেন্দ্র করে আওয়ামি লিগের ভিতরে এবং বাইরে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জামাতে ইসলামীর ভূমিকা বাংলাদেশের মানুষ ভুলতে পারেন না। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামি লিগ নেতৃত্ব দিয়েছে। আর জামাতে-ইসলামী ছিল সেদিন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ঘনিষ্ঠ দোসর। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবর রহমানের মহানুভবতা ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে তাদের অনেকেই সেদিন নিজেদের গা বাঁচাতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের রাজত্বে বহুদলীয় রাজনীতির প্রবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করে জামাতে-ইসলামী প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আসরে অবতীর্ণ হয়। এভাবেই তারা পুনর্বাসিত হয় রাজনৈতিকভাবে। এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর 'ইসলাম''কে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করলে জামাতে-ইসলামী পুনগঠিত হবার সুযোগ পায়। জামাতে-ইসলামীর কার্যকলাপ দেখে এটা পরিষ্কার বলা যায়, স্বাধীনতার পর তাদের চরিত্রে এতটুকু পরিবর্তন আসেনি। অতীত ভূমিকার জন্য এতটুকু অনুতপ্ত নয় তারা। স্বাধীন বাংলাদেশে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েমে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভুল বোঝাবুঝির অবসানে শেখ হাসিনা বলেন ঃ জামাতে-ইসলামীর সঙ্গে আমাদের রাজপথে কোনো ঐক্য নেই। ঐক্য হচ্ছে সংসদে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তি হাসিনার এই বক্তব্য মানতে রাজি নন। তাদের বক্তব্য ঃ সংসদের বিরোধী দলের অভিন্ন কার্যক্রমের নামে গৃহীত আওয়ামি লিগ, জামাতে-ইসলামী ও জাতীয় পার্টির ঐক্য কেবল জামাতে-ইসলামীর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সাম্প্রদায়িক তৎপরতাকে শুধু উৎসাহিত করবে না, স্বৈরাচারের রাজনীতিকেও বৈধতা দেবে।

রাজনীতির টানাপোড়েনে সরকার ও বিরোধীপক্ষ — উভয়পক্ষই অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। সংসদ বয়কটের দরুন আট মাস ধরে চলতে থাকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা। এই অবস্থা কাটাতে বিদেশী কূটনীতিকরাও রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ দিতে এগিয়ে আসেন। এই প্রেক্ষাপটেই ঢাকায় আবির্ভাব ঘটে কমনওয়েলথের মহাসচিব এমেকা এনিয়াওকু'র। এমেকা ঢাকায় এসে দু'পক্ষের মধ্যে দরবার করে একটা সংলাপ শুরুর দায়িত্ব নেন। উভয়পক্ষে আলোচনার একটা পটভূমি তৈরি করে দিয়ে তিনি ফিরে যান। পরে তার প্রতিনিধি নিনিয়ান স্টিফেনের মধ্যস্থতায় কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে দু'পক্ষ বৈঠকে বসলেও সপ্তাহান্তে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সরকার ও বিরোধীপক্ষের এই আলোচনায় কমনওয়েলথের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়েছে ঢাকায়। বিরোধীপক্ষের কেউ কেউ এটাকে দেশের রাজনীতিতে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের মতে, ক্ষমতায় ফেরার জন্য আওয়ামি লিগ মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মৌলবাদ জামাতে-ইসলামী ও স্বৈরাচারী জাতীয় পার্টির সঙ্গে মিতালি করে পুনরায় তারা ক্ষমতাসীন হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। বিরোধীদের একটি অংশ, বিশেষ করে বামপন্থীরা মনে করেন, বি এন পি এবং আওয়ামি লিগের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়া মেটানোর জন্য নিনিয়ান স্টিফেনকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই ঘটনা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে আগামীদিনে বিপদ হয়ে উঠতে পারে বলে তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ

দু'বছব ধরে বিরোধীদের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের পর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশে গঠিত হয়েছিল নিরপেক্ষ তদারকি সরকার। ভেঙে দেওয়া হয় সদ্য "নির্বাচিত" বিতর্কিত সংসদ। এই সংসদের অস্তিত্ব যে ক্ষণস্থায়ী হবে, তা সবাই ধরে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তার ২৫ বছরের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জীতে কোন জাতীয় সংসদই পূর্ণ মেয়াদকাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। সামরিক অভ্যুত্থান অথবা আন্দোলনের ধাক্কায় মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই সবক'টি সংসদকেই মৃত্যুর মুখ দেখতে হয়েছে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত নির্বাচনী প্রহসনের পথে গঠিত ষষ্ঠ সংসদের আয়ুও ছিল মাত্র দিন কয়েকের জন্য।

রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করতে বাংলাদেশে কখনো এসেছেন কমনওয়েলথের বিশেষ দূত, আবার পশ্চিমী কোন দেশের কূটনীতিক। সবাই ব্যর্থ হয়েছেন। একসময় আসরে অবতীর্ণ হন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত। শাসক ও বিরোধী দলের নেতারা তাঁর বাসভবনে গিয়ে বৈঠক করেছেন। কিন্তু মীমাংসা সূত্র মেলেনি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাক গলানোয় আপত্তি উঠেছে। প্রতিবাদ উঠেছে তাঁর বাসভবনে গিয়ে শাসক ও বিরোধী নেতাদের শলাপরামর্শ করায়। অবশেষে খালেদা জিয়া সরকার নির্বাচনের উদ্যোগ নেন। সবক'টি বিরোধী দল এই নির্বাচন বয়কট করে। সাজানো নির্বাচনের ফলাফলে প্রাধান্য ঘটে শাসক দলেরই। দেশে ও বিদেশে কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে খালেদা সরকার। খালেদা জিয়াও নিশ্চয়ই জানতেন, বিরোধী দলহীন নির্বাচন যতই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হোক না কেন, তা হবে নির্বাচনের প্রহসন মাত্র। তা সত্ত্বেও তিনি এই পথে পা বাড়ান।

১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল তদারকি সরকারের নেতৃত্বে। তার আগে এরশাদের স্বৈরশাসনকে হঠানোর দাবিতে দেশজুড়ে সংগঠিত হয়েছিল দুর্বার গণ-আন্দোলন ও গণ-প্রতিরোধ। পুলিস-মিলিটারি দিয়ে এই আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এরশাদ। গঠিত হয় বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে তদারকি সরকার। খালেদা জিয়ার পদত্যাগের পরও তদারকি সরকার গঠিত হয়েছিল। এবার তদারকি সরকারের প্রধান হন প্রাক্তন বিচারপতি মহম্মদ হাবিবুর রহমান। তবে, ১৯৯১ সালের মতো এই তদারকি সরকারের যাত্রাপথ খুব মসৃণ হয়নি। দাবি ও পালটা দাবির মুখোমুখি হতে হয়েছে তদারকি সরকারকে। তবে তদারকি সরকারের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা। তদারকি সরকারের প্রধান হাবিবুর রহমান ঘোষণা করেছেন, 'আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে আমরা যেকোনো রকম কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে কুণ্ঠিত হবো না।'

বাংলাদেশে ক্ষমতার মসনদে হাসিনা

দু' দশক পর আওয়ামি লিগ বাংলাদেশে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচন গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্তত বিদেশী পর্যবেক্ষকরা তাই মনে করেন। ঐ বছরে বাংলাদেশে এটি ছিল দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনী

ফলাফলে আওয়ামি লিগ একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। সংসদের মোট ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামি লিগ পায় ১৪৬টি। (সরকার গড়ার পর বিজয়ী একজন বিক্ষুব্ধ আওয়ামি লিগ প্রার্থী দলে ফিরে আসেন। এছাড়া সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের ২৭টি আওয়ামি লিগের হস্তগত হয়। এভাবে আওয়ামি লিগের মোট আসন দাঁড়ায় ১৭৪)। ১১৬টি আসন জিতে বি এন পি দ্বিতীয় স্থানে আসে। আর তৃতীয় স্থানে আসে এরশাদের জাতীয় পার্টি — পায় ৩২টি আসন। সরকার গড়ার ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টিই ভারসাম্য রক্ষাকারী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর এই দলের সমর্থন নিয়েই শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকারে ক্ষমতাসীন হবার সুযোগ পায়। নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভোটাররা মূলত দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদিকে আওয়ামি লিগ, তাকে যেমন জনগণ নিরঙ্কুশ সমর্থন দেয়নি, আবার অপরদিকে বি এন পি-কেও জনগণ তেমন জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেনি।

এবারের নির্বাচনে বি এন পি-র সামনে প্রধান এবং বড় বাধা ছিল গুণ্ডামি, সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতা। গোটা দেশে অরাজক অবস্থা কায়েম হয়েছিল, সন্ত্রাসবাদীরা এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, সাধারণ মানুষ এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের সুযোগ খুঁজছিল। তাছাড়া বি এন পি-র একাধিক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ছিল দুর্নীতির অভিযোগ। সার সঙ্কট নিয়ে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে। অভিযোগ, এর মোটা অংশ বি এন পি-র নেতা ও মন্ত্রীদের পকেটে যায়। সাধারণ মানুষ সামগ্রিকভাবে একটা পরিবর্তন চাইছিলেন। এই মনোভাবও বি এন পি-র সামনে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, জামাতে ইসলামীকে প্রত্যাখ্যান। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ১৮টি আসনে জয়ী জামাতে ইসলামী এবার পেয়েছে মাত্র ৩টি আসন। তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার ১২.১৩ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮.৫৭ শতাংশ।

আওয়ামি লিগ সরকার গড়ার পর বাংলাদেশের রাজনীতি এক বিচিত্র দিকে মোড় নেয়। যে এরশাদকে একসময় স্বৈরাচারী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সেই এরশাদের জাতীয় পার্টির সহযোগিতা নিয়েই আওয়ামি লিগকে এবার ক্ষমতাসীন হতে হয়েছে। মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিকেও। এর সঙ্গে মন্ত্রিসভায় স্থান পান এরশাদের একসময়ের সহযোগী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (রব গোষ্ঠী) একমাত্র প্রতিনিধিও। এভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারকে "জাতীয় ঐকমত্যে"র সরকার বলে হাজির করার চেষ্টা করেছেন। জাতীয় পার্টির মধ্যে বরাবরই দুটি গোষ্ঠী বিদ্যমান। একটি গোষ্ঠী আওয়ামি লিগ ও অপর গোষ্ঠী বি এন পি-র সঙ্গে সহযোগিতা করে চলার পক্ষপাতী। দলের মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। তিনি দলে আওয়ামিপন্থী বলে পরিচিত। তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগদান নিয়ে দলে বিভেদ দেখা দিলে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহ্‌মেদ দল থেকে ইস্তফা দেন। দলে তিনি বি এন পি পন্থী হিসেবে পরিচিত।

ঢাকার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বি এন পি-র পরে আওয়ামি লিগ সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌলিক কোন পরিবর্তন আনতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ, কর্মসূচী বিচার করলে আওয়ামি লিগ ও বি এন পি-র মধ্যে ব্যবধানটানা দুষ্কর। উভয় দলেরই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন প্রায় কাছাকাছি। নীতির দিক থেকে চুলচেরা

বিচার না করাই ভালো। এটা ঠিক, জাতীয় 'ঐক্যমতের সরকারের' কথা বলে শেখ হাসিনা জনমনে অনেক প্রত্যাশা তৈরি করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কতটা তিনি রক্ষা করতে পারবেন? বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই মুহূর্তে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদ দমন, সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, জনজীবনকে সন্ত্রাসের কলুষিত পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত করা। রাজনৈতিক অঙ্গ নে টানাপোড়েনে বি এন পি, আওয়ামি লিগ, জাতীয় পার্টি এবং জামাতে ইসলামী দলে বরাবর সন্ত্রাসবাদীরা আশ্রয় পেয়ে এসেছে। এদের নিয়ন্ত্রণে রেখে সন্ত্রাস দমন করা কীভাবে সম্ভব তা নিয়েও বড় রকমের প্রশ্ন রয়েছে। অথচ দেশের মানুষের কাছে এই মুহূর্তে এটি হচ্ছে গুরুতর সমস্যা।

আরও একটি প্রশ্ন ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘোরাফেরা করছে। স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগের পাশে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলি ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শেখ হাসিনা এরশাদের জাতীয় পার্টি ও গোলাম আজমের জামাতে ইসলামী দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন। নির্বাচনে অবশ্য দলগুলি আলাদাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু সরকার গড়ায় শেখ হাসিনাকে জাতীয় পার্টির সাহায্য নিতে হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, নির্বাচনী প্রচারে ও সরকারে আসার পর আওয়ামি লিগ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের মানুষ পাঁচ বছর বি এন পি-র শাসন দেখেছে। সঞ্চয় করেছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। এবারে দেখবে আওয়ামি লিগের নেতৃত্বাধীন 'জাতীয় ঐক্যমতের' সরকারের শাসন। এই ঐক্যমতের আড়াল থেকেই কিছুদিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যার মোকাবিলা সরকার কীভাবে করে সেটাই দেখার। এখানেই হবে শেখ হাসিনার আসল পরীক্ষা।

পাকিস্তান

সামরিক শাসক জিয়াউল হকের আকস্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রথম সোপান রচিত হয়। তবে দীর্ঘদিন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের কাছে মাথা নত করে থাকায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হবার বিষয়ে জনগণ প্রাথমিকভাবে খুব বেশি আশাবাদী ছিলেন না।

তাই দীর্ঘ এগার বছর যথেচ্ছ ক্ষমতা ভোগের পর সামরিক কর্তারা রাতারাতি গণতন্ত্রের সাধক হয়ে যাবেন এমন চিন্তাকে অনেকেই প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন না। জিয়ার মৃত্যুর জন্য পরোক্ষে ভারতকে অভিযুক্ত করা, প্রাদেশিক সরকারগুলিতে জিয়াপন্থীদের বসিয়ে রাখা, হায়দরাবাদ ও করাচিতে আচমকা অথচ সুপরিকল্পিত দাঙ্গার ঘটনা ঘটা প্রভৃতি থেকে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মনে নির্বাচনের নিশ্চয়তা, নির্বাচন হলেও তা অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে কি না এসব নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

পাক নির্বাচনের প্রশ্নে মার্কিন প্রশাসনের ভূমিকা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ হতে বাধ্য। একথা মনে করার মত কোনো কারণ ঘটেনি যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু পাক শাসকশ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলিকে হঠাৎ মার্কিনবিরোধী করে তোলে এবং মার্কিন প্রভাব আর তাঁদের উপর খাটেনি। তখন পাকিস্তানে নিযুক্ত নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ওক্‌লে সাংবাদিকদের প্রশ্নের

জবাবে বলেছিলেন, আমরা চাই পাকিস্তানে নির্বাচিত একটি সরকার। নির্বাচনে কোন্ দল জয়ী হবে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। আমরা দেখব সেই সরকার কী নীতি গ্রহণ করে। তার উপরই নির্ভর করবে পাক-মার্কিন সম্পর্ক।

এদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে বিভিন্ন মোর্চা ভাঙাগড়া শুরু হয়। জিয়া-জুনেজা বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জিয়া-সৃষ্ট পাকিস্তান মুসলিম লীগ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। পরে দুটি গোষ্ঠী আবার এক হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে জুনেজাপন্থী মুসলিম লীগের সঙ্গে মোর্চাবদ্ধ প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খানের তারিক-ই-ইশতিকলাল দল মোর্চা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। অন্যদিকে, জিয়াশাহীর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে দীর্ঘদিন যাবত একত্রে সংগ্রাম করার পর নির্বাচনের মুখে এসে মুভমেন্ট ফর রেস্টোরেশন অব ডেমোক্র্যাসি বা এম আর ডি মোর্চা ভেঙে গিয়েছিল। মোর্চার প্রধান শরিক বেনজির ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির সর্বগ্রাসী নীতির পরিণামেই মোর্চা ভেঙে গেছে। বেনজির ভুট্টো পরিষ্কার করেই বলেছিলেন, তাঁর দল ক্ষমতায় এলে শিল্প জাতীয়করণের কোন ঘটনা ঘটবে না, বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

করাচি বিশ্ববিদ্যাললের ফলিত অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৫-৮৬ এই সময়ের মধ্যে গড় জাতীয় উৎপাদনে বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ মত ছিল। কিন্তু ১৯৮৭-৮৮ সালে বৃদ্ধির এই হার কমে ৫.৮ শতাংশ হয়েছে। বিনিয়োগের হারও ১৯৮৬-৮৭-র ১৬.১ শতাংশ থেকে নেমে ১৯৮৭-৮৮ সালে ১৫.৭ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, একদিকে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে আয় বৈষম্য বেড়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার দ্বিগুণ হয়েছে। উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে অনাবাসী পাকিস্তানীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু গত বছরের তুলনায় বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১০ শতাংশ বেড়ে গেছে। গবেষণা কেন্দ্রটির মতে এটি কোন সাময়িক পিছু হঠা নয়, এটা এতাবৎকালে অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতি ও কাঠামোর ত্রুটির দীর্ঘমেয়াদী ফলশ্রুতি।

দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানের শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তর অংশই এখনও অসংগঠিত। সামরিক স্বৈরশাহী চলাকালে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তেমনভাবে প্রসার লাভ করেনি। শিল্প শ্রমিক সহ আনুমানিক ৪০ লক্ষ কর্মরত মানুষের মধ্যে ১০ শতাংশের মত শ্রমজীবী মানুষ সংগঠিত। কৃষিতে এই চিত্র আরও শোচনীয়।

শ্রমজীবী মানুষের জঙ্গী সংগঠনের অভাব পাকিস্তানের নির্বাচনকে সঠিক গতিমুখ দিতে পারেনি। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও পাকিস্তানে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া দ্বিধাজড়িত হলেও দীর্ঘকাল স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পরে একটি নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থার সূচনা করে।

পাক-ভারত আলোচনা আবার শুরু

পাকিস্তানে এক দশকেরও বেশি সামরিক স্বৈরশাহী চলার পর বেনজির ভুট্টো যখন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন ভারতে একটা স্বস্তি ও আশার মনোভাব সঞ্চারিত হয়। এটা স্বাভাবিক কেন না পাকিস্তান শুধু মাত্র ভারতের প্রতিবেশী দেশ মাত্র নয়, দু'টি দেশ একই ইতিহাসের শরিক। জিয়াউল হকের শাসনে পাকিস্তান এতদঞ্চলে

মার্কিন রণনীতির অন্যতম প্রধান মিত্রশক্তিতে পরিণত হয় এবং পাকিস্তানকে দেওয়া মার্কিন সমরাস্ত্র ভারতীয় উপমহাদেশে উত্তেজনা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অবাঞ্ছিত পরিবেশকে তীব্রতর করে। পাকিস্তানে গণতন্ত্রীকরণ পুনরায় শুরু হবার ঘটনা ভারতে এই মনোভাব সৃষ্টি করে যে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার হলে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার পথ পুনরায় খুলে যাবে।

পাকিস্তানে নির্বাচনের পর সরকার গঠন প্রক্রিয়াতে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং আপাতদৃষ্টে দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রীত্ব পাবার জন্য বেনজির ভুট্টোকে পাক সামরিক বাহিনী তথা মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে কিছু সমঝোতায় আসতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিন বাদে প্রথম উচ্চপর্যায়ের আলোচনার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে উভয়পক্ষে সতর্ক প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই সময় ইসলামাবাদ সফরের কারণ ছিল 'সার্ক' গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলন। সঙ্গতভাবেই প্রায় ত্রিশ বছর বাদে একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পাকিস্তানে উপস্থিতির এই সুযোগকে দু'টি দেশ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কাজে ব্যবহার করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইসলামাবাদে জনসাধারণের যে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন লাভ করেছেন তা থেকেই বোঝা যায় ভারতের মত পাকিস্তানের মানুষও দু' দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের জন্য কতটা আগ্রহী। যদিও প্রয়াত সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউল হক ভারতে বারকয়েক নানা কারণে এসেছিলেন এবং দু' দেশের সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার কথাও বলেছিলেন তবু দু' দেশের সাধারণ মানুষ জিয়াউল হকের কথাকে কখনই আন্তরিক বলে গ্রহণ করেননি।

রাজীব-বেনজির শীর্ষ বৈঠক এবং দু' দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আমলা পর্যায়ের আলোচনার পর আপাততঃ তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিগুলির অন্য তাৎপর্যও খুঁজে দেখার আগে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং ইন্দিরা গান্ধীর আলোচনার পর সম্পাদিত সিমলা চুক্তির পর এই প্রথম ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চুক্তি হয়। এই কারণেই সাম্প্রতিক চুক্তিগুলিকে ভারতে সকলেই স্বাগত জানান।

তিনটি চুক্তির মধ্যে একটি দু' দেশের বিমান পরিবহণ ব্যবসায় দ্বৈত কর বা 'ডবল ট্যাক্সেশন' এড়ানো সংক্রান্ত। এটি দু' দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংক্রান্ত ব্যাপার। দ্বিতীয় চুক্তিটি দু' দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় সংক্রান্ত। চুক্তি অনুসারে শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা সংস্থা, সাংবাদিক সংস্থা, সাহিত্যিকদের সংস্থা পরস্পরের দেশে সেমিনারে, সম্মেলন ইত্যাদিতে যোগদানের কথা বলা হয়। শিল্পী, সাহিত্যিক, গবেষক প্রমুখরা যাতায়াতের কথা বলা হয়। উভয় দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে পরস্পর সম্পর্কে ভুল বা বিকৃত তথ্য না থাকে সেগুলি দেখার কথা বলা হয়। গুরুত্বের দিক থেকে এই চুক্তিটি খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। দুটি দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রাথমিক শর্ত দু'টি দেশের মানুষের ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদান। বিশেষ করে দু'টি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাপক মিলের পরিপ্রেক্ষিতে এটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে।

তৃতীয় চুক্তিটি দু' দেশের পারমাণবিক সংস্থাগুলি অনাক্রমণের পারস্পরিক চুক্তি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি নতুন কোন ঐকমত্যের ব্যাপার নয়। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী এবং জিয়াউল হক এই মর্মে মৌখিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। কিন্তু পরবর্তীকালে দু' দেশের

সম্পর্কের বস্তুতঃ অবনতির কারণে মৌখিক প্রতিশ্রুতি মৌখিক স্তরেই থেকে যায়। চুক্তি অনুসারে পরস্পরের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোন কাজ ভারত বা পাকিস্তান নিজেরা করবে না, উৎসাহ দেবে না বা ঐ ধরনের কোন আক্রমণে শরিক হবে না একথা বলা হয়।

এই চুক্তিটিকে মোটামুটি একটা আপস বলা যায়। 'সাক' সম্মেলন উপলক্ষে পাকিস্তান আঞ্চলিক স্তরে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের দৃষ্টিভঙ্গী পুনরায় ব্যক্ত করে। ভারত এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করে এই যুক্তিতে যে, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং কেবলমাত্র কোনো আঞ্চলিক স্তরে এই সমস্যার কোনো সমাধান হতে পারে না। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়াও চিরাচরিত অস্ত্র হ্রাসের কথাও তোলে। এই প্রসঙ্গেও ভারত দ্বিমত ব্যঙ্গ করে কারণ পাক-মার্কিন সামরিক সহযোগিতাকেই ভারত এই প্রশ্নে প্রধান প্রতিবন্ধক বলে গণ্য করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকেই ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সার্বিক 'নো ওয়ার প্যাক্ট' বা অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব রেখে আসছে। প্রয়াত পাক রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হক এই প্রসঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি বা 'নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফারেশন ট্রিটি'র পাল্টা প্রস্তাব দেন। এই ধরনের কোনো চুক্তিতে ভারত শরিক হতে রাজি নয় কারণ এর দ্বারা পারমাণবিক শক্তিধর কয়েকটি রাষ্ট্রই বিশেষ সুবিধার অবস্থান ভোগ করবে।

যাই হোক, ভারত-পাক আলোচনার পুনরায় শুরু হবার ঘটনা নিঃসন্দেহে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষ্যে স্বাগত পদক্ষেপ।

বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হবার পর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী মার্কিন প্রশাসনের কাছে অতিরিক্ত আরও ৬০টি এফ-১৬ জঙ্গী বিমান চেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন না নিয়েই এই ধরনের পদক্ষেপ এটাই ইঙ্গিত করে যে প্রধানমন্ত্রী হবার সময় বেনজির ভুট্টোকে সামরিক বাহিনীর কিছু স্বাধীন ভূমিকা স্বীকার করে নিতে হয়েছে। আফগানিস্তান প্রসঙ্গে পাক অবস্থান সম্পর্কেও একই কথা বলা হয়েছে। অবশ্য কারও কারও মতে বেনজির ভুট্টোর সরকার আফগানিস্তান প্রসঙ্গে জিয়া আমলের অবস্থানকে মেনে নিতে বাধ্য হলেও চড়া সুরটা একটু নরম খাতে বইয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আফগান প্রতিবিপ্লবীরা আগের মতই পাকিস্তানের মাধ্যমে মার্কিন মদত যথারীতি পেয়ে চলেছে। অর্থাৎ পাকিস্তান আগের মতই আফগানিস্তান সম্পর্কে জেনিভা চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে।

কাশ্মীর প্রশ্নেও বেনজির ভুট্টো গরম কথাই বলেছেন। বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে বেনজির কাশ্মীর প্রশ্নকেই পাক-ভারত সম্পর্কের সার্বিক স্বাভাবিকীকরণের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন বলে ব্যক্ত করেছেন। এই অবস্থানের সঙ্গে সিমলা চুক্তির উপর জোর দেবার জন্য বেনজিরের ঘোষিত অবস্থানের কিছু দ্বন্দ্ব থেকে গেছে।

রাজনৈতিক সঙ্কট

বেনজির সরকার পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করতে পারেন নি। ফলে তিনি জনসমর্থনও হারিয়েছিলেন। ১৯৯০ সালে পাক সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী প্রয়োগ করে যে বেনজির ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী তখত থেকে হটিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি ইশাক

খান, এবং তাঁর স্থানে আসীন হয়েছিলেন নওয়াজ শরিফ, তাঁকেও ববখাস্ত করেন সেই রাষ্ট্রপতি ইশাক খান। পাকিস্তানী বাজনীতির নিরিখে এতে অবাক হবার কিছু নেই যে রাষ্ট্রপতির এই কুকর্মে হাত মেলান সেই বেনজির ভুট্টো, যাকে এর আগে একই কুকর্মের শিকার হতে হয়েছিল।

১৯৮৫ সালে পাক সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী পাশ করিয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে একছত্র স্বৈরাচারী ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউল হক। তিনিই তখন দেশের রাষ্ট্রপতি। সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা ঠাট বজায় থাকলেও সংসদ অথবা প্রধানমন্ত্রীকে যে রাষ্ট্রপতির পুতুলের মতো নড়াচড়া করতে হবে তা বুঝতে দেরি হয়নি নির্বাচনে জয়ী প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর। নির্বাচিত দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফও তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। তাই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ছাঁটাই করতে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন তিনি। ইশাক খানও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পালটা চালে শরিফকে ধরাশায়ী করেছেন।

রাষ্ট্রপতি বনাম প্রধানমন্ত্রীর দ্বন্দ্বে উভয়েই চেয়েছেন সেনাবাহিনীর আনুকূল্য। পাক সেনা প্রধান অসিও নওয়াজ জানজুয়ার হঠাৎ মৃত্যু উভয়ের সামনেই এক অভাবনীয় সুযোগ হিসাবে হাজির হয়। শরিফ যখন সমর্থক জেনারেলদের তালিকা তৈরিতে ব্যস্ত তখন রাষ্ট্রপতি ইশাক খান বেশ কয়েকজন শীর্ষ সেনা অফিসারকে ডিঙিয়ে তাঁর নিজের লোক জেনারেল আবদুল ওয়াজ শরিফের সাজানো ঘুঁটি তছনছ করে দিলেন। এই একটি চালেই ক্ষমতার ভারসাম্য সপক্ষে টেনে আনলেন রাষ্ট্রপতি গুলাম ইশাক খান।

প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ রণে ভঙ্গ দিলেন না। প্রধান বিরোধী দল পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে (পি পি পি) কাছে টানতে এই দলের নেত্রী বেনজির ভুট্টোকে জাতীয় সংসদের বিদেশ নীতি বিষয়ক কমিটির চেয়ারপার্সন করে দিলেন তিনি। মর্যাদার দিক থেকে এই পদটি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমান। বেনজিরও সাগ্রহে গ্রহণ করলেন এই পদ।

শাসক জোট ইসলামী জামহুরি ইত্তেহাদ (আই জে আই)-র প্রধান শরিফ মুসলিম লিগের সভাপতি জুনেজোর মৃত্যু নওয়াজ শরিফের কাছে আর একটি সুযোগ এনে দিল। মুসলিম লিগের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক ডেকে নিজেকে দলীয় সভাপতি নির্বাচিত করালেন তিনি। প্রমাদ গুণলেন রাষ্ট্রপতি গুলাম ইশাক খান। প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং মুসলিম লিগের সভাপতিত্ব এক হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিপদ বুঝলেন তিনি। নেপথ্যে থেকে পালটা চাল দিলেন তিনিঃ শরিফ মন্ত্রিসভা থেকে একের পর এক ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকলেন প্রভাবশালী মন্ত্রীরা। শরিফ বুঝলেন, সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। সন্ধিচুক্তি নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করলেন তিনি। নওয়াজ শরিফ জানালেন রাষ্ট্রপতি পদের পরবর্তী নির্বাচনের গুলাম ইশাক খানই হবেন মুসলিম লিগের প্রার্থী। কিন্তু পাঠান খানকে টলাতে পারলেন না তিনি। ইশাক খান জানতেন, নওয়াজ শরিফের দয়ায় দ্বিতীয় টার্মের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেও একছত্র ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। ফলে সন্ধিচুক্তি হলো না। বেনজির তড়িঘড়ি লন্ডন থেকে দেশে ফিরে এলেন। গুলাম ইশাক খানের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সমঝোতা পাকা করলেন তিনি। পি পি পি-র ৪০ জন সাংসদ জাতীয় সাংসদ থেকে ইস্তাফা দিলেন।

এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে দুর্নীতি স্বজন পোষণ ইত্যাদি অভিযোগের সঙ্গে সংসদীয় ব্যবস্তা ভেঙে পড়ার খতিয়ানটি যোগ করে ১৮ই এপ্রিল রাতে

প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে বরখাস্ত করলেন, জাতীয় সংসদ ভেঙে দিলেন রাষ্ট্রপতি গুলাম ইশাক খান।

একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, অন্যান্য বারের মতো সরাসরি এবং প্রকাশ্যে পাক রাজনীতির মঞ্চে উপস্থিত হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য পেছন থেকে শরিফকে মদত দিয়েছে আমেরিকা। পাকিস্তানের প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনের পর বেনজির ভুট্টোকেই প্রধানমন্ত্রী করার ইচ্ছা মার্কিন প্রশাসনের। তবে পাকিস্তানের ব্যাপারে আমেরিকা যে আগের মতো আগ্রহী নয় প্রকারান্তরে সে কথাটাও জানিয়ে দিয়েছে মার্কিন সরকার। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি, আফগানিস্তানে প্রতিবিপ্লবী মৌলবাদীদের ক্ষমতায় বসানোর পর পাকিস্তান সম্পর্কে আমেরিকার অতিরিক্ত আগ্রহের কোন কারণও নেই। মার্কিন প্রশাসন সজাগ যে পাকিস্তানের দিকে তাদের প্রসারিত বন্ধুত্বের হাত ভারতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এখন মার্কিনী লক্ষ্য ভারত। চীনের পরেই ভারত যে শুধু বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যা অধ্যুষিত বিশাল বাজার তাই নয়, মার্কিনী রণনীতি ও বিশ্ব আধিপত্যের দিক থেকে ভারতের ভৌগলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই দেশের সঙ্গে সংলগ্ন ছয়টি দেশের সীমান্ত। তাছাড়া, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিনী আধিপত্য বজায় রাখতে হলে ভারতের সহযোগিতাও একান্ত কাম্য।

তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে একেবারে নিস্পৃহ থাকতে পারে না আমেরিকা। ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির যন্ত্র হিসাবে পাকিস্তানকে দরকার যন্ত্রী আমেরিকার। তাই পাক নাটকে মঞ্চের নেপথ্যে দাঁড়িয়ে কলকাঠি নাড়তেই থাকে ওয়াশিংটন।

তিব্বত

সাতশ' বছরের বেশি সময় ধরে তিব্বত হচ্ছে চীনের ভূখণ্ড। ইতিহাসের তথ্য থেকে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিব্বত চীনের ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন চীন য়ুয়ান রাজতন্ত্রের শাসনাধীন।

১৯৪৯ সালে চীনে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে তাইওয়ান এবং তিব্বত ব্যতিরেকে চীন মুক্ত হয়। ১৯৫১ সালের ২৩শে মে তিব্বতের স্থানীয় শাসকবর্গের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে তিব্বত শান্তিপূর্ণ ভাবে মুক্ত হয়। কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হতে না হতেই সেখানে দালাই লামার নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা করে। লালফৌজ প্রতিবিপ্লবীদের সেই চক্রান্ত পরাস্ত এবং পর্যুদস্ত করে দেয়। দালাই লামা চীন ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসেন এবং তখন থেকেই ভারতে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু বিদেশে থেকেও তিব্বতের বুকে প্রতিবিপ্লবী কাজকর্মে তিনি উস্কানি দিয়ে চলতে থাকেন।

১৯৮২ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বিদেশে বসবাসকারি চীনা নাগরিকদের স্বদেশে ফিরে আসার জন্য আবেদন জানায়। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে হংকং, ম্যাকাও প্রভৃতি স্থান থেকে বহু চীনা নাগরিক দেশে ফিরে যান। চীন সরকার দালাই লামাকে চীনে স্বাগত জানায় এবং আশ্বাস দেয় যে, তিনি যদি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তবে তাঁকে উপযুক্ত রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে চীন সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ দফা প্রস্তাবও দেওয়া হয়।

তিব্বত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কোন দিনই চায় নি। তিব্বতের বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যাঁরা সেই পঞ্চাশের দশকে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই দেশে ফিরতে থাকেন। বৌদ্ধ নেতারা বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই দেশে ফিরতে থাকেন। বৌদ্ধ নেতারা বিশেষ করে পাঞ্চেত লামা প্রমুখ তিব্বতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং সমাজ সংস্কারে যুক্ত হয়ে চীন সরকারের তিব্বত নীতির প্রতি সমর্থন জানালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আরো মরিয়া হয়ে ওঠে এবং দালাই লামাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমন্ত্রণ জানায়। দালাই লামা সেখানে গিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি তিব্বতের লামাদের প্রতি সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভ্যুত্থানের আবেদন জানান। ইতিমধ্যে সেখানে সাংবাদিকের বেশ ধরে বহু বিদেশী যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মার্কিন নাগরিক তিব্বতে গিয়ে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের প্ররোচিত করতে থাকেন। এই প্ররোচনামূলক কাজের প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে অসংখ্য লামার বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে। দ্রুত বিক্ষোভ হিংসাত্মক কার্যকলাপে রূপান্তরিত হয়। এটা সুখের বিষয় চীন সরকার দ্রুততার সঙ্গে হস্তক্ষেপে করে তিব্বত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হন। কিন্তু সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও দালাই লামাকে শিখণ্ডী করে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

তিব্বতের পরিস্থিতি

তিব্বতের রাজধানী নতুন করে হাঙ্গামা এবং সংঘর্ষ বাধার ফলে আবার সেখানে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আর এই জটিল পরিস্থিতির ফলশ্রুতি হিসাবে সেখানে জারি করতে হয়েছে সামরিক আইন। বার বার লাসায় কেন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে সে বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিযে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 'তিব্বত সম্পর্কে 'শত প্রশ্ন' শিরোনামার একটি বই প্রকাশ করেছে।

এই পরিস্থিতিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য লাসায় সামরিক আইন জারি করা হয়। সামরিক আইন জারি হবার পরে সেখানে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসে। চীনের প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ নিজে এই সামরিক আইন স্বাক্ষর করেন। তিনি বলেন, লাসায় যে সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে তার পিছনে সাধারন তিব্বতিদের কোন সমর্থন নেই। কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে। তাদের লক্ষ্য লাসায় আইনের সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা। সামরিক আইনের লক্ষ্য হলো নিরীহ নরনারীদের বিষয় সম্পত্তি ও জীবনরক্ষা করা। লাসায় সামাজিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা। সামরিক আইন জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়া চিৎকার শুরু করে যে তিব্বতে মানবাধিকার বিপন্ন। পিপলস ডেলী এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে তার জবাব দেয়। নিবন্ধে লেখা হয় ঃ 'তিব্বতের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধির জন্য ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়োজন। ১৯৫৯ সালের গণতান্ত্রিক সংস্কারের পূর্বে তিব্বতে ছিল ভূমিদাস ব্যবস্থা। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে সেই ব্যবস্থা ছিল সব থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং নিষ্ঠুর। তিব্বতী অভিজাততন্ত্রী, লাসা এবং তদানিন্তন তিব্বতের স্থানীয় সরকার নিজেদের ইচ্ছামত জনগণকে হত্যা করার অধিকার ভোগ করতেন। সাধারণ তিব্বতী নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না।

বর্তমানে বিদেশে অবস্থানরত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা পর্যটকের ছদ্মবেশে তিব্বতের

অভ্যন্তরে গুপ্তচর এবং চোরাকারবারীদের পাঠাচ্ছেন। তাদের হাত দিয়েই পাঠানো হচ্ছে গোপন অস্ত্র-শস্ত্র। আর আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তি সেই অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করছে যথেচ্ছভাবে।"

নিবন্ধে বলা হয়েছে ঃ "এটা সর্বজনবিদিত যে, গত কয়েক দশক ধরে কিছু বিদেশী শক্তি এবং তিব্বতী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কখনও তিব্বতকে চীনা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস ছেড়ে দেয় নি। এজন্যই চীন সরকার বর্তমানে চীনের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার জন্য তিব্বতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

তিব্বতে সামরিক আইন কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর জেনারেল ঝাঙ সাও-সঙ-এর উপর। তিনি তিব্বতের আঞ্চলিক সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক কমিশনার। বেজিঙ থেকে সামরিক আইন কার্যকর করার জন্য কয়েকটি আদেশ জারি করেন। সেই আদেশের লক্ষ্য হলো, লাসায় জরুরী ভিত্তিতে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সভা-সমাবেশ-বিক্ষোভ নিষিদ্ধকরণ, লাসার ধর্মঘট বে-আইনি ঘোষণা করা। কোন ব্যক্তিকে লাসা শহরে প্রবেশ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই সিকিউরিটি চেক-এর মধ্যে দিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে হবে। যে সমস্ত বিদেশী লাসার বসবাস করছেন তাঁদের নির্দেশ দেওয়ামাত্র লাসা ত্যাগ করতে হবে। কোন বিদেশিকে লাসায় নতুন করে প্রবেশ করতে হলে তাঁকে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে।

সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর উপর যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার আটক ও অন্যান্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পরেই লাসা শহরের অধিকাংশ দোকানপাট খুলে যায়, পুরোদমে ব্যবসা বাণিজ্য চালু হয়। তিনদিন ধরে লাসার বুকে যে তাণ্ডব চলে, যে অরাজক ও বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে নতুন করে জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়। সমস্ত সিনেমা হল এবং নাট্যশালায় মানুষের ভীড় উপচে পড়ে। বারগোর স্ট্রীটে যেখানে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বে-আইনি প্যারেড সংঘটিত করেছিলেন সেখানে আবার বৌদ্ধ মন্দিরগুলি খুলে যায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনী আবার উপাসনা শুরু করেন।

তিনদিনের হাঙ্গামায় অনেক দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অনেকেই অত্যাবশ্যক পণ্য পর্যন্ত সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন। তিনদিন পরে দোকান-পাট খুলে যাবার পর জিনিসপত্রের চাহিদা প্রচণ্ড বেড়ে যায়। বাজারের বামনে দীর্ঘ লাইন পড়ে। অনেককেই চড়া দামে জিনিসপত্র কিনতে হয়। অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করে বলেন ঃ 'সামরিক আইন জারি না হলে আমাদের না খেয়ে মরতে হতো'।

চীন

কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে দুটি ভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বের অবস্থান রয়েছে। পার্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে এই দ্বন্দ্ব দুটির সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

আমরা অবশ্যই ভুলব না যে মার্কসবাদের উপর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চূড়ান্ত পর্যায়ে মাও সে-তুঙ-এর 'দ্বন্দ্ব সম্পর্কে' অসাধারণ তাত্ত্বিক রচনাটির প্রকাশ। এই রচনার মাধ্যমে বিশ্বকে

বোঝার মৌলিক প্রণালীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সব কিছুরই বিকাশের প্রক্রিয়ার চরিত্র ব্যক্ত হয়। এই বিকাশ ঘটে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের গতির মাধ্যমে। দ্বন্দ্ব নেই এমন অবস্থায় কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সমাধানের মাধ্যমে আমাদের পার্টির বিকাশ হয়েছে এবং পার্টি এগিয়ে যাচ্ছে। যদি পার্টির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব না থাকত এবং তার সমাধানের জন্য কোন আদর্শগত সংগ্রাম না হত, তাহলে পার্টি-জীবন শেষ হয়ে যেত।

পঞ্চাশের দশকে মাও সে-তুঙ তাঁর আরেকটি তাত্ত্বিক রচনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন দ্বন্দ্বকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এটিও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট তত্ত্বগত ধারণা। প্রথমতঃ, তিনি সফল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিক পদ্ধতির প্রয়োগে পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সমাধান করেছিলেন, কিন্তু নতুন ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির সেই দ্বন্দ্বকে আর বেশি ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি তাঁর 'দ্বন্দ্ব সম্পর্কে' রচনায় পার্টির ভেতরকার দ্বন্দ্বকে বৈরীমূলক অথবা অ-বৈরীমূলক দ্বন্দ্বে বিভক্ত করেছিলেন এবং বারংবার তার উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি নিজেই এই দুই ধরনের দ্বন্দ্বকে নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন, বিশেষ করে পার্টির ভেতরকার দ্বন্দ্বের প্রকৃতির উপলব্ধিতে। এর ফলে তিনি অনেক জিনিসেরই সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছেন। চীনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা তিনি করেছিলেন তা পার্টি ও রাষ্ট্রের পক্ষে চরম বিপর্যয় এনেছিল। অথচ এই বিপর্যয় এড়ানো যেত।

সারমর্ম ও প্রকাশভঙ্গীর ভিত্তিতে এবং মাও সে-তুঙ-এর চিন্তাধারা ও চলতি প্রথার অনুসরণে পার্টির ভেতরে যে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব রয়েছে তার শ্রেণীবিন্যাস দুভাবে করা যায় : পার্টি সম্পর্কে বোধ এবং পার্টির কাজ নিয়ে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে পার্টি ও জনগণের স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কমরেড মাও তাঁর শেষ জীবনে এই ধরনের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন নি। ফলে, ভিন্ন মতকে বর্জন করার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সঠিক মতামতও যদি তাঁর মতের চেয়ে ভিন্নতর হত, তাহলেই সেই মতকে 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি', 'ধনতান্ত্রিক পথের দিশারী' বা 'পার্টি-বিরোধী' বলে অভিহিত করা হত।

অতীতের ভুল থেকে চীনের পার্টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়েছে। বোঝাপড়া ও কর্মধারা সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশিত হলে তার মোকাবিলায় পার্টি এখন সম্পূর্ণ অন্য পথ গ্রহণ করেছে। যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বারংবার মত বিনিময়ের পর গৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পার্টি সদস্যদের মতামত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত, পার্টির সভায় তাঁরা যে-কোনো ব্যক্তিকে সমালোচনা করতে পারেন এবং তাঁদের মতামত ও সমালোচনা ভুল হলেও সেই অধিকার রক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, যথাসাধ্য চেষ্টার পরও যদি কোন কাজে ভুল হয়, তাহলে সেই ভুল সংশোধনের সুযোগ তাঁদের দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত নীতি ও কর্মসূচী মনঃপূত না হওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁরা সেই নীতি ও কর্মসূচীকে রূপায়ণে সচেষ্ট হন, তাহলে তাঁদের মতপার্থক্য তাঁরা বজায় রাখতে পারবেন।

কিন্তু চীনের পার্টির ভেতরে আরেক ধরনের দ্বন্দ্ব আছে, তা হলো ব্যক্তি-স্বার্থের সঙ্গে পার্টি ও জনগণের স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এখন প্রশ্ন হল, সেই দ্বন্দ্বের চরিত্র কি?

প্রত্যেক পার্টিসভ্য নিঃশর্তভাবে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থকে পার্টি ও জনগণের স্বার্থের অধীনস্থ

রাখবেন, এই দাবি আমরা করি। যাঁরা পার্টির সভ্য এবং যাঁরা নন, তাঁদের মধ্যে এই নীতিই হল বিভাজন-রেখা। আমরা যখন বলি যে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা সর্বহারাদের অগ্রদূত, তখন আমরা এটাই বোঝাবার চেষ্টা করি যে সর্বকালে সর্ব অবস্থায় তাঁরা পার্টি ও জনসাধারণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেন এবং তাঁরা স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দেন পার্টি ও জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করতে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে।

কিছু পার্টিসভ্য আছেন যাঁরা পার্টি ও জনগণের স্বার্থের দিকে কোন নজর দেন না। কিছু সভ্য আছেন যাঁরা পার্টি ও জনগণের স্বার্থের প্রতি উদাসীন।

আবার এমন কিছু সভ্যও আছেন যাঁরা অত্যন্ত স্বার্থপর। পার্টি ও জনগণের স্বার্থের উর্ধ্বে তাঁরা নিজেদের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা এতদূর যান যে আইন ও পার্টি-শৃঙ্খলা পর্যন্ত তাঁরা লঙ্ঘন করেন এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তাঁদের আচরণ একজন পার্টিসভ্যের মৌল অবস্থানের বিরোধী।

আমার মতে, দ্বিতীয় ধরনের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আমাদের পার্টির মূল সমস্যা হল যে আমবা এর প্রকৃতি ভাল বুঝি না। অত্যন্ত জটিল বৈরীমূলক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কোন পরিষ্কার অবস্থান না নিয়ে এবং স্থির-নিশ্চিত সমাধানের পথে না গিয়ে আমরা অনেক সময়ই বাড়াবাড়ি করে ফেলি। কমরেড ডেঙ জিয়াও পিঙ-এর মতে এটা নরম-নীতির ফলশ্রুতি। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে।

কমরেড মাও-সে-তুঙ বলেছিলেন, চীনের রাজনৈতিক পরিবেশে কেন্দ্রিকতা ও গণতন্ত্র, শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা, ঐক্যবদ্ধ সংকল্প, ব্যক্তিগত মানসিক প্রশান্তি ও প্রাণোচ্ছল ভাব বজায় থাকবে। অতীতে চীনের পার্টি ভুল করেছে বলে এই অবস্থান দীর্ঘকাল ধরে অর্জন করতে পারেনি। একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণ অধিবেশনের পর অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা সংহত, বিকশিত ও কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সাম্যবাদী আদর্শকে জয়যুক্ত করার পথে উক্ত পরিবেশের সৃষ্টি নিবিড়ভাবে জড়িত।

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের তাৎপর্য

১৯৮২ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর পিকিং-এর গ্রেট হলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১,৫৪৫ জন প্রতিনিধি এবং ১৪৫ জন বিকল্প প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই দ্বাদশ কংগ্রেসকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা "ঐক্য ও বিজয়ের" কংগ্রেস বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা একথাও বলেছেন ঃ সপ্তম কংগ্রেসের পর এই দ্বাদশ কংগ্রেস চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কংগ্রেস পরিচালনা করার জন্য তেঙ সিয়াও পিঙ, ইয়ে চিয়ে উইঙ, ঝাও ঝিয়াঙ, লি সিয়েন নিয়েন, চেন উয়ান, হুয়া কুও ফেঙ, চু সিয়ান কুইন, নিয়ে রঙ চেন, পেঙ চেন এবং তেঙ উইঙ চও কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতি-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে তেঙ-সিয়াও-পিঙ প্রথম দিনের অধিবেশনের কাজ পরিচালনা করেন। তিনিই কংগ্রেস উদ্বোধন করেন।

তেঙ সিয়াও পিঙ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানতঃ এই কংগ্রেসের গুরুত্ব এবং কংগ্রেসের

আলোচ্যসূচী ব্যাখ্যা করেন। এগারোদিনের কংগ্রেসের সমগ্র আলোচ্য সূচীকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয় ঃ (১) একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা ও রিপোর্ট গ্রহণ। এই রিপোর্টে নতুন পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। (২) চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নতুন গঠনতন্ত্র গ্রহণ। (৩) নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিশন এবং শৃঙ্খলা পরিদর্শন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিশন নির্বাচন।

৩ কোটি ৯০ লক্ষ সদস্য বিশিষ্ট চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই তাৎপর্যবাহী কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে তেঙ-সিয়াও-পিঙ কংগ্রেসের উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত করেন। তিনি বলেন ঃ "১৯৮০-র দশক হল আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দশক। সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের কাজ জোরদার করা, মাতৃভূমির পূর্ণ একত্রীকরণ বিশেষ করে তাইওয়ানকে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনা এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা—এই তিনটি কাজই হলো বর্তমান দশকে আমাদের জনগণের প্রধান কাজ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো এই সমস্ত কাজের কেন্দ্রীয় কাজ। কেননা চীনের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী সমাধানের ভিত্তিই হলো অর্থনৈতিক অগ্রগতি। বর্তমান শতকের শেষের আঠারোটি বছরে আমাদের চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হতে হবে ঃ (১) প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং পার্টিকর্মীদের মধ্যে আরো বিপ্লবী প্রেরণা সৃষ্টি; যুবকদের আরো শিক্ষিত এবং উপযুক্ত করে তোলা; (২) সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলা; (৩) অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে এমন যে কোন অপরাধমূলক কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন করা এবং (৪) নতুন পার্টি গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে পার্টি স্টাইলের পরিবর্তন ঘটানো। সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পথ ধরে অগ্রসর হতে এগুলিই হলো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

তেঙ সিয়াও পিঙ-এর উদ্বোধনী ভাষণের পর হু ইয়াও বাঙ একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে মূল রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রাজনৈতিক রিপোর্টকে ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ (১) ঐতিহাসিক পরিবর্তন এবং আমাদের নতুন মহান কর্তব্য; (২) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য সর্বব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি; (৩) সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ; (৪) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা; (৫) স্বাধীন বৈদেশিক নীতি; (৬) সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের প্রশ্নে পার্টিই প্রাণশক্তি।

(১) ঐতিহাসিক পরিবর্তন এবং আমাদের মহান নতুন কর্তব্য ঃ এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিগত দিনের কাজকর্মের মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই মূল্যায়নের ভিত্তি হলো, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ।

রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ গত ছয় বছর ধরে আমরা যে সংগ্রাম করেছি তার পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার দশকে পার্টি এবং রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। আমাদের বিজয় সহজসাধ্য ছিল না। কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্র পার্টিকে পরিচালনা করায় এবং জনগণ সমস্ত রকমের বাধা-বিপত্তি দূর করার কাজে এগিয়ে আসায় এই বিজয় সম্ভবপর হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বে এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় যে বামপন্থী ভুলভ্রান্তি ঘটে তার প্রভাব খুবই গভীর এবং ব্যাপক। এই প্রভাব খুবই ক্ষতিসাধন করে। লিন পিয়াও এবং

চিয়াঙ চিঙ চক্রের মুখোশ উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও অনুভব করি যে, সমস্ত রকমের বামপন্থী ভুল-ভ্রান্তি দূর করা প্রয়োজন। এই সমস্ত ভুলভ্রান্তির মধ্যে মাও সে তুঙ-এর ভুল-ভ্রান্তি গুলিও পড়ে। চীন বিপ্লবে কমরেড মাও সে তুঙ-এর অবদান মহান এবং তা মুছে দেওয়া যায় না। এ জন্যই তিনি পার্টি এবং জনগণের মধ্যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ভবিষ্যতের বছরগুলিতেও তাঁর এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এখন প্রশ্ন হলো ঃ আমাদের পার্টির ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে আত্ম-সমালোচনা করার মার্কসবাদী সাহসিকতা আমাদের আছে কিনা? এই সমস্ত ভুলভ্রান্তির মধ্যে মাও সে তুঙ-এর ভুল-ভ্রান্তি গুলিও পড়ে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ মাও সে তুঙ, মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারা এবং বর্তমান সামাজতান্ত্রিক স্তরে শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। অতীতের বামপন্থী ভুলভ্রান্তিগুলি এজন্যই দূর হওয়া প্রয়োজন যে, এখন কোন কোন কমরেড ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই পুরানো ধারণাই পোষণ করছেন যে 'শ্রেণীসংগ্রামই হলো মূল ভিত্তি। আবার অনেকে মার্কসবাদী পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে, তাঁরা পার্টির নেতৃত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক পথকেই অস্বীকার করতে চান। এই সমস্ত নীতিগত প্রশ্নে আমাদের পার্টি সব সময়ই বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করেছে এবং বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সময়োচিত সংগ্রাম পরিচালনা করেছে।

এই সমস্ত প্রশ্নে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেসে কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল সেটা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একাদশ কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের কর্তব্য সম্পর্কিত অধ্যায়ের শুরুতেই বলা হয় ঃ "প্রথম মহান সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়সূচক পরিসমাপ্তি আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে নতুন যুগের সূচনা করেছেন। এই সংকটময় মুহূর্তে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রণকৌশলগত সিদ্ধান্ত হলো ঃ শ্রেণী সংগ্রামকে ভিত্তি করে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করো, স্থায়িত্ব ও ঐক্য অর্জন করো, সর্বহারার একনায়কত্ব শক্তিশালী করো, দুই পথ এবং দুই শ্রেণীর মধ্যে যখন প্রচণ্ড সংঘাত চলছে তখন মহান সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়গুলি সংহত করো, বিকাশ ঘটাও। চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ এর মহান পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরো এবং তাকে রক্ষা করো।"

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছিল ঃ "স্থায়িত্ব ও ঐক্যের অর্থ শ্রেণী সংগ্রাম পরিহার করা নয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়-সূচক পরিসমাপ্তির অর্থ এই নয় যে, শ্রেণী সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে. সর্বহারার একনায়কত্বে বিপ্লব অব্যাহত রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রের সমগ্র ঐতিহাসিক যুগে দুটি শ্রেণী সর্বহারা এবং বুর্জোয়া; দুটি পথ— সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র-র মধ্যে সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবে, কঠোর হবে এবং কোন কোন সময় খুবই তীব্র হবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মত রাজনৈতিক বিপ্লব ভবিষ্যতে বহু সময়ই ঘটবে। আমাদের চেয়ারম্যান মাও-এর শিক্ষাগুলি অনুধাবন করতে হবে এবং সর্বহারার একনায়কত্বেও বিপ্লব অব্যাহত রাখতে হবে"।

(২) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য সর্বব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি ঃ দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "এই নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ কর্তব্য হলো, সমগ্র জাতির সমস্ত মানুষকে কঠোর পরিশ্রম আত্মনির্ভরশীলতার নীতির ভিত্তিতে

ঐক্যবদ্ধ করা। এর উদ্দেশ্য হবে, ধীরে ধীরে শিল্প, কৃষি, জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে পৌঁছানো। এইভাবে চীনকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত এবং গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে হবে।

নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের যে বহুবিধ কাজের সম্মুখীন হতে হবে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, চীনের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ।"

এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষির উপর। বলা হয়েছে, জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি হল কৃষি। আমরা যদি কৃষির অগ্রগতি ঘটাতে পারি তবে অন্যান্য সমস্যারও আমরা সহজেই মোকাবিলা করতে পারব। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও নির্মাণ কাজের মূল লক্ষ্য হবে দেশের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ করা। আমাদের অর্থনীতির মূল নীতি হলো ঃ প্রথম জনগণের ক্ষুধা নির্বাপণ করা, তারপর দেশকে গড়ে তোলা।

(৩) সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সভ্যতা ঃ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেমন অর্থনৈতিক প্রশ্নে আধুনিকীকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে তার সাথে সাথে চীন সভ্যতাকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সভ্যতায় উন্নীত করার সংকল্প গ্রহণ করেছে। এটা গ্রহণ করেছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কৌশলগত নীতি হিসাবে। কেননা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সভ্যতা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রশ্নে বৈষয়িক সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

হু ইয়াও সাঙ তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সভ্যতার দুটি দিক আছে ঃ (১) সাংস্কৃতিক (২) মতাদর্শগত। একে অপরের পরিপূরক। সাংস্কৃতিক বিষয়ে যে সমস্ত দিক রয়েছে সেগুলি হলো ঃ শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্য, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা, রেডিও টেলিভিশন, জনস্বাস্থ্য, লাইব্রেরি মিউজিয়াম ইত্যাদি। আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অবশ্যই পরিচালিত হবে সাম্যবাদী আদর্শের ভিত্তিতে। অতীতে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণ মনোভাব গ্রহণ করা হয় এবং এই সমস্ত বিষয়ের গুরুত্বকে লঘু করে দেখা হয়। এই সমস্ত ঘটনা বৈষয়িক এবং আদর্শভিত্তিক সভ্যতা গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা এই সমস্ত ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা দূর করার জন্য সর্বতো প্রয়াস চালিয়েছি। আমরা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেকে, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি পিছিয়ে না পড়ে। বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী বহন করে নিয়ে যেতে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সমগ্র পার্টি এবং সমাজকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, শ্রমিক-কৃষকের ন্যায় বুদ্ধিজীবীরাও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একটি শক্তি। আমরা এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর, যে পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা উৎসাহ নিয়ে জনগণের স্বার্থে কাজ করতে পারেন।

বৈষয়িক এবং আদর্শভিত্তিক সভ্যতা গঠনের জন্য যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত তা হলো, সর্বজনীন শিক্ষা। ১৯৮০ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং স্টেট কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১৯৯০ সালের মধ্যে দেশের সর্বত্র সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। যে সমস্ত স্থানের অর্থনীতি ও শিক্ষা উন্নত সেই সমস্ত স্থানে একাজ আগেই করা হবে। চীনের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকায় এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবু এই কঠিন কাজ আমাদের করতেই

হবে এবং তা আমরা করবই। কৃষি এবং গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই আমাদের এ কাজ করতে হবে।

আমাদের আদর্শভিত্তিক সভ্যতার সমাজতান্ত্রিক চরিত্র নির্ধারিত হয় মতাদর্শগত শিক্ষার দ্বারা। এই মতাদর্শগত শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট হলো ঃ শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সাম্যবাদী ধারণা, বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ, সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শৃঙ্খলাবোধ, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা, সমাজতান্ত্রিক দেশাত্মবোধ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ। এক কথায়, বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা, নৈতিকতা এবং শৃঙ্খলা। সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সভ্যতা গঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া সমগ্র পার্টির এক মহান কর্তব্য, সমগ্র জনগণের একটা সাধারণ কর্তব্য। পার্টির অভ্যন্তরের আদর্শগত শিক্ষা হলো ঃ এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সভ্যতা গঠনের ভিত্তি। এ কাজে পার্টি সদস্যদেরই নৈতিকভাবে এবং আদর্শগতভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

(৪) উচ্চস্তরে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ঃ উচ্চস্তরের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নেও দ্বাদশ কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ সমাজতান্ত্রিক, বৈষয়িক ও আদর্শভিত্তিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন উচ্চস্তরের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। উচ্চস্তরের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাই আমদের অন্যতম মূল লক্ষ্য ও কর্তব্য। আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হলো জনগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একদিকে শ্রমজীবী জনগণ, জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হচ্ছেন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে; অন্যদিকে সমাজতন্ত্রকে যারা খাটো করে দেখে, যারা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব পোষণ করে সেই ক্ষুদ্র অংশের বিরুদ্ধে একনায়কত্ব চালায়। সমাজতন্ত্র সমস্ত মানুষের সাধারণ স্বার্থ বক্ষা করে। একমাত্র উচ্চস্তরের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই পারে জনগণের ইচ্ছা, স্বার্থ ও প্রয়োজনগুলি পূরণ করতে। এই ব্যবস্থাই পারে জনগণের দায়িত্ব এবং তাঁদের উদ্যোগ প্রসারিত করতে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস থেকে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর প্রাথমিক পর্যায়ে এবং ১১ই সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত পর্যায়ে এই কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হলো ৩৪৮ জন। এঁদের মধ্যে ২১০ জন সদস্য এবং ১৩৮ জন বিকল্প সদস্য। পার্টি কংগ্রেস থেকে ১৪৯ জনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিশন গঠিত হয়।

নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার ৬০ শতাংশই হলেন নতুন অর্থাৎ এই প্রথম তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে এলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির ইস্তেহারে বলা হয়েছে, "এই সমস্ত কমরেডের রাজনৈতিক চেতনা ও সাংগঠনিক" দক্ষতার ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩৪৮ জন সদস্য বিশিষ্ট সি পি সি-র কেন্দ্রীয় কমিটির ২১১ জন সদস্য হলেন নতুন। এঁদের মধ্যে আবার ১৪০ জনের বয়স ৬০ বছরের কম। অর্থাৎ ৬০ বছরের কম বয়স্ক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের বেশি। কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের বয়স হলো মাত্র ৩৮ বছর। এবারে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির সময় বিশেষ কাজে পারদর্শী কমরেডদের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই ধরনের ৫৯ জন কমরেড অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। পূর্বের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আগত কেন্দ্রীয়

কমিটির সদস্য সংখ্যা হলো ৩১ জন (৮.৯ শতাংশ)। মহিলা সদস্যের সংখ্যা হলো ২৪ জন (৬.৯ শতাংশ)।

১২ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হু ইয়াও বাঙ এবং ঝাও জিয়াঙ। কেন্দ্রীয় কমিটির এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটির ৩৪৮ জন সদস্য ব্যতিরেকেও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিশনের ১৪৯ জন সদস্য যোগদান করেন। তা ছাড়া হুয়াঙ কে চেঙ দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন থেকে পলিটব্যুরো, পলিটব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটি, সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়। তা ছাড়া সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়াম্যান সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

নবগঠিত পলিটব্যুরোর সদস্য সংখ্যা হলো ২৮ জন। এঁদের মধ্যে ২৫ জন হলেন সদস্য এবং ৩ জন হলেন বিকল্প সদস্য। একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সংখ্যা ছিল ২১।

নবগঠিত পলিটব্যুরোর সদস্যগণ হলেন ঃ ওয়ান লি, চি ঝঙ চুন, ওয়াঙ চেন, ওয়েই গুও কুইঙ, উলান হু, ফাঙ ই, তেঙ সিয়াও পিঙ, তেঙ উইঙ চাও (মহিলা) ইয়ে চিয়েন উইঙ, লি সিয়ান নিয়েন, লি তে সেঙ,উয়াঙ সাঙকুন, উয়াঙ তে চি, উই কুইলি, সঙ রেঙ ইয়ঙ, ঝাঙ তিঙফা, চেন উয়ান, ঝা জিয়াঙ, হু গুয়াওমু, হু ইয়াও বাঙ, নিয়ে রঙচেন, নি চিফু, চু সিয়াঙ কুইয়ান, পেঙ চেন এবং লিয়াও চেঙ ঝি। পলিটব্যুরোর বিকল্প সদস্যগণ হলেন ঃ ইয়াও উইলিন, কুইন জিয়েই, চেন মুহুয়া (মহিলা)।

কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন থেকে পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। এই স্টান্ডিং কমিটির সদস্য সংখ্যা হলো ৬। এঁরা হলেন, হু ইয়াও বাঙ, ইয়ে চিয়েন উইঙ, তেঙ সিয়াও পিঙ, ঝাও জিয়াঙ, লি সিয়েন নিয়েন এবং চেন উয়ান।

কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং ১১ জনের সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করেছে। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন হু ইয়াও বাঙ। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ হলেন ওয়ান লি, চি ঝঙ চুয়ান, তেঙ লি কুয়ান, ইয়ঙ উয়ঙ, উ কুইলি, গু মু, চেন পিচিয়ান, হু কুইলি, ইয়াও উইলিন। সম্পাদকমণ্ডলীর বিকল্প সদস্য হলেন, কুইয়াও সি এবং হাও জিয়ানচুই (মিহিলা)।

কেন্দ্রীয় কমিটি সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চেয়ারম্যান হলেন তেঙ সিয়াও পিঙ। ভাইস-চেয়ারব্যানগণ হলেন ইয়ে চিয়েন উইঙ, চু চিয়ম কুইয়ান, নিয়ে রঙ চেনু বেং ওয়াঙ সাঙকুন।

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে পর্যালোচনা

১৯৮৪ সালের মে মাসে গণচীনের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝাও জিয়াঙ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের নীতি ব্যাখ্যা করেন। চীনের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ নিচে দেওয়া হলো ঃ

১। অভ্যন্তরীণ অগ্রগতি

বিগত বছরে সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের সন্তোষজনক অগ্রগতি ঘটেছে। ঘটনাবলীর গতি-প্রকৃতিও অতিশয় উৎসাহব্যঞ্জক। ১৯৮৩ সালে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ মূল্য

শতকরা ১০.৫% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে আর কৃষিক্ষেত্রে তা' হচ্ছে শতকরা ৯.৫% ভাগ। উভয় ক্ষেত্রের এবং শস্য, তুলা, কয়লা, অশোধিত তেল, ইস্পাত, ইস্পাতের পাত, ঢালাই-না-করা লৌহপিণ্ড, সিমেন্ট এবং রাসায়নিক সার প্রভৃতি ৩০টি প্রধান শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ মূল্য নির্দিষ্ট সময়ের দু'বছর আগেই, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮১-৮৫) অন্তর্গত ১৯৮৫ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছে বা সেই লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। এখন, নিশ্চিতভাবেই আমরা বলতে পারি, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সবগুলি লক্ষ্যমাত্রাই পূর্ণ হবে বা লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাবে।

আগামী বছরে আর্থিক অগ্রগতিই প্রধান করণীয়রূপে অবশিষ্ট থাকছে। আমাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক কাজে দুটি প্রধান বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করা উচিত — যথা, আর্থিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ।

আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস

গ্রামাঞ্চলে, পরিবারগুলির এবং উৎপাদনের সঙ্গে পারিশ্রমিককে যুক্ত করার ভিত্তিতে এবং বিশেষজ্ঞ পরিবারগুলিকে, তৎসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সংগঠনগুলিকে উৎসাহদান ও পণ্য উৎপাদন প্রসারে সক্রিয় কৃষকদের সাহায্যদানের ভিত্তিতে সংযত হওয়া ও চুক্তিবদ্ধ দায়িত্ব প্রথার বহুবিধ মাধ্যমগুলিকে উন্নত করা প্রয়োজন। শহরাঞ্চলেও সংস্কার ত্বরান্বিত হওয়া উচিত।

শহরাঞ্চলের অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে এখন প্রধান করণীয় হলো, ভালোভাবে পরিচালিত ও খারাপভাবে পরিচালিত সংস্থাগুলোর মধ্যে এবং বেশি কাজ করা ও কম কাজ-করা কর্মীদের মধ্যে কোন পার্থক্য না-করার প্রচলিত পদ্ধতিকে উচ্ছেদ করা। এটাও দেখতে হবে যে, সংস্থাগুলো যেন রাষ্ট্রের "বৃহৎ ভাণ্ডার" থেকেই সম্পদ শুষে না নেয় এবং কর্মীরাও যেন সংস্থাগুলোর "বৃহৎ ভান্ডার" থেকেই একইভাবে সম্পদের অপচয় না ঘটায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে লভ্যাংশদানের পরিবর্তে করদানের পদ্ধতির প্রচলনই অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর সুবিধাজনক। গত বছরে এই সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। আর, ১৯৮৪ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক থেকে আরম্ভ করার পর যে—সংস্থাগুলি তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য কর-পরবর্তী লভ্যাংশ রেখে দেয় সেগুলোর ক্ষেত্রে এখন লভ্যাংশদানের পরিবর্তে করদানের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের দিকেই দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি চুক্তি বা দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতিতে যৌথভাবে বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। অথবা যৌথ সংস্থাগুলির মতো তারাও রাষ্ট্রকে কর দিতে পারে।

আর্থিক দায়িত্ববিধির বহুবিধ পদ্ধতির মাধ্যমে সব সংস্থাগুলিরই উচিত, বণ্টন-সমতাকে বাদ দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সংস্থার কর্মীদের বেতনক্রমকে যুক্ত করা — শুধু সংস্থার সামগ্রিক কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, তাদের ব্যক্তিগত ভূমিকার ভিত্তিতেও। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাগুলি বহুবিধ মজুরি-পদ্ধতি চালু করতে পারে, যথা — কাজভিত্তিক বোনাস, আংশিক হারের বেতন, সীমিত মজুরি এবং পদ ও সাহায্যমূলক কাজের উপযোগী পারিশ্রমিক। সংস্থাগুলি শ্রমিক-কর্মচারীদের বোনাস যথাযথভাবে বাড়াতে পারে তখনই, যখন তারা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সমস্ত কোটা পূর্ণ করতে বা সেই পূর্ণ মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবে এবং আরো কর দিতে পারবে এবং পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে আরো বেশি

লভ্যাংশ উপার্জন করতে পারবে কিন্তু সংস্থাগুলি বোনাস হ্রাস করবে অথবা বন্ধ করে দেবে অথবা এমন-কি মজুরি বা বেতনের অংশ কেটে নেবে — যদি শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের কোটা-পূরণে ব্যর্থ হয় এবং কম কব দেয় এবং কম লাভ অর্জন করে।

নিম্নবর্ণিত দশটি বিষয়ে সংস্থাগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয় — উৎপাদন ও কর্মসম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা, উৎপন্নদ্রব্য বিক্রয়, মূল্য-নির্ধারণ, জিনিসপত্র বা উপাদান নির্বাচন ও ক্রয়, তহবিলের ব্যবহার, সম্পদের ব্যবহার, কাঠামো-নির্মান কর্মী ও শ্রম-সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রশাসন, মজুরি ও বোনাস এবং ইউনিটগুলির পারস্পরিক অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালী।

যে পদ্ধতিতে ডিরেক্টর বা ম্যানেজার পূর্ণ দায়িত্বের অধিকারী হন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ক্রমশঃ সেই পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। উৎপাদন পরিচালনা, প্রশাসন এবং তাঁদের সংস্থাগুলির কার্যপ্রণালীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ডিরেক্টরদের ও ম্যানেজারদের উপর রাষ্ট্র কর্তৃক ক্রমশঃ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে সংস্থাগুলির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের কার্যকর অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে কয়েক প্রস্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শহরাঞ্চলের সব শিল্পের মধ্যে বিনিয়োগমূলক দায়িত্ব-পদ্ধতি ও বেসরকারী আমন্ত্রণমূলক পদ্ধতিপালনে গৃহ নির্মাণ শিল্পই সর্বাগ্রে সংস্কারমূলক মঞ্চের সম্মুখীন হতে পারে।

পরিকল্পিত অর্থনীতির ভূমিকাকে প্রাথমিক ও বাজার নিয়ন্ত্রণের ভূমিকাকে পরিপূরক করার নীতিতে কাজ করে এবং সমাজতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়কে উন্নীত করার প্রয়োজন মিটিয়ে, প্রশাসনিক বিভিন্ন বিভাগ ও পর্যায় অনুসারে সম্মিলিত ক্রয় ও পণ্য সরবরাহসহ বর্তমান পণ্য সরবরাহ পদ্ধতিকে স্বল্পসংখ্যক সংযোগ-সমন্বিত একটি খোলামেলা বহুমুখী চরিত্রে আমাদের রূপান্তরিত করা উচিত — যাতে শহর ও গ্রামের মধ্যে পণ্যের সহজ চলাচল ও বিভিন্ন এলাকার মধ্যে পণ্য-বিনিময় সুনিশ্চিত করতে একটা ক্রুশাকার জালের কাঠামো গড়ে উঠবে এবং একটা সম্মিলিত সমাজতান্ত্রিক বাজার বাস্তবে রূপায়িত হবে।

বহির্বিশ্বে মুক্ত-দ্বার নীতি

বহির্বিশ্বের কাছে দ্বারা-উন্মোচন এমন একটি সঠিক নীতি, চীনের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে যা' সুসঙ্গত এবং এই নীতি আমরা অবশ্যই অটলভাবে প্রয়োগ করবো। স্টেট কাউন্সিল বিশেষ অর্থনীতিক জোন্‌গুলি আরো ভালোভাবে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ইয়ামেনের বিশেষ অর্থনীতিক জোন্‌টিকে প্রসারিত করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডালিয়ান কিঙ্‌হুয়াঙ্‌ডাও, তিয়ানজিন, অনটাই, কিঙ্‌ডাও, লিয়ান্‌য়ুঙ্‌গাঙ, নাঙটঙ, সাংহাই, নিংবো, ওয়েনঝাও, ফুঝাও, গুয়াঙ্‌ঝাও, ঝাঙ্‌জিয়াং ভ্‌বেহাই এই চৌদ্দটি উপকূলবর্তী শহর এবং হাইনান্‌ দ্বীপকে বহির্বিশ্বের কাছে আরো খুলে দেওয়া হবে। বিশেষ আর্থিক এলাকাগুলির জন্য পরিকল্পিত কয়েকটি বিশেষ নীতি সেই সব জায়গায় প্রয়োগ করা হবে এবং তাদের সিদ্ধান্তগ্রহনে ক্ষমতাও প্রসারিত করা হবে। এই সব বন্দর-শহরের কলকারখানায় যে-সব বিদেশী ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করবে, সংশ্লিষ্ট চুক্তি অনুসারে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে তাদের আরো বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।

যে-সব নির্মাণপ্রকল্পে বিদেশী বিনিয়োগ এবং বিদেশী কারিগরির ব্যবহার করা হয়, সেগুলি পরীক্ষা করে দেখার ও অনুমোদন করার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হবে। বিদেশী

ব্যবসায়ীদের আসা-যাওয়ার নিয়ম-পদ্ধতিগুলি সরলীকৃত হবে। পুরোপুরি তাদের নিজেদের বিনিয়োগ দিয়েই সংস্থা স্থাপনের অধিকার বিদেশী ব্যবসায়ীদের দেওয়া হবে। যৌথ উদ্যোগগুলির যৌথ পরিচালনার সময়সীমা যথাযথভাবে বর্ধিত করা হবে। যে-সব বিদেশী বিনিয়োগকারী চীনকে অগ্রসর কারিগরি দিয়ে যথার্থ সাহায্য করবে, তারা তাদের উৎপন্ন পণ্যের একটা বিশেষ অংশ অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি করার সুযোগ পাবে।

২. বিদেশ নীতি

পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব বিস্তারে এবং অন্যান্য বহু দেশের সঙ্গে সম্পর্কের সূচনায় ও উন্নতিতে বিগত বছর থেকে চীন কূটনৈতিকভাবে সক্রিয় রয়েছে।

আমরা আমাদের কূটনৈতিক সাফল্যগুলি অর্জন করতে পেরেছি তার কারণ, আমাদের সংবিধানে নির্ধারিত আমাদের বিদেশ নীতির সাধারণ সূত্রের প্রতি আমরা অটলনিষ্ঠ হয়েছি। ইতোমধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে, বাস্তবের সঙ্গে আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে আমরা নিজেদের যথাসময়ে পুনরায় খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি এবং সেগুলিকে সমৃদ্ধ করেছি।

চীনের এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বের জনগণের মৌলিক স্বার্থগুলির কথা ভেবেই চীন অগ্রণী হয়, তড়িঘড়ি কোন কিছু করবে না, বাইরের কোন চাপের কাছেও নতি স্বীকার করবে না।

বিশ্বশান্তির সপক্ষে

এটাই (বিশ্বশান্তি রক্ষা) হল চীনের বিদেশ নীতির প্রাথমিক লক্ষ্য। চীন শান্তি কামনা করে, যুদ্ধ নয়। চীন ঠাণ্ডা ও গরম, দুরকম লড়াইয়েরই বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সর্বাগ্রে যা অবশ্য করণীয়, তা হলো — দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার এবং তাদের প্ররোচনায় বা সমর্থনে সঙ্ঘটিত আঞ্চলিক যুদ্ধগুলির অবসান। দুই বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উদ্‌ভূত বিক্ষোভ অশান্তিও নির্মূল করা প্রয়োজন। মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক সহজ হোক, এটা আমরা দেখতে চাই। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি এবং দুটি সামরিক জোটের মধ্যে তীব্র বিরোধিতারও অবসানের পক্ষে আমরা।

চীন নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে এবং অস্ত্রপ্রতিযোগিতা, বিশেষত : পারমাণবিক অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে। সমস্ত রকম পারমাণবিক, রাসায়নিক, জৈবিক ও মহাকাশ অস্ত্রাদির সামগ্রিক নিষিদ্ধকরণ ও সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনের এবং প্রচলিত অস্ত্রাদির উল্লেখযোগ্য হ্রাসের পক্ষেই আমাদের অবস্থান। চীন একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র। যাই হোক, কখনোই এবং কোন অবস্থাতেই চীন প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করবে না এবং চীন এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী নয় এমন কোন রষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করবে না। চীন পক্ষপাতমূলক "পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার-বিরোধী চুক্তি"[১]-র সমালোচনা করে এবং এই চুক্তি মানতে অস্বীকার করছে। কিন্তু চীন কোনভাবেই পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার সমর্থন করে না এবং পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে অন্যান্য দেশকে সাহায্য করে চীন এই প্রসারে লিপ্তও হবে না।

চীন মনে করে, প্রচলিত অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই পারমাণবিক অস্ত্রও হ্রাস করা

উচিত। নিরস্ত্রীকরণের যে কোনো বাস্তবসম্মত প্রস্তাব আমরা সমর্থন করব, যদি সেটা এই মৌলিক নীতিকে স্বীকার করে যে, দুটি বৃহৎ শক্তিকে তাদের পারমাণবিক ও প্রচলিত অস্ত্রাদি হ্রাসে অগ্রণী হতে হবে।

বিশ্বশান্তির সুরক্ষা সর্বত্র জনগণের সাধারণ আকাঙ্ক্ষা। গত কয়েক বছর যাবত ইউরোপে, জাপান এবং অন্যান্য অনেক দেশে পারমাণবিক অস্ত্র, পারমাণবিক ভীতি ও পারমাণবিক অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে বিশাল সব শান্তি-আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে। আজ বিশ্বের রাজনৈতিক জীবনে এ এমন একটা জিনিস, যা গভীর মনঃসংযোগের যোগ্য। চীনের সরকার ও জনগণ এগুলির প্রতি সহমর্মিতা ও সমর্থন জ্ঞাপন করছে।

বিশ্বশান্তির পথে প্রধান বাধাই হলো প্রভুত্ববিস্তারের লোভ। বিশ্ব শান্তির সুরক্ষার জন্য সমস্ত ধরনেরই প্রভুত্ববাসনার বিশেষত ঃ বিশ্ব কর্তৃত্ব নিয়ে বৃহৎ শক্তি দুটির প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অত্যাবশ্যক। চীন কখনোই প্রভুত্ব-সন্ধানী হবে না, প্রভুত্বমূলক কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। বিশ্বশান্তির পক্ষে একটা মারাত্মক ভয় এখন বিদ্যমান কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, সমস্ত দেশের জনগণ যতক্ষণ তাঁদের ঐক্য শক্তিশালী রাখতে ও সংগ্রাম করতে এবং আক্রমণ ও যুদ্ধনীতি অনুসরণে বৃহৎ শক্তিগুলিরপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারবেন একটা নতুন বিশ্বযুদ্ধ প্রতিহত করা ও বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বৈদেশিক নীতি

পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক সংহতি সম্পর্কে শ্রদ্ধা, পারস্পরিক অনাক্রমণ, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা ও পারস্পরিক কল্যাণ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি নীতি আমাদের সংবিধানে দীর্ঘকাল যাবত লিখিত আছে। সমস্ত দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে চীন এই মৌল নীতিগুলি অনুসরণ করে থাকে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সৎ-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার উপরে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যে-সব দেশের সঙ্গে আমরা শান্তিতে বাস করে আসছি, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা সুদৃঢ় ও প্রসারিত করতে আমরা সক্রিয় হব। আর, যে-সব দেশের আমাদের সঙ্গে কোনো-না কোনোরকম বিরোধ আছে তাদের সঙ্গে সেই বিরোধগুলি মিটিয়ে ফেলতে আমরা সর্বতভাবে চেষ্টা করব যাতে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্রমশঃ উন্নতি হয়। এই বিরোধগুলি যদি সাময়িকভাবে দূর করা না-ও যায়, তথাপি আমরা ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।

চীনের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে বলা যায়, দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিকল্পে চীন তাদের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করতে প্রস্তুত — অবশ্য, ভিয়েতনাম যদি প্রতিশ্রুতি দেয় ও ঘোষণা করে যে, কাম্পুচিয়া থেকে সে তার সৈন্য সরিয়ে নেবে এবং সৈন্য অপসারণের কাজ শুরু করে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন—এই দুই বৃহৎ বৃহৎ শক্তির সঙ্গে আমাদে সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রেও একইভাবে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চ নীতির অনুগামী। চীন-মার্কিন সম্পর্ক প্রসারের উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করি, কেননা, বিশ্বের শান্তি ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চীন-সোভিয়েতের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক আমাদের

আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আর্থিক, কারিগরি ও সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রসারে আমরা প্রস্তুত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের একটা নীতিভিত্তিক অবস্থান আছে। আমরা তাদের প্রভুত্ববিস্তারের বিরোধী বলেই তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি সাধন থেকে বিরত হব না, আবার, তাদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি চাই বলেই আমবা আমাদের প্রভুত্ববিরোধী অবস্থান পরিত্যাগ করবো না, তেমনি আবার বৃহৎ শক্তি দুটির একটির মূল্যে অপরটির সঙ্গে আমরা আমাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হব না।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চসূত্র কেবল বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাবিশিষ্ট দেশগুলির সঙ্গেই সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিসহ একই সমাজ ব্যবস্থা সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যেও সম্পর্ক বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চসূত্র মেনে চললে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা সম্পন্ন দেশগুলিও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করতে পারে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় থাকে; কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চসূত্র মেনে না চললে একই সমাজব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যেও তীব্র বিরোধ, এমনকি সঙ্ঘর্ষও দেখা দিতে পারে। যদি সমস্ত দেশই পঞ্চসূত্র মেনে চলে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শান্ত থাকবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের উদ্দেশ্যও চরিতার্থ হবে এবং বিশ্বশান্তিও সুরক্ষিত হবে।

বিশ্বশান্তি

সাম্রাজ্যবাদ, প্রভুত্বকামিতা, উপনিবেশবাদ, সম্প্রসারনবাদ ও বর্ণ-বিভেদের বিরুদ্ধে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সংগ্রামকে চীন সুদৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য কোন্ সাম্রাজ্যবাদী অথবা প্রভুত্বকামী শক্তি, তাতে কিছু আসে-যায় না, চীন কখনোই আক্রমণকারী শক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিবেচনা করে তাদের আক্রমণ ও হস্তক্ষেপমূলক কাজকর্মের সঙ্গে সমঝোতা করে না। বিশ্ব শান্তি ও তার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক শান্তি ও সুস্থিতি অর্জনে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সব প্রচেষ্টাকেই চীন দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করে। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশকে তাদের প্রধান করণীয়রূপে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশই একটা ঐতিহাসিক পর্বে প্রবেশ করেছে। চীন বিকাশশীল একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। একটি নতুন আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিকাশশীল দেশগুলির সংগ্রামে চীন তাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করে। চীন উত্তর-দক্ষিণের আলোচনা সমর্থন করে এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণেও ইচ্ছুক। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বিদ্যমান সমবায় পকল্পগুলির প্রসঙ্গে চীন সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে বিবিধ সাহায্য দান চালিয়ে যাবে। তৃতীয় দুনিয়ার যে-দেশগুলি তীব্র সঙ্কটাপন্ন ও বিশেষভাবে সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করছে, চীনের সামর্থমতো রাখা হয় তাদের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাবে চীন। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি চীনের পরীক্ষিত বন্ধু, আর, সব সময়েই এই মূল্যবান বন্ধুত্বের পক্ষ অবলম্বন করাই চীনের অবশ্য কর্তব্য। যে-রকম সমাজ ব্যবস্থা তারা চায়, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির জনগণই সেটা বেছে নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারী এবং চীন তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে না। সমস্ত দেশের সঙ্গেই তার স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নত করুক,

আমরা সেটাই চীন দেখতে চাই। তাদের নিজের নিজের পরিস্থিতি অনুসারে তাদের কাবও-কাবও হয় একটা বৃহৎ শক্তির, নয় তো অপর বৃহৎ শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক আছে এবং তদনুরূপ সাহায্যই তারা সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শক্তির কাছে পেয়ে থাকে কিন্তু তাদের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চীনের প্রচেষ্টা তার দরুন ব্যাহত হবে না।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে মৌলিক স্বার্থগত কোনো বিরোধ নেই এবং বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত পারস্পরিক বোঝাপড়া ও পারস্পরিক লেনদেনের দৃষ্টিভঙ্গিতে, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিরোধ ও বিতর্কগুলির একটা সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব ও সমীচিন বলে চীন সব সময়েই মনে করেছে। তাদের বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের মধ্যে কোনোক্রমেই চীন জড়িয়ে পড়বে না এবং এসব ক্ষেত্রে কোনো বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপেরও চীন বিরুদ্ধে।

(৩) তাইওয়ান ও হংকং

দেশ ও জাতির মৌলিক স্বার্থের দিক থেকে এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও তাইওয়ান-এব বর্তমান পরিস্থিতি বিচারে দেশের পুনর্মিলনের পর "এক দেশ দুই পদ্ধতি"-র ধারণাটাই চীনের বাস্তবে প্রয়োগের জন্য সামনে রেখেছি। চীনের প্রস্তাব ও ধ্যান-ধারণাগুলি যুক্তিপূর্ণ ও আন্তরিক। তাইওয়ান কর্তৃপক্ষ যা-ই বলুক বা করুক, সবই উপলব্ধি করা যাবে, যদি তাইওয়ান-প্রণালীর উভয় তীরের স্বদেশবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ ও যাওয়া-আসার বিনিময তাইওয়ান সহজতর করে, উভয় তীরের স্বদেশবাসীদের পারস্পরিক বোঝাপড়া তাইওয়ান বর্ধিত করে এবং চীনের মাতৃভূমির পুনর্মিলনে তাইওয়ান সহায়ক হয়। চীন বিশ্বাস করে, যতদিন কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একই সাধারণ ভাষার অংশীদার, শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলনের পবে অবশিষ্ট সব কিছুরই মীমাংসা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব হবে। আরো দেবিতে করার চেয়ে তাইওয়ান সমস্যার সমাধান আরো ত্বরান্বিত করা বেশি ভালো। কোনো দ্বিধা বা বিলম্ব জনগণের ইচ্ছার বিরোধী। চীন আশা করে, তাইওয়ান কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে।

হংকং-এর উপরে সার্বভৌম ক্ষমতা চীন পুনরায় প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে ১৯৯৭ সালে। ১৯৯৭ সালে হংকং-এর একটা বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত করা হয়; স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারাই শাসনের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিপুল পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতাও তাদের জন্য রাখা হয়। পূর্বতন সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং জীবন যাপন পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখা হয়। পূর্বতন আইন-কানুনও মূলত অপরিবর্তিত রাখা হয়। একটি স্বাধীন বন্দর এবং আন্তর্জাতিক একটি আর্থিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে হংকং-এর নিজস্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। বিদেশী রাষ্ট্রগুলি, অঞ্চলসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে হংকং-এর আর্থিক সম্পর্ক রক্ষিত ও বিকশিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

১৯৭৮ সলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটেছে। ঐ বছর ১৬ই জানুয়ারি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হু ইয়াও বাঙ সাধারণ

সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সাধাবন সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝাও জিয়াঙ। পদত্যাগের কারণ হিসেবে হু ইয়াও বাঙ নিজেই বলেছেন ঃ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভুলের জন্য তিনি পদত্যাগ করছেন। অবশ্য হু ইয়াও বাঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোতে রয়েছেন।

হু ইয়াও বাঙ যেদিন পদত্যাগ করেন এবং ঝাও জিয়াঙ যেদিন সাধারণ সম্পাদকেব দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সেদিনই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার প্রধান ব্রু হাউজে অপসারিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি পশ্চিমী দুনিয়ার বিষাক্ত নৈতিকতাবাদের প্রচার করছিলেন।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বহিষ্কৃত হন। তা ছাড়া দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি (উপাচার্য) এবং সহ-সভাপতি (সহকারী উপাচার্য) নিজ নিজ পদ থেকে অপসারিত হন। তা ছাড়া চীনের এডুকেশন কমিশনের বেশ কয়েকজন সদস্যও অপসারিত হন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রচার ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরিবর্তন কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। ১৯৮৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দেয় হেফেই বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর নানজিং এবং সবশেষে বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই ছাত্র বিক্ষোভের পশ্চাদ্‌পট কি? ছাত্ররা প্রধানতঃ যে দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করেন তা হলো তাঁদের বেশি বেশি গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে—বিশেষ করে চীনের গণ-কংগ্রেসে দিতে হবে। এই আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন অশান্ত হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় চীনে ঢালাওভাবে দেওয়াল পোস্টার এবং ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৮২ সালে এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধিত হয়। কিন্তু এবারের ছাত্র আন্দোলনের সময় দেখা গেল সেগুলি আবার পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। কেবল তাই নয়, চীনের বুকে নিউ সোস্যালিস্ট ডেমোক্রাটিক পার্টি নামে একটি পার্টির কার্যকলাপ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সংগঠিত হতে থাকে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই নতুন পার্টিকে প্রতি-বিপ্লবী শক্তি হিসাবে অভিহিত করে।

চীনের কমিক্ষনিস্ট পার্টির পলিপব্যুরো এই সমস্ত ঘটনাকে বুর্জোয়া মতাদর্শ, চিন্তা চেতনার অভিব্যাক্তি বলে অভিহিত করে। এই ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তত্ত্বগত অভিযান শুরু করে এবং ১৯৮৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর বেজিং রিভিউয়ের 'অন সোস্যালিস্ট ডেমোক্রাসি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রকৃত অর্থ কি এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকারের পার্থক্যটাই বিক্ষোভের উৎস কি?—সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং এই অসন্তোষ দূরীভূত করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্মির দ্বাদশ কংগ্রেসে গৃহীত সাত-দফা কর্মসূচীর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সেই সাত-দফা কর্মসূচী হলো ঃ

(১) শোষণব্যবস্থাগুলির বিলোপ;

(২) উৎপাদনের উপায়গুলির রাষ্ট্রীয় মালিকানা;

(৩) কাজ অনুযায়ী পাবিশ্রমিক,

(৪) পরিকল্পিত অর্থনীতি (১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির দ্বাদশ কেন্দ্রীয় কমিটিব তৃতীয় প্লেনারি অধিবেশনে সংশোধিত হয়ে হয়েছে "পরিকল্পিত পণ্য অর্থনীতি"):

(৫) শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য মেহনতী মানুষের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা;

(৬) উচ্চ বিকশিত উৎপাদিকা শক্তিসমূহ এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা, যা শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির চাইতে বেশি হবে;

(৭) মার্কসবাদের পথনির্দেশিকার অধীনে পরিশীলিত সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস

রাজধানী বেজিঙ শহরের প্রাণকেন্দ্র তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে বিশ্ববিখ্যাত 'গ্রেট হল অব দি পিপ্‌ল'-এ ১৯৮৭ সালের ২৬ শে অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বর আট দিনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। চীনে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এটি হলো ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস। দ্বাদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮২ সালে।

নানা কারণে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই ত্রয়োদশ কংগ্রেস ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

চীন-সোভিয়েত পার্টিগত সম্পর্কের পুনরুন্নতির যে প্রচেষ্টা দুই পার্টি করে চলেছে তা এই পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে প্রতিফলিত হয়েছে দুটি ঘটনায়। একটি হলো, পার্টি কংগ্রেস শুরু হবার তিনদিন আগে থেকে পার্টি কংগ্রেসের স্থানটির কাছে চীনের ইয়ুথ আর্ট থিয়েটার ও চীনের যুব শিল্পী এবং মস্কো ইয়ুথ লীগ থিয়েটারের সহযোগিতায় সোভিয়েত নাটক 'রক্তিম ঘাসে নীল ঘোড়া' নামক নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। পরিচালনা করছেন মস্কো ইয়ুথ লীগ থিয়েটারের মারকো জাহারভ ও ইউরি মাহায়েভ। মঞ্চ স্থপতি ছিলেন সোভিয়েত শিল্পী ফিওদর মাকুশিস্কো। নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল, ১৯২০ সালের অক্টোবরে রাশিয়ান কমিউনিস্ট ইয়ুথ লীগের তৃতীয় কংগ্রেসের আগের সারা দিনটি লেনিনের কিভাবে কাটলো। দ্বিতীয় ঘটনা হলো, দীর্ঘ ৩১ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছে। দু'টিই হলো কমিউনিস্ট আন্দোলনে সাড়া জাগানো স্বাগত ঘটনা।

ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের ঐতিহাসিক তৃতীয় বিষয়টি ছিল বর্তমানে চীনে যে সংস্কার প্রচেষ্টা চলেছে তার মূল উদ্দেশ্যটি নির্দেশ করা। পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ঝাও জিয়াঙ বলেন : সমাজতন্ত্রের মধ্যে নিহিত উৎকর্ষকে আয়ত্ত করে সর্বতোভাবে তা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সংস্কারের চলতি নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সংস্কারগুলিকে সংহত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করাই ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রধান কাজ।

ত্রয়োদশ কংগ্রেসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ৪ কোটি ৬০ লক্ষ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ১৯৩৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ২৬শে অক্টোবর সকাল ৯টায় 'গ্রেট হল অব দি পিপ্‌ল'-এ পার্টি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অনুষ্টিত হয় ৪০০ দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে। দূরদর্শন মারফত সরাসরি অনুষ্ঠান সারা দেশে প্রচারিত হয়। সম্মেলন

পরিচালনার জন্য জন্য দেঙ জিয়াও পিঙ, ঝাও জিয়াঙ, চেন ইয়ুন, লিজিয়ান জিয়ান এবং হু ইয়াও বাঙ-কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবীণ নেতা দেঙ জিয়াও পিঙ পার্টি কংগ্রেস উদ্বোধন করার পরে ঝাও জিয়াঙ দ্বাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রাজনৈতিক প্রস্তাবটি পেশ করেন।

'চীনের বৈশিষ্ট্য সহ সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলে'—এই শিরোনামে রিপোর্টটিতে ঝাও জিয়াঙ বলেন, বর্তমান কংগ্রেসের মূল কর্তব্য হলো, সংস্কারের কাজকে দ্রুততর করা, গভীরতর করা। সংস্কারের পথেই চীন শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এই সংস্কার হলো চীনের জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন।

ত্রয়োদশ কংগ্রেস চীনের বর্তমান সমাজকে 'সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তর' বলে চিহ্নিত করেছে। একই সঙ্গে এই স্তর থেকে অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যাপকতরভাবে বাণিজ্যের উপর জোর দিয়েছে। ঝাও বলেন, পুনর্বিকশিত ধনতন্ত্র ছাড়া চীনের মানুষ সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করতে পারে না, এই ধারণা ভুল। বিপ্লবের বিকাশের প্রশ্নে এটি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিজনিত ভুলের এটাই ছিল মূল ধারণাগত উৎস। অন্যদিক সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরকে লাফিয়ে অতিক্রম করা যায়, এটাও অবাস্তব ধারণা। এই ধারণা বামপন্থী ভুলগুলির জন্ম দিয়েছিল।

রিপোর্ট বলা হয়েছে, আধা-ঔপনিবেশক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভ থেকে প্রসূত চীনের সমাজতন্ত্রকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে প্রাথমিক পর্বে। এই স্তরে শিল্পায়ন, বাণিজ্যের বিকাশ, উৎপাদনের সামাজিকীকরণ সম্পূর্ণ হবে এবং সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ মূলত অর্জিত হবে, তখনই শেষ হবে সমাজতন্ত্রের এই প্রাথমিক পর্ব।

কংগ্রেসে রিপোর্টের উপর আলোচনার একই সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্য সামনে রেখে, এই মুহূর্তের জরুরী কর্তব্য রূপে বলা হয়েছে, প্রথম গুরুত্ব দিতে হবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশকে, যাতে মানের উন্নতি ঘটে ও শ্রমশক্তির দক্ষতা বাড়ে।

রিপোর্টে ঝাও বলেন : গত নয় বছরে চীনে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। চীনের জনগণের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে এখন আর খাদ্য বস্ত্রের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হয় না। বেড়েছে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ। জাতীয় উৎপাদন, মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ হয়েছে। মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পরিণত হবে আধুনিক শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে। চীনে সমাজতন্ত্রের বর্তমান স্তরে ধীরে ধীরে দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতার অবসান ঘটবে। ঝাও বলেন, আরও সাহসের সঙ্গে চীনকে বিশ্ব অর্থনীতির প্রাঙ্গণে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়াতে হবে। দরজা বন্ধ করে রাখলে কোনো দেশেরই অগ্রগতি ঘটে না।

ঝাও বলেন, সব রকমের কাল্পনিক চিন্তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। সমাজ বিকাশের স্তরে যেমন দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কে, তেমনি বামপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কেও সাবধান থাকতে হবে।

চীনের অর্থনীতি ও সমাজজীবনের সমস্যাগুলির বিস্তৃত উল্লেখ করে রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, পৃথিবীর সর্বাধিক জনসমষ্টির দেশে সমাজতন্ত্র গড়তে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপক

আমলাতান্ত্রিকতার উদ্ভব সম্পর্কে জনগণ খুশি নন। নানামাত্রায় কোথাও কোথাও দুর্নীতির প্রভাবও আছে। এই প্রেক্ষাপটেই ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক-সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিন্যাসে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই সংস্কার কখনোই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে নয়। ঝাও বলেছেন, পার্টি ও সরকারের কাজের সুষম দায়িত্ব বণ্টন হল রাজনৈতিক সংস্কারের মূল সূত্র। ক্ষমতার অতিকেন্দ্রীকরণ কমাতে দায়িত্ব ও অধিকারের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে।

আইনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর পরিকল্পনাও পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হবে।

পার্টির সর্বস্তরে নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্বে নিয়ে আসার আহ্বানও রিপোর্ট জানানো হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দশ লক্ষের বেশি পার্টি ও প্রশাসনিক কর্মী গত পাঁচ বৎসরে অবসর নিয়েছেন। ফলে প্রাদেশিক, কাউনিট ও প্রিফেক্ট স্তরে নবীনেরা দায়িত্ব পেয়েছেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়েছে, চীন স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে চলবে। লক্ষ্য হবে শান্তির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি। বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি চীনে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক। ঝাও বলেছেন, আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হলো, শান্তি এবং অর্থনৈতিক বিকাশ। ঝাও বলেছেন, শান্তি রক্ষায় এবং অর্থনৈতিক বিকাশে দুনিয়ার মানুষের তীব্র প্রচেষ্টার পরিণতিতে অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসানের, আক্রমণ ও আগ্রাসনের অবসানের, প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণের এবং আঞ্চলিক সংঘর্ষগুলির দ্রুত সমাধানের দাবি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটেই রিপোর্টে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণের প্রশ্নে যে নীতিগত মতৈক্য ঘটেছে তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। তবে একে অস্ত্র হ্রাসের দিকে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। হিসেবে বিচার করা হয়। অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান এখনও অনেক দূরে। ঝাও বলেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি নীতির উপর ভিত্তি করে চীন পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পকর্কে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট ও অন্যান্য পার্টির সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তি রূপে রিপোর্টে চারটি নীতির কথা বলা হয়েছে ঃ স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ সমতা, পারস্পরিক মর্যাদা এবং অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা।

১৯৮২ সালের দ্বাদশ কংগ্রেসের পর থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৩০টি বিদেশী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে বা পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এদের মধ্যে ৩০টি হলো কমিউনিস্ট বা ওয়ার্কার্স পার্টি, ৩০টি সোস্যাল ডেমক্রাটিক পার্টি, এবং ৬০টির বেশি হলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল। এখন মোট ২৩০টি বিদেশী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

ঝাও জিয়াঙের রিপোর্ট ও প্রস্তাব গ্রহণের পর ১লা নভেম্বর কংগ্রেসের সপ্তম দিনে সকালে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস সমাপ্ত হয়। নবনির্বাচিত ১৭৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি ২রা নভেম্বর প্রথম অধিবেশনে পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় সেনা কমিশন ও উপদেষ্টা কমিশনের সদস্যদের নির্বাচিত করে। গত দ্বাদশকংগ্রেসে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল আয়তনে কিঞ্চিৎ বড়—২১০ জন সদস্যের। এবারের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অবসর নিলেন বেশ কয়েকজন প্রবীণ সদস্য। ঝাও জিয়াঙ

ও হু ইয়াও বাঙ পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। বিদায় নিয়েছেন তিন প্রবীণ সদস্য দেঙ জিয়াঙ পিঙ, লি জিয়ান নিয়ান ও চেন ইজন। বিদায়ী পলিটব্যুরোর সাতজন সাতজন সদস্যও এবার বিদায় নিলেন। এরা হলেন, জি ঝোনশুন, ফ্যাঙ ই, ইয়াঙ শাঙকুন, ইয়ু কুইলি, হু কিয়াওমু, জি ঝিক্ ও পেঙ ঝেন। বিদায় নিয়েছেন পলিটব্যুরোর দুই বিকল্প সদস্য ঝিন জিউয়ে এবং চেন মু হুয়াও। অবসর নিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর দুই সদস্য দেঙ লিকুন ও বেন পি জিয়ান। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের গড় বয়স হলো ৫৫ বছর।

জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন

চীনের সপ্তম জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯৮৮ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে ১৩ই এপ্রিল বেজিঙ শহরের গ্রেট হল অব দা পিপলস-এ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে চীনের রাষ্ট্রপতি পদে ইয়াঙ সাঙকুন, উপরাষ্ট্রপতি পদে ওয়াঙ লি, প্রধানমন্ত্রী পদে লি পেঙ, সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান পদে দেঙ জিয়াও পিঙ, রাজনৈতিক গণউপদেষ্টা পর্যদের চেয়ারম্যান পদে লি জিয়ান নিয়ান নির্বাচিত হন। তাছাড়া, এই কংগ্রেস থেকে চীন সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তাও নির্বাচিত হন।

এই গণ-কংগ্রেসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস থেকে 'আরো খোলামেলা'র যে নীতি গৃহীত হয় তাতে অনেকেই মনে করেছিলেন এই 'খোলামেলা'র নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্লসনস্ত নীতির অনুরূপ ছাড়া অপর কিছু নয়। কিন্তু চীনের গণ-কংগ্রেস থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রশ্নে যে দশ দফা কর্মসূচী ঘোষিত হয় তাতে দেখা যায় চীনের এই 'খোলামেলা' নীতি যথেষ্ট পরিমাণে সীমিত। এমনকি চীন ১৯৮৩ সালে যে মুক্তদ্বার নীতি গ্রহণ করে এই কংগ্রেসে সেই মুক্তদ্বার নীতির যথেষ্ট পর্যালোচনা করা হয় এবং এই নীতির নেতিবাচক দিকগুলি পরিহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩৪ বছর পর এই প্রথম চীনের জাতীয় গণ-কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকগণ উপস্থিত থাকার সুযোগ পান। জাতীয় গণ-কংগ্রেসের রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, এই কংগ্রেস অনেক ক্ষেত্রেই চীনের ইতিহাসে নতুনত্ব দাবি করতে পারে। ২৯৭০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৬২ জন প্রতিনিধি চীনের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ। এত সংখ্যক শিক্ষিত প্রতিনিধি এর পূর্বে চীনের জাতীয় গণ-কংগ্রেসে কখনও উপস্থিত হন নি। ২২৬৪ জন প্রতিনিধির বয়েস ১৮ থেকে ৬০ বছর। এটাই সপ্তম জাতীয় গণ-কংগ্রেস অধিবেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জাতীয় গণ-কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে এই সর্বপ্রথম শ্রমিক প্রতিনিধির চাইতে বুদ্ধিজীবি বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব করেন। এই কংগ্রেসে যেখানে ৬৮৪ জন শ্রমিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন সেখানে বুদ্ধিজীবির সংখ্যা ছিল ৬৯৭ জন।

জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ। দশ দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। এই দশ দফা কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য ছিল : জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি।

তিনি বলেন, ১৯৯২ সালের মধ্যে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা

হয়েছে ১৫,৫০০ কোটি য়ুয়ান। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে হলে প্রতি বছর ৭.৫ শতাংশ হারে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। ১৯৯২ সালে যদি চীন এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে পারে তবে চীনের মোট জাতীয় উৎপাদন ১৯৮০ সালের তুলনায় ১.৭ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এই ১৯৮০ সালেই চীন অর্থনীতিতে আধুনিকীকরণের নীতি গ্রহণ করে।

দেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে লি যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন সেটি হলো কৃষি। বলা বাহুল্য, চীনের ষষ্ঠ জাতীয় গণ-কংগ্রেস থেকে সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এখানেই। ষষ্ঠ জাতীয় গণ-কংগ্রেসে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে কৃষি এবং শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল দেশে আধুনিকীকরণের নীতি তখনই সাফল্য অর্জন করবে যখন কৃষি এবং শিল্প সমানতালে চলতে পারবে। কিন্তু এই রিপোর্টে কৃষিকে অর্থনীতির গতি সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কৃষির উপর আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবেই। কৃষিই আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

এজন্যই কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সরকারী উদ্যোগে গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনে সমস্ত উদ্বৃত্ত ফসল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও ষষ্ঠ কংগ্রেস থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠ কংগ্রেসে স্থানীয় বাজার সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে যখন এই ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা হয় তখনই বলা হয়েছিল স্থানীয় বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ রপ্তানির প্রশ্নে ক্ষতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। এবারের কংগ্রেসে স্থানীয় বাজার উদ্যোগ সম্পর্কে কোন কথা বলা হয় নি। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতা আরো বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ বর্তমানে চীনে যিনি সর্বনিম্ন আয় করেন (আংশিক সময়ের কর্মী) তাঁর আয়ের পরিমাণ ৭০ য়ুয়ান। এই শতকের শেষে এই পরিমাণ অন্ততঃ দশ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে। আর তা করতে গিয়ে যাতে কোনরূপ মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে সেজন্য বছরে ৮০ লক্ষ টন করে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। এই হারে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানো যায় তবে বর্তমান শতকের শেষে গিয়ে দেশে বাৎসরিক শস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০ কোটি টন। বিশ্বের কোন দেশে এত বিপুল পরিমাণ শস্য উৎপাদন হয় না।

রিপোর্টে আর যে সমস্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে; সরকারী সংস্থাগুলির যথার্থ কাঠামোগত সংস্কার, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ও আইন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা; উন্নত সমাজতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করা, পরিবার-পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ, পরিবেশকে আরো বেশি বেশি করে দূষণ মুক্ত করা, গ্রাম ও শহরের জনগণের মধ্যেকার আয়ের সমতা করা এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করা।

বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নতি

১৯৮০-র দশকের শেষে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এবং বিশেষ করে

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এর শুভ প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য। দীর্ঘ বিশ বছর বাদে ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সাবেক সোভিয়েতের একজন বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের নেতা চীনে যান দু-দেশের শীর্ষ নেতাদের আলোচনার প্রস্তুতি নিতে। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের বিদেশমন্ত্রী কিয়ান কিচেন মস্কো সফর করে আসেন। ডিসেম্বর মাসেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চীনে যান। এটা ছিল দীর্ঘ ৩৪ বছর বাদে কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম চীন সফর। ঐ বছরের জানুয়ারি মাসে ভিয়েতনামের উপ-বিদেশমন্ত্রী দিন হো লিয়েম চীন ঘুরে এসেছেন। এটাও ছিল ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসের পর কোন উচ্চ পর্যায়ের ভিয়েতনামী নেতার প্রথম চীন সফর।

ষাটের দশকে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অবনতির সুযোগ সাম্রাজ্যবাদীরা যথাসাধ্য কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং উত্তেজনা জীইয়ে রাখে। চীনের সঙ্গে উপরে উল্লেখিত দেশগুলির কোনো না কোনো কারণে সশস্ত্র সংঘর্ষও সাময়িকভাবে হলেও ঘটেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) আগাগোড়াই এসব প্রশ্নে একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার পতাকাতলে নীতিনিষ্ঠ ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করেছে, অন্যদিকে ভারত ও চীনের বিরোধগুলি আলাপ-আলোচনা মাধ্যমে মীমাংসার দাবিতেও লড়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আসার পর ঘটনাবলীর প্রবাহ এখন যে দিকে চলেছে তাকে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিমাত্রই স্বাগত জানাবে।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর চীন সফর দু-দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন উদ্যোগের সূচনা করেছে। যদিও ১৯৮১ সাল থেকেই দু-দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে উভয় দেশই সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, তবু দু-দেশের সরকারের শীর্ষ নেতাদের আলোচনা এবং অতীত থেকে চোখ ঘুরিয়ে সামনে প্রসারিত করার সঙ্কল্প ঘোষণা আগেকার প্রয়াসগুলিকে নতুন তাৎপর্য ও গতিবেগ এনে দিয়েছে।

ভারতের সঙ্গে চীনের সব থেকে বড় বিরোধ সীমান্ত প্রশ্নে। খানিকটা একই ধরনের বিরোধ চীন এবং সোভিয়েতের মধ্যেও ছিল। চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধের ইতিমধ্যেই আলোচনার মাধ্যমে সন্তোষজনক মিমাংসা হয়েছে। চীন যে ভারতের সঙ্গেও সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে প্রস্তুত এই ইঙ্গিত অনেক আগে থেকেই চীন দিয়ে আসছিল। যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার কথা চীন আগেও বলেছে। এক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল ভারত সরকারের আবেগ-মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া। ভারত এবং ভারতের বাইরের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভারতে একটা অন্ধ চীন-বিদ্বেষের মানসিকতা গড়ে তোলার এবং সেটা ধরে রেখে তাতে শান দেবার অপচেষ্টা লাগাতার চালিয়ে গেছে। এখনও তারা চেষ্টার ত্রুটি করছে না। চীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কল্পনাশ্রয়ী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নানা তত্ত্ব সুকৌশলে প্রচার হচ্ছে।

কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মানুষই চীনের সঙ্গে ভারতের খারাপ সম্পর্কে খুশি ছিলেন না। তাই ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটায় এদেশের মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন।

চীনের নেতা দেঙ জিয়াওপিঙ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় পঞ্চশীলের নীতিগুলিকে নতুন করে উল্লেখ করে ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনের বর্তমান মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনাতে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ একই মনোভাব

ব্যক্ত কবেছেন। এগুলি যে কেবল কথাব কথা নয়, এবং চীন যে সীমান্ত সমস্যাব জটিলতা সম্পর্কে উদাসীন নয় তারই প্রমাণ যুক্ত বিবৃতিতে "ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য" সমাধানে পৌছাবার কথা বলা এবং উচ্চপর্যাযের যুক্ত ওযার্কিং গ্রুপ গঠন করা। এই গ্রুপের উপব সীমান্তে শান্তি বজায় বাখার দাযিত্বও ন্যস্ত হয়েছে। সীমান্ত সমস্যা নিয়েও ১৯৮১ সাল থেকে কয়েক দফা আমলা পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনার পব ওযার্কিং গ্রুপ গঠন বিরোধ মীমাংসার প্রয়াসকে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শক্তি ও সমর্থন যেগায়।

ভাবতেব সঙ্গে বিজ্ঞান প্রযুক্তি, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিনিময়ের চুক্তি হয়েছে। অসামরিক বিমান চলাচল নিয়েও চুক্তি হয়েছে। এছাড়া, ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলতে এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতেও চীন আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সামগ্রিকভাবে বিচাব কবলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর চমকপ্রদ আশু সাফল্যের ঝলকানি না দিলেও দু দেশেব সম্পর্কের প্রশ্নটিকে একটি সঠিক গতিমুখ দিতে সহাযক হয়েছে।

অবশ্য ভারতীয় শাসকশ্রেণীগুলির উপর প্রশ্নাতীত ভরসা রাখার কোনো অবকাশ নেই। চীন তথা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া-বিরোধী শক্তিগুলিও নিষ্ক্রিয় নেই। স্বাভাবিকভাবেই ভারত সরকারেব যুক্তিসঙ্গত অবস্থানকে ধরে রাখা এবং তাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা যে কত কঠিন তা পরবর্তিকালের ঘটনাবলী প্রমান করেছে।

১৯৭৮ সালে কাম্পুচিয়াতে ভিয়েতনামের স্বেচ্ছা-সৈন্যবাহিনীর প্রবেশকে কেন্দ্র করে চীন-ভীয়েতনাম সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সীমান্ত প্রশ্নও জড়িত ছিল। দুই দেশের সীমান্তে দুঃখজনক কিছু সামরিক সংঘর্ষও ঘটে। কাম্পুচিয়ার পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে চীন-ভিয়েতনাম ও চীন-কাম্পুচিয়া সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কাম্পুচিয়ার সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসা এবং কাম্পুচিয়াতে জাতীয় পুনর্মিলন সম্ভব করার প্রয়াসগুলি শুরু হবার পর পরিস্থিতিতে কাম্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ভিয়েতনাম কাম্পুচিয়া থেকে সেনা ফিরিয়ে নিতে শুরু করায় চীনের একটি প্রধান ক্ষোভ প্রশমিত হতে থাকে। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে ভিয়েতনামের উপ-বিদেশমন্ত্রী দিয়েন হো লিয়েমের সঙ্গে চীনের আলোচনার যে বিবরণ সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় কাম্পুচিয়া সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে চীন ও ভিয়েতনাম ঐক্যমত্যে পৌছেছে। চীনা সূত্র থেকে প্রচারিত সংবাদ অনুসারে, কাম্পুচিয়ার প্রাক্তন শাসক পল পট চক্রের ক্ষমতার ফিরে আসা নিয়ে ভিয়েতনামের আপত্তির বিষয়টিও চীন-ভিয়েতনাম আলোচনায় একটা ঐকমত অবস্থান সম্ভব করেছে। যতদূর জানা গেছে, চীন ও ভিয়েতনাম একমত হয়েছে যে, রাজনৈতিক মীমাংসার ফলে গঠিতব্য জাতীয় পুনর্মিলন কোয়ালিন সরকারে কাম্পুচিয়ার বিবাদমান চারটি গোষ্ঠীই থাকবে, তবে কারুরই একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকবে না। চীনও নাকি পল পট চক্রকে সামরিক সাহায্যদান বন্ধ করতে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে।

১৯৮৯ সালের তিয়েনানসেন রাজনীতি

১৯৮৯ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ৬ই জুন চীনের বুকে কী ঘটেছিল — এ প্রশ্ন সমগ্র বিশ্ববাসীর। চীনের বিভিন্ন সরকারী দলিল থেকে সংগৃহীত সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ঘটনাবলী এখানে প্রকাশ করা হলো।

১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে জুনের প্রথমভাগে পর্যন্ত চীনে যে ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল এবং যা পরবর্তীকালে রাজধানী বেজিং-এ প্রতিবিপ্লবী চেহারা নেয়, তার উদ্দেশ্য ছিল চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে উৎখাত করা এবং সমাজতান্ত্রিক চীনকে ধ্বংস করা। ঐ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রতিবিপ্লবী কার্যাবলীর পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। পার্টি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রশ্নে জড়িত এই সংগ্রামে কমরেড ঝাও ঝিয়াং-এর বিরাট ভুল ছিল ঐ অস্থিরতাকে সমর্থন জানানো এবং পার্টিকে টুকরো করার চেষ্টা করা। ঐ বিপযয়ের প্রসারতার জন্য তিনিই দায়ী। এই গভীর সঙ্কটকালে কমরেড্ দেং জিয়াও পিং-এর নেতৃত্ব পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং সমগ্র পার্টি ও জনগণের সমর্থন নিয়ে কিছু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। চীনের গণমুক্তি ফৌজ এবং সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর অবদান ও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। চীনের এই সাম্প্রতিক ছাত্র-বিক্ষোভ এবং তাকে কেন্দ্র করে প্রতিবিপ্লবী কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়।

এক ঃ এই অস্থিরতা সৃষ্টি দীর্ঘদিনের পূর্ব-পরিকল্পিত। পাশ্চাত্যের কিছু রাজনৈতিক শক্তি সর্বদাই চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন চীনসহ সব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকেই সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুত করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে। কিছু ভুল সিদ্ধান্ত এবং সাময়িক অর্থনৈতিক অসুবিধের রন্ধ্রপথে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে তারা ঢুকে পড়তে চাইছিল। চীনেও কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে এবং বাইরে কিছু মুষ্টিমেয় লোক বুর্জোয়া স্বাধীনতার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। বাইরের ষড়যন্ত্রকারীদের উৎসাহে তারাও দেশের অভ্যন্তরে ভ্রান্ত আদর্শের দোহাই দিয়ে সঙ্গবদ্ধভাবে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য বছরের পর বছর প্রয়াস চালিয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক চীনকে ধ্বংস করা। ক্রমাগত সভা-সমিতি করে, জনগণের মধ্যে মিথ্যে ধারণা ছড়িয়ে এবং গুজব রটিয়ে তারা ঐ চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ ও ছাত্রদের কিছু দাবি-দাওয়ার প্রতি সুব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জনৈক অতি-উদার মার্কিন অর্থনীতিবিদের সঙ্গে কমরেড্ ঝাও জিয়াং-এর সাক্ষাৎকারকে হংকং এর কাগজগুলো ফলাও করে প্রচার করে। এবং নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে "দেঙ-কে উৎখাত করে" "ঝাও জিয়াংকে অধিক ক্ষমতাদানের" সুপারিশ করে। এমনকি চীনকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝাও জিয়াংকে সমর্থন করার কথাও বলা হয়। এছাড়া পূর্ববর্তী "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ক্ষমতা হস্তান্তর পদ্ধতির পরিবর্তন বিরোধী মতবাদকে"ও ছুঁড়ে ফেলে দেবার কথা বলা হয়। আর এসব প্রচার করা হয়েছিলো একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তা হলো ঝাও জিয়াং-এর ত্রুটিগুলো আড়াল করা এবং বুর্জোয়া উদারনৈতিকতার দিকে চীনকে ঠেলে দেওয়া।

অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, প্রচার, নানাবিধ সচিত্র পোস্টার ইত্যাদির সাহায্যে ভ্রমাত্মক, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের অবাধ প্রচার চললো। ১৯৮৯ সালের ২৮শে জানুয়ারি মাসে সু সাউজি, ফ্যাংলি ঝি এবং অন্যান্য তথাকথিত 'নয়া আলোকপ্রাপ্ত' বুদ্ধিজীবীরা বেজিং-এ একটি সমিতি গঠন করেন। এই উপলক্ষে শতাধিক মার্কিন, ফরাসি, ইতালিয় ও চীনা সাংবাদিক সমবেত হন। ফ্যাং এই সমাবেশকে 'বারুদগন্ধী' বলে বর্ণনা করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্যাং লি ঝি, চেন জুন প্রমুখরা ফ্রেন্ডশিপ হোটেলে আর একটি সম্মেলন করেন যেখান থেকে লিখি দুটি বড় দাবী "গণতন্ত্র"ও "মানবাধিকার" এর সপক্ষে

বক্তব্য রাখেন এবং চীনের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সামিল হতে ছোট-খাট ব্যবসায়ীদেরও আহ্বান জানান। ১৯৮৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ফৌজদারি আইনে সাজাপ্রাপ্ত কিছু কয়েদিকে ছেড়ে দেবার দাবী জানানো হয়। ২৩ শে ফেব্রুয়ারি তাইওয়ান থেকে প্রকাশিত একটা কাগজে ''বৃহৎ এক আন্দোলনের শুরু' বলে এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় নিউইয়র্ক শহর থেকে ঐ সংগ্রামের কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোট বড় নানা পোস্টারের মাধ্যমে 'দে জিয়াও পিংকে ক্ষমতাচ্যুত' করতে বলা হয় এবং ''কমিউনিস্ট পার্টির অন্তঃসার শূন্যতার কথা প্রচার করা হয়। প্রকাশ্যে দাবী করা হয় পার্টির ৪টি মূলনীতিকে (সমাজতন্ত্রের পথে চলা, জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও-এর চিন্তাধারার প্রতি আনুগত্য) বর্জন করার জন্য। 'গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য এবং অর্থনেতিক স্বাধীনতার জন্যও প্রচার চলতে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে এসমস্ত কিছুই করা হচ্ছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণে।

নানারকম গুজব সৃষ্টির মাধ্যমে ছাত্রদের ক্ষোভকে উস্‌কে দেওয়া চলছিল। পরিণতিতে বেজিং এবং দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০,০০০ ছাত্র ক্লাস বর্জন শুরু করে। এই অস্থিরতা শুধুমাত্র বেজিং-এর ছাত্রসমাজে আবদ্ধ না থেকে দেশ ও সমাজের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। ''চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করার জন্য''এবং ক্লাস বর্জন করার জন্য ব্যাপক প্রচার চলতে থাকে।

চীনের বাইরের রাজনৈতিক শক্তিগুলিও এবং কুয়োমিংটাংদের মদতপুষ্ট ছাত্র-সংগঠনগুলি এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। ওয়াং বিংজ্যাং এবং তাং গুয়ানজং প্রমুখ গণতন্ত্রপ্রেমী ছাত্রনেতারা নিউইয়র্ক থেকে টোকিওতে উড়ে আসে এবং সরাসরি চীনের ছাত্র আন্দোলনে অস্থিরতা সৃষ্টিতে মদত জোগায়।

ঐ সময়ে তড়িঘড়ি করে মার্কিনমুলুকে ''চীনা গণতান্ত্রিক দল'' এর পত্তন করা হয়। হংকং, তাইওয়ান, মার্কিনমুলুক এবং পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলি এই অস্থিরতায় ইন্ধন জুগিয়ে চলে। নানাবিধ প্রচার মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা, বিশেষতঃ 'ভয়েস অব আমেরিকা'-র মাধ্যমে নানারকম গুজব এবং চীনা সরকার ও পার্টি বিরোধী প্রচার চলতে থাকে।

ছাত্ররা বে-আইনী ঘোষিত তথাকথিত 'মানবাধিকার লীগে'র প্রধান রেন ওয়ান্ডিং ও ফ্যাং লিঝির পত্নী লি সুজিয়ান প্রমুখকে উপদেষ্টা করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারকে ধ্বংস করার চেষ্টা অবিরামভাবে চালাতে থাকে। সংক্ষেপে এক পূর্বপরিকল্পিত, সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা পাশ্চাত্যমদতপুষ্ট অতি মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাত্রবিক্ষোভ-এর সামান্য আন্দোলনকে বিধ্বংসী ঝড়ে রূপান্তরের চেষ্টা চালায়।

দুই ঃ ছাত্রবিক্ষোভকে মূলধন করে ষড়যন্ত্রকারীরা গোলযোগ সৃষ্টির জন্য গোড়া থেকেই সচেষ্ট ছিল।

১৯৮৯ সালের এপ্রিলের ১৫ তারিখে কমরেড্ হু ইয়াব্যাং-এর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশকে কেন্দ্র করে অশান্তি ও ছাত্রবিক্ষোভ এর সূচনা হয়। এই শোকপ্রকাশ উপলক্ষে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের বিরোধিতা করার জন্য ডাক দেওয়া হয়।

অতিদ্রুত পার্টির প্রতি আক্রমণ এবং সরকারের প্রতি নানা কুৎসা রটনার মাধ্যমে নেতৃত্ব এবং সরকারকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা শুরু করা হয়। কেউ কেউ ''চীনা কমিউনিস্ট

পার্টির বিলোপ সাধন" এবং বহু পার্টি প্রবর্তনের জন্য ডাক দেয়। সমস্ত প্রতিষ্ঠান, এবং সেনাবাহিনী থেকে রাজনৈতিক কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। সরকারী মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তনের জন্যও দাবী জানানো হয়। এমনকি কেউ কেউ কুয়োমিংটাংদের ডেকে আনার প্রস্তাবও রাখে। কমরেড্ দেংজিয়াং-এর অপসারণ দাবি এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করা হয়। এই সময়ে সাংহাই মিউনিসিপ্যাল পার্টি কমিটি ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ করে এবং প্রতিবিপ্লবীদের সমালোচনার লক্ষ্য হয়। এই সময়ে অন্দোলনকারীরা দেশের প্রচলিত আইন-কানুনকে তুচ্ছ করে নানাবিধ অ-সাংবিধানিক কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। নানারকম ছাত্র সংগঠন তৈরি করে তারা এক অরাজগতার সৃষ্টি করে এবং যা খুশি তাই করতে থাকে। এ সময়ে নানারকম মারাত্মব গুজব রটনা করা, যেমন কমরেড্ লি পেং কর্তৃক ভর্ৎসিত হয়ে হার্ট-অ্যাটাক হওয়ার ফলে কমরেড্ ইয়াওব্যাং মারা গেছেন ইত্যাদি। যা আদৌ সত্য নয়। ১৯৮৯ সালের ১৯শে এপ্রিল জনৈক ছাত্র ট্রলি-বাস চাপা পড়ে নিহত হন, এটাকে কমিউনিস্ট পুলিস দ্বারা হত্যাকাণ্ড বলে প্রচার করা হয়।

২০শে এপ্রিল গুজব রটনা করা হয় পুলিস নারী পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য জনগণকে মারধর করেছেন এবং ১০০০ এর মতো বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের মেরে ফেলা হয়েছে। এইসব গুজবের ফলে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে কমরেড্ লি পেংকে অপদস্ত করার জন্য ছাত্ররা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয় এই বলে যে লি পেং ছাত্রদের সঙ্গে কোনরকম আলোচনায় বসতে রাজি নন। তিয়েনমেন স্কেয়ারে সমবেত ছাত্ররা এই রটনার ফলে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং 'গ্রেট হল অব্ দি পিপল'-এর ক্ষতিসাধন করে।

তিন ঃ পিপল্‌স্ ডেলির এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখের সম্পাদকীয় ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। ১৫ই এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত কমরেড্ ঝাও জিয়াং সমস্ত ঘটনাই নীরবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং এই অশান্তির ব্যাপকতা লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে নীরব থাকেন। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বারংবার ঝাওজিয়াংকে অনুরোধ করেন এ বিষয়ে পার্টির নীতি কি হবে তা যেন স্থির করা হয়।

কিন্তু ঝাও প্রসঙ্গটা বরবার এড়িয়ে যান। ২৩শে এপ্রিল গণতান্ত্রিক কোরিয়ায় যাওয়ার আগে একটা মিটিং ডাকার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আবারও অনুরোধ করলে ঝাও তাঁকে কোনোরকম গুরুত্ব দেন নি।

২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যের সময় পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটির সভ্যরা কমরেড লি পেঙ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘটনাগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। সবাই একমত হন যে, পার্টি বিরোধী এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী এক সংঘর্ষের সূচনা হয়েছে। সেখানে এই বিষয়ে জনগণকে অবহিত করানোর জন্যও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরদিন কমরেড দেঙ জিয়াওপি এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে পলিটিক্যাল ব্যুরোর সিদ্ধান্ত এবং বিশ্লেষণকে সমর্থন জানান। তিনি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা দেখান যে, এই ছাত্র-বিক্ষোভ শুধুমাত্র ছাত্র-বিক্ষোভ নয়, এটা এক রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির ও কমিউনিস্ট পার্টির উৎখাত করার জন্য প্রচেষ্টা। ..... ক্যাডারদের মনোবল বৃদ্ধি এবং ঘটনার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার পক্ষে এই বিশ্লেষণ খুবই উপযোগী হয়েছিলো।

পিপল্‌স্ ডেলির ২৬শে এপ্রিল তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে কমরেড দেঙ-এর ব্যাখ্যা এবং ঘটনাবলীর তাৎপর্য সঠিকাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে, ছাত্র-বিক্ষোভ নিয়ে জনগণের বিভ্রান্তি বহুলাংশে দূরীভূত হয়।

চার : ৪ঠা মে কমরেড ঝাও জিয়াঙ-এর প্রদত্ত ভাষণ অশান্তিকে আবার চাগিয়ে তোলে

যখন ছাত্র-অশান্তি স্তিমিত প্রায় তখন ঝাও স্ববিরোধী কথাবার্তা শুরু করেন। কোরিয়া থেকে তিনি ইতিপূর্বে স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। এমনকি দেশে ফিরে এসেও পুনরায় তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে, ৪ঠা মে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি ছাত্র-বিক্ষোভের প্রতি নরম সুর প্রদর্শন করেন। এভাবে পলিটিক্যাল ব্যুরোর বিশ্লেষণের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব প্রদর্শন করেন। এর ফলে জনগণে মনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এবং কোন বিশ্লেষণ ঠিক, সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। এ অবস্থায় বেজিঙ মিউনিসিপ্যাল পার্টি কমিটি জনগণের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং ডাকার কথা বললেও কমরেড ঝও জিয়াঙ তা উপেক্ষা করেন।

এ অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা নতুন করে উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং দল ও সরকার-বিরোধী প্রচারকে নিয়ে যেতে থাকে।

পাঁচ : অশান্তি বৃদ্ধির জন্য অনশন ধর্মঘটে সাহায্য নেওয়া

ছাত্র-আন্দোলনের শুরুতেই পার্টি ও সরকার তাদের কিছু দাবিদাওয়া পূরণ ও সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

পরে তারা তাদের নানাবিধ অযৌক্তিক দাবির সামনে দল ও সরকারকে মাথা নোয়াবার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। ৪ঠা মে, ঝাও এর প্রদত্ত ভাষণে মুষ্টিমেয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং এটাকে দল ও সরকারের দুর্বলতা কলে চিহ্নিত করে।

তারা ৩০,০০০ জন ছাত্রের গণ-অনশনের সিদ্ধান্ত নিলো এবং তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল।

অনশন ধর্মঘট চলাকালীন পার্টি ও সরকার অনশনকারীদের কষ্টলাঘব করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাদের জন্য ওষুধপত্র, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, তাঁবু, জল, শীতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কম্বল ইত্যাদি ব্যাবস্থা করা হলো। অনশন চলাকালে একজন ছাত্রও মারা যান নি।

এত করেও তাদের মন জয় করা গেলো না। কারণ জঘন্য চক্রান্তকারীরা তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতেই বদ্ধপরিকর ছিল।

৬ই মে, ঝাও জিয়াঙ এই ছাত্র-আন্দোলনকে 'জনগণের সঙ্গে পার্টির সংঘাত' রূপে চিহ্নিত করলেন এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী এই আন্দোলনকে 'জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন' বলে বর্ণনা করলেন।

এ সময়ে দেঙ জিয়াওপিঙ-বিরোধী এবং লি পেঙ-বিরোধী শ্লোগান ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলো।

এ সময় বেজিঙের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। ছাত্ররা নানারকম আরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলল।

ছয় : সামরিক শাসন জারি করা ছাড়া অন্য পথ ছিলো না

বেজিঙ-এর নিরাপত্তা এবং জনগণের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সামরিক আইন জারি করার সিদ্ধান্ত নিতে হল।

১৯৮৯ সালের ১৯শে মে পার্টির এবং সরকারের যে আলোচনা সভা ডাকা হলো, ঝাও জিয়াঙ তাতে অনুপস্থিত থাকলেন এবং নিজেকে পার্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করলেন।

সামরিক আইন জারি করার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। তাঁরা সেখানে অবস্থানের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন এবং ঝাও জিয়াঙ-এর পুনর্বাসনের দাবি তুললেন। এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জরুরী অধিবেশন ডাকার জন্য দাবি জানালেন। অন্যদিকে, তারা সমস্ত কর্মী, ছাত্র এবং দোকানদারদের দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল হতে এবং জীবনপণ করে পার্টি ও সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে আহ্বান জানালেন।

এদিকে, সরকার ও পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আছে এরকম নগন্য কিছু লোকের মারফৎ সরকারী সিদ্ধান্ত বিরোধীদের কাছে পৌছতে লাগলো এবং তারাও কিভাবে সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করা যায়, সে বিষয়ে দ্রুত রণকৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলেন।

চক্রান্তকারীরা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং সাময়িকভাবে জনগণের একাংশকে (যাঁরা প্রকৃত ঘটনা জানতেন না) বিভ্রান্ত করলেন।

তারা দেঙ-কে ক্ষমতাচ্যুত করতে এবং ঝাও জিয়াঙকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে সোচ্চার হলেন। পাশাপাশি ২ লক্ষ লোক জড়ো করে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার দখল করাব কথাও ঘোষণা করল্লেন।

এই তীব্র আপৎকালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও স্টেট কাউন্সিল ২০শে মে সকাল থেকে বেজিঙে সামরিক শাসন জারির সিদ্ধান্ত নিলেন। এর উদ্দেশ্য একটাই, বৃহত্তর অশান্তিকে রোধ করা এবং জনগণের বৃহদংশ, যাঁবা এই অশান্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন, তাঁদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা।

ইতিমধ্যে চক্রান্তকারীরা স্থানে স্থানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেনাবাহিনী অবাধে শহরে প্রবেশ করতে না পারে।

সামরিক আইন জারি করার পরিপ্রেক্ষিতে ষড়যন্ত্রকারীরা কৌশলগত নীতি হিসাবে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার ছেড়ে না যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং সেখানে রক্তস্রোত বইয়ে দেবার কথা ছকে ফেলে যাতে সাধারণ মানুষের সমর্থন তাদের পক্ষে যায়। তারা মার্কিনীদের 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'-র অনুকরণে 'গণতন্ত্রের দেবী' নামের একটি মূর্তিও বানিয়ে ফেলে। এ সময়ে ছাত্রদের উৎসাহ জাগাতে লিউ ঝিয়াবো এবং অন্যান্য সড়যন্ত্রকারীরা পর্দার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন। এবং সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবার কথা ঘোষণা করলেন। এ সময় ছাত্ররা রাতারাতি বহু অবৈধ সংগঠন গড়ে তুললেন। নানা সরকারী সংস্থা, এমনকি সৈন্য বাহিনীও বিবিধ খবর পাঠিয়ে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা চালালেন।

ইয়ান জিয়াকি, ঝাও জুনঝিঙ প্রমুখরা পার্টির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আবেদন জানালেন, যাতে জরুরী অধিবেশন ডেকে গোপন ভোটের মারফৎ সামরিক আইন বাতিল করা হয়।

পাশাপাশি, এই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সংগঠকরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত ধরনের সমাজ-বিরোধী ও অপরাধীদের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে সমবেত করতে লাগলেন এবং তীব্র হিংসাত্মক কাজকর্ম শুরু করে দিলেন। তারা পার্টির নেতাদের অপহরণ এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য জোর তৎপরতা শুরু করলেন। তারা একটা স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী গঠন এবং তার সাহায্যে ঝাও জিয়াঙকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার কথাও ঘোষণা করলেন।

ষড়যন্ত্রকারীদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করা হলো। স্টোন কোম্পানি লক্ষ লক্ষ ইয়ান (চীনা মুদ্রা) জুগিয়ে চললো। বাইরে থেকেও জলস্রোতের মতো অর্থ আসতে লাগলো। মার্কিন মুলক, ব্রিটেন এবং হংকং থেকে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং লক্ষ লক্ষ হংকং ডলার পাঠানো হলো। সেনাবাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হল। সেনা বাহিনীর যে-কোনো গাড়ির অগ্রগমনে যারা বাধা দেবে, তাদের জন্য ৩০ ইয়ান এবং তাকে পোড়ানোর জন্য ৩০০০ ইয়ান (গাড়ি প্রতি) দেবার কথা ঘোষণা করা হল। তাইওয়ান থেকে প্রতিবিপ্লবীদের জন্য ১ লক্ষ ডলার সাহায্য পাঠানো হল। এমনকি কুয়োমিনটাংরা ১ কোটি ডলার সাহায্য পাঠাবার প্রস্তাব নিল।

এ সবের দ্বারাই এই চক্রান্তের গভীরতা এবং ব্যাপকতার বিষয়ে অনুমান করা যায়, যা দমন করা সহজসাধ্য ছিল না।

সাত : কি করে জনগণের এক ক্ষুদ্র অংশ প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপকে ছড়িয়ে দিয়েছিল

চীনের গণমুক্তি ফৌজ শুধুমাত্র জাতীয় প্রতিরক্ষাকে মজবুত করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্যই সৃষ্ট হয় নি। এই ফৌজ জনগণের পরিশ্রমের ফসলকে রক্ষা, জাতির পুনর্গঠন এবং জনগণের সেবার জন্যও দায়বদ্ধ। কাজেই, সমাজ জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই সেনাবাহিনীকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে হল।

মুষ্টিমেয় চক্রান্তকারীরা অনুধাবন করলেন, যদি সেনা বাহিনীকে বাধা দেওয়া না যায়, তাহলে তাদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজেই তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে নানারকম গণ্ডগোল পাকিয়ে তুললেন, যা ক্রমে প্রতিবিপ্লবী চেহারা ধারণ করে।

১৯৮৯ সালের জুনের ৩ তারিখ থেকে যখন সেনা বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করল, ষড়যন্ত্রকারীরা তখন থেকে নানাভাবে তাদের বাধাদান এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জাম লুঠ-পাঠ করতে আরম্ভ করে দিলেন। জিয়ানগুয়ামেন, নানহিয়ন, ঝিডান, মঝিড়ি এবং অন্যান্য জায়গায় সেনাবাহিনীর ট্রাম লুঠ হতে লাগলো। এবং সেনাবাহিনী আক্রান্ত হল।

লিউবুকাউতে সেনাবাহিনীর মেশিনগান ও গোলাবারুদ লুঠ করা হল। পরদিন লুফাংকিয়াওতে সৈনিকদের ধরে প্রচণ্ড মারধর করা হলো। কাউকে কাউকে অন্ধ করে দেওয়া হলো। আহত সৈন্যদের যাতে হাসপাতালে নয়ে যেতে না পারা যায়, তার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের টায়ার ফুটো করে দেওয়া হল।

ফুইউজি, জেনগিলু, ঝুয়ানউয়ামেন, হুফাঙকিউ, মাসুদি, ডোংসি প্রভৃতি স্থানে সেনা বাহিনীকে আক্রমণ করে, তাদের সাজ-সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়া হল।

একই সঙ্গে জনতা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ভবন, যেমন 'গ্রেট হল্ অব্ দি পিপল্' পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির প্রচার দপ্তর, বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রগুলির ওপর আক্রমণ

চালালো। রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা ছাত্র-সংগঠনগুলি ছাত্র ও জনতার মধ্যে ছুরি, লোহার রড়, চেইন, তীক্ষ্ণ বাঁশের লাঠি ইত্যাদি বিলোতে শুরু করলো — সেনা বাহিনীর লোকদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে। তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার থেকে লাউড় স্পীকারের সাহায্যে জনগণকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে এবং সরকারকে উৎখাত করতে প্রচুর চালানো হল।

তারা পরিকল্পনা করলো, কিভাবে সরকার-বিবোধী এই সংগ্রামকে জনগণেব মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, স্টেট্ কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশন মিলিত নির্দেশ দিল, যাতে সেনা বাহিনী দ্রুত শহরে প্রবেশ করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আট : কিভাবে প্রতিবিপ্লবীর গণমুক্তি ফৌজ সদস্যদের খতম করেছে

সামরিক আইন জারি হওয়ার পর সেনাবাহিনী যখন শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন থেকে তারা অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছে, যাতে সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলা যায়।

৩রা জুনের দাঙ্গার পর যখন সেনা বাহিনী শহরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার আগেই বারবার প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে জনগণকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, যেন তারা রাস্তায় কোনোরকম বাধার সৃষ্টি না করেন। জনগণ যেন তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের দিকে না যান। শ্রমিকরা যেন নিজের নিজের কাজ করেন এবং নাগরিকরা যেন ঘরেই থাকেন — এসব কথা রেডিও, টিভিতে বারবার ঘোষণা করা হয়।

অথচ ষড়যন্ত্রকারীরা বারবার বাধা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মিলিটারি ট্রাককে পুড়িয়ে দেওয়া হয়ে। অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করা হ্‌।

কোথাও কোথাও জনতা নিজস্ব গাড়ি করে আগ্নয়াস্ত্র নিয়ে সেনা বাহিনীকে আক্রমণ করেছে। বিভিন্ন সরাকারী ভবনে ভাঙচুর করা হয়েছে, তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের সামনের পাইন গাছগুলিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারী বাস, দমকল, অ্যাম্বুলেন্স এবং ট্যাক্সিগুলিকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং অধিকাংশকেই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জনতা বিভিন্নস্থানে সৈন্যদের হত্যা পর্যন্ত করেছে। চাংগাং এভিনিউ, ঝিড়ান ক্রশিং, ফুচেংমেন, চাংওয়েমেং, প্রভৃতি স্থানে এক বা একাধিক সৈনিকদের হত্যা করা হয়েছে। এমনকি হত্যার পর কারো কারো চোখ পর্যন্ত খুব্‌লে তুলে নেওয়া হয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যে ১২৮০ টি মিলিটারি যান, বাস, ট্যাক্সি, ইত্যাদিকে ধ্বংস করা হয়েছে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করা হয়েছে। ৬০০০-এর বেশি সৈনিক, পুলিস-কর্মী এবং নিরাপত্তাবক্ষী বাহিনী ঐ সময়ে আহত হয়েছেন। কয়েক ডজন লোকের মৃত্যু ঘটেছে। মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে, দেশের সংবিধানকে রক্ষা করতে সেনাবাহিনী ও অন্যান্যরা নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন।

এ সমস্ত মারাত্মক ঘটনা (যা সহজেই দমন করা যেতো) থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়, সেনা বাহিনী কি অসীম ধৈর্য ও সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছে।

যে গণমুক্তি ফৌজ মার্কিন মদতপুষ্ট ৮০ লক্ষ কুয়োমিনটাং সৈন্যকে পরাজিত করেছিলো, তাদের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু জনগণের প্রতি ভালোবাসা, অহেতুক জীবন ও সম্পত্তি হানিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাতেই বীভৎস প্রতিবিপ্লবী আক্রমনের মুখোমুখি হয়েও তারা নীরবে সব সহ্য করে চলছিলেন। কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করার পর নিরীহ

জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনেই বাধ্য হযে সেনাবাহিনীকে অস্ত্র প্রযোগ করতে হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিলো, সম্ভাব্য ব্যাপকতর ক্ষয-ক্ষতিকে রোধ করা। এর আগে বারংবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হযেছে।

এই দাঙ্গায় ৩০০০ জন নাগরিক আহত হয়েছেন এবং ২০০ জন লোকের মৃত্যু ঘটে। যার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৬৮। অ-সামরিক লোকদের মধ্যে যারা হতাহত হয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই দুষ্কৃতকারী, সাধারণ মানুষরা ঘটনাচক্রে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার ও অন্যান্য লোকজন, যাঁরা ঘটনাস্থলে কর্মরত ছিলেন।

কিন্তু 'ভয়েস্ .অব্ আমেরিকা' এবং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য প্রচার মাধ্যমগুলি অবিরাম প্রচার করেছে, তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে রক্তবন্যা বইছে, হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে ইত্যাদি। অথচ সেনাবাহিনী বারবার তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারকে খালি করে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, এবং ছাত্ররা যাতে নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে পারেন, তার জন্য পথ করে দিয়েছেন।

গোটা অভিযান চলাকালীন সময়ে একজন ছাত্রও মারা যান নি। সন্ধ্যে ৫.৩০-এর মধ্যে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে সমস্তরকম অবরোধ মুক্ত হয়।

এই প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে বেজিং তথা চীনের অর্থনীতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন সমস্ত কৃষক, শ্রমিক এবং অন্যান্য কর্মীরা এই ক্ষতিপূরণের জন্য অক্লান্ত কাজ করে চলেছেন। ছাত্ররা পড়াশুনার জগতে ফিরে গেছেন।

তবুও এই প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের এখানেই সমাপ্তি ঘটেছে, একথা বলা যায় না। কারণ, চক্রান্তকারীরা পরাজয়কে মেনে নেয় নি, পরেও অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাবার চেষ্টা এবং স্বপ্ন দেখছে নতুন উদ্যমে ফিরে আসবার।

প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ দমনের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক সংগ্রাম অনেক দেশের সমর্থন লাভ করেছে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কিছু পশ্চিমী রাষ্ট্র প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত করে জঘন্য সব গুজব রটিয়ে চলেছে। এবং বিভিন্নভাবে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চীনের সরকার কখনোও বাইরের চাপের কাছে মাথা নত করেনি। সব গুজবের অবসান ঘটিয়ে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

চীন দ্রুত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে এগিয়ে গেছে। চীনের স্বকীয় বিদেশ নীতি, যা শান্তির সপক্ষে অবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরির জন্য সচেষ্ট, সেই নীতি ধরেই এগিয়ে গেছে, শান্তিপুর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী চীন।

নীতিগত প্রত্যয়; কর্মক্ষেত্রে সাফল্য

১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। গণচীনের ভিতরেও বিগত বছরটা ছিল কঠিন পরীক্ষার সময়। ঐ বছর জুন মাসে চীনের রাজধানী বেজিঙের তিয়েন আন মেন স্কোয়ারকে কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠা বিদ্রোহের আগুনকে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে গণচীনের সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টি। ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে চীনের সরকার এবং পার্টিতেও।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী সম্পর্কে গণচীনের অবস্থান

ব্যাখ্যা করেছেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জিয়াঙ জেমিন এবং প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ।

১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারি বেজিঙে 'চাইনিজ পিপ্‌লস পলিটিক্যাল কনসালটেটিভ কনফারেন্স' আয়োজিত এক নববর্ষের চায়েব আসরে জিয়াঙ জেমিন বলেন, বিশ্বটা এখন ঠিক শান্ত বলা যায় না। বড় বড় ঘটনা ঘটছে যার মধ্যে জড়িয়ে আছে বহু রকমেব দ্বন্দ্ব, বিরোধ এবং অস্থিতিশীল উপাদান। এসব সত্ত্বেও সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক ধাঁচটা একই রয়ে গেছে। "আমরা বিশ্বের ঘটনাবলীর দিকে নজর রেখেছি। অনুরূপভাবে, অন্যান্য দেশগুলি, বিশেষ করে তৃতীয বিশ্বের দেশগুলি নজর রেখেছে চীনের ঘটনাবলী এবং স্থিতিশীলতার ওপর।"

জিয়াঙ জেমিন সেই আসরে আরও বলেছেন, চীন বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং মানবজাতির অগ্রগতির প্রয়াস অব্যাহত রাখবে। সেই সঙ্গে চীন থাকবে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত।

গণচীনরে রাষ্ট্রপতি ইয়াঙ শাঙকুন বিভিন্ন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীনের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, চীন মনে করে পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পিছনে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দু'রকম কারণই আছে। চীন ঐ সব ঘটনাবলীর সম্পর্কে এখনই কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করতে চায় না।

ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ বলেছেন, বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে চীন স্বাধীন নীতি নিয়ে চলেছে। চীন চায় পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে সকল দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে। পূর্ব ইউরোপের প্রসঙ্গে লি পেঙ বলেন, চীন কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অথবা সে দেশের পার্টিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। চীন ঐ সব দেশের জনগণের পছন্দকেই মর্যাদা দেবে। কিন্তু, ঐ একই বৈঠকে লি পেঙ দৃঢ়ভাবে বলেছেন, আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পরিবর্তন সত্ত্বেও চীন আত্মবিশ্বাসে ভর রেখে সমাজতান্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে। চীনে চলমান সংস্কার এবং বাইরে জগতের কাছে খোলা দরজা নীতি থেকেও চীন সরে আসবে না।

এদিকে, বুর্জোয়া সংবাদ সংস্থাগুলির খবর অনুসারে, ঐ বছর নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে চীনের কমিউস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম প্লেনামে প্রবীণ নেতা তেঙ সিয়াও পেঙ সোভিয়েত নেতা গরবাচ্যভের অনুসৃত নীতিগুলিকে নাকি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন বলে সমালোচনা করেছেন। একই দোষে তিনি পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, গণতান্ত্রিক জার্মান ইত্যাদি দেশের ঘটনাবলীকেও দুষ্ট করেছেন।

ঐ বছর জুন মাসে চীনের রাজধানী বেজিঙে বিদ্রোহ দমন প্রসঙ্গে লি পেঙ বলেন, সাফল্যের সঙ্গে ঐ বিদ্রোহ দমন করা গেছে এবং তার ফলে রক্ষা করা গেছে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা, রক্ষা করা গেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং গণপ্রজাতন্ত্রকে। ঐ বিদ্রোহ দমনে গৃহীত কঠোর ব্যবস্থাগুলি যথার্থ ছিল বলেই লি পেঙ জোরের সঙ্গে পুনরুল্লেখ কবেন। চীনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ বলেছেন, দরদামের উর্দ্ধগতি ঠেকানো গেছে। মুদ্রাস্ফীতির হারও আগের বছরের তুলনায় ১৯৮৯ সালে কিঞ্চিত নিম্নমুখী হয়েছে। কলকারখানা ইত্যাদি পুঁজি নির্মাণ এবং নোটের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বৈষম্যটা কমিয়ে আনা গেছে। ভোগের চাহিদা নিম্নমুখী হয়েছে এবং প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে উন্নততর সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে।

লি পেঙ-এর মতে, ১৯৮৯ সালে চীনে কৃষিতে ভাল ফলন হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, ১৯৮৪ সালেব পর এটা একটা রেকর্ড। বিভিন্ন অঞ্চলে গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও এই ফলন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু শিল্পে কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্য অবিক্রীত থাকাব সমস্যাটা রয়ে গেছে। যে সব জিনিসের ক্ষেত্রে এই অবস্থাটা বিরাজ করছে সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলি খতিয়ে দেখছে চাহিদা আছে এমন অন্য কোন জিনিস উৎপাদন করা যায় কিনা। সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর এবং আর্থিক সংস্থাগুলি এ বিষয়ে সাহায্য করেছে।

ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে চীনের জাতীয় যোজনা সম্মেলনে লি পেঙ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ১৯৯০ সালে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে চীনকে অধিকতর সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌছবে। পাশাপাশি, বৈদেশিক ঋণ ও সুদ পরিশোধের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বর্তমান নিচু মানের দক্ষতার কারণে শিল্পে অগ্রগতি খানিকটা শ্লথ হয়েছে। এর ফলে রাজস্বের উপর চাপ পড়ার সম্ভাবনা। এর সঙ্গে আছে বছরেব পর বছর ধরে পুঞ্জীভূত সমস্যাগুলি।

লি পেঙ বলেছেন, চীনের জাতীয় অর্থনীতির এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার স্বার্থেই ১৯৯০ সালে অর্থনৈতিক বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। একই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জিয়ঙ জেমিন। তাঁর মতে 'চীনের পক্ষে সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নটি চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। সমাজ স্থিতিশীল থাকলে তবেই অনান্য কাজ করা সম্ভব।' জিয়াঙ জেমিন মনে কবেন, 'অর্থনৈতিক শুদ্ধিকরণ এবং সংস্কার কর্মসূচীকে আরও নিবিড় করার ক্ষেত্রে ১৯৯০ সালটা চীনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বছর। আবার, এই বছরেই শুরু হয় একটা নতুন দশক। চীনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই বছরে অর্জিত সাফল্যগুলির গুরুত্ব খুবই বেশি।' জেমিন-এর মতে, অন্যান্য অ-কমিউনিস্ট দল ও সংগঠনগুলির এবং সেই সঙ্গে চীনে বসবাসকারী সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির সহযোগিতা নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সাময়িক সমস্যাগুলির ফলপ্রসূ মোকাবিলা করে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক সংস্কার

গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী নতুন মাত্রা পেয়েছে। চীনের পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করেছে যে, দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ উন্নত করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেগুলি সাফল্যের সাথে রূপায়িত হয়েছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, তবে একথা বলা যায় না যে, দেশের অর্থনীতিতে নতুন করে গতি সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য চীন সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ এই পরিকল্পনায় (১৯৯১-৯৫) অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে গতি সৃষ্টি করা হবে, তবে অবশ্যই কোন অনিয়ন্ত্রিত গতি নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও কাঠামোগত পরিবর্তন আনা হবে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশের ভিত্তি'র দিকে লক্ষ্য রেখে। আর স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশের লক্ষ্য হবে আগামী শতকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি আরো মজবুত করা।

অর্থনৈতিক কমিশন চীনেব অর্থনৈতিক সংস্কাবেব বিগত দিনেব কার্যক্রমেব পর্যালোচনা এবং মূল্যাযন কবেছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে চীন সবকাব অর্থনৈতিক সংস্কাব কর্মসূচী গ্রহণ কবে। সেই কর্মসূচীব লক্ষ্য ছিল ১৯৯০ সালেব মধ্যে দেশেব কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন তিনগুণ কবা। কমিশনেব বিপোর্টে উল্লেখ কবা হযেছে যে, এই লক্ষ্যমাত্রা পূবণে সবকাব বহুলাংশে সফল হযেছে। কমিশনেব মতে, ১৯৯০ সালে উৎপাদন যে অবস্থায দাঁডিযেছে তাতে পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্যমাত্রায পৌছুতে কৃষি ও শিল্প উভয ক্ষেত্রেই বছবে ৭.২ শতাংশ হাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। গত ১০ বছবে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেযেছে ৯.৫ শতাংশ হাবে। তাই বাকি বছবগুলিতে উৎপাদন ৫ থেকে ৬ শতাংশ হাবে বৃদ্ধি পেলেই লক্ষ্যমাত্রা পূবণ কবা যাবে। শিল্প ক্ষেত্রে অবশ্য এই হাব দাঁডাবে ৬ থেকে ৮ শতাংশ। ষষ্ঠ ও সপ্তম পবিকল্পনায় জাতীয অর্থনীতিব সুষম বিকাশ এজন্যই সম্ভবপব হযেছে যে, ঐ দুটি পবিকল্পনাতেই বিনিযোগ ও ঋণ কঠোব নিযন্ত্রণেব মধ্যে ছিল। এই নিযন্ত্রণেব ফলে কখনই অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায নি।

অর্থনৈতিক কমিশন শিল্প বিকাশে কযেকটি প্রতিবন্ধকতাব কথা উল্লেখ কবেছে। বিপোর্টে বলা হযেছে, শিল্পোন্নযনেব কাঠামোগত প্রশ্নেব সাথে চীনেব অর্থনৈতিক বিকাশেব দ্বন্দ্বগুলি দীর্ঘদিনেব। আব শিল্প বিকাশেব প্রতিবন্ধকতাগুলিব মধ্যে বযেছে বিদ্যুৎ সবববাহেব স্বল্পতা, কাঁচামালেব অভাব এবং অপর্যাপ্ত পবিবহণ ব্যবস্থা। তাই আগামী দিনেব অর্থনৈতিক সংস্কাবেব কেন্দ্রীয বিষযবস্তু হবে শিল্পেব কাঠামোগত পবিবর্তন। কৃষিপণ্য এবং শিল্পজাত পণ্যেব উৎপাদনেব মধ্যে সমতা বাখা দবকাব। সেজন্য আগামীদিনেব শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিব উপব জোব দিতে হবে। তেমনি আবাব ভাবি শিল্প এবং হাল্‌কা শিল্পেব উৎপাদন হাবেব মধ্যেও পার্থক্য বযেছে। সেই পার্থক্য ঘোচাতে ভাবি শিল্পেব উৎপাদন এক থেকে দুই শতাংশ বৃদ্ধি কবতে হবে।

কমিশন আগামীদিনেব অর্থনৈতিক উন্নযনেব জন্য তিনটি লক্ষ্য স্থিব কবেছে। এক) ঋণ শোধ, দুই) বাসস্থান এবং তিন) জনগণেব জীবনমানেব উন্নতি। সপ্তম পবিকল্পনায বিদেশ থেকে যে পবিমাণ ঋণ পাওযা গেছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায সেই পবিমাণ ঋণ পাওযা যাবে না। পবন্তু, বেশি পবিমাণ ঋণ শোধ কবতে হবে। এমতবস্থায অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায মাথা পিছু আয কিছুটা কমতে পাবে। তবে যেহেতু এই সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধিব উপব জোব দেওযা হয়েছে তাই কর্মীদেব প্রকৃত মজুবি মূল্যমানেব চেয়ে দু থেকে তিন শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

কমিশন বলেছে : চীনে সবকাবী মূলধন বিনিযোগেব ক্ষমতা সীমিত হযে এসেছে। এজন্য কমিশনেব সমনে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হযেছে। এক) বেসবকাবী মূলধনেব বিনিযোগ। দুই) সামাজিক মূলধন সৃষ্টি। কমিশন বেসবকাবী মূলধন বিনিযোগেব প্রশ্নটি বাতিল কবে দেয়নি। তবে বেসবকাবী মূলধন এমন অনিযন্ত্রিত ভাবে বিনিযোগ কবতে দেওয়া হবে না যাতে কবে বেসবকাবী মূলধন গুহায বন্দী বাঘেব বূপ ধাবণ কবতে পাবে। ভবিষ্যতে বাজাবে অস্থিবতা সৃষ্টি কবতে পাবে। এক্ষেত্রে সবকাবী মূলধনেব সাথে সাথে জোব দেওয়া হয়েছে সামাজিক মূলধন সৃষ্টিব উপব। আব এই উভয মূলধনেব প্রশ্নে সমান গুবুত্ব দেওয়া হবে। তবে সামাজিক মূলধন কীভাবে সৃষ্টি হবে? কমিশনেব বিপোর্টে বলা হয়েছে, মূল শিল্প ও কাবিগবী শিল্পেব বিকাশেব জন্যই সামাজিক মূলধন সৃষ্টিব উপব গুবুত্ব আবোপ কবা হযেছে।

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প, এই প্রকল্পের সুদের হার বৃদ্ধি এবং কঠোর শ্রম এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়াব মধ্য দিয়ে সামাজিক মূলধন সৃষ্টি করা হবে। অনেকে মনে কবতে পারেন যে, এটা কাল্পনিক ব্যাপাব। কিন্তু চীনের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা আদৌ কাল্পনিক নয়। এটা অতি বাস্তব সম্মত। এই ত্রিবিধ ব্যবস্থার উপর যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণ ঠিকমত থাকে তবে কোন সমস্যা হবার কথা নয়।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমেব ভিত্তি হবে সংস্কার - কাঠামোগত সংস্কার, মূলধনী সংস্কার। এই সংস্কারের লক্ষ্য হলো, নবম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় দেশে ভারি শিল্পের উন্নয়ন কেবল গতির উপর নির্ভর করবে না, নির্ভর করবে কাঠামো সংস্কার এবং দক্ষতার উপর। মূলধনী এবং কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করা না গেলে শিল্প বিকাশে শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে না। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্তব্যটা কি? চীনের বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের প্রশ্নের সঙ্গে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম চাবিকাঠি হলো রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব। এই স্থায়িত্ব কোন স্বল্প মেয়াদী ব্যাপার হতে পারে না। প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়িত্ব।

চীনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বিশেষ করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি আরো কেন্দ্রীভূত করা হবে? না বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেওয়া হবে? কমিশনের রিপোর্টে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে দুটি পর্যায়ে। এক ১৯৮৯ সালের মে-জুন মাসের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের পর দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়। সেই মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিস্থিতিতে দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে অনিবার্য কারণেই সরকারী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আজ পরিস্থিতির অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। মুদ্রাস্ফীতি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এমত অবস্থায় ঐ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করবে। পরন্তু, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য পরিকল্পনার উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরো জোরদার করতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাফল্যের চাবিকাঠি। পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকলে অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থাও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বাজার ব্যবস্থার কোন বৈরিতা নেই। পরন্তু একে অপরের পরিপূরক।

চীন-অ্যাঙ্গোলা সম্পর্কের উন্নতি

চীন এবং অ্যাঙ্গোলার মধ্যে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন দু দেশের জনগণের স্বার্থে এবং ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দুদেশের মধ্যেকার বন্ধুত্বের প্রশ্নে এটা একটা নতুন পদক্ষেপ।

১৯৬১ সালে অ্যাঙ্গোলা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৭৫ সালে অ্যাঙ্গোলা স্বাধীনতা অর্জন করে। তখন থেকেই অ্যাঙ্গোলার জনগণ দেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছেন। এইভাবে তাঁরা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে চলেছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অ্যাঙ্গোলা সরকার তার পেট্রোলিয়াম শিল্প এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেছে। জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ণেও এই সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

অ্যাঙ্গোলা সরকার যে তদানীন্তন দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার দেশসমূহের সাথে যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা রক্ষা করে চলেছে তা খুবই প্রশংসার দাবি রাখে। এই সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক প্রশ্নে অ্যাঙ্গোলা সরকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, উপনিবেশবাদ-বিরোধী এবং ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অ্যাঙ্গোলা সরকার এবং অ্যাঙ্গোলার জনগণ যে গৌরবজনক সাফল্য অর্জন করেছে সেজন্য চীন সরকার এবং চীনের জনগণ তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সমর্থনের মধ্য দিয়ে চীন এবং অ্যাঙ্গোলার জনগণের মধ্যেকার বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়েছে। যদিও অ্যাঙ্গোলা স্বাধীন হবার সাথে সাথে দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি, তথাপি বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া অনেক আগেই হয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে চীন অ্যাঙ্গোলাকে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে অ্যাঙ্গোলা মনে করে যে, গণ সাধারণতন্ত্রী চীন সরকারই হলো চীনের একমাত্র সরকার এবং তাইওয়ান হচ্ছে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে দু'দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে চীন-অ্যাঙ্গোলা সম্পর্ক এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। দিন যত যাবে দু দেশের সরকার এবং জনগণের যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অ্যাঙ্গোলা ও চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে চৌ এন লাই

সমাজতান্ত্রিক যুগে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে চৌ এন লাই-এর মূল্যায়ন পার্টিতে তাঁর অন্যতম প্রধান অবদান। চৌ এন লাই ১৯৫৬ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বলেছিলেন, অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই আজ সরকারী কাজকর্মে নিযুক্ত এবং তাঁরা সমাজতন্ত্রের সেবা করছেন। এজন্য এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। তিনি বলেছিলেন ঃ বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা বা তাঁরা যে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ সে কথা অস্বীকার করার যে প্রবণতা পার্টির অভ্যন্তরে রয়েছে সেটা সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। চৌ এন লাই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই মত পোষণ করতেন। চৌ এন লাই সব সময়ই বুদ্ধিজীবীদের চেতনা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করতেন। চৌ এন লাই বলতেনঃ বুদ্ধিজীবীগণ দেশের মূল্যবান সম্পদ ভাণ্ডার। চীনের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কাজে তাঁদের পেশাগত বুদ্ধির পূর্ণ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে তিনি সব সময়ই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁরা যাতে তাঁদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করতে পারেন এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন সেদিকে সদা সর্বদা নজর রাখতেন। বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের জীবনমানের উন্নতির দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলতেন, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের জন্য বই, তথ্য, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করার

বিষয়টি একেবারে নগণ্য নয়। মেধাবী বুদ্ধিজীবীদের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে নিয়ে আসার উপরও তিনি বিশেষ জোর দিতেন।

একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় প্লেনাম অধিবেশনের পর বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতীতে যে সমস্ত ভুল ত্রুটি হয়েছিল সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। তথাপি বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে চৌ এন লাই-এর মতামতটি ভালো করে অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা চীনের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং আধুনিকীকরণের কর্মসূচী রূপায়ণের সাফল্য নির্ভর করছে শ্রমিক-কৃষক বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের উপর।

তাইওয়ান সঙ্কট

তাইওয়ান সমস্যা দীর্ঘদিনের এক জটিল সমস্যা। তাইওয়ান দ্বীপের পূর্বতন নাম ফরমোসা। একসময় এই দ্বীপ জাপানের অধীনে ছিল। প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের পর ১৮৯৫ সালের ৮ই মে সিমোনোসেকি চুক্তি বলে তাইওয়ান জাপানের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দ্বীপ জেনারেল চিয়াঙ কাইশেকের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে দ্বীপটি সরাসরি চীনা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে চলে আসে। ১৯৪৫ সালের ১লা অক্টোবর গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী চীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর, তাইওয়ান চীনের মূলভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেখানে জাতীয়তাবাদীদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালের ১লা মার্চ চিয়াঙ কাইশেক তাইওয়ানের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নিজেকে রিপাবলিক অব চায়নার রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী চীনের পরিবর্তে তাইওয়ানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারি আমেরিকা তাইওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

চীন কোনদিনই তাইওয়ানকে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেয়নি। চীন প্রথম থেকেই তাইওয়ানকে মূল ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে। পাশাপাশি একথাও মনে করে যে, কোন প্রকার শক্তিপ্রয়োগ নয়, শান্তিপূর্ণভাবে তাইওয়ানের মূল ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্তিই তাইওয়ান সমস্যার একমাত্র সমাধানের পথ। চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াঙ জেমিন এই শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলনের জন আট দফা প্রস্তাবও দিয়েছেন। এই আট দফা প্রস্তাবের মর্মবস্তু হলো :

১) চীন এক এবং অখণ্ড, এই নীতির উপর ভিত্তি করে শান্তিপূর্ণভাবে পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করতে হবে। চীনের সার্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ড কখনও বিভাজন করা যাবে না। কথায় বা কাজে স্বাধীন তাইওয়ান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, দেশকে বিভাজন করে পৃথক সরকার গঠন, কিছুদিনের জন্য হলেও, দুই চীন সৃষ্টির কোন উদ্যোগ চীন সরকার মেনে নেবে না।

২) বেসরকারী পর্যায়ে কোন বিদেশী রাষ্ট্র যদি তাইওয়ানের সঙ্গে অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় রাখে, তাতে চীনের কোন আপত্তি নেই। তবে এই সম্পর্কের আড়ালে যদি পৃথক তাইওয়ান সৃষ্টির কোন চেষ্টা করা হয়, তবে তা চীন মেনে নেবে না।

৩) উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনার সুযোগ সব সময়েই রয়েছে। কিন্তু সেই আলোচনার প্রাক্-শর্ত হলো যে, তাইওয়ানকে এক ও অখণ্ড চীনের নীতি মেনে নিতে হবে।

৪) শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলনের উদ্যোগই সর্বোত্তম উদ্যোগ। চীন কখনই চায় না তার সহযোদ্ধা

চীনা জনগণের উপর কোনরূপ আক্রমণ নেমে আসুক। কোন অবস্থাতেই চীন তাইওয়ানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে না।

৫) রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়পক্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক বিনিময় ও সহযোগিতা যাতে আরও প্রসারিত হয়, সেজন্য চীন চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

৬) উভয় অংশের চীনা জনগণই নিজ নিজ সংস্কৃতি রক্ষা ও তার বিকাশ ঘটানোর জন্য সর্বতো প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

৭) নিজ নিজ ভূখণ্ডে যে যে ধরনের জীবনযাত্রা রয়েছে, যে যে ধরনের আইনানুগ অধিকার ভোগ করে থাকেন, তা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করা হবে।

৮) তাইওয়ানের রাজনৈতিক নেতারা যদি মূল ভূখণ্ড পরিদর্শন করতে চান, তবে তাঁদের স্বাগত জানানো হবে; আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাইওয়ান কর্তৃপক্ষ যদি চীনা নেতাদের আমন্ত্রণ জানান, তবে চীন সেই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে মতামত বিনিময়ের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। এই আলোচনায় কোন তৃতীয় পক্ষ বা তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ চীন মেনে নেবে না।

জিয়াঙ জেমিনের এই আট দফা প্রস্তাবেই তাইওয়ান সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৯৫ সালে সমগ্র বিশ্বের সাথে চীনের জনগণও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়েব পঞ্চাশ বছর উদযাপন করেছেন। তবে চীনের জনগণ এই প্রচার অভিযানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনও ফ্যাসিস্ত শক্তির হাতে আক্রান্ত হয়েছিল। সেই ফ্যাসিস্ত শক্তি ছিল জাপান। একশ' বছর পূর্বে ঠিক একই সময়ে জাপানের হাতে চীন আক্রান্ত হয় এবং চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান পরাজিত হয়। চীনের জনগণ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তির সময় এই দুটি বিজয়কে একই সঙ্গে স্মরণ করেছেন। পাশাপাশি চীন সরকার কূটনীতিকভাবে জাপানের সঙ্গে সুপ্রতিবেশি সম্পর্ক স্থাপনের কৌশল গ্রহণ করেছে। চীন সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলে আজ জাপানের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের সব থেকে বড় ক্ষেত্র হয় চীন। উন্নত বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রভাব রাজনীতির ক্ষেত্রেও পড়ে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন ও জাপান এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যেকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। জাপান এই বন্ধুত্বের সম্পর্কের আরো উন্নতি ঘটানোর জন্য সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। জাপান অবশ্যই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না। চীন ও জাপানের জনগণের মধ্যেকার পারস্পরিক সহযোগিতা এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

চীন সরকার ও চীনের জনগণও চান জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের আরো উন্নতি ঘটাতে। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই ফ্যাসি-বিরোধী প্রচার অভিযান অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়। তাঁরা স্মরণ করছেন ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের দুই সাধারণ সৈনিককে। একজন জাপানীজ এবং একজন চীনা। এঁরা অতি সাধারণ ব্যক্তিত্ব হলেও ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে এঁদের কৃতিত্ব

ছিল অসাধারণ। এঁদের একজন ছিলেন হিদেকো মিদোবিকাওয়া। এই জাপানী রমনীকে চীনের জনগণ আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছেন। কি ছিল তাঁর অবদান? ১৯৪০-র দশকের একেবারে প্রথমভাগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জাপান চীন আক্রমণ করে। চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হেইলঙজিয়াঙ। হিদেকো জাপান থেকে চীনে আসেন ১৯৩৭ সালে একজন সাংবাদিক হিসেবে। তারপর ঐ প্রদেশেই বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই বিয়ে করেন লিউ রেন নামে এক যুবককে যিনি চীনা নাগরিক। জাপান চীন আক্রমণ করলে হিদেকো এবং লিউ জাপ ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই লিউ রণক্ষেত্রে মারা যান। হিদেকো চীনা বাহিনীর পক্ষে রেডিও বার্তা প্রেরণের কাজে নিজেকে নিযোজিত করেন। জাপ সেনাদের উদ্দেশে প্রেরিত তাঁর অনেক বার্তার মধ্যে একটি বর্তার মর্মবস্তু হলো ঃ "তোমরা ভুল করেছো। চীনে তোমরা রক্ত ঝরানো বন্ধ করো। এখানে তোমাদের স্থান নেই। চীন ও জাপান ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। কেবল একটি জল ধারা দুই দেশকে পৃথক করে রেখেছে।" হিদেকো মাত্র দশ বছর চীনে ছিলেন। তারপর কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসেবে ৩৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। কিন্তু দশ বছরেই তিনি চীনের জনগণের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন সাংবাদিক হিসেবে তিনি যেসব সংবাদ পাঠিয়েছিলেন সেই সমস্ত সংবাদে ফুটে উঠেছিল চীনের জনগণের বীরত্বের কাহিনী। আব সেই সমস্ত কাহিনী অনুপ্রাণিত করেছিল চীন, জাপান তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণকে। জাপ সাহিত্যে হিদেকো আজ বিশেষ স্থান পেয়েছে। বেইজিং অপেরায় অভিনীত হচ্ছে হিদেকো'র জীবন কথা। আর চীন-জাপান যৌথ উদ্যোগে তৈরী করেছে হিদেকো'র জীবনী সংবলিত টি ভি সিরিয়াল 'দ্য স্টার সাইনস ওভার দ্য হোমল্যান্ড'।

হিদেকো'র মতই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে চীনের জনগণ আর একজন যাঁকে স্মরণ করছেন তাঁর নাম উয়ান বাওহাঙ। তিনিই সর্বপ্রথম সোভিয়েত সরকারের কাছে এই মর্মে খবর পৌছে দেন যে জার্মানি ১৯৪১ সালের ২২ শে জুন গভীর রাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে। তখন তিনি চিয়াঙ-কাই-শেক পরিচালিত কুয়োমিঙটান বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পঞ্চাশ বর্ষে চীন সরকার উয়ানকে 'অবিস্মরণী নায়ক' সম্মানে ভূষিত করেছে। তার চাইতেও বড় কথা হলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিনগুলিতে উয়ান চীনের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৭৮ সালে তিনি মারা যান। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি উয়ানের ফ্যাসি-বিরোধী ভূমিকার জন্য মরণোত্তর সভ্যপদ দিয়ে পার্টিতে তাঁর পুনর্বাসন ঘটিয়েছে।

জাপান

বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রশ্নে জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে বিরোধ চলছে তা নিরসন কল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত বিদেশী গাড়ি বিক্রি হবে সেই সমস্ত গাড়ির পার্টস যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই ধরনের আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক চলেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮২-৮৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করে।

জাপানী দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি বহু দ্রব্যসামগ্রী যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত করা হয় সেই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর তুলনায় মার্কিন বাজারে জাপানী দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা অনেক বেশি। এর ফলে মার্কিনী বাজারে স্রোতের মত জাপানী দ্রব্য প্রবেশ করছে। পক্ষান্তরে, জাপানে মার্কিন দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১ সালে এই বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি মার্কিনী ডলার। ১৯৮২ সালে সেই ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০ কোটি মার্কিন ডলারে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জাপান থেকে মার্কিন বাজারে ২০ শতাংশ গাড়ি এবং টেলিভিশন সেট, ৯০ শতাংশ মোটর বাইক, ১০ শতাংশ ইস্পাতজাত দ্রব্য, ৫০ শতাংশ মেশিন টুলস, টেপ রেকর্ডার এবং ঘড়ি আমদানি হয়েছে। অন্যদিকে এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাপানে রপ্তানির পরিমাণ একেবারেই নগণ্য।

১৯৮০ দশকের প্রথমদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান উভয় দেশেই চলছিল গভীর অর্থনৈতিক মন্দা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছিল। ১৯৩০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল এই অর্থনৈতিক মন্দা তার তুলনায় আরো গভীর ইস্পাত এবং অটো শিল্পে সংকট সবচেয়ে বেশি।

দুই দেশের এই গভীর অর্থনৈতিক মন্দাজনিত পরিস্থিতিতেই বিচার করতে হবে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ইস্যুটি। ১৯৭৬ সাল থেকে জাপানে তার জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ১ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করে আসছে। জাপান অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হোক এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনদিনই চায়নি — এখনও চায়না। এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় জাপানি প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করুক। বর্তমানে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ছত্রছায়ায় অবস্থান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একেবারেই পছন্দ করে না।

এর আগে, মার্কিনী চাপের পর জাপান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে সামুদ্রিক এলাকায় নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আজো কার্যকর হয়নি। সামুদ্রিক এলাকায় জাপান তার নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখনও গড়ে তুলতে পারেনি। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের প্রতি বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, সামুদ্রিক এলাকায় জাপানকে অবশ্যই নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর এই দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি উভয় দেশের স্বার্থের কৌশল নিয়েই বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে এশিয়ায় জাপানই হচ্ছে তার প্রধান বন্ধু। আবার জাপানও মনে করে তার প্রতিরক্ষা নির্ভর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্যের উপর। বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষার প্রশ্নে দুদেশের মধ্যে সম্পর্কের যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানকল্পে জাপান ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুটি উপঢৌকন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে : (১) জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২৩টি শিল্পজাত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক হ্রাস করবে; (২) ১৯৮৩ সালের মধ্যে জাপান তার প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৬.৫ শতাংশ করবে। এতে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট নয়। আর সন্তুষ্ট নয় বলেই জাপানের প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন সফরের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাড়িঘড়ি করে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করে।

রিক্রুট কেলেঙ্কারির ঘূর্ণিঝড়

ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে জাপানে প্রায়শই প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে থাকে। কিন্তু ছয়-সাত মাস যাবৎ জাপানে 'রিক্রুট-কসমস' কেলেঙ্কারি নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল তার প্রকোপেও রাজনীতি ও ব্যবসায়ী মহলে অনেক মহিরুহ ধরাশায়ী হয়েছিলেন।

'রিক্রুট-কসমস' কেলেঙ্কারি জাপানের শাসকদল লিবারাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চরিত্র উদঘাটিত করেছে। চারটি উপদলে বিভক্ত এল ডি পি-র কোন অংশই যে এই কেলেঙ্কাবি থেকে মুক্ত নয় তাও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

'রিক্রুট-কসমস কেলেঙ্কারির' মূল ঘটনাটা কী? রিক্রুট কোম্পানি জাপানের অন্যতম বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সরবরাহ শিল্পে এই কোম্পানির রমরমা ব্যবসা। এই কোম্পানি জমিজমা, আবাসন, তথ্য-প্রভৃতি ব্যবসার জন্য একটি সহযোগী সংস্থা গঠনেব উদ্যেগ নেয় এবং 'রিক্রুট-কসমস' নামে একটি নতুন কোম্পানির শেয়ার বাজারে ছাড়ার আগেই শেয়ারের একটা বড় অংশ গোপনে বিশেষ করে শাসক দলের নেতাদের কাছে খুবই কম দরে বিক্রি করা হয়। এরপর নতুন কোম্পানি যখন শেয়ার বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন ঐ সব নেতারা খোলাবাজারে তাঁদের গোপনে কেনা শেয়ারগুলি বেচে দিয়ে বিপুল মুনাফা লুটে নেন। এ ছাড়া, রিক্রুট কোম্পানি শাসক দলটির বিভিন্ন উপদলের নেতাদের সমর্থক বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাতে নানাভাবে বিপুল অর্থ তুলে দিয়েছিল।

কম করেও ১৬ জন সুপরিচিত নেতা, বেশ কয়কজন সরকারী আমলা এবং অন্যান্য ব্যক্তি এই কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন, যদিও বিধিসম্মতভাবে বিচার হচ্ছে কেবল এক ব্যক্তির — রিক্রুট কোম্পানির প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের মুখ্য সচিব হিরোশিমা মাৎসুবারা-র। এই লোকটি রিক্রুট কেলেঙ্কারির তদন্তে নিযুক্ত সংসদ সদস্য ইয়ানোসুকে নারাজাকিকে ৫০ লক্ষ ইয়েন (৫ লক্ষাধিক টাকা) ঘুষ দিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে। লুকানো টি ভি ক্যামেরা ঘুষ দিতে উদ্যত মাৎসুবারার ফোটো তুলে নেয়।

কেলেঙ্কারির খবর প্রথম ফাঁস হবার পর জাপানের সোস্যালিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি সরকারী দলের নেতা ও মন্ত্রীদের কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ তোলে প্রথম দিকে ডি পি সরকার অভিযোগকে আমল দেয়নি। উল্টে একটা ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয় যে, বেআইনি কিছু ঘটেনি, যা ঘটেছে সেরকম ঘটনা জাপানে নতুন কিছু নয়। জাপানে সংসদ সদস্যদের দায়-দায়িত্ব পালন করতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় তা বহন করার ক্ষমতা অনেকেরই থাকে না বলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের অশুভ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। স্বভাবতই বিরোধী দলের সাংসদরা এসব সুবিধা পান না কারণ সরকারের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাবার জন্যই ব্যাবসায়ীরা অর্থ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও মন্ত্রীদের প্রভাবিত করে থাকে।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ও সোস্যালিস্ট পার্টি দুর্নীতির এত বড় ঘটনাকে নিয়ে ঝড় তোলে। সংসদ সদস্যদের দিয়ে তদন্তে দাবি ওঠে। অর্থমন্ত্রী কিচি মিয়াজাওয়ার এই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। মিয়াজাওয়ার প্রাক্তন এক সচিব এতে যুক্ত ছিলেন বলে স্বীকারও করেন। এর পরিণতিতে সরাসরি যোগাযোগ প্রমাণ না হলেও নিজের ও দলের ভাবমূর্তি বজায় রাখার নামে প্রধানমন্ত্রী নবোরু তাকেশিতা অর্থমন্ত্রী কিচি মিয়াজাওয়াকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

কিচি মিয়াজাওয়া জাপানের শাসক লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চারটি উপদলের একটির প্রধান ছিলেন। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে দলের প্রথানুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নবোরু তাকেশিতার ছ-বছরের মেয়াদ শেষ হলে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার ছিলেন কিচি মিয়াজাওয়া। কিন্তু তাকেশিতা অন্য দুটি উপদলের নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইয়াসুহিরো নাকাসোনে এবং সিন্তারো আবে-র সঙ্গে জোট বেঁধে মিয়াজাওয়াকে অপসারিত করেন।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাকেশিতা ভেবেছিলেন মিয়াজাওয়াকে বলি দিয়ে গণ-দেবতাকে প্রসন্ন করতে পারবেন। কিন্তু তা হয়নি। মিয়োজাওয়ায় সরে যেতে বাধ্য হওয়ায় দলের মধ্যেও খেয়োখেয়ি শুরু হয়। সোস্যালিস্ট পার্টি এই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত ১৪ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করে। এই তালিকায় অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন মাৎসুকি ফুকুদা, যিনি প্রধানমন্ত্রী তাকেশিতার বিবাহ সূত্রে আত্মীয়। তাকেশিতা যখন ইতিপূর্বে দলের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন তখন ফুকুদা ১০ হাজার গোপন শেয়ার কেনার কথা স্বীকারও করেছেন।

পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে প্রধানমন্ত্রী তাকেশিতা দুটি পদক্ষেপ নেন। বিরোধী দলগুলির দাবি মেনে নিয়ে তিনি শাসক দলের নেতাদের নিয়ে একটা শক্তিশালী কমিটি বানিয়ে রাজনৈতিক সংস্কার আনার আশ্বাস দেন। তাছাড়া, মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দিয়ে ঢেলে সাজান যার ধাক্কায় পুরোনো ১৪ জন মন্ত্রী বাদ পড়েন। মাত্র ৬ জন মন্ত্রী বহাল থাকেন।

তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী তাকেশিতা ভেবেছিলেন রিক্রুট-কসমস কেলেঙ্কারি শাসক দল ও সরকারের জনপ্রিয়তায় যে দ্রুত ভাঙন সৃষ্টি করেছে তা পুনরুদ্ধার করা যাবে। কিন্তু তা হয়নি। নতুন মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী করে যাঁকে আনা হয় এবং যাঁকে রিক্রুট কেলেঙ্কারির অনুপুঙ্খ তদন্ত করার এবং রাজনৈতিক সংস্কার আনার মূল ভূমিকা দেবার কথা বলা হয় সেই ৭৬ বছর বয়স্ক তাকাশি হাসেগাওয়া মন্ত্রী হবার তিন দিনের মধ্যে নিজেই ঐ কেলেঙ্কারির ভাগিদার প্রমাণ হওয়ায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি প্রমাণ না থাকলেও তাঁর সমর্থক একটি গোষ্ঠী রিক্রুট কোম্পানির কাছ থেকে আর্থিক "দান" নিয়েছে এটা প্রমাণিত হয়।

তাকাশি হাসেগাওয়ার পদত্যাগ প্রধানমন্ত্রী তাকেশিতাকে বিপাকে ফেলেছে। দুর্নীতির ব্যাপকতা সাধারণ মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। তাছাড়া, কিছু মন্ত্রী বদল করে লোকের চোখে ধূলো দেবার কৌশলটাও ধরা পড়ে গেছে। সরকারের কোনো নীতির বদল না করে এবং শাসক দলের চারটি উপদলের ভারসাম্য রক্ষা করে মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন জনমনে দাগ কাটতে পারেনি।

এ যাবৎ অবশ্য শাসক দলের কোনো নেতার সম্পর্কেই রিক্রুট কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু উপদলীয় প্রধানদের বেশ কিছু সচিব এর সঙ্গে জড়িত বলে স্বীকার করেছেন। জাপানের মানুষদের দৃঢ় বিশ্বাস এই সব সচিবরা আসলে তাঁদের প্রভুদের বেনামদার হিসেবে কাজ করেছেন এবং লাভের অর্থটা গেছে প্রভুদেরই পকেটে।

প্রথম দিকে সকলেরই সন্দেহ ছিল প্রাক্তন মন্ত্রী এবং শাসক দলের একটি উপদলের নেতা ইয়াসুহিরো নাকাসোনে এবং তার গোষ্ঠীর ওপর। নাকাসোনে সম্পর্কে এই ধরনের সংশয় আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছিল। নাকাসোনে নিজে কিন্তু চুপচাপ ছিলেন। কিচি মিয়াজাওয়া পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি উপদলের মুখে চুনকালি লাগে। পরে

তাকেশিতা উপদলেরও পরিছন্নতার মুখোশ খুলে পড়ে। সাধারণ মানুষের কাছে শাসক দল লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সামগ্রিকভাবেই ধিকৃত হচ্ছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে এক জনমত সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে শাসক দলের জনপ্রিয়তা কম করেও ১৯ শতাংশ কমে গিয়েছিল।

জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোস্যালিস্ট পার্টি শাসক দল ও সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাকেশিতা ট্যাক্স বৃদ্ধির বিল সুকৌশলে সংসদে পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। এই কর বৃদ্ধি, দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষে জনমত ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছিল।

জাপানে আগে 'লকহীড কেলেঙ্কারির' ধাক্কায় একজন প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় দিতে হয়। রিক্রুট কেলেঙ্কারির ব্যাপকতা তার তুলনার অনেক বেশি। এর ফলে গোটা নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহনের মাধ্যমে তহবিল গড়ে তোলার প্রথা ইত্যাদি পরিবর্তন করে ব্যাপক সংস্কারের দাবি ওঠে।

সাধারণ নির্বাচন

১৯৯৬ সালের ২০ শে অক্টোবর জাপান সংসদ, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ-র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাপানের নির্বাচনে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। কমিউনিস্ট পার্টি ২৬টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছিল ১৫টি আসন; অর্থাৎ ১৯৯৩ সালের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টি ১১টি বেশি আসন অর্জন করে। পাঁচশো আসনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি যে ২৬টি আসনে জয়লাভ করে, তার মধ্যে ২৪টি আসনেই জয়ী হয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কেন্দ্রে। অপর দুটি আসনে জয়ী হয় একক আসন বিশিষ্ট কেন্দ্র থেকে। এখানে উল্লেখ্য, এই প্রথম জাপানে দ্বিবিধ ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাপানের শাসক দলগুলি এই দ্বিবিধ নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল, জাপানের কমিউনিস্ট পার্টিকে ডায়েটের বাইরে রাখার জন্য। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালের পর জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি এর পূর্বে আর কখনও এতবড় সাফল্য অর্জন করেনি। ১৯৭০ সালে জে সি পি ৪১টি আসনে জয়ী হলেও ভোট পেয়েছিল ১০.৭ শতাংশ। ১৯৯৬-র নির্বাচনে ভোট পড়ে ৫৯.৬ শতাংশ। কমিউনিস্ট পার্টি পায় ১২ শতাংশ ভোট। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া একমাত্র লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি পেয়েছিল ২১১টি আসন, এবারের নির্বাচনে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৯টি-তে। অর্থাৎ আগের নির্বাচনের তুলনায় লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ২৮টি আসন বেশি পেয়েছে, কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য আরও ১২টি আসনে জয়ী হবার প্রয়োজন ছিল। এই দুটি রাজনৈতিক দল ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের শক্তি হ্রাস পেয়েছে, ব্যতিক্রম জাপানের ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গত নির্বাচনে পেরেছিল ৫২টি আসন; এবারও পেয়েছে ৫২টি আসন। সবচেয়ে বিপর্যয় ঘটেছে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির। গত নির্বাচনে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি পেয়েছিল ৩০টি আসন, এবার পেয়েছে ১৫টি — অর্থাৎ ঠিক অর্ধেক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে এত কম ভোট এর পূর্বে আর কখনও পড়েনি। এর প্রধান কারণ হলো জাপানের জনগণের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে, রাজনীতি মানেই দুর্নীতি; আর রাজনীতিবিদেরা দ্রুতহারে বেশি বেশি করে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এজন্য তাঁরা রাজনীতির প্রতিই বেশি বেশি করে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন। এই প্রেক্ষাপটে জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ৭০ লক্ষ ভোট পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি যে ২৬টি আসন পেয়েছে, তার গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়। কেননা, জাপানের সংবিধান অনুযায়ী সংসদে কোন বিল পেশ করতে হলে ন্যূনতম ২০জন সদস্যের সম্মতি দরকার। গত দেড় দশকের বেশি সময় জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির এই অধিকার ছিল না। দীর্ঘদিন পরে পার্টি সেই অধিকার অর্জন করলো। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হবার পরই জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান তেসুজো ফুয়া বলেছেন ঃ নবগঠিত সংসদের প্রথম অধিবেশনেই কমিউনিস্ট পার্টি প্রশাসনিক সংস্কার, রাজনৈতিক তহবিলে অনুদান গ্রহণ নিষিদ্ধ করা, অবসর গ্রহণের পর আমলাদের বড় বড় পদে নিয়োগ বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিল পেশ করবে। পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি আরও ঘোষণা করেছে যে, সংসদের ভেতরে ও বাইরে পার্টি জনস্বার্থে রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

জাপানের সম্রাট ও সাধারণ মানুষ

জাপ সম্রাট হিরোহিতোর বিরুদ্ধে জাপানের জনগণের ঘৃণা যে কত তীব্র তার প্রমাণ মিলল সম্রাটের মৃত্যুর পর। সম্রাটের মৃত্যুর পর সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয়। এতে দেশের সর্বস্তরের সঙ্গীতশিল্পীরা প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করেন। জাপান মিউজিসিয়ানস ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ছ' হাজার। জাপানে সঙ্গীতশিল্পীদের এটাই বৃহত্তম ইউনিয়ন। সম্রাটের মৃত্যুতে সঙ্গীত বন্ধ করে দেওয়ায় ইউনিয়ন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মিউজিসিয়ানস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ জাপ সম্রাটের মৃত্যুতে নাচ-গান বন্ধ করে দেবার মধ্য দিয়ে নিছক প্রয়াত সম্রাটের প্রতি যে সম্মান জানানো হয়েছে তাই নয়, সম্মান জানানো হয়েছে রাজতন্ত্রের প্রতি। অথচ দেশের জনগণ রাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জাপানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। সরকারী নির্দেশ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে—এটা গণতন্ত্রের পক্ষে অপমানকর। জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার সরকারের নেই।

মৃত্যুর পর যেভাবে সম্রাট হিরোহিতোকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা হয়েছে তাতে জাপানের বুদ্ধিজীবিরা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র এবং কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ। খ্যাতনামা অধ্যাপক মিনোরু আন্দো সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, সরকার এবং গণমাধ্যমগুলি যেভাবে হিরোহিতোর প্রশংসায় মেতেছে, যেভাবে হিরোহিতোকে শান্তির দূত হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে তা খুবই দুঃখজনক। যুদ্ধের সময় প্রয়াত সম্রাটের নিন্দনীয় ভূমিকার কথা আমাদের ভবিষ্যতেও মনে রাখতে হবে। সম্রাটের আমলের দানবীয় ব্যবস্থাবলী যাতে ভবিষ্যতে জনগণের উপর নতুন করে চেপে না বসে সেদিকে কঠোর নজর রাখতে হবে।

দেশের সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং ধর্মীয় নেতারা হিরোহিতোর ভাবমূর্তি তুলে

ধরাব নিন্দা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যেভাবে হিবোহিতোব প্রশংসা কবা হয়েছে তাতে জনগণের সার্বভৌম মতামতের রীতিনীতি ভঙ্গ কবা হযেছে। একটি সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে ঃ সম্রাটের মৃত্যুব জন্য শোক যেন জনগণেব উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয। সমাবেশেব ডাক দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স ইউনিয়ন, জাপান সায়েন্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, দ্য পীচ কমিটি এবং দ্য স্টুডেন্ট সেলফ গভর্নিং অর্গানাইজেশন।

দেশের ইতিহাস বিজ্ঞানীদের চারটি সংগঠন একটি যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁবা সম্রাটের মৃত্যুর পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন এবং দেশের অভ্যন্তরে যে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নতুন সম্রাট আকিহিতোর মন্তব্য এবং তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী তাকেশিতোর জবাবের মধ্যে যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, সম্রাট সক্রিয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এটা নতুন ধরনের রাজতন্ত্র কায়েম করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। সম্রাটকে রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা সংবিধানের পরিধি বহির্ভূত কাজ।

আধুনিক রাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হয়। হিরোহিতোর যুদ্ধাপরাধ এবং অন্যান্য অপরাধগুলি আড়াল করার চেষ্টা হয়।

জাপানের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা আসাহি সিমবুন সুকেমাসাইরের ব্যক্তিগত ডায়েরী থেকে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ধার করেছে। ঐ তথ্যে বলা হয়েছে ঃ সম্রাট হিরোহিতো ওকিনায়ায় দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করার অনুরোধ করেন। ১৯৪৭ সালে হিরোহিতো তেরাসাকির মাধ্যমে মিত্রশক্তির সদর দপ্তরে একটি বার্তা পাঠান। ঐ বার্তায় তিনি ওকিনায়াতে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করার অনুরোধ জানান। ওকিনায়া প্রিফেকচ্যুয়াল অ্যাসেমব্লি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, অ্যাসেমব্লি হিরোহিতোর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবে না।

জাপ-মার্কিন বানিজ্যিক দ্বন্দ্ব

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ তাঁর কার্যকাল শেষ হবার অব্যবহিত আগে এশিয়া সফরে গিয়েছিলেন। 'এশিয়া' না বলে এটিকে 'জাপান সফর' বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ বুশ সাহেবের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো জাপানী পুঁজির হাত ধরে, যে গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে আমেরিকা তলিয়ে যাচ্ছে, তার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা। জাপানে পৌঁছানোর আগে, বুশ অস্ট্রেলিয়াতে নেমে সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আশ্বাস দিতে গিয়েছিলেন যে, 'পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষা' করার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'প্রতিশ্রুতি ভোলেনি।' জবাবে তাঁকে শুনতে হয়েছে ঃ "অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এসে আবার নিরাপত্তার প্রশ্ন তোলা কেন?" আর, "গত চব্বিশ বছরে তো কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপতির অস্ট্রেলিয়ায় পদার্পণের প্রয়োজন মনে হয়নি; আজ হঠাৎ আসার কারণ কি এটাই নয় যে, অস্ট্রেলিয়ার বাজারে মার্কিন শস্য আমদানির ঢালাও বৃদ্ধি করে বুশ প্রশাসন নিজের দেশের নুয়ে যাওয়া কৃষি কাঠামোকে চট্‌জলদি সজীবকরার তালে আছেন"। পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমের ভাষায়, জবাবে বুশ যা বলেছেন তা "অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী তোতলামির" পর্যায়ে পড়ে। এতো গেল অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের 'লাভ'। এরপর, সিঙ্গাপুর ছুঁয়ে (সেখানে ফিলিপাইনের সুবিক উপসাগর থেকে, মার্কিন নৌ-ঘাঁটি সরিয়ে আনতে বুশ বাধ্য হয়েছেন) বুশ উড়ে গেলেন জাপানে।

কেন জাপান সফর? বুশের নিজের ভাষায় "চাকরি, আরো, আরো চাকরি চাই"। তো, আমেরিকায় কি চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না? "বিশ্বব্যবস্থা" কায়েম করতে চলেছে যে দেশ, সেখানে কিনা কর্মহীনতার ঘৃণ্য প্রার্দুভাব? একেবারে ঠিক কথা। চরম আর্থিক সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছিল বুশ সাহেবের দেশ। যৎকিঞ্চিৎ পরিসংখ্যান দেওয়া যেতে পারে। দেশের শ্রমশক্তির ২৫% বেকার। সংখ্যায় তা দাঁড়ায় আড়াই কোটিরও বেশি — এবং এ'সংখ্যার দ্রুত বাড়বৃদ্ধি হচ্ছিল। একের পর এক ব্যাঙ্ক, একের পর এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, ক্রেতাসাধারণের আস্থা দ্রুতহারে কমেছে প্রশাসনের ওপর। মোট জাতীয় উৎপাদনের হার প্রতি বছর ১.৪% হারে কমছে। ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচক বছরে ৩% হারে বাড়ছে। গোটা অর্থনীতির বাৎসরিক বিকাশের হার কমতে ঠেকেছে ০.৩% — যা' ও দেশের ইতিহাসের সর্বনিম্ন হার। ১৯৯১ সালে আমেরিকা ২৫০০ কোটি ডলারের আমদানির তুলনায় ২১০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী করেছে। এবং প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে, এই ব্যবধান বেড়েই চলে। পরের বছর ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, আর আমেরিকার ৬১% মানুষ নাকি জোর দিয়ে বলেছেন, বর্তমান প্রশাসন অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানে এখনো দিক খুঁজে পাচ্ছেন না! সুতরাং, চাকরি, আরো, আরো চাকরির আশায় বুশ এলেন জাপানে।

এলেন, দেখলেন, এবং মূর্চ্ছা গেলেন। জাপানের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী পোড়খাওয়া রাজনীতিজ্ঞ কিইচি মিয়াজাওয়া প্রথমেই বুশকে মনে করিয়ে দিলেন যে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে এখন জাপান। আর, তাই বুশের একতরফা ফতোয়াতে কোন কার্যসিদ্ধি হবে না। আলোচনা শুরু হলো। বুশের সঙ্গে গিয়েছিলেন, আমলা ও রাজনৈতিক পার্শ্বচর ছাড়াও, তিন মার্কিন গাড়ী প্রস্তুতকারকও। কারণ বুশের অন্যতম রণনীতি ছিল, জাপানকে বেশি বেশি করে মার্কিনী গাড়ী কিনতে বাধ্য করা — এবং জাপানি গাড়ীর আমদানি কমিয়ে দেওয়া। জেনারেল মোটরস্ বন্ধ হওয়ার ধাক্কা তখনও বুশকে যথেষ্ট বিচলিত করে রেখেছিল, সন্দেহ নেই। বুশ প্রায় অনুনয়-বিনয় করছেন দেখে, জাপান সুযোগ বুঝে চাপ দিলো। যে চুক্তি বেরিয়ে এলো তা বুশের মনপসন্দ না হলেও তাঁকে গিলতে বাধ্য করলেন মিয়াজাওয়া। বলা হলো, জাপান প্রতি বছর মার্কিন গাড়ী আমদানির পরিমাণ বর্তমানের চাইতে ১৫% শতাংশেরও কম বৃদ্ধি করবেন — আবার, এর মধ্যে যন্ত্রাংশও ধরা হয়েছে। অপরদিকে, বুশ মেনে নিলেন যে, জাপানে মার্কিন বিনিয়োগের পরিমাণ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বৃদ্ধি করতে হবে ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি। বুশের সঙ্গী ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিনিধি, এবং ক্রাইসল্যার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, উভয়েই মোটেই খুশি হননি বুশের দুর্বল ভঙ্গিমায় আলোচনায়। অপরদিকে, জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তানাহাশি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ঃ "যতদূর সম্ভব জাপান ছাড় দিয়েছে, কোন অবস্থাতেই এর চেয়ে বেশি কিছু আমরা দিতে রাজি নই"।

দেশে ফিরে বুশকে ব্যাপক সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছিল। যেখানে জাপানের *সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মার্কিনী ঘাটতির পরিমাণ ৪১০ কোটি ডলারেরও বেশি, সেখানে কিনা "গাড়ীর সেলসম্যান" বুশ ১০০ কোটি ডলারেরও সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হল!* তবে এটাও তাঁর অতিবড় সমালোচকও স্বীকার করছেন যে মার্কিন অর্থনীতির দুর্দশাগ্রস্ততা বোঝাতে বুশ যতদূর যাবার গেছেন, জাপানি প্রধানমন্ত্রীর কাছে — হয়তো বা তার চাইতেও

কিছুটা বেশি। ভোজসভায় মিয়াজাওয়ার কোলে বুশের অজ্ঞান হওযাটা দূবদর্শনের কল্যাণে কারুবই নজর এড়ায়নি।

ইন্দোনেশিয়া

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাবলীর সূত্র খোঁজা যেতে পারে ১৯৯৬ সালের জনজাগরণের তরঙ্গের মধ্যে। এই গণজাগরণের গভীরতা এতোই বেশি যে, কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের মধ্যে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে বড় প্রশ্ন ঃ অদূর ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়া কোন্ পথ নেবে? যে কোনো ইতিহাসের ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা যায়, বিশ্বের সব থেকে স্থায়ী রাষ্ট্রনায়ক কে, তবে সহজ উত্তর হবে, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো। এর পরের নামই ছিল ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জেনারেল সুহার্তো। ১৯৯৬ সালেই বোঝা গিয়েছিল যে সুহার্তোর এর স্থায়ী সরকার এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দিন গুনছে। একটানা ত্রিশ বছর ধরে ইন্দোনেশিয়ার বুকে চলেছিল এককেন্দ্রিক স্বৈরশাসন, সুহার্তোর পরোক্ষ সামরিক শাসন। তবে কঠিন তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিরোধীরাও চলছিলেন অত্যন্ত কঠোর সতর্কতার সঙ্গে। কেননা দশ হাজারের বেশি কমিউনিস্ট জেলে বন্দী—তাঁরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বিশ-পঁচিশ বছর ধরে জেলে রয়েছেন। বিশ হাজারের বেশি প্রাক্তন কমিউনিস্ট হয় আত্মগোপনে রয়েছেন নতুবা দেশ ছাড়া হয়েছেন। এ জন্য ইন্দোনেশিয়ার বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক এবং কর্মীরা বর্তমানে ডেমোক্র্যাটিক পিপল্‌স পার্টির তত্ত্বাবধানে কাজ করছেন। এঁদেরই একজন সংগঠক বাইশ বছরের শিক্ষিত যুবক ইয়ান।১৯৯৬ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ার বুকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হলে তিনি তাৎক্ষণিক আত্মগোপনে যান। আত্মগোপনে যাবার ঠিক প্রাক-মুহূর্তে তিনি 'টাইম' পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, বর্তমানে যে সুযোগ এসেছে তা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তবে তড়িঘড়ি করে কিছুই হবে না। অতীতের ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আগামী দু'বছরের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্র পালটে যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো, আগামী দু'বছরের কথা বলা হচ্ছিল কেন? আর সেখানকার বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে সুযোগটাই বা কী? ১৯৯৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ নির্বাচন ছিল। জেনারেল সুহার্তোর শাসনে এটি ছিল সপ্তম সাধারন নির্বাচন। ইন্দোনেশিয়ার শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-প্রধান। রাষ্ট্রপতিই সেখানকার সর্বেসর্বা। সেখানে একটি সংসদ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কোন গণতন্ত্র নেই। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন এক হাজারের মতো এক নির্ব্াচকমণ্ডলী। এঁদের পঞ্চাশ শতাংশ সরকার মনোনীত আর পঞ্চাশ শতাংশ পার্লামেন্টের সদস্য। সরকার যে সমস্ত সদস্য মনোনীত করে, তার সিংহভাগই সেনাবাহিনীর সভ্য। ইন্দোনেশিয়ায় বর্তমানে সরকারীভাবে তিনটি রাজনৈতিক দল কাজ করছে। এই তিনটি রাজনৈতিক দল হলো জেনারেল সুহার্তোর গোলকার পার্টি, দ্য ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং দ্য ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এর মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত পার্টি আর ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি খ্রিষ্টানদের রাজনৈতিক দল। সুহার্তোর গোলকার পার্টি ছাড়া যে দু'টি রাজনৈতিক দল রয়েছে তারাও

ছিল সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত। সুহার্তো নিজেই বার বার ঘোষণা করতেন যে, ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ঐতিহ্য হলো নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, আর নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিটা হলো রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের নীতির উপর ভিত্তি করেই ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে সেখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চার শ' আসনযুক্ত সংসদে শাসক গোলকার পার্টি ২৯৯টি আসন পায়। কিন্তু নির্বাচনের পর থেকেই ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সুহার্তো সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করতে থাকে। পরবর্তী নির্বাচনে এই পার্টি যাতে সুহার্তোর কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করে সে জন্য তিনি প্রথম থেকেই সচেষ্ট হন। ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরে দুই ধরনের প্রবণতা রয়েছে। একটি অংশ সুহার্তোর অর্থনৈতিক নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে আসছে। এই অংশ মনে করতো যে, ইন্দোনেশিয়ার বুকে যে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে সুহার্তোর অর্থনীতিতে উদারনীতিকরণ। অপর অংশ মনে করে, এই উদারনীতি দেশে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছে। এই নীতির ফলে দেশের অভ্যন্তরে একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। সেই গোষ্ঠীই সুহার্তোর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। সিংহভাগ নরনারী দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করছেন। ১৯৯৬ সালেই পরিকল্পনা করা হয় যে সুহার্তোর অর্থনীতির বিরুদ্ধে যদি ব্যাপকতার মঞ্চ গঠন করা যায়, সেই মঞ্চের নেতৃত্বে যদি ব্যাপকতর আন্দোলন সংঘঠিত করা যায় তবে দু'বছর পর যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে সুহার্তোকে পরাজিত করা সম্ভব।

দেশের বিরোধীদের কাছে তখনকার সুযোগটা কী ছিল? দেশের অভ্যন্তরে কোনো গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিলনা। স্বভাবতই মানুষ গণতন্ত্রের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি ঘটেছিল ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যাঁরা এই সমস্ত আন্দোলন সংগঠিত করেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই আত্মগোপন অবস্থায় কাজ করছেন। তা সত্ত্বেও সুহার্তো মনে করতেন যে, ত্রিশ বছরের মধ্যে এই শক্তিই তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় রকমের চ্যালেঞ্জস্বরূপ। কেননা ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশ্চিমী দুনিয়া বিশেষ করে আই এম এফ বা বিশ্ব ব্যাঙ্ক খুশি হলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু খুশি নন। বিশ কোটি মানুষের দেশ ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রাষ্ট্র। তার চেয়েও বড় কথা হলো, এই বিশ কোটি নরনারী বাস করেন প্রায় তের হাজার দ্বীপে। আবার ইন্দোনেশিয়ার ভাষার সংখ্যা হলো পাঁচ শত। যদিও দেশটি মুসলিম অধ্যুষিত, কিন্তু এখানে হিন্দু ও খ্রিষ্টান জনগণের বসবাসও কম নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব থেকে আগে এই ইন্দোনেশিয়ার বুকেই উদারনীতিকরণের কাজ শুরু হয়। দেশটাকে পুরোপুরিভাবে বেসরকারী ও বিদেশীপুঁজির জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া শুরু হয় সত্তর দশকের একেবারে গোড়া থেকেই। ফলশ্রুতি হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার, বিশেষ করে উচ্চমধ্যবিত্তদের মাসিক উপার্জন দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের মধ্যে, অনেকে, এখন থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে যাঁরা মাসে পঞ্চাশ ডলার উপার্জন করতেন তাঁরা বর্তমানে এক হাজারের বেশি ডলার উপার্জন করছেন। সেখানে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ চার হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ইন্দোনেশিয়ার আপাত অগ্রগতিতে সুহার্তো নিজে খুবই আত্মতুষ্ট ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায়নি। পরন্তু সেখানকার সাধারণ গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কট দিনকে দিন বেড়েই চলেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য

দেশের মতো ইন্দোনেশিয়াও কৃষিপ্রধান দেশ। শহরাঞ্চলে উচ্চ মধ্যবিত্তের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেলেও গ্রামের কৃষিজীবী জনগণ যে সঙ্কটের মধ্যে ছিলেন আজও সেই সঙ্কটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। পরন্তু বিভিন্ন দ্বীপে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে এই অসন্তোষ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কেননা শহরাঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁদের জীবনমান দ্রুত নেমে যাচ্ছে, জীবনযাত্রার ফারাক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে সুহার্তো পরিবারের দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ। সুহার্তোর ছেলে-মেয়েরা ইন্দোনেশিয়ায় বাণিজ্য সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চাইছেন। তাঁদের মূলধনের পরিমাণ পাঁচ শ' কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট, দুর্নীতি এবং স্বজন-পোষণ ইন্দোনেশিয়ায় দ্রুততার সঙ্গে সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুহার্তোর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। তিনি নিজে এখনও তার কোন বিকল্পের কথা ভাবতে পারেননি। রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর এমন কি নিজ দল গোলকার পার্টির সর্বময় কর্তা হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। অথচ তিনি দ্রুত শারীরিক অক্ষমতার শিকার হয়ে পড়ছেন। বেশ কিছুদিন ধরে ফুসফুসে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে গোলকার পার্টির অভ্যন্তরেও সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সুহার্তোকন্যা তুতুত বর্তমানে গোলকার পার্টির ভাইস চেয়ারপারসন। তিনি নিজেকে সুহার্তোর উত্তরাধিকারী বলে চিহ্নিত করতে শুরু করেছিলেন। এতে খোদ গোলকার পার্টির অভ্যন্তরেই সঙ্কট দেখা দিয়েছিল।

নিজ দলের অভ্যন্তরের অসন্তোষ চাপা দেবার জন্য সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভেতরের সঙ্কট সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করেন। সুহার্তোর এই অপকৌশলের বিরুদ্ধে সংগ্রাটাই পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। আর ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী। তারই নেতৃত্বে পরিচালিত গণতন্ত্রের আন্দোলন ইন্দোনেশিয়ার বুকে এক গণজাগরণ সৃষ্টি করেছে। কে এই মেঘবতী। মেঘবতী ১৯৮৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার সংসদে নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালে তিনি দ্য ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারপারসন পদে আসীন হন। তখন থেকেই দেশের অভ্যন্তরে প্রচার চলছে যে, মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী পরবর্তী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হবেন এবং সুহার্তোর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই প্রচারে আর কেউ নন স্বয়ং সুহার্তো আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তিনি নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন মেঘবতীতে দ্য ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্বের পদ থেকে অপসারণ করার। সরকারী সহযোগিতায় এ বছরের ২২-২৩শে জুন মেডান-এ দ্য ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক বিশেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেই বিশেষ কংগ্রেসে মেঘবতীকে অপসারণ করে সুর্যদি-কে দলের চেয়ারপারসন পদে নিযুক্ত করা হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই জাকার্তা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মেঘবতীর কয়েক হাজার সমর্থক মিছিল বের করেন এবং ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অফিসটি দখলে নেন। চার সপ্তাহ ধরে তাঁরা এই সদর দপ্তরটি দখলে রাখেন। অফিসের সামনে বিরাট মঞ্চ গঠন করা হয়। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে এগিয়ে আসে ফ্রি স্পিচ মুভমেন্ট—এটি ইন্দোনেশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের সব থেকে বড় সংগঠন। চার সপ্তাহ পরে পুলিস সদর দপ্তর থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় এবং ২৪৫ জন অবস্থানকারীকে গ্রেপ্তার করে। এরপর পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সমগ্র জাকার্তা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দোকানপাট লুঠ হয়, ব্যাঙ্ক এবং সরকারী অফিসে আগুন লাগানো হয়। সরকার এই বিক্ষোভ

দমনে সেনাবাহিনী নামায়, এমন কি মেঘবতীর বিরুদ্ধে পর্যন্ত সমন জারি করে। সুহার্তো যথারীতি সমগ্র ঘটনাকে কমিউনিস্টদের চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেন এবং ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নেতাদের বিনা বিচারে আটক করার নির্দেশ দেন। এমন কি এ ধরনের অভিযোগও করা হয়, বিক্ষোভের পিছনে ফিলিপাইনস-এর কমিউনিস্ট পার্টি এবং অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির মদত রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা এই অভিযোগ হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেন। 'টেম্পো' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক গোয়েনায়ান মহম্মদের ভাষায় 'বর্তমান পরিস্থিতিতে ইন্দোনেশিয়ার জেনারেলরা ব্যতিরেকে আর কেউ কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের ভয় দেখছেন না।' সব থেকে বেশি আক্রমণ নেমে এসেছে নিষিদ্ধ ডেমোক্র্যাটিক পিপল্‌স পার্টির নেতাদের উপর, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের উপর। কিন্তু আক্রমণ যতো বৃদ্ধি পাচ্ছে বিক্ষোভও ততো বেশি বেশি করে প্রসারিত হচ্ছে। মেঘবতীর নামের সাথে সুকর্ণর নাম যুক্ত থাকায় বিক্ষোভ আন্দোলন বিশেষ গতি অর্জন করেছে। সুহার্তো সরকার ইতোমধ্যেই ফরমান জারি করেছে যে, মেঘবতী'র নামের সাথে সুকর্ণপুত্রী পদবি ব্যবহার করা যাবে না—তাঁকে তাঁর স্বামীর পদবী ব্যবহার করতে হবে। মেঘবতী সে সময় ছিলেন কার্যত গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন। বাড়ি থেকেই তিনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন—যদিও স্থানীয় সংবাদপত্রে তাঁর কোনো বিবৃতি ছাপতে দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ মুসলিম নরনারীর প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন উলামা মুসলিমের নেতা আবদুর রহমান ওয়াদিদ-র সঙ্গে মেঘবতী ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার পর ওয়াদিদ নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, মেঘবতী যে সমস্ত দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন আমি তাঁর প্রতিটি দাবি সমর্থন করি। আবার একটি মুসলিম সংগঠনের নেতা আমিয়েন রেজ বলেছিলেন, আমি মেঘবতীর পক্ষে বা বিপক্ষে নই, তবে সমকালীন ঘটনাবলী থেকে যদি সুহার্তো শিক্ষা গ্রহণ না করেন তবে তাঁর পক্ষে ভবিষ্যৎ খুবই বিপজ্জনক। দেশের শ্বাসরুদ্ধকারী পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেঘবতী নিজেই বলেছিলেন, এই মুহূর্তে আমাদের আন্দোলনের আশু লক্ষ্য হলো, মানুষ কথা বলুক, ইন্দোনেশিয়ার মানুষ কথা বলতে পর্যন্ত ভুলে গেছেন। এমন কি তাঁরা হাসি-কান্নাও ভুলে গেছেন। এ দেশের কোনো মানুষই মুক্ত নন। আমিও মুক্ত নই। আমি পার্লামেন্টের সদস্য কিন্তু বাড়ির বাইরে বেরুতে পারছি না। আমার বিরুদ্ধে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নেই। কিন্তু আমার সমর্থকরাই আমাকে বাড়ির বাইরে বেরতে দিচ্ছে না। কেননা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে। এখন দেশে যা যা ঘটছে তা স্বতঃস্ফূর্ত। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ভাবে ফারাক বৃদ্ধি পাচ্ছে, মধ্যবিত্তরা যেভাবে গরিব হয়ে পড়ছেন, তাতে বেশিদিন আর মানুষকে বাকরুদ্ধ করে রাখা যাবে না। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আমি কমিউনিস্টদের উপর নির্ভরশীল, তাঁদের সংগঠিত করছি। কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে মানুষকে আর কতোদিন পঙ্গু করে রাখা যায়। বর্তমান সরকার মানুষের উপর নয়, পুলিস-মিলিটারির উপর নির্ভরশীল। পুলিস-মিলিটারি মানুষকে ভয় দেখাতে পারে, ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না।

নিজ দলের নেতৃত্বের পদ থেকে অবৈধভাবে অপসারিত হবার পর মেঘবতী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি সূর্যদি'র চেয়ারপারসন হবার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর আন্দোলনের

বাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ডেমোক্র্যাটিক পিপল্স পার্টিকে ব্যবহাব করেছেন। এই নিষিদ্ধ দলের চেয়ারম্যান বুদিমান সুফজাতমিকো নিজেই বলেছেন, গণতন্ত্রে জনগনের সংগ্রাম বানচাল করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর এই সংগ্রামে আমাদের সকলের নেত্রী হলেন মেঘবতী। ডেমোক্র্যাটিক পিপ্লস্ পার্টি ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তম সংগঠন। যেহেতু রাজনৈতিক দল হিসেবে এটি নিষিদ্ধ তাই বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও) হিসেবে কাজ করছে। এই সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য হলো ঃ ইন্দোনেশিয়ার জনগণের মধ্যে বামপন্থী সামাজিক গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জাগিযে তোলা। ডেমোক্র্যাটিক পিপল্স পার্টির ঘোষিত লক্ষ্যে যেহেতু বামপন্থী চেতনাব কতা বলা হয়েছে, সরকার তাই এই সংগঠনকে এক কথায কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। ১৯৯৬ সালে ইন্দোনেশীয়ার সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস হাসিম বিদেশী কূটনীতিবিদদের সঙ্গে মিলিত হন। এটা কেটা অস্বাভাবিক ঘটনা। তিনি বিদেশী কূটনীতিবিদদের কাছে বলেন, 'ইন্দোনেশিয়ার বুকে বর্তমানে যা ঘটছে তা সবটাই কমিউনিস্টদের কাজ। কমিউনিস্ট ব্যতিরেকে আর কেউ এ ধরনের বিক্ষোভ কবতে পারে না। যদিও বর্তমান আন্দোলনকারীদের চেহারা একটি ছোট্ট আলুর মতো। কিন্তু কমিউনিস্টদের প্রকৃত চেহারা কেউই কখনও জানতে পারে না। তাই যে কোনো বিক্ষাভ অঙ্কুরেই ধ্বংস করা দরকার।' সেনা প্রধানেরা যাই বলুন না কেন, ইন্দোনেশিয়ার গণজাগরণ যে অদমনীয় তা ১৯৯৬ সালের ১২ই আগস্টের সংখ্যায় প্রকাশিত 'নিউজ উইকে'র এক নিবন্ধতেই পরিস্ফুট। ঐ নিবন্ধে লেখা হয়েছে, জাকার্তায় সম্প্রতি যে রায়ট (সংসর্ষ) সংগঠিত হলো সে যেন অজস্র শিল্প কারখানার মধ্যে এক একক বিস্পোরনের মতো। এই ঘটনায় পুড়ে ছারখার হলো নানা ধরনেব সরকারী সৌধ আর ব্যাঙ্কসমূহ। কিন্তু তার কবল থেকে বাদ গেল শরের ফ্যাশানবহুল এলাকা। যে কেউ এই দাঙ্গার সামনে দাঁড়িয়ে স্মৃতির পাতা ওলাটালেই দেকতে পাবে বত্রিশ বছর আগের সেই দৃশ্যগুলি — ১৯৯৬ সালের দৃশ্যগুলি যে অঞ্চল দাঙ্গার আগুনে পুড়লো এখানেই সেদিন সংগঠিত হয়েছিল একটার পর কেটা লাগাতার ছাত্র-াান্দোলন যার ফলশ্রুতিতে একদিকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল প্রথম রাষ্ট্রপতি সুকর্ণর পতনের আর সুহার্তোর ক্ষমতা দকলের সুহার্তো তার চরম ক্ষমতার ব্যবহার করে দৃঢ় এক (সামরিক) প্রশাসন গড়ে তুলেছিল।

ইতিহাসের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো, সে কাউকে ক্ষমা করে না। ইতিহাসের সেই বিস্ময়কর পথে ইন্দোনেশিয়ার শুরু হয়েছে প্রতিশোধ গ্রহণের পালা।

যদিও বাইরে থেকে দেখলে মেঘবতী বা তার ছোট রাজনৈতিক দল ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কেউই ক্ষমতাধর সুহার্তোর সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার ক্ষমতা রাখাতেন না, এমন কি মেঘবতী তো তাঁর আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী পিতৃস্বভাবের বিপরীত মেরুতেই অবস্থান করেন। সুকর্ণ তাঁর ছেলেদের নাম রেখেছিলেন লাইটনিং (ভাস্বর), থান্ডার (বজ্র), টাইফুন (ঝঞ্ঝা) কিন্তু মেয়ের নাম রেখেছিলেন মেঘ বা মেঘবতী। মেঘবতী সাধারণভাব কোনো সঙ্ঘর্ষে জড়াতে চাইতেন না। ফলত, মেঘবতী প্রচণ্ড ক্ষমতাধর সুহার্তোর সঙ্গে রাজনৈতিক যুদ্ধে সবদিক থেকেই এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বী। সুহার্তোর হাতে প্রভূত সামরিক শক্তি, অঢেল অর্থ আর সমগ্র প্রচার মাধ্যম।

অন্যদিকে সুহার্তো জোরদার অর্থনীতি গঠনের নামে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই দেশের

মানুষকে করে তুলেছিল অরাজনৈতিক। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও মানুষের স্মৃতি থেকে রাজনীতি মুছে যায়নি—যায় না।

ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ মানুষের জন্ম সুহার্তোর ক্ষমতা দখল আর তার ভয়ঙ্কর সাফল্যে পর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুহার্তো উন্নয়নমুখী সাফল্যের খতিয়ানে যেমন দেশের বহু পুরানো সমস্যার সমাধান আছে তেমনি নতুন নতুন সমস্যার জন্মও দিয়েছে। যেমন জনগণের মধ্যে আয়ের বৈষম্য বহু ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতার প্রধান বিস্ফোরক হয়ে উঠেছে। ইন্দোনেশিয়ার ধনীরা সম্পদ বৃদ্ধি, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এমনকি রাজনীতির ক্ষমতাও জাঁকিয়ে বসেছে।

অন্যদিকে প্রাথমিকস্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার যে সরকারী ইতিহাস পড়ানো হয়ে থাকে, সেই বিকৃত ইতিহাসের বিরুদ্ধে অধিকাংশ তরুণ ও প্রতিবাদী ইন্দোনেশিয়ানরা প্রবল আপত্তি তুলেছে। কারণ সেখানে রাষ্ট্রপতি সুকর্ণর সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে দুর্দশা যন্ত্রণা আর অভাবের কাল হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা জোরের সঙ্গে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, সুহার্তো এবং তাঁর সেনানায়কেরা কমিউনিস্টদের হত্যা করেছে, কারণ তারা ছিলো রক্তপিপাসু সব খলনায়ক। এখনও তাদের বিপদ থেকে দেশ নাকি মুক্ত নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব মিলিয়ে যে বিকৃত ইততিহাস তৈরি করা হয়েছে তা হয়ে উঠেছে অতীতে এক নির্মম অশ্লীল সাহিত্য, যা দেখে বা এই বিকৃত ইতিহাস পড়েই নতুন প্রজন্ম ভাবতে শুরু করেছে যে, এর মধ্যে নিহিত যে সত্য রয়েছে তা নিশ্চয়ই হবে রহস্যময় আর উত্তেজনাপূর্ণ।

কার্যকরী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তরুণেরা সুহার্তো জামানার বিরুদ্ধে ভোট প্রদানের পথ খুঁজতে গিয়ে একদিকে সুকর্ণর গৌরবগাথা তুলে ধরছে আর অন্যদিকে কল্পনাপ্রবণভাবে প্রচার করছে বামপন্থার কথা।

বিগত ১৯৮৮-র অক্টোবরের কথা। 'টেম্পো' নামের এক সংবাদ সাপ্তাহিক তার পাঠকদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়েছিল সুকর্ণর জাতীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতির প্রশ্নে। তাতে দেখা যায়, জাতীয় নেতা হিসেবে তার কূলপ্লাবী বিশাল জনপ্রিয়তা। তা দেখে সামরিক সরকার এতোটাই মুষড়ে পড়ে যে, সরকার তার তথ্য বিভাগের মাধ্যমে ঐ পত্রিকাকে বাধ্য করে এই সমীক্ষার কাজ বন্ধ করতে। এ বছরই ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রসঙ্গে লিখিত একটি বই 'বে-আইনী' ঘোষণা করা হয়। অপরাধ ঐ বইয়ে একটি সমীক্ষা প্রকাশ করা হয়েছিল যেখানে তরুণেরা সুপারিশ করছে যে, কিছুতেই পার্টির প্রবীণ সদস্যদের নানা অজুহাতে হয়রানি করা চলবে না।

১৯৯৬ সাল থেকে মেঘবতী তরুণদের যে উদ্দাম সমর্থন পাচ্ছেন তা এই স্মরণের রাজনীতির অংশ। মেঘবতীকে তাঁর প্রধান পদ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে সামরিক অধিনায়ক এই তরুণ বাহিনীর কাছ থেকেই পায় চরম বিরোধিতা।

অবশেষে প্রচার মাধ্যমের যিনি দায়িত্ব প্রাপ্ত সামরিক অধিনায়ক তিনি সম্পাদকদের নির্দেশ দিলেন যে, মেঘবতীর নামের সঙ্গে যেন তাঁর পিতা সুকর্ণর নাম না যুক্ত করা হয়। বরঞ্চ তারা মেঘবতীর স্বামীর পদবিটি যেন ব্যবহার করেন।

এই সব জেনারেলদের কথা শুনে মনে হয় যে, যদিও বত্রিশ বছর আগেই সুহার্তো কমিউনিস্টদের নিধন করে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল তা সত্ত্বেও দেশে আজও কমিউনিস্টরাই এক বিশাল প্রতিবাদী শক্তি।

ডেমোক্র্যাটিক পিপল্‌স পার্টি (পি আর ডি) মূলত বিভিন্ন মতবাদী অনেকগুলো ছোট ছোট দলের একটি মঞ্চ—যাদের নেতৃত্বে আছে বিশ থেকে ত্রিশ বছব বযসেব কিছু শীর্ণ তবুণ-তরুণী—সেই পার্টিকেই সামরিক শাসকেরা চিহ্নিত করেছে কমিউনিস্টদের একমাত্র প্রচাবক বূপে। আর এ কথাও সত্যি যে, তারা নিজেদেরকে বামপন্থী আন্দোলনের অংশীদার বূপে পরিচয় দিতে ভালোই বাসে। ১৯৯৬ সালে যখন এই পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয সেদিন তার পরিধান করেছিল লাল রঙের 'বন্দনা'।

তবে তাদের মনে সাম্যবাদী চিন্তা কতটা ছিলো তা নিয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা শক্ত হলেও তারা যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাস করে আর আস্থাবান বহুদলীয রাজনীতিতে—এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়।

এই পরিস্থিতিতে পি অর ডি'র চেয়ারম্যান বুদিমান সুজাতমিকো তাই ঘোষণা করে বলতে পারেন, এসো, যদি পারে তো প্রমাণ করে। যে, আমরা কমিউনিস্ট। বুদিমানও তেমন চমকপ্রদ কেউ নন—তার পিতা ছিলেন একটি বিদেশী কোম্পানির কর্মী মাত্র।

বুদিমানের কথায় ঃ কমিউনিস্টদের প্রতি যদি কোনো বিরূপ বক্তব্য না থেকে থাকে তবে তাব পেছনেও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে ।

বুদিমান ও তার তরুণ বন্ধুদের কাছে দেশের ইতিহাসের যে তাৎপর্য তা জাতীয ইতিহাসের সরকারী ভাষ্যের চেয়ে ভিন্নতর। কারণ জীবনের প্রারম্ভকালে দেশের যে ইতিহাসের সঙ্গে তাদের পরিচয় সেখানে তারা দেখেছেন, স্বাধীনতাকামী বামপন্থী দেশপ্রেমিকদের উপর সুহার্তো বাহিনীর নির্মম নিধনযজ্ঞ ও রক্তাক্ত নিস্পেষণ। আর আজ যখন এই তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা উন্মেষিত হচ্ছে তখন তাদেরকে ঐ সব নির্যাতিত শহীদদের মৃত অস্তিত্ব যেন তাড়া করে ফিরছে। আর সে জন্যই ইন্দোনেশিয়ার তরুণেরা সুহার্তোর সামরিক জামানার তৈরি ইতিহাসের ভাষ্যকে অস্বীকার করেছে।

কাম্বোডিয়া

কাম্বোডিয়ার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করার লক্ষ্যে পয়লা জুলাই, ১৯৯৩ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এখানে এক দশক বা তার কিছু বেশি সময়ের কাম্বোডিয়ার ঘটনাবলী উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে খামের রুজ বাহিনী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে কাম্বোডিয়াকে মুক্ত করেন এবং রিপাবলিক অব কাম্পুচিয়া প্রতিষ্ঠা করে। এই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন খিউ শামফান এবং পেন নাউথ। কাম্বোডিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কবলমুক্ত হবার পর দেশে যে নতুন সরকার গঠিত হয় সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন প্রিন্স নরোদম সিহানুক এবং প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন পল পট। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পল পট সরকার অত্যাচারী সরকার হিসেবে চিহ্নিত হন। কাম্বোডিয়া (তখন নাম ছিল কাম্পুচিয়া) বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেশ থেকে সকল বিদেশীকে বিতাড়ন করা হয়। সমস্ত শহর থেকে জোর করে হাজার হাজার নরনারীকে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁদের কঠোর কায়িক শ্রম করতে বাধ্য করা হয়। এরই পাশাপাশি চলতে থাকে গণহত্যা। পল পটের অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানের লক্ষ্য নিয়ে

১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কাম্পুচিয়ান ন্যাশনাল ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর ন্যাশনাল স্যালভেশন। এই ফ্রন্ট ভিয়েতনামের সাহায্যে ১৯৭৯ সালে ৮ই জানুয়ারি পিপল্‌স রিপাবলিক গঠন করে। পিপলস রেভোলিউশনারি পার্টির হেঙ সামরিন দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এ সময় থেকেই কাম্বোডিয়া গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ হেঙ সামরিন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। ১৯৮২ সালে খামের রুজ সনসানের নেতৃত্বাধীন খেমের পিপলস ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। সনসান প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই সরকারকেই স্বীকৃতি দেয় এবং 'কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট অব ডেমোক্র্যাটিক কাম্পুচিয়া' রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ অর্জন করে। অর্থাৎ কাম্বোডিয়ায় একই সাথে দুটি পাল্টা সরকার চলতে থাকে। ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা হলেও নির্বাচনের আগে অবধি কাম্বোডিয়ায় প্রকৃতপক্ষে দুই ধরনের সরকার বলবৎ থাকে। আর উভয় পক্ষের মধ্যে চলতে থাকে রক্তাক্ত সংঘাত।

১৯৮৫ সাল থেকে কাম্বোডিয়ার বুকে এই রক্তাক্ত সংঘর্ষ বন্ধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয়। খামের রুজ-এর সঙ্গে মতানৈক্যের দরুন সনসান প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। খামের রুজ-এর মধ্যেও মতানৈক্য বৃদ্ধি পায়। খামের রুজ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা পেন নাউথ এবং খিউ শামফান-এর মধ্যে তত্ত্বগত বিরোধ দেখা দেয়। পেন নাউথ সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করার পক্ষে এবং খিউ শামফান এই সংগ্রাম আরো জোরদার করার পক্ষে মত দেন। সনসান পদত্যাগ করার পর তিনি বুদ্ধিস্ট লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠন করেন। কাম্পুচিয়ান ন্যাশনাল ইউনাইটেড ফ্রন্টও ভেঙ্গে যায়। হুন সেনের নেতৃত্বে গঠিত হয় কাম্বোডিয়ান পিপলস পার্টি। ভিয়েতনামের সমর্থনপুষ্ট পিপলস পার্টির নেতা হিসেবে হুন সেন ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে কাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় থেকেই কাম্বোডিয়ার রাজনৈতিক শক্তি চারভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ঃ (১) হুন সেন পরিচালিত কাম্বোডিয়ান পিপল্‌স পার্টি, (২) প্রিন্স নরোদম সিহানুক সমর্থিত এবং তাঁর পুত্র প্রিন্স নরোদম রণরিদ্ধে পরিচালিত ফুনসিনপেক, (৩) খিউ শামফান লিবারেশন ফ্রন্ট এবং (৪) সনসান পরিচালিত বুদ্ধিস্ট লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই চারটি বিবদমান রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সমঝোতার লক্ষ্য নিয়ে প্রথম বেসরকারী আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৮ সালে জাকার্তায়। রাজনৈতিক সমঝোতার প্রশ্নে সেই আলোচনা ফলপ্রসূ না হলেও জাকার্তা বৈঠকেই স্থির হয় যে কাম্বোডিয়ার রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধান কল্পে দেশ থেকে ভিয়েতনামী সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। ১৯৮৯ সালের জুলাই এবং আগষ্ট মাসে প্রায় এক মাস ধরে কাম্বোডিয়া প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই সম্মেলনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক বৈঠক যাতে কার্যকর হয় সেজন্য ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়া থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়।

১৯৯০ সালের আগষ্ট মাস থেকে কাম্বোডিয়ায় শান্তি স্থাপনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শুরু হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ কাম্বোডিয়ায় সুপ্রিম ন্যাশনাল কাউন্সিল (এস এন সি) গঠন করে। এই কাউন্সিলে হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ, অর্থ এবং তথ্যমন্ত্রক ন্যস্ত হয়। কাউন্সিলে সরকারের পক্ষ থেকে ৬ জন এবং খামের বাহিনীর পক্ষ থেকে ২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রথম পর্যায়ে কাউন্সিলের মধ্যে মতবিরোধ এত তীব্র আকারে দেখা দেয় যে, কাউন্সিল কোন চেয়ারম্যান নির্বাচন পর্যন্ত করতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য

পরবর্তী কালে প্রিন্স নরোদম সিহানুক এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কাউন্সিল তাঁকেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পদে নিযুক্ত করে। কাম্বোডিয়ার শান্তি প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কাম্বোডিয়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের তদারকিতে নির্বাচন করতে হবে। গঠিত হয় ইউ এন ট্রান্সিশনাল অথরিটি ইন কাম্বোডিয়া। জাপানের ইয়ামুসি আকাসি এই অথরিটিব প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এক বছর পরে ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়। সেই পদ্ধতির ভিত্তিতেই ২৩ থেকে ২৮ শে মে সেখানে গণপরিষদের নির্বাচন হলো।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাম্বোডিয়ায় গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সব থেকে আনন্দের কথা, যে খামের রুজ বাহিনী গত ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে গেরিলা যুদ্ধের লাইন গ্রহণ করে চলেছিল সেই খামের রুজ সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন পরিত্যাগ করেছে। খামের রুজ নেতা খিউ শামফান নমপেনে ফিরে এসেছেন এবং রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেই সদর দপ্তর স্থাপন করেছেন। সরকারের কাছে অঙ্গীকার করেছেন গণতান্ত্রিক পথে চলার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও জনগণের কাছে অঙ্গীকার করেছে যত দ্রুত সম্ভব কাম্বোডিয়ার নতুন সংবিধান প্রণীত হবে, দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রক্রিয়া যদি সফল হয় তবে রক্তাক্ত কাম্বোডিয়ায় আবার যথার্থ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

দক্ষিণ কোরিয়া

"তাকছায়ে তাদো" (স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক) ধ্বনি তুলে দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণ যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তা নিঃসন্দেহে সে দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকতম। প্রথম দিকে এই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল ছাত্ররা, পরে দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ এমনকি উচ্চমধ্যবিত্তরা পর্যন্ত এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। গণমতের তীব্র চাপের মুখে পড়ে স্বৈরতন্ত্রী সরকারকে ইতিমধ্যেই কিছুটা পিছু হঠতে হয়েছে।

১৯৮০ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পথে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন সে দেশের বর্তমানে রাষ্ট্রপতি চুন দু হোয়ান। দক্ষিণ কোরিয়ার চলে আসা স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুন দু হোয়ান কোন ব্যতিক্রম নন, তিনিও একই ব্যবস্থা বহাল রাখেন। এ যাবৎ কখনো কোন আন্দোলনের মুখে তিনি পড়েন কি এমন নয়, তবে সেই সব বিক্ষোভ ততটা ব্যাপক না হওয়ার ফলে একনায়কতন্ত্রী সরকার তা দমন করে। কিন্তু, পরবর্তী পর্যায়ে যা ঘটতে শুরু করে তার চরিত্র কিছুটা ভিন্ন।

প্রথমত পুলিস হেফাজতে জনৈক ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পথে নামে দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্ররা। প্রথম দিকে দাঙ্গাদমনকারী পুলিস পাঠিয়ে সেই আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু, ক্রমশই বেশী বেশী পরিমাণে ছাত্ররা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে এবং একরাতে ৮০ জন দাঙ্গা পুলিস রুটিনমাফিক ছাত্রদের সভার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সহসা আবিষ্কার করে যে তাদের ঘিরে ফেলেছে হাজার হাজার প্রতিবাদী ছাত্র। ভয়ে তারা ঢাল ও লাঠি ফেলে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে ও ছাত্রদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা পর্যন্ত করে।

আন্দোলন তার দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছে যায় স্বৈরাচারী শাসক চুন দু হোয়ান-এর একটি হঠকারী ও অগণতান্ত্রিক ঘোষণার ফলে। চুন দু হোয়ান ঘোষণা করেন যে ১৯৮৮ সালে অলিম্পিক শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নটি বিবেচিত হবে না। রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হিসাবে তিনি রোহ-তায়ে উ-র নামও ঘোষণা করেন। এবং এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে তিনি "গণতন্ত্রের পথে এক বিরাট অগ্রগতি" আখ্যা দেন।

এখন, দক্ষিণ কোরিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই "গণতন্ত্রের পথে এক বিরাট অগ্রগতি" কথাটির কি মানে তা একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। প্রথমত, দেশের মানুষের ভোটে সরাসরি এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন না। এ জন্য তৈরী হয়েছে "ইলেকটোরাল কলেজ"। দ্বিতীয়ত, এই ইলেকটোরাল কলেজে যারা আছেন তাদেব প্রায় প্রত্যেকেই সরকারের সমর্থক। সংসদ শব্দটার কোন বালাই সেখানে নেই। তৃতীয়ত, প্রার্থী হিসাবে বাছা হয়েছিল একটাই নাম—রোহ্-তায়ে উ। এই রোহ্-তায়ে উ ১৯৭৫ সালে কোরিয়ার মিলিটারি একাডেমিতে চুন দু হোয়ানের সহপাঠী ছিলেন। যখন চুন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেন তখন প্রথম যে ক'জন সেনানায়ক তাকে সমর্থন করেন তার মধ্যে একজন হচ্ছেন রোহ্-তায়ে উ। সুতরাং একথাটা ভেবে নেওয়া অসঙ্গত হবে না যে দক্ষিণ কোরিয়ায় যেহেতু বিগত চারজন শাসকই সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে হয় প্রাণ নয় ক্ষমতা অথবা দুই-ই হারিয়েছেন সেহেতু চুন দু হোয়ান তার প্রাণ ও ক্ষমতা দুই-ই বাঁচাবার জন্য এমন একজনকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য বেছে নিলেন যাকে তিনি আক্ষরিকভাবে সর্ব অর্থেই বিশ্বাস করতে পারেন। যার আড়ালে বসে দেশ শাসন করতে চুন দু হোয়ানের কোন অসুবিধাই হবে না।

স্বৈরাচারী শাসকরা জনগণকে বোকা ভেবে প্রায়ই সন্তুষ্ট থাকেন, কিন্তু, ইতিহাসের শিক্ষা হলো, জনগণ কখনই বোকা নন। ইতিহাসের এই শিক্ষাটা এখন চুন দু হোয়ান ঠেকে শিখেছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত এই ঘোষণার পর দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ছাত্রদের আন্দোলন তো চলছিলই, পরে তার সঙ্গে যোগ দিলেন সমস্ত স্তরের মানুষ। তাদের প্রত্যেকের একটাই দাবী, দক্ষিণ কোরিয়ার একজন ছাত্রনেতার ভাষায় তা হলো—"কোরিয়ার জনগণ চান কোরিয়ার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি।"

আন্দোলন ক্রমশই আরো বেশী বেশী করে ব্যাপক ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে। তাতে যোগ দিতে শুরু করে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মীয় সংগঠনগুলিও। পথে নেমে পড়েন এমনকি গৃহবধূরাও। শেষাবধি দেখা যায় যে এক ধরনের বামপন্থী চরিত্র পেতে চলেছে এই আন্দোলন। দুই কোরিয়ার মিলনের প্রশ্নটিও উঠতে শুরু করে।

এইবার টনক নড়ে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। দক্ষিণ কোরিয়ার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ আপাতত ৪৩০ কোটি ডলার যার সিংহভাগটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ধার। সেই ঋণের জোরে মার্কিন প্রশাসন দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের উপর নানান প্রভাব খাটায়। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি। বর্তমান গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন যদি একবার সম্পূর্ণত বামপন্থী চরিত্র পেয়ে যায় তবে মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে তার চেয়ে দুর্ঘটনা আর কিছু হতে পারে না।

তাই, তড়িঘড়ি অবস্থা সামাল দেবার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি চুন দু হোয়ানকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি বিরোধী নেতাদের সঙ্গে হোয়ানকে কথা বলার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। এছাড়া পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক সহকারী

সচিব গ্যাস্টন সিগুরকেও সিওলে পাঠানো হয়েছিল। সিগুরও হোয়ানের সঙ্গে আলোচনা করেন, বিরোধী নেতাদের সঙ্গেও তার বৈঠক হয়। এরপরে চুন দু হোয়ান কিছুটা মাথা নোয়ান। ইতিমধ্যেই ২১০০ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মুক্তি দেওয়াও হয়েছে কিম দায়ে জুঙ প্রমুখ বিরোধী নেতাদের। সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হযেছে। অবশ্য, কোন বামপন্থী কর্মীকে মুক্তি দেওয়া হয়নি বা হবেও না।

এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার স্বৈরতন্ত্রী সরকার আন্দোলনের বামপন্থী ঝোঁককে ঠেকাতে চেষ্টা করেন। বামপন্থাকে তারা এতদূর ভয় পান যে এর সংক্রমণ রোধ করার জন্য বিরোধীদের প্রধান দাবী—সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টিও চুন দু হোয়ান মেনে নিয়েছেন।

প্রধান বিরোধী নেতারাও এই বামপন্থার প্রশ্নে মার্কিন প্রশাসন বা স্বৈরতন্ত্রী হোয়ান সরকারের সঙ্গে একমত দেখা যায়। কেননা, বামপন্থী কর্মীদের মুক্তির জন্য এরা কেউ কিছুই করেন নি। বরং, বামপন্থী কর্মীরা যখন জেলে পচছেন তখন কিস ইয়ং সাম বা কিম দায়ে জুঙ প্রভৃতি বিরোধী নেতারা সরকারের সঙ্গে আপস আলোচনা চালান।

ফিলিপিনস

শেষপর্যন্ত স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিভূ প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্ড মার্কোস অপসৃত হন। নতুন প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হন ১৯৮৩ সালে মার্কোস প্রশাসনের ষড়যন্ত্রে নিহত বিরোধী রাজনীতিবিদ বেনিগ্‌নো আকিনোর ৫৩ বছর বয়স্কা বিধবা পত্নী কোরাজন আকিনো। মার্কোস-প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে যে নির্বাচন হয়েছিল, একটি পরীক্ষার হিসেবে শতকরা প্রায় ৪৬ থেকে ৫৪ ভাগ ভোটই ছিল প্রতারণাপূর্ণ। নির্বাচন এমন প্রহসনমূলক হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদ মার্কোসকেই প্রেসিডন্ট পদে বিজয়ী বলে ঘোষণা করে। কিন্তু বিপুল গণ-সমর্থনের জোয়ারের ফলে সৈন্যবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংযুক্ত হওয়ার ফলে মার্কোসকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু রেখে গেলেন এক সাংবিধানিক প্রশ্ন ঃ জাতীয় পরিষদের ঘোষণা বাতিল না হওয়ার ফলে আকিনো কি আইনানুগ প্রেসিডেন্ট? শপথ নেওয়ার সময় আকিনো বললেন, "আমি ফিলিপিনস্-এর জনগণের নামে শপথ গ্রহণ করছি।" প্রতিরক্ষামন্ত্রী এন্‌রিল বলেন, "সংবিধান মার্কোসের পক্ষে, কিন্তু জনগণ আমাদের সাথে।"

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ফিলিপিনস্ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল ফিলিপিনস্-এর আর্থনীতিক কাঠামো, বহির্বাণিজ্য বলে কিছু ছিল না, ওয়ারশ-র পর ম্যানিলাই ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কবলে সবচেয়ে বিধ্বস্ত নগরী। এই অবস্থায় ম্যানুয়েল রোক্সাস প্রেসিডেন্ট হয়ে স্বাধীন ফিলিপিনস্-এর হাল ধরেছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিনস্-কে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও তার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে ফিলিপিনস্ প্রশাসনের পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না, এখনও তা সম্ভব নয়। বিশ বছর রোক্সাস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এর মধ্যে ফিলিপিনস্-এর রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হলেন ফার্দিনান্ড মার্কোস। কমিউনিস্ট প্রভাবিত হাক্-বিদ্রোহ দমনে তার ভূমিকা এবং ফিলিপিনস্-এর আর্থনীতিক উন্নয়নে তার প্রচেষ্টা দেশের জনগণের কাছে মার্কোস-এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলে

ধরল। বীর-পূজায় অভ্যস্ত ফিলিপিনস্-এর জনগণ ১৯৬৬ সালে মার্কোসকে প্রেসিডেন্ট রূপে বরণ করে নিলেন।

কিন্তু মার্কোস-এর বিশ বছরের প্রশাসনে ফিলিপিনস্-এর জনগণের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। ১৪ বছর আগে সামরিক প্রশাসন জারি করে জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপহরণ করা হয়। নির্বিচারে তুচ্ছ অপরাধের জন্যও আটক করা হয়। ফিলিপিনস্-এর একটি ধর্মীয় সংগঠনের হিসেব থেকে দেখা যায়, ১৯৮৫ সালে ৬০২ জনকে সরিয়ে (হত্যা?) ফেলা হয়েছে, ২৭৬ জনকে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১৩২৬টি ক্ষেত্রে চরম নির্যাতন করা হয়েছে। মার্কোস-এর কারাগারে নির্যাতনের মর্মন্তুদ কাহিনী ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকাশ হচ্ছে মার্কোস-দম্পতির বিলাসবহুল জীবনযাপনের অনেক কাহিনী। মার্কোস-এর আমলে এই সমস্ত নির্যাতন ও হত্যার তদন্তের জন্য আকিনো-সরকার একটি কমিশন গঠনের কথা ভাবছেন। 'হেবিয়াস-কর্পাস' আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বার্থে। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান জোস্‌মারিয়া সিসন্ ১৯৭৭ সাল থেকে কারাগারে আছেন। বিশেষ বিবেচনা না করে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মার্কোস-এর স্বৈরাচারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত-ক্ষোভের চরম প্রকাশ হয় ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাসে, যখন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আকিনোর স্বামী তিন বছর নির্বাসনে থাকার পর দেশে ফিরে আসেন এবং বিমানবন্দরেই নিহত হন। ফিলিপিনস্-এর সমাজব্যবস্থায় চার্চ এবং সামরিক বাহিনীর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের প্রায় ৮৫ শতাংশ রোমান ক্যাথলিক, তাই ম্যানিলোর আর্চবিশপ জেইস্ কার্ডিনাল সিন্ অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তিনি প্রকাশ্যে মার্কোস-এর বিরুদ্ধে বিরোধী নেতাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

১৯৭৭ সাল থেকে মার্কোস্ সরকারের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই-এ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী জোয়ান এন্‌রিল-এর প্রভাব কমতে শুরু করে। তখন থেকেই সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহের সূচনা হয়। এন্‌রিল বুঝতে পেরেছিলেন যে, জেনারেল ভের সঙ্গে ক্ষমতার লড়াই-এ তিনি হঠে যাচ্ছেন, তাই আত্মরক্ষার্থে 'সেনাবাহিনীর সংস্কার আন্দোলন' নামে একটি সংস্থার সৃষ্টি করেন। এন্‌রিল পরবর্তকালে স্বীকার করছেন যে, এই সংস্থার মাধ্যমেই তিনি গোপনে মার্কোস-বিরোধী শক্তিকে সংগঠিত করেছিলেন।

নাটকীয় ঘটনার শুরু হয় যখন মার্কোস্ ঘোষণা করেন যে, তাঁর পিছনে যে গণ-সমর্থন রয়েছে তা মার্কিন প্রশাসনকে বোঝাবার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বিশেষ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আকিনো ঘোষণা করেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মার্কোসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আর্চবিশপ সিন্ প্রভাবশালী সেনেটের সালভাডোর লরেলকে বুঝিয়ে আকিনোর সমর্থনে রাজি করালেন। এরই মধ্যে এন্‌রিল ১০০ জন সুশিক্ষিত সৈনিক নিয়ে তাঁর সংস্কার আন্দোলন জোরদার করে তুললেন। কখনও মার্কোসকে বুঝতে দেওয়া হয়নি যে এই সংস্কার আন্দোলন তারই বিরুদ্ধে। নির্বাচনের সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রূপে মার্কোসের সমর্থনে প্রচার চালিয়েছেন এন্‌রিল, কিন্তু তাঁর সংস্কার আন্দোলন সংস্থা প্রচার করতে শুরু করল এই বলে যে, ভোটপর্বে যেন সততা বজায় থাকে। এর ফলে

সেনাবাহিনীর যে অংশ জেনারেল ভের-এব সমর্থক, তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। সংস্কাবপন্থীরাও ভোট গণনায় জুলুমবাজি এবং অগ্রণী বিরোধী নেতা এভেলিও জেভিয়াব-এব হত্যায প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পরেই সংস্কাবপন্থীরা মার্কোসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু ভোট গণনায় ব্যাপক কাবচুপি হয। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত ২০ জনের একটি পরিদর্শক দলের অন্যতম সেনেটব বিচার্ড লুগাব মন্তব্য কবেন যে, প্রেসিডেন্টেব প্রযোজনের ভিত্তিতে ভোট গণনা নির্ধাবিত হয়েছে। স্বভাবতই ঘটনার গতি দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলে। জাতীয় পরিষদ মার্কোসকে প্রেসিডেন্ট বূপে ঘোষণা করে, কয়েকদিন পবে সবকার থেকে এন্‌বিলের পদত্যাগ ও জেনারেল রামোশ-এব সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া ঘটনা প্রবাহকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। আর্চবিশপ সিন্ জনগণের কাছে আবেদন করেন, এন্‌রিল ও রামোশের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য। ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ পর্যায়ে এন্‌রিল ও রামোশের বোঝাপড়াই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয।

ফিলিপিনস্ কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক শাখা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। আকিনো যাদেব মন্ত্রিমণ্ডলীতে স্থান দিয়েছেন ফ্রন্ট তাদের সমালোচনা করেছে, কিন্তু প্রেস বিবৃতি দিয়ে স্বীকার করেছে যে, জাতীয় স্বাধীনতা ও যথার্থ গণতন্ত্রের জন্য ফিলিপিনস্-এর জনগণের সংগ্রামে মার্কোসেব বিদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়।

কিন্তু যে সমস্ত কমিউনিস্ট গেবিলা নয়া গণ-বাহিনীতে রয়েছে তাদের পক্ষে, সাময়িক হলেও, আকিনোর বিজয় একটি আঘাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৩ সাল থেকে শতকরা কুড়ি হারে এই বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৬,৫০০ থেকে ২০,০০০ হাজারের মধ্যে। নির্বাচনী প্রচারের সময় অবশ্য আকিনো বলেছিলেন যে, নয়া গণ-বাহিনীর সামরিক সমাধান করতে গিয়ে মার্কোস এই বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, দারিদ্র্য ও অসন্তোষ দূর করতে পারলেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আকিনো ৬ মাসেব জন্য অস্ত্রসংবরণের ঘোষণা করেছেন বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে। ভাইস্ প্রেসিডেন্ট লবেল বলেন, যদি একটি বিশ্বাসযোগ্য সরকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করা যায় ও বিদ্রোহীদের প্রতি ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহলে পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধরত শতকবা ৯০ জন সৈনিক অস্ত্রসংবরণ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এই মতকে অবাস্তব বলে বাতিল কবে দিয়েছে। একজন পশ্চিমী কূটনীতিকের মতে আকিনো সরকার কমিউনিস্টদের কিছুটা দুর্বল করে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু সব কিছুই নির্ভর করবে এই নতুন সরকার আর্থিক সমস্যাব সমাধান কতটা করতে পারলেন তার উপর। যদি না পারেন, তাহলে বিদ্রোহী নয়া গণ-বাহিনীর সংখ্যা বেড়েই যাবে।

আকিনোর মতে ফিলিপিনস্-এর জনগণ কোনো দমনমূলক সরকারকে বরদাস্ত করবেন না, তা সেটা বাম বা ডান যে মতাদর্শেরই হোক না কেন। এন্‌রিল মনে করেন, জনগণ চায় একজন মধ্যপন্থী, সংস্কারমুক্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ সরকার পরিচালনা করুক। মন্ত্রিপরিষদ্ গঠনের ব্যাপারে আকিনো এই মধ্যপন্থী মানসিকতার নিদর্শন রেখেছেন। অবশ্য বামপন্থীদের কাছে এই সরকার বুর্জোয়া সরকার রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

মার্কোস-প্রশাসন ফিলিপিনস্-এর আর্থিক কাঠামো বিপর্যস্ত প্রায়। যথেচ্ছভাবে তিনি টাকা খরচ করেছেন বিলাসবহুল প্রকল্পে, তিনশ' সরকারী কর্পোরেশনে তিনি ব্যয় করেছেন অপরিকল্পিতভাবে। বন্ধু এবং আত্মীয়দের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় তিনি বিশেষ নজর

রাখতেন। তাদের কোম্পানিগুলির যদি দূরবস্থা দেখা দিত তাহলে সরকারী সাহায্য তিনি দরাজভাবে এগিয়ে দিতেন। ফিলিপিনস্-এ মার্কোস-এর প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করে বলা হতো 'আত্মিক ধনতন্ত্রবাদ'। ১৯৮৩ সালে আর্থিক অবস্থা এত খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা ঘোষণা করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে আকিনো সরকার সততা ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। উন্নয়নের একটি অন্যতম শর্ত হলো আত্মবিশ্বাস, তা আবার ফিলিপিনস্‌রা ফিরে পেয়েছে। ম্যানিলার শেয়ার বাজারে তেজীভাব দেখা দেয়। শেয়ারের দাম প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বেড়ে যায়। নিউ ইয়র্ক শহরের শেয়ার বাজারেও ফিলিপিনস্ টেলিফোন কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে যায়।

পশ্চিম এশিয়া

১৯৮২ সালের ৪ঠা জুন বিশ্ব জনমত অগ্রাহ্য করে ইজরায়েলী হানাদারেরা লেবানন আক্রমণ করার ফলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত লেবানন আর একটি মারাত্মক যুদ্ধে নিমজ্জিত হয়। দু'মাসের বেশি সময় ধরে সেখানে যুদ্ধ চলে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতিরেকে বিশ্বের প্রতিটি দেশ এই ইজরায়েলী হানার নিন্দা করেছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অবিলম্বে লেবাননে ইজরায়েলী সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে প্রস্তাব আছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রয়োগ করে সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

নব পর্যায়ে এই ইজরায়েলী হানার পিছনে কি অজুহাত খাড়া করা হয়? ১৯৮২ সালের ২রা জুন লন্ডনে ইজরায়েলী রাষ্ট্রদূত নিহত হন। ইজরায়েল মনগড়া অভিযোগ করে যে, প্যালেস্তাইনীরা ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছে। তারপরই বেগিন প্রশাসন লেবাননের অভ্যন্তরে আক্রমণাত্মক অভিযান সংগঠিত করে। ইজরায়েলের বোমারু বিমানগুলি উপর্যোপরি দক্ষিণ লেবাননে বোমা বর্ষণ করে। বেছে বেছে বাসগৃহের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের মধ্যে যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিল এই পর্যায়ে ইজরায়েল লেবানন আক্রমণ করে এক বছরের মধ্যে তিন বার যুদ্ধবিরতি চুক্তি লংঘন করে। ১৯৮২ সালে আরো দু'বার ইজরায়েল লেবানন আক্রমণ করে।

লেবানন আক্রমণের কয়েকমাস পূর্বে ইজরায়েল সিনাই থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে। ইজরায়েল বিশ্বজনমতের কাছে এই ধারণা সৃষ্টি করতে চায় যে, সে আবাব দুনিয়ার সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চায়। কিন্তু এটা ছিল নিছক প্রতারণা। সিনাই অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সাথে সাথে ইজরায়েল জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর, গাজা এবং গোলান হাইটসে বেশি বেশি সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করতে থাকে। অধিকৃত এলাকায় আরব জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া আন্দোলনকে প্রচণ্ড দমন-পীড়নের রথচক্রে পিষ্ট করার কৌশল গ্রহণ করে।

লেবাননের অভ্যন্তরে এই ইজরায়েলী হানা উল্লেখযোগ্য, কারণ ১৯৬৭ সালের পরে ইজরায়েলের ঘৃণ্যতম আক্রমণ। এর পূর্বে লেবাননের অভ্যন্তরে ইজরায়েলের সর্ববৃহৎ আক্রমণ সংঘটিত হয় ১৯৭৮ সালের ১৪ই মার্চ। তখনও ইজরায়েল বেইরুট অবরোধ করে এবং ৪০ হাজারের বেশী নরনারীকে হত্যা করে। কিন্তু ইজরায়েলী আক্রমন এমন ঘৃন্য রূপ

গ্রহণ করে নি। ১৯৮২ সালেব ৪ঠা জুনেব ইজরায়েলী হানার পিছনে যে মার্কিন যুক্তরষ্ট্রের সাহায্য, সহযোগিতা ও মদত ছিল সেটাও সুস্পষ্ট। লেবানন আক্রমণ করাব কয়েক দিন পূর্বে ইজরায়েলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অ্যাবিয়েল স্যারন ওয়াশিংটন যান। সেখানে তিনি রেগান, হেগ, উইবারগারের সাথে গভীর শলাপরামর্শ করেন। এরপর ইজরায়েলী বাহিনী মার্কিনী পরিকল্পনা মতই লেবানন আক্রমণ করে। লেবাননে অবস্থিত প্যালেস্তাইনী শিবিরগুলি ধ্বংস করা এবং লেবাননের বুক থেকে প্যালেস্তাইনীদের চিরতরে বিতাড়ন করাই যে এই আক্রমণের লক্ষ্য তাও এখন পরিষ্কার হযে যায়। আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দশ দিনের মধ্যে ইজরায়েলী বাহিনী বেইরুট বিমান বন্দর ঘিরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সিরিয়া-লেবাননের মধ্যেকার যোগাযোগ রক্ষাকারী একমাত্র সড়কটি দখল করে নেয়—যাতে কবে সিরিয়ার সেনাবাহিনী প্যালেস্তাইনীদের সাহায্যে এগিয়ে না আসতে পারে।

মার্কিন পরিকল্পনামাফিক যেমন ইজরায়েলী সেনাবাহিনীকে রণক্ষেত্রে সজ্জিত করা হয় ঠিক তেমনি বেগিন প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শমতই কূটনৈতিক অভিযান চালাতে থাকে। যুদ্ধ চলার তিন সপ্তাহ পরে সমগ্র প্যালেস্তাইনী মুক্তি যোদ্ধাদের অবরুদ্ধ করে রেখে ইজরায়েল সরকার ফিলিপ হাবিব নামে এক জন 'শান্তির দূত' কে পি এল ও নেতাদের কাছে পাঠায়। এই তথাকথিত শান্তির দূত পি এল ও নেতাদের পরামর্শ দেন, প্যালেস্তাইন মুক্তি সংস্থার এবং বিপ্লবী সরকারের সদর দপ্তর যেন লেবানন থেকে স্থানান্তর করে মিশরে নিয়ে যাওয়া হয়। মিশর সরকারও এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। প্যালেস্তাইন মুক্তি সংস্থা যেন তার বিপ্লবী চরিত্রে পরিবর্তন ঘটায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খপ্পরে পড়ে। পি এল ও নেতারা এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্যালেস্তাইন মুক্তি সংস্থার একজন প্রথম সারির নেতা ঘোষণা করেছেন, প্যালেস্তাইন মুক্তি সংস্থা কোন অবস্থাতেই অস্ত্রত্যাগ করবে না বা লেবানন ত্যাগ করবে না। ইজরায়েলী চাপের কাছে প্যালেস্তাইনীরা কোন অবস্থাতেই নতি স্বীকার করবেন না। তবে ব্যাপকহারে বোমা বর্ষণ করে ইজরায়েলী সেনারা যেভাবে লেবাননে নিরীহ নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস করে তার হাত থেকে নিরীহ নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য যে আন্তর্জাতিক প্রয়াস চালায় তাকে সর্বতোভাবে সফল করে তোলার জন্য পি এল ও প্রয়াস চালায়।

পি এল ও'র রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান ফারুক অল কাডুগু বলেছেন : প্যালেস্তাইনীদের নিরস্ত্রীকরণ করার কথা বলা অর্থহীন। এতে প্যালেস্তাইনীদের উদ্বেগেরও কোন কারণ নেই। কেননা পি এল ও'-র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কারো অজানা নয়। সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হল : প্যালেস্তাইনীদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধার করা। এই লক্ষ্যসাধনে পি এল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর এই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হলো লেবাননকে ইজরায়েলী কবলমুক্ত করা।

ইজরায়েলের এই বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এমন কি খোদ ইজরায়েলের জনগণও ইজরায়েল সরকারের বর্বরোচিত আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার। ১৯৮২ সালের ৩রা জুলাই ইজরায়েলের রাজধানী তেলআভিভ-এ লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ হয় লেবাননে ইজরায়েলী হানার বিরুদ্ধে। মিছিলকারীদের প্রধান প্রধান দাবি ছিল : লেবানন যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে অবিলম্বে লেবানন থেকে ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে; প্যালেস্তাইনের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে হবে এবং ইজরায়েলের

প্রধানমন্ত্রী বেগিন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্যারনকে পদত্যাগ কবতে হবে। স্যারনকে নরঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করে একটি প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিলঃ স্যারন—তুমি আমাদের পুত্রদের হত্যা করছ। সমাবেশ থেকে অবিলম্বে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের আহ্বান জনানো হয়। পি এল ও'র সাহায্যে চীন সরকার ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের জরুরী সাহায্য পি এল ওকে পাঠায়। হাজার হাজার গ্রীক জনগণ পি এল ও'র সাহায্যে রক্ত সংগ্রহ করে।

সমগ্র বিশ্বজনমত যখন প্যালেস্তাইন মুক্তি সংস্থার পক্ষে তখন এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আরব দুনিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে পি এল ও'র পাশে দাঁড়াতে পারেনি। মুখ্যে অবশ্য প্রতিটি আরব দেশই ইজরায়েলী আক্রমণের নিন্দা করেছে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে ইজরায়েলী আক্রমণের মোকাবিলা করার কোন উদ্যাগ আরব দেশগুলির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। সেটা যদি করা হত তবে ইজরায়েলের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হত।

উপসাগরীয় যুদ্ধ

২রা আগষ্ট ১৯৯০ থেকে ১৫ই জানুয়ারি ১৯৯১ — দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ মাসের প্রস্তাব, পালটা প্রস্তাব, বিতর্ক, বৈঠকের অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সময় অনুসারে ১৭ই জানুয়ারি ভোর হবার আগে শুরু হলো উপসাগরীয় যুদ্ধ। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ বলেছিলেন, তিনদিনের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ করে নেবেন তিনি। বাস্তবে তা ঘটেনি।

অথচ, উপসাগরীয় যুদ্ধ এড়ানো অসম্ভব ছিল না। ইরাকের কুয়েত দখল নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। বহুদিন থেকেই কুয়েতের বিরুদ্ধে ভূগর্ভস্থ তেল চুরির অভিযোগ আনছিল ইরাক। তাছাড়া দুটি দ্বীপ ও একটি তৈলক্ষেত্র নিয়েও ইরাক-কুয়েত বিরোধ দীর্ঘদিনের। এই তিনটিকে ইরাকের অংশ বলে দাবি করে আসছিল বাগদাদ। ইরাকী দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি কেউ।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির মানচিত্র এঁকে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা — বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। সীমান্ত রেখা সুনির্দিষ্ট করতে কোন একটি দেশের স্বার্থ, তার সুবিধা-অসুবিধা, জাতিসত্ত্বার প্রশ্ন কিছুই দেখা হয় নি। সাম্রাজবাদীরা নিজেদের ইচ্ছামতো মানচিত্রের উপর কাটাকুটি করেছে এবং খামখেয়ালীর এই মোটা দাগগুলিকেই নিজেদের 'ইচ্ছাপত্র' হিসাবে আরব দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

একই ঘটনা ঘটেছে প্যালেস্তাইনেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আরবভূমির উপর খাড়া করা হয়েছে ইজরায়েলকে। আরব প্যালেস্তিনীয়দের আশা-আকাঙ্খার কথা, স্বভূমি-স্বদেশের কথা বিচার বিবেচনা করা হয় নি। পরবর্তীকালে ইজরায়েল তার সীমানার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। অধিকৃত গাজা স্ট্রিপ, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে প্রতিদিন প্যালেস্তিনীয়দের গুলি করে মারে ইজরায়েলী সেনারা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ মাঝে মধ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করেই দায়মুক্ত হয়। ইজরায়েলকে অধিকৃত অঞ্চল ছাড়তে চরম সময়সীমা দেওয়া হয় নি। প্যালেস্তিনীয় জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সবসময় বাধা দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি।

অথচ এরাই কুয়েতের সার্বভৌমত্বের জন্য যুদ্ধ শুরু করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেনি। ১৯৯১ সালের ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে ইরাককে কুয়েত ছাড়ার জন্য চরম সময়সীমা দিয়েছিল

রাষ্ট্রসঙ্ঘেব নিরাপত্তা পরিষদ। বলা হয়, এই চরম সময়সীমা না মানাব জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বহুদেশীয় শক্তিজোট ইরাক আক্রমণ করে। ঘোষিত উদ্দেশ্য, কুয়েতকে মুক্ত করা। উল্লেখ্য, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচ দেশের মধ্যে দুটি দেশ — সোভিযেত ইউনিয়ন ও চীন এই যুদ্ধে অংশ নেয় নি। বরং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা চলিয়ে যায়। ফ্রান্সও একেবারে শেষ মুহূর্তে, ফরাসী শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পরে যুদ্ধের শরিক হয়। তাও যুদ্ধের প্রথম সাতদিন ইরাকের উপর বোমা বর্ষণ করেনি ফরাসী বিমানবহর, কুয়েতের উপর বোমা বর্ষণ সীমিত রেখেছিল তারা। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচ দেশের মধ্যে দুটি দেশ যুদ্ধে যোগ দেয় নি, একটি দেশ দ্বিধার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন আসে বাকি দুটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনের এতো দায় কেন?

তা কি শুধু একটি দেশকে অপর একটি দেশের দখলদারি থেকে মুক্ত করার সদিচ্ছায়? দূর অতীতের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, সাম্প্রতিককালেও এমন সাম্রাজ্যবাদী সদিচ্ছা দেখা যায় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের দাবিয়ে রাখতে সেখানকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেত শাসকদের বড় খুঁটি ইঙ্গ মার্কিন মদত। পানামায়, গ্রেনাদায় সেনা পাঠিয়ে সরকারের পতন ঘটিয়েছে আমেরিকা। প্রমাণ হয়ে গেছে, চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো এবং রাষ্ট্রপতি সাভাদোর আলেন্দেকে হত্যার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল সি আই এ-র সদর দপ্তরেই। কিউবার বিরুদ্ধে প্রতিদিনই চলছে মার্কিন প্ররোচনা। নিকারাগুয়ার নির্বাচনে সরাসরি মার্কিনী মদত ও ডলার ঢালা হয়েছে দানিয়েল ওরতেগাকে হঠাতে। গ্রেনাদা, পানামা, কিউবা, নিকারাগুয়া সর্বত্রই ঐ দেশগুলির সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কোন শাস্তি হয় নি তার।

তাই এটা তর্কাতীত যে, কুয়েতের সার্বভৌমত্ব নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যাথা ছিল না। তাদের তেল-স্বার্থ বিপন্ন হয়েছে বলেই এই আগ্রাসী অভিযান, কেবল এটুকু বললে মূল্যায়নে ঘাটতি থেকে যায়। ইরাক ও কুয়েত থেকে পশ্চিমী দুনিয়ার তেল আমদানির পরিমাণ কখনোই খুব বেশি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ইরাকের কুয়েত দখলের পর পশ্চিমী বহুজাতিক তেল কর্পোরেশনগুলির মজুত তেলের ভাণ্ডারে টান পড়েনি। সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে মুনাফা বাড়তে তারা তেলের দাম বাড়িয়েছে।

আসলে তেলের চেয়ে আরো বড় স্বার্থ সুরক্ষিত করতেই যুদ্ধে নেমেছে আমেরিকা, ব্রিটেন। এই দুটি দেশেই চলছিল অর্থনৈতিক মন্দা। সঙ্কট ক্রমশই গভীর হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের চিরায়ত নিয়ম অনুসারেই অর্থনীতিকে তেজী করতে একটা যুদ্ধের দরকার হয়ে পড়েছিল তাদের। ইরাকের কুয়েত দখল তাদের কাছে এনে দেয় সেই সুযোগ। ইউরোপ উত্তেজনা হ্রাস বিশেষ করে মার্কিনী অস্ত্র ব্যবসায়ী ও অস্ত্র নির্মাতাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করছিল। বাণিজ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একদিকে জাপান, অন্যদিকে জার্মানির সঙ্গে প্রতিয়োগিতায় হঠতে হচ্ছিল মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রশাসনের উপর চাপের মাত্রা ক্রমাগতই বাড়াচ্ছিল তারা। ব্রিটেনের শাসকদলে বিদ্রোহ ও মার্গারেট থ্যাচারের ইস্তফা, মার্কিন সিনেট নির্বাচনে শাসক রিপাবলিকান দলের ট্র্যাডিশন্যাল শক্ত ঘাঁটিগুলিতে পরাজয় এই সঙ্কটেরই ফলশ্রুতি। যে শত্রুর ভাবমূর্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তাদের অস্ত্র উৎপাদনে উৎসাহ যুগিয়েছে তাদের কাছে বিকল্প ছিল হয় একই সঙ্গে অসংখ্য আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরু করানো অথবা একটা বড় ধরনের যুদ্ধ।

উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরুর প্রথম সপ্তাহেই ইরাকের উপর যেভাবে বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ হয়েছে তা থেকেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ভাণ্ডারে মজুত অস্ত্রের পরিমাণ সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যায়।

তবে তেল, অস্ত্র, শিল্প অথবা অর্থনৈতিক সঙ্কটের চেয়ে আরো বড় কারণ হলো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মার্কিনী নীতি, বিশ্বের উপর মার্কিনী খবরদারি এবং বিশ্ব কর্তৃত্ববাদ জোরালো করা। ভাগ-বাঁটোয়ারা থেকে যাতে বঞ্চিত হতে না হয় তাই 'চিরাচরিত প্রভাবাধীন এলাকা' মধ্যপ্রাচ্যে 'হৃত গৌরব' ফিরিয়ে আনতে ছুটে এসেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। উপসাগরীয় যুদ্ধ আসলে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব কায়েমের যুদ্ধ। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বেফাঁস বলে ফেলেন, 'উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হলেও সেখানে থেকে যাবে ব্রিটেন। মার্কিনী নেতারা বলেন, তাদের ছত্রচ্ছায়ায় আরব দেশগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এহেন ঘোষণার পরিষ্কার অর্থ হলো, তুরস্ক, গ্রীসে শেষ হওয়া ন্যাটো সীমান্তের পর থেকে পাক-ভারত সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে একটি নতুন যুদ্ধজোট গড়ে তোলা।

দক্ষিণ আমেরিকা-ক্যারিবীয় উপসাগর অঞ্চলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'খিড়কির দরজা' বলে মনে করে। যে কোন তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরে সেখানে সেনা পাঠাতে কখনো দ্বিধা করেনি মার্কিন প্রশাসন। ইউরোপের দিকে তাকালে কী দেখি? ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা ভেঙে গেছে কিন্তু ন্যাটো অক্ষত থাকছে। অর্থাৎ, ইউরোপের উপর মার্কিনী কর্তৃত্ব বজায় থাকছে (যদিও সংযুক্ত জার্মানি ক্রমশই নিজের প্রভাব বাড়ানোর জন্য সক্রিয় হয়ে উঠছে)। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান আমেরিকার মিত্র। দিয়েগো গাসিয়ার ঘাঁটি থেকে আফ্রিকার একাংশসহ ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অঞ্চলে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে আমেরিকা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুরে আছে শক্তিশালী মার্কিন সেনা ঘাঁটি। অস্ট্রেলিয়া ইঙ্গমার্কিন নীতিরই অনুবর্তী। পূর্ব এশিয়ায় তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিনী কর্তৃত্ববাদের শৃঙ্খলে বন্দী। জাপানের ভূমিকা হলো সাহায্যকারী।

মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েল ছাড়া আর কোথাও ভালোভাবে পা রাখার জায়গা পায় নি আমেরিকা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যুদ্ধ বাধিয়ে আধিপত্য বিস্তারের কাজ হাসিল করতে চায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

যেটা অনেকেই ভুলে থাকতে চাইছিল, উপসাগরীয় যুদ্ধ সে কথাটাই আবার মনে করিয়ে দিল—বৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের দাঁত এখনো যথেষ্টই ধারালো।

যুদ্ধ পরবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থা

একমাসেরও বেশি সময় ধরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বোমাবর্ষণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী কুয়েতকে মুক্ত করার জন্য ১৯৯১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি কুয়েতে অবস্থিত ইরাকী বাহিনী এবং দক্ষিণ ইরাকের উপর স্থলপথে আক্রমণ শুরু করে। সামরিক দিক থেকে এই আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থতার দরুন ইরাক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ১২ দফা প্রস্তাব বিনা শর্তে মেনে নেয়। ১৯৯০ সালের আগষ্ট মাসে ইরাকে কর্তৃক কুয়েত আক্রমণ ও তা' দখলের পর নিরাপত্তা

পরিষদ এই ১২-দফা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ২৭শে ফেব্রুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এক টেলিভিশন বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, কুয়েতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, উপসাগরীয় যুদ্ধ কার্যত শেষ হয়েছে এবং মিত্রবাহিনী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবে। অবশেষে ছয় সপ্তাহব্যাপী বিমান আক্রমণ এবং একশো ঘণ্টার স্থলযুদ্ধের পর যুদ্ধ স্থগিত রাখা হয়।

সংঘর্ষ শেষ হওয়ামাত্র সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি উপসাগরীয় এলাকার ভবিষ্যত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কূটনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে দেন। উপসাগরীয় সঙ্কটের শুরুর সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, তার প্রধান লক্ষ্যগুলি হ'ল — কুয়েত থেকে ইরাকী বাহিনী প্রত্যাহার, কুয়েতের আইনসম্মত সরকারের পুনরুদ্ধার, উপসাগর অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চত করা।

পশ্চিমী ও বিশ্ব অর্থনীতিব পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ এই উপসাগরীয় অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য একটি নিরাপত্তা ব্যাবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমাজ চেষ্টা চালায়। কিছু আমেরিকাবাসী এ কাজের জন্য ন্যাটো (NATO) ধরনের সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। অনেকে আবার Conference on Security and Co-operation in Europe গোছের একটা কিছুর পক্ষপাতী ছিলেন, কেউ কেউ আবার বাগদাদ চুক্তির আদলে আঞ্চলিক কাঠামো তৈরির পক্ষে মত দেন। এদিকে আবার আরব দেশগুলি সর্ব-আরব আঞ্চলিব নিরাপত্তা কাঠামো গোছের একটা কিছুর উপর জোর দেন। ১৯৫০ সালের আরব যুক্ত প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং আরব লীগের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী পশ্চিমী ও অন্যান্য অ-আরব দেশকে বাদ দিয়ে একধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এরা মডেল করতে চান। অবশ্য ইরান ও তুরস্কের মত অ-আরব দেশদুটি উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধোত্তরকালে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে খুবই আগ্রহী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ যদি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায় তবে এই অঞ্চলের জটিল স্বভাবের জন্য তাদের কতকগুলি গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ন্যাটো ধরনের সংস্থা মানেই সেখানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা ও প্রাসঙ্গিক সংগঠন গড়ে তোলা। এর ফলে আরব দেশগুলির মার্কিন-বিরোধী অংশ সেখানে অতি সহজেই গুরুতর কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে এবং চরমপন্থীরা এতে উৎসাহিত হতে পারে। একটি শিথিল CSCE ধরনের সংস্থা আবার আক্রমণ মোকাবিলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আবার এসব পরিমণ্ডলের বাইরের সবাইকে বাদ দিলে আরবদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ বেধে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে অঞ্চলের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পরে। অন্যদিকে আবার এই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাইরের দেশকে নিলে আরবদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং কোন কোন রাষ্ট্রকে আধিপত্যশীল করে তুলতে পারে।

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুবই পরিষ্কার। উপসাগরীয় অঞ্চলের সহযোগিতায় পরিষদের ছয়টি দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সর্বোচ্চ প্রাধান্য পায় এবং এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থেকে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'ল নিরাপদে তৈল যাতায়ত ব্যবস্থার উপর এই দেশের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপসাগর অঞ্চল থেকে পর্যাক্রমে স্থলবাহিনী অপসারণের কথা ঘোষণা করলেও সঙ্গে সঙ্গে এমন ইঙ্গিত দিয়েছে তারা ঐ এলাকায় আরো শক্তিশালী বিমান ও নৌবাহিনী মোতায়েন করে।

উপসাগরীয় অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেবলমাত্র একটি নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন করাই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়নি। নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী দেশগুলি উপসাগরীর অঞ্চলে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার পরিকল্পনা ছিল। তারা চাইছিল ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির আর্থিক ফারাক থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান করতে, চায় কুয়েত ও ইরাকের মত যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের কাজে শামিল হতে এবং আরব-ইজরায়েল সমস্যার সমাধান করতে।

উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে ইরাক অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নরমপন্থী আরব দেশগুলির সঙ্গে ইজরায়েলের সম্পর্কের খানিকটা উন্নতি ঘটে ও এই কারণে পরিস্থিতি খানিকটা ইজরায়েলের অনুকূলে যায়। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সমস্যা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আ্যরো কঠোর করে এবং প্যালেস্তাইন মুক্তি সংস্থার সঙ্গে কোনরকম আলাপ-আলোচনায় বসবে না বলে ইঙ্গিত দেয়। কাজে কাজেই মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি আলোচনা নিয়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা আশু নিরসনের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

উপরন্তু, নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইরাকের কি ভূমিকা হবে সে বিষয়টিরও কোন মীমাংসা হয়নি। সামরিক বিজয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বর্তমান ইরাকী সরকারকে ফেলে দিতে চাইছে। দক্ষিন ইরাকের অনেকগুলি শহরে ইতিমধ্যে সরকার-বিরোধী দাঙ্গা ঘটে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ইরাক এক গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়, এরই হাত ধরে এসেছে জনগোষ্ঠিগত সমস্যা এবং শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ।

সর্বদাই নানা জটিল সমস্যার সূতিকাগার এই মধ্যপ্রাচ্য উপসাগরীয় যুদ্ধ এক নতুন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। এই অঞ্চলে একটা নতুন নিদর্শন স্থাপনের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ আজ উপস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ জয় করা খুব কঠিন হয়নি, কিন্তু, দীর্ঘকালের অশান্তি-দীর্ন এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার কাজটি তাদের পক্ষে খুব সহজ হবে না। অঞ্চলিক নিরাপত্তার ব্যাপারটিকে স্থিতিশীল করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "শক্তির ভারসাম্য" রক্ষার কৌশল অবলম্বন করতে হতে পারে।

ইরান

ইরানের প্রেসিডেন্ট আবলহাসান বানিসদর দেশত্যাগ করার পর ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয়। সেখানে ব্যাপক হত্যার বন্যা বয়ে চলে। বানিসদর দেশত্যাগ করে প্যারিসে আশ্রয় নেন এবং সেখানে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের কথাও ঘোষণা করেন। অবশ্য ফরাসী সরকার তাতে আপত্তি জানায় এবং বানিসদর বেশিদুর অগ্রসর হতে পারেননি।

বানিসদর প্যারিসে সংবাদিকদের কাছে বলেন: তাঁর হাতে দশটি তুরুপের তাস রয়েছে, দশজনকে হত্যা করলেই ইরানের বর্তমান শাসনের অবসান ঘটবে। এই দশজনের মধ্যে ছিলেন ইরান মজলিস (সংসদ)-এর স্পীকার রাফসনজানি, প্রেসিডেন্ট রাজাই এবং প্রধানমন্ত্রী বাহোনার। এর পরই বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আলি রাজাই এবং প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ বাহোনারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বার কিন্তু ব্যর্থ হলো না। বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন প্রেসিডেন্ট রাজাই এবং প্রধানমন্ত্রী বাহোনার।

ইরানে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইরানের ইসলামিক বিপাবলিক দলের ৯০ জন নেতা সমবেত হন ঐ দলের সদর দপ্তরে। সেখানেও ঘটে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা বিস্ফোরণ। দলের ৯০ জন নেতাব মধ্যে ৭২ জনই নিহত হলেন বোমা বিস্ফোবণে। এই ৭২ জনের মধ্যে ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক আযাতুল্লাহ্ মহম্মদ বেহেস্তি, চারজন মন্ত্রী, ছয়জন উপমন্ত্রী এবং সংসদের ২০ জন সদস্য। ইবানেব বুকে বাজনৈতিক নেতারা বিশেষ করে শাসকদল ইসলামিক রিপাবলিক দলের নেতারা প্রতিনিয়ত আতঙ্কে দিন গোনেন। শাসকদল কিন্তু এত হত্যাকাণ্ড থেকেও কোনরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেনি। শাসকদলের এখন আক্রমণের লক্ষ্য বামপন্থী এবং অন্যান্য গণতন্ত্রীরা। ইতিমধ্যে আঠারশ বামপন্থীকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে। একদিনে ৫১ জন বামপন্থীকে কোতল করা হয়। এই সমস্ত ঘটনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ইরানের শাসক দল হিংসার পথেই বিরোধীদের দমন করতে চায়। এর ফল কি দাঁড়ায়? শাসকদল দেশের অভ্যন্তরে এক গভীর সংকট সৃষ্টি করে। ইরানে মোট ৫১টি রাজনৈতিক দল। এই ৫১টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৩৬টি রাজনৈতিক দলই শাসক দলের বিরুদ্ধে চলে যায়। বানিসদর ব্যতিরেকেও খোমেইনির বিরুদ্ধে চলে গেছেন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সাকুর বক্তিয়ার, প্রাক্তন সেনা প্রধান বাহরাম আর্যানা। খোমেইনি এই সমস্ত বিরোধীদের হয় হত্যা নতুবা বন্দী করার কৌশল গ্রহণ করেন। এই সময়ে কেবল যে আঠারশ' বামপন্থীকে হত্যা করা হয় তাই নয়, ন'হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে বন্দী করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এক একটি পরিবারকে পর্যন্ত কোতল করা হয়। রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে মার্কসবাদ-বিরোধী প্রচার করা হচ্ছে। সম্প্রতি এক টেলিভিশন চিত্রে দেখানো হয়েছে—"এক রমণী তার পুত্রকে নিজের হাতে হত্যা করছেন। আল্লার উদ্দেশে তাঁকে উৎসর্গ করছেন। কেননা ঐ পুত্র মার্কসবাদে বিশ্বাসী।" এই সমস্ত ঘটনা ইরানে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলেছে। যেহেতু ইরানে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রভাব এবং সংগঠন দুর্বল, তাই এই অস্থিরতা সেখানে জনগণের মনে হতাশা সৃষ্টি করে। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন এর চেয়ে শাহ্-র রাজতন্ত্র ভালো ছিল। ইরানের একজন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা মাসুদ রাজাভির ভাষায় ইরানের বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলে ঃ ইরান বিপ্লবের শাহ শাসনের পরে মধ্যে ইরানের শাসকদলের এক একজন নেতা নয়া যীশুতে পরিণত হয়েছেন। স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেকারী বাড়ছে। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। ইরান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে ইরানে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

ইরানের জনগণ কঠোর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শাহ্-র পতন ঘটায়। শাহ্কে টিকিয়ে রাখতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বর্তমান শাসক ইসলামিক রিপাবলিক পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদীদের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে, শাহ্ দেশ থেকে বিতাড়িত হন। বিদেশে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন থেকে ইরানের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা এখনও রয়েছে। কিন্তু এই ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে শাসক দল গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয় মনোভাব ও নীতি গ্রহণ করে। শাহ্-বিরোধী সংগ্রামে ইসলামিক রিপাবলিক দলের প্রতি ইরানের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই সমর্থন জানায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শাসক দল এই সমস্ত দলের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে এবং তাদের উপর দমন-পীড়ন চালাতে থাকে।

গোঁড়া ধর্মীয় নীতি ইরানের গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলিকেও নস্যাৎ করতে থাকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার সঙ্গে ইরান সরকারের পরবর্তী ভূমিকা গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

মিশর*

মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত নিহত হলেন। ১৯৭৩ সালে সংগঠিত যুদ্ধের বিজয় বার্ষিকী উপলক্ষে ৬ই অক্টোবর সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ হচ্ছিল কায়রোতে। সাদাত এবং তাঁর সহকর্মীরা সেই কুচকাওয়াজ পরিদর্শনকালেই কয়েকজন সৈন্যের গুলিতে নিহত হলেন।

তবে সাদাতের নিহত হবার ঘটনা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে মিশরের বুকে যে পরিস্থিতি চলেছে তাতে যে একটা অঘটন ঘটবে সেই আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যাচ্ছিল। মিশরের বুকে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেই পরিস্থিতিরই বিস্ফোরণ ঘটে সাদাতের নিহত হবার ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

১৯৭০ সালে নাসেরের মৃত্যুর পর সাদাত মিশরের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন (১) নাসের অনুসৃত পথ ধরেই তিনি চলবেন; ২) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তিনি পয়লা নম্বরের শত্রু বলে মনে করবেন। নাসের সাবেক চেয়েছিলেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে। সাদাত ক্ষমতাশীন হবার এক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই তিনি সাবেক সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় পনেরো হাজার সামরিক উপদেষ্টাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। সাদাতের এই সাবেক সোভিয়েত বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিশরের বাণিজ্যচুক্তি পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। ক্রমশ সাদাত একেবারে উগ্র সোভিয়েত বিরোধী হয়ে ওঠেন। তিনি মিশরে দীর্ঘদিনের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভ্লাদিমির পলিকভকে বিতাড়ন করেন। কে জি বি এজেন্ট আখ্যা দিয়ে ছয় জন সোভিয়েত অফিসার এবং দুজন সোভিয়েত সাংবাদিককে বহিষ্কৃত করা হয়। এক হাজারের বেশি সাবেক সোভিয়েত নাগরিককে মিশর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাবেক সোভিয়েত বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বামপন্থীদের উপরও নেমে আসে প্রচণ্ড দমন পীড়ন। ১,৫৩৬ জন বামপন্থী কর্মী এখন মিশরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বামপন্থীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করার অপরাধে লার্মঁদ-র ফরাসী সাংবাদিক মিশর থেকে বহিষ্কৃত হন। বামপন্থীদের উপর অত্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মিশরের বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা ইব্রাহিম শাকি বলেছেন ঃ "গত কয়েক সপ্তাহে সাদাত যেভাবে মিশরের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন তা পূর্বে কেউ কখনও করেন নি।"

এতো গেল একটি দিক। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সাদাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কীভাবে রক্ষা করলেন? তিনি বলেছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাঁর এক নম্বর শত্রু। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মার্কিন

* ভৌগোলিক দিক দিয়ে মিশরের অবস্থান আফ্রিকাতে হলেও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের হিসাবে মিশরের অবস্থান পশ্চিম এশিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মিশরের রাজনৈতিক ঘটনাবলী এশিয়ায় আলোচিত হল

সরকার তাঁর একনম্বর বন্ধু হয়ে ওঠে। তিনি দ্রুত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উপব নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সমগ্র আরব দুনিয়াব সাহায্য ও সহযোগিতায় তিনি ১৯৭৩ সালে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রশংসা অর্জন করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করার জন্য তিনি ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্প ডেভিডে গিয়ে ইজরায়েলের সঙ্গে একতরফা "শান্তি চুক্তি" করে বসেন। সমগ্র আরব দুনিয়া বিস্মিত হয়ে যায়। সকলেই তাঁকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিল। সাদাতের মৃত্যুর সময় আরব দুনিয়ার একমাত্র সুদান ও ওমান ছাড়া মিশরের কোন বন্ধু ছিল না। গোটা আরব দুনিয়ার সাদাত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন।

কেবল আরব দুনিয়া নয় নিজ দেশেও এই চুক্তি বাতিলের দাবি ওঠে। বিরোধী পক্ষ এমন কী এককালে সাদাতের একান্ত সমর্থকেরাও এই চুক্তি বাতিলের দাবি জানাতে থাকেন। বিশেষ করে যখন ইজরায়েল ইরাকের অভ্যন্তরে বোমা বর্ষণ করে তখন সমগ্র মিশর প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। মিশরের সমস্ত বড় বড় শহরে বিরাট বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। ইজরায়েলী পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির বিরুদ্ধে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, শিক্ষায়তন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত লোকেরা প্রচণ্ড রকমের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। সাদাত দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে এই প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। এমন কী নাসেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মিশরের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদ হেকালকেও তিনি বন্দী করেন।

এ দিকে মিশরের অর্থনৈতিক সংকট গভীর থেকে গভীরতর হয়ে পড়ে। রাবাত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি মিশরকে চার হাজার কোটি ডলার সাহায্য দিয়ে আসছিল। এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। মিশর আরবলীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়। আরব দেশগুলি মিশরের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট চালিয়ে যেতে থাকে।

সাদাত এই অবস্থা সামলাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এতে অবস্থার কোন সুরাহা হয় না, সংকট বৃদ্ধিই পেতে থাকে। গণ-অসন্তোষ প্রবল আকার ধারণ করে। বিভিন্ন ইসলামিক গ্রুপ, মিশরীয় চার্চ, নাসের পন্থী সংগঠন, কমিউনিস্ট সকলেই সাদাতের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, শুধু রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, শিল্পপতিরাও ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, একদা যাঁরা সাদাতের একান্ত আপনজন ছিলেন তাঁরা মিলে জাতীয় কোয়ালিশন নামে একটা সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থায় ছিলেনঃ সাদাতের আমলের দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ আবদেল আজিজ সিদ্দিকী ও মহম্মদ সিদ্দিকী সোলেইমান, সাদাতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী মুরাদ খালেব প্রমুখ। সাদাত এঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তো দূরের কথা প্রকৃত পক্ষে তিনি এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সাদাত পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেন। ঘরে বাইরে নিঃসঙ্গ সাদাত সম্পর্কে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ইউনিয়নিস্ট দলের একজন নেতা মন্তব্য করছেন ঃ "সাদাত চাইছিলেন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা, জনসাধারণ, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দল—সব তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তিনি একদলীয় এমন একটি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইছিলেন, যেখানে তাঁর সমালোচনায় কেউ টু শব্দটি উচ্চারণ করতে পারবে না। এক কথায় তিনি একজন আধুনিক স্বৈরাচারী হতে চাইছিলেন।" সাদাতের এই সমস্ত

স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপেই তাঁকে শত্রুবেষ্টিত করে তুলেছিল। সাদাত নিজেই নিজের কবর রচনা করেন।

ইরাক

১৯৯১ সালের ৪৩ দিন ধরে উপসাগরীয় যুদ্ধের অল্পদিনের মধ্যেই ইরাককে শিকার হতে হয় আর একটি মার্কিনী বোমারু বিমান আক্রমণের। ১৯৯৬ সালের ৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে আমেরিকা ৪৫ বার বাগদাদে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার পূর্বে সাধারণভাবে যে সতর্কীকরণ করা হয় তা পর্যন্ত করা হয়নি। সবরকমের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে আমেরিকা একটানা বোমা বর্ষণ করে চলে। ইরাকের অভ্যন্তরে বোমা বর্ষণের ফলে পাঁচজন নিহত এবং এগারোজন আহত হয়। রণতরী এবং সাবমেরিন থেকে ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৯১ সালের যুদ্ধেও আমেরিকা একইরকমের কৌশল গ্রহণ করেছিল। তবে সেবারে যেমন বেশি বেশি করে তারা ঘনবসতি অঞ্চল বেছে নিয়েছিল, এবারে তাদের কৌশলটি ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তারা এই আক্রমণকে একটি বড় ধরনের হুমকি দেবার ঘটনা হিসেবেই বেছে নিয়েছিল। তাছাড়া ১৯৯০ সালে ইরাক যতটা এবং যেভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল, এবারে কিন্তু ততটা বিচ্ছিন্ন হল না। ১৯৯১ সালে ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে কেবল চীন ও রাশিয়া মৃদু নিন্দা করেছিল। এবারে চীন, রাশিয়া ছাড়াও ফ্রান্স এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে। এমনকি রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের তলবি সভা ডাকার প্রস্তাব পর্যন্ত দেয় এবং এমন কথা বলে যে সে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করবে। তাছাড়া ব্রিটেন, জাপান এবং জার্মানি সরাসরি আমেরিকার নিন্দা না করলেও এই তিনটি রাষ্ট্র আমেরিকা যে ৩২ অক্ষরেখা থেকে ৩৫ অক্ষরেখা পর্যন্ত তার 'উড়ান অঞ্চল' বিস্তৃত করতে চাইছে তার প্রতিবাদ করে। এখানে উল্লেখ্য, এই অঞ্চলটি 'উড়ান নিষিদ্ধ' অঞ্চল বলে পরিচিত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারেবারেই বাগদাদে বোমা বর্ষনের সময় এই অঞ্চলটিকেই বেছে নেয়। আমেরিকার সামরিক কৌশলটিও পরিষ্কার। এই 'উড়ান নিষিদ্ধ' অঞ্চলটি যদি সে বিমান চলাচলের কাজে ব্যবহার করতে পারে, তবে ভবিষ্যতে অতি সহজেই ইরানের যে কোন স্থানে বোমা বর্ষণ করতে পারবে। ইরাক এবং ইরানের আকাশের মধ্যবর্তী এই বিস্তীর্ণ আকাশটি এখন আমেরিকার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঠিক একইভাবে ব্রিটেন ও জার্মানির কাছে অঞ্চলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই অক্ষরেখা-অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলটি ইউরোপীয় ভূখণ্ডে যাতায়াতের সবথেকে নিরাপদ পথ। তাছাড়া এই অঞ্চলটি উড়ান অঞ্চল হিসেবে যদি আমেরিকা একবার ব্যবহার করতে পারে তবে সে ভবিষ্যতে ঐ পথকে বাণিজ্যিক পথ হিসেবে যে ব্যবহার করবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? এতে মধ্য এশিয়া ও আরব দুনিয়ার বুকে আমেরিকার আকাশপথে গুপ্তচর বৃত্তির কাজও সহজতর হবে। যা যে কোন বৃহৎ শক্তির কাছে স্বাভাবিক উদ্বেগের কারণ। 'উড়ান নিষেধ' অঞ্চল ব্যবহার করার আরও রহস্য রয়েছে। ১৯৯১ সালের যুদ্ধের পর আমেরিকাই এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইরাকের আপত্তি সত্ত্বেও আমেরিকা একতরফাভাবে 'উড়ান নিষেধ' ঘোষণা করে। এখন সেই আকাশ অঞ্চল ব্যবহার করে আমেরিকা ঐ পথে অর্থাৎ

বাগদাদে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও নিজেদের উড়ানযানের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা করে নিতে চাইছে।

আমেরিকা কেন এই ধরনের আক্রমণ চালালো? এখানে উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের পর আমেরিকা যে ইরাকের বিরুদ্ধে এই প্রথম আক্রমণ চালালো তা নয়। এর পূর্বেও আমেরিকা একবার ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানে। তখন অজুহাত দেখানো হয়েছিল যে, কুয়েতে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশকে ইরাকীরা হত্যার চেষ্টা করে। আর এবারে? এবার আমেরিকা নিজেই অজুহাত সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আবার সেই অজুহাতের বীজ নিহিত রয়েছে ১৯৯১ সালের যুদ্ধ বিরতি চুক্তির মধ্যেই। ঐ বছরের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ (একমাত্র কিউবা নিরপেক্ষ থাকে) প্রস্তাব গ্রহণ করে যে ইরাকের অভ্যন্তরে দশ কিলোমিটার অঞ্চল অসামরিক এলাকা হিসেবে ইরাককে ছেড়ে দিতে হবে। ইরাক, সেই অঞ্চলের বসবাসকারী নাগরিকদের কি হবে? — এই প্রশ্ন তোলে? কিন্তু আমেরিকা এবং তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলি সেই প্রস্তাবে কোন কর্ণপাত করে না। ফলে ইরাক রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঐ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়। এরপর আমেরিকা ইরাকের উপর আরও নতুন নতুন উপায়ে চাপ সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করে। এ ধরনেরই একটি উদ্যোগ হলো পৃথক কুর্দ রাষ্ট্র গঠনের জন্য আমেরিকার মদত। আমেরিকার এই মদত কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। ইরাক, ইরান এবং তুরস্কের মধ্যে বিরোধ জীইয়ে রাখতে এটা পশ্চিমী দুনিয়ার বহুদিনের প্রয়াস।

কুর্দ জাতি সমস্যাটা কি?

ইরাকের উত্তর অঞ্চলে কুর্দ জাতিগোষ্ঠীভুক্ত জনগণের বাস। এই জাতিগোষ্ঠীর মানুষ শুধু ইরাকেই নয়, ইরান এবং তুরস্কেও এদের অবস্থান রয়েছে। এই তিনটি দেশের কুর্দরা স্বতন্ত্রভূখণ্ড এবং স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ সংগ্রাম করে আসছে। কিন্তু কোনদিনই এই সংগ্রাম খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ইরাকের কুর্দরা চলতি শতাব্দীর বিশের দশকের প্রথম দিকে কুর্দিস্তান গঠন করেছিল। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৪ সাল মাত্র দু'বছর এই রাজত্ব টিকে ছিল। ১৯৪৬ সালে ইরানের কুর্দরা মহাবাদ-প্রজাতন্ত্র গঠন করেছিল। কিন্তু তা এক বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালে হালাবজা, সুলেমেনিয়া এবং অর্বিল শহরকে কেন্দ্র করে ৩৬ হাজার কিলোমিটার বিশিষ্ট এলাকাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুর্দদের নিরাপদ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানায়। অবশ্য মজার বিষয় হলো এই যে, প্রস্তাবিত নিরাপদ এলাকার বাইরে এক চতুর্থাংশ কুর্দদের বসবাস রয়েছে। নিরাপদ এলাকা গঠনের দাবিকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে কুর্দদের আটটি রাজনৈতিক দল মিলে ইরাকি কুর্দিস্তান ফ্রন্ট গঠন করে। কিন্তু এই ফ্রন্ট তেমন কোন কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করেনি। কুর্দদের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল মাসুদ ব্রাজানি পরিচালিত কুর্দিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (কে ডি পি) এবং জালাল তালাবানি পরিচালিত প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তান (পি ইউ কে) -এর মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতামূলক সম্পর্কই এর প্রধান কারণ। কে ডি পি হলো কুর্দদের মধ্যে সর্ববৃহৎ পার্টি। ১৯৪৫ সালে এই পার্টি গঠিত হয়। মাসুদ ব্রাজানির পিতা ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। পিতা কিছুটা মার্কিন ঘেঁষা ছিলেন। কিন্তু মাসুদ ব্রাজানির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক তত

ভাল নয়। কিছুদিন আগে ইরাকের কুর্দ সমস্যা নিয়ে প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার যে বৈঠক আহ্বান করেছিলেন মাসুদ ব্রাজানি তাতে অংশগ্রহণ করেননি। নির্বাসনে থাকাকালীন তাঁর পিতার রহস্যজনক মৃত্যুর জন্য কিসিঞ্জার দায়ী বলে তিনি মনে করেন। ১৯৭৫ সালে কে ডি পি'র মধ্যে ভাঙন ধরে। জালাল তালাবানি নতুন পার্টি পি ইউ কে গঠন করেন। মার্কিনী গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সি আই এ)'র মদতপুষ্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর এ ফ্রি ইরাকের (এই সংস্থাটি পরবর্তীকালে ইরাকী ন্যাশনাল কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়) সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। ইরাকের প্রতিবেশী রাষ্ট্র তুরস্কে অবস্থিত কুর্দ জাতিগোষ্ঠীর একটি রাজনৈতিক দল আছে যার নাম হলো কুর্দি ওয়ার্কার্স পার্টি (পি কে কে)। ইরাকের কুর্দ পার্টির দাবির বিপ্রতীপে এবং স্বতন্ত্র কুর্দিস্তানের পক্ষে। তুরস্ক এদের বিরুদ্ধে একসময় সামরিক অভিযান সংগঠিত করে এবং বহু কুর্দ ইরাকে প্রবেশ করে। এক বছর আগে পি কে কে'র বিরুদ্ধে কে ডি পি এবং পি ইউ কে জোটবদ্ধ হয়। আসলে ইরাকের কুর্দরা তুরস্ক বা ইরানের কুর্দদের তুলনায় কিছুটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। ১৯৯২ সালের মে মাসে কুর্দ এলাকায় যে নির্বাচন হয় তাতে কে ডি পি এবং পি ইউ কে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পি ইউ কে ইরানের সমর্থনে ক্ষমতাশীল হয়ে উঠেছে বলে কে ডি পি অভিযোগ তোলে। অন্যদিকে পি ইউ কে'র অভিযোগ যে কে ডি পি বাগদাদের সমর্থনপুষ্ট। এই অবস্থায় উভয় দলের মধ্যে প্রধানত অর্বিল প্রদেশের দখল নিয়ে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এই অবস্থায় ২২শে আগষ্ট কে ডি পি ইরাকী রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৩১শে আগষ্ট ইরাকের ৩০ হাজার রিপাবলিকান গার্ড এবং ৪০০টি ট্যাঙ্ক অর্বিলে প্রবেশ করে যার সূত্র ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাকে বিমান হানা সংগঠিত করে।

বস্তুতপক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কোনদিনই কুর্দদের জাতিসত্তা সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিল না। এখনও নেই। ইরাককে এবং বিশেষত সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যই তারা কুর্দ সমস্যাকে ব্যবহার করতে চায়। এর প্রমাণও রয়েছে। গতবছর তুরস্কের কুর্দরা যখন স্বতন্ত্র কুর্দস্তানের দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল তখন সেই সংগ্রামকে দমন করার জন্য তুরস্কের সরকার ত্রিশ হাজার সেনা পাঠিয়েছিল। তখন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুর্দদের সমর্থনে তুরস্কের উপর বোমাবর্ষণ করেনি। এ থেকেই বোঝা যায় যে কুর্দদের প্রতি দরদ থেকে নয়, সাদ্দাম হোসেন এবং ইরাকের জনগণকে শিক্ষা দেবার জন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এহেন পদক্ষেপ।

ইজরায়েল — প্যালেস্টাইন

১৯৯৩ সালের এক স্মরণীয় দিন হল ১৩ই সেপ্টেম্বর। সেদিন হোয়াইট হাউসের লনে স্বাক্ষরিত হয় পি এল ও-ইজরায়েল চুক্তি। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে প্যালেস্তাইন পেল স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। এই অধিকারের জন্য পি এল ও বা প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে রক্তাক্ত সংঘর্ষ চালিয়ে এসেছে। বার বার আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। দীর্ঘ ৪৫ বছরের সংগ্রামে প্যালেস্তাইনের তিন লক্ষ নরনারীর জীবনহানি ঘটেছে।

হোয়াইট হাউসের লনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের উপস্থিতিতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তিতে অবশ্যই সীমিত স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষব করেন ইজরায়েলের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সিমন পেরেজ এবং পি এল ও'র বিদেশ বিভাগের প্রধান মাহমুদ আব্বাস। এই চুক্তির সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন মার্কিন বিদেশ সচিব ওয়াবেন ক্রিস্টোফার এবং রুশ বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রেই কোসিরেভ। চুক্তি শেষে ইয়াসেব আবাফত ঘোষণা করেন ঃ "আজকের এই চুক্তি হলো সার্বভৌম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।" আমেরিকার হোয়াইট হাউসে যখন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে ঠিক তখনই প্যালেস্তাইনের ইজরায়েলী অধিকৃত ভূখণ্ড গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ছিল উৎসবমুখর। হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয় নরনারী বিজয় পতাকা নিয়ে সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। নাচ আর গানে সমগ্র এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। নিষিদ্ধ প্যালেস্তিনীয় পতাকা উড়তে থাকে ঘরে ঘবে।

হোয়াইট হাউসের চুক্তির পূর্বে ১০ই সেপ্টেম্বর পি এল ও এবং ইজরায়েলকে পারস্পরিক স্বীকৃতি দিয়ে আর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। জেরুজালেমে চুক্তিপত্রে সই করেন ইজরায়েলের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী ইৎঝাক রাবিন। একই সময়ে নরওয়ের রাজধানী তিউনিসে অপর এক চুক্তিপত্রে সই করেন পি এল ও প্রধান ইয়াসের আরাফত। ইজরায়েল স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বলা হয় ঃ প্যালেস্তিনীয় জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে পি এল ও'কে ইজরায়েলী সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং পশ্চিম এশিযার শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ায় ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবে। চুক্তি বলে ইজরায়েল অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজা স্ট্রিপের জেরিকো অঞ্চলে প্যালেস্তিনীয়রা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্তাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই চুক্তি ছিল প্রথম চুক্তি।

হোয়াইট হাউসে সম্পাদিত এই চুক্তি নানাদিক থেকে ঐতিহাসিক হলেও কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এই চুক্তির আশু প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনার পূর্বে প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল বিরোধটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। আজ মধ্যপ্রাচ্যে অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে যে ইজরায়েল অবস্থান করছে তা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত। এটি একটি ইহুদি রাষ্ট্র। ১৯৭৬ সালে যদিও সংবিধান সংশোধন করে ইজরায়েলকে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়, ১৯৯১ সালে নতুন করে সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্রের পূর্বে ইহুদি রাষ্ট্র শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইজরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটটা কি? ১৯০৭ সালে বিশ্ব ইহুদি সংগঠন প্যালেস্তিনীয় অঞ্চলে পৃথক ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯১৭ সালে ব্রিটেন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইহুদিদের জন্য স্বশাসিত অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর পরই পূর্ব ইউরোপ থেকে হাজার হাজার ইহুদি বিতাড়িত হয়ে ঐ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্যাপক ইহুদি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ১৯২০, ১৯২৯, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৬ সালে ঐ অঞ্চলে বারবার আরবদের জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। তখন প্যালেস্তাইন ব্রিটিশ শাসিত রাষ্ট্র। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে লাখে লাখে ইহুদি ঐ

অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হন। আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে প্রতিদিন রক্তাক্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। ব্রিটিশ শাসিত প্যালেস্তাইনেই ৫০ হাজার বেশি আরব নরনারী নিহত হন। তখন ব্রিটিশ সরকার সমস্ত বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাতে তুলে দেয়। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্যালেস্তাইনকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ শতাংশ ইহুদি সংখ্যালঘু জনগণের জন্য ৬০ শতাংশ প্যালেস্তাইন ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া হয়। আরবরা এর প্রতিবাদ করে। প্রথম থেকেই ইহুদিরা সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয়। গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিতে থাকে এবং ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যালেস্তিনীয়রা এর প্রতিবাদ করেন। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রই প্যালেস্তিনীয়দের পাশে এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধ ছিল আরব-ইজরায়েলের মধ্যেকার পাঁচটি যুদ্ধের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হন। প্যালেস্তাইনের ৮০ শতাংশ ভূখণ্ড ইজরায়েলের দখলে চলে যায়। বাকি ২০ শতাংশের মধ্যে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের দখল নেয় জর্ডন এবং গাজা স্ট্রিপের দখল নেয় মিশর। বারো লক্ষ প্যালেস্তিনীয় পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রসমূহের ১৪টি দেশে তাবু খাটিয়ে এই বারো লক্ষ (বর্তমানে বিশ লক্ষ) নরনারী যাযাবরের জীবনযাপন করছেন।

১৯৬৭ সালে ইজরায়েল পার্শ্ববর্তী সকল আরব রাষ্ট্রের উপরই আক্রমণ শুরু করে। ছয়দিনের এই যুদ্ধে ইজরায়েল জর্ডনের কাছ থেকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং মিশরের কাছ থেকে গাজা স্ট্রিপ ছিনিয়ে নেয়। কেবল তাই নয়, প্যালেস্তিনীয় অধ্যুষিত মিশরের সিনাই এবং সিরিয়ার গোলান হাইটসও তারা দখল করে। আরো ৪ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় দ্বিতীয়বারের জন্য উদ্বাস্তু হলেন। আর প্যালেস্তিনীয়দের নিজ ভূখণ্ড বলে আর কিছু রইল না। মিশর ও জর্ডানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেদিন ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইজরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

১৯৬৭ সালের পর আবার আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ বাঁধে ১৯৭৩ সালে। এই যুদ্ধে আরবদের কিছুটা অগ্রগতি ঘটে। সিরিয়া গোলান হাইটস পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু ইজরায়েলী বাহিনী গোলান হাইটসের কুইনেত্রা শহর ত্যাগ করার পূর্বে সমগ্র শহরটি পুড়িয়ে দেয়। ৫৫ হাজার নরনারী উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। ১৯৭৯ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্য দিয়ে মিশর সিনাই ফিরে পায়।

ইজরায়েল তার জন্মলগ্ন থেকেই আরবদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে আরবদের ৪৭৫টি গ্রামের মধ্যে ৩৮৫টি গ্রাম ধ্বংস করে। ১৬,৩০০ আরব গৃহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যেই প্রায় দু'লক্ষ প্যালেস্তিনীয় নিহত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পূর্বে জার্মানে ইহুদিদের যে ধরনের অত্যাচারের শিকার হতে হয় ইহুদিরাও প্রায় একই ধরনের অত্যাচার শুরু করে প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে। ১৯৮০ সালে দেখা যায় ছয় হাজার প্যালেস্তিনীয় বন্দী রয়েছেন ইজরায়েলের কারাগারে। এঁদের অনেককেই বিভিন্ন দেশের উদ্বাস্তু ক্যাম্প থেকে ধরে আনা হয়। তাঁদের প্রায় অধিকাংশই ছিলেন বিনাবিচারে বন্দী। ১৯৮১ সালের ১৭ই জুলাই পি এল ও'র মূল সংগঠনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার সংকল্প নিয়ে বেইরুটে বোমাবর্ষণ করে। একদিনের বোমাবর্ষণে দু'শ নরনারী নিহত হন। সেদিন এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।

আরব দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং সম্পদশালী রাষ্ট্র প্যালেস্তাইন ১৯৬০-এর দশকের শেষাশেষি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। আরবরা বিশেষ করে প্যালেস্তিনীয়রা নিজ সত্তাহীন হয়ে পড়েন। প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আরব ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট। এই মুভমেন্ট প্রধানত পরিচালিত হয় ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের জেহাদ — এই স্লোগান নিয়ে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পর আরব ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট নিজেদের কার্যকলাপের আদর্শগত পর্যালোচনা করে। তাঁরা স্থির করেন যে, কেবল ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সাফল্য অর্জন করা যাবে না। সেজন্য তাঁরা আন্দোলনের মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদান যুক্ত করেন এবং নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করেন। নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় — আরব ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট। প্রায় একই সময়ে দামাস্কাসে প্যালেস্তিনীয় কিছু যুবক প্যালেস্তাইন লিবারেশন ফ্রন্ট নামে একটি সংগঠন গঠন করেন। এব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহ্মদ ইলেরি নামে এক প্যালেস্তিনীয় বুদ্ধিজীবি যুবক। কিন্তু প্যালেস্তিনীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা অল ফতেহ্ এই সংগঠনের নেতৃত্ব এবং আন্দোলনের রণকৌশল মানতে অস্বীকার করেন। আর একটি পৃথক সংগঠন গঠিত হয় — পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্তাইন। এই ফ্রন্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক এবং কূটনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। তাদের কর্মসূচীর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, প্যালেস্তিনীয়দের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কখনই প্রতিষ্ঠিত হবে না যদি না এই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটা অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

১৯৭৩ সালে যখন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবদের কিছুটা অগ্রগতি ঘটে তখন এই গ্রুপ মিলে গিয়ে প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পি এল এ ও গঠন করেন — যার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হলেন ইয়াসের আরাফত। এই পি এল ও'র নেতৃত্বেই দীর্ঘদিন ধরে মুক্তি সংগ্রাম চলছে।

ইজরায়েলীদের আক্রমণ এবং নির্যাতন ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পাবার পটভূমিকায় পি এল ও প্রতিরোধ যুদ্ধের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্তিফাদ নামে পি এল ও'র শাখা সংগঠন। ইন্তিফাদ'এর অর্থ হলো পবিত্র অভ্যুত্থান। এটি পি এল ও'র সামরিক শাখাও বলা চলে। এদের নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ গাজা স্ট্রিপ এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করে। ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে প্রবাসে প্যালেস্তাইন সরকার গঠিত হয়। সেই সরকারের রাজধানী স্থাপিত হয় তিউনিসে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই প্যালেস্তাইন সরকারকে দর্শকের মর্যাদা দেয়।

এদিকে ক্রমাগত যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ইজরায়েলের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। সেখানকার গণতান্ত্রিক শক্তি বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি অবিলম্বে এই যুদ্ধের দাবি জানাতে থাকে। গত এপ্রিল মাসে ইৎঝাক রাবিন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাবার পরেই তিনি ঘোষণা করেন যে, মধ্য প্রাচ্যের সব থেকে বড় সমস্যা প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল সংঘাতের তিনি অবসান ঘটাবেন। তখন থেকেই কূটনৈতিক পর্যায়ে চলতে থাকে আলোচনার পর আলোচনা। সেই কূটনৈতিক কার্যক্রমেরই ফলশ্রুতি হলো ১৩ই সেপ্টেম্বরের চুক্তি। এই চুক্তি নানাদিক থেকে ঐতিহাসিক হলেও প্যালেস্তিনীয়রা যা দাবি করেছিলেন তার মাত্র ২০ শতাংশ পেয়েছেন। তাই অনেকেই অসন্তুষ্ট, অনেকেই বিক্ষুব্ধ।

ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাত

যখন পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে বিরোধের সূত্রপাত হয়। তখন ইজরায়েল সরকার সিদ্ধান্ত নেয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য জেরুজালেমে একটি সুরঙ্গ খোঁড়া হবে। স্থানটি হচ্ছে আল আক্সা মসজিদের দেওয়াল সংলগ্ন। এই সুরঙ্গ চালু হলে জেরুজালেমের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে ভূগর্ভস্থ যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা বাড়বে। শক্ত হবে সমগ্র জেরুজালেমের উপর ইজরায়েলী শাসন ক্ষমতা কায়েম করাব বৈধ ভিত্তি। প্যালেস্তিনীয়দের মতে, জেরুজালেমকে ইহুদি মনোভাবাপন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জেরুজালেমের বহু এলাকায় আরববাসীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পূর্ব জেরুজালেম তো পশ্চিম উপকূল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্যালেস্তিনীয়দের বক্তব্য ঃ এই সুরঙ্গ চালু করে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আঘাত করার চেষ্টা হচ্ছে। খোঁড়াখুঁড়ির দরুন বহুপ্রাচীন আল আক্সা মসজিদের দুর্বল ভিতের যথেষ্ট ক্ষতি হবে।

ইজরায়েল সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীজুড়েই প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। প্যালেস্তিনীয় এলাকা ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজায় নতুন করে অসন্তোষ দেখা দেয়, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সমাবেশ হয় নিউইয়র্কে ও ওয়াশিংটনে। সর্বত্রই প্রতিবাদী প্যালেস্তিনীয়রা ঘোষণা করেন ঃ "আমরা যে-কোনো মূল্যে সুরঙ্গ খোঁড়া রুখবো।" এই ঘটনায় প্যালেস্তিনীয়দের চাপা-পড়া ইস্যুগুলি পুনরায় সংবাদপত্রের শিরোনাম পেতে শুরু করে। আমেরিকায় ভোটের মুখে ক্লিন্টন ভেবেছিলেন পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি এনে রাজনৈতিক ফায়দা তুলবেন। কিন্তু পরিকল্পনাটা ভেস্তে যাওয়ার বরং সমালোচনার মুখেই পড়েন তিনি।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্ররোচনামূলক আচরণ, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন করে ইজরায়েলী হানা, সিরিয়ার প্রতি হুমকি, শান্তি চুক্তি অগ্রাহ্য করে জর্ডন নদীর পশ্চিমপারে নতুন করে ইহুদি বসতি স্থাপনের ঘোষণা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতিকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে। সিরিয়া ও লেবানন তো ইজরায়েলের আচরণে ক্রুদ্ধ, এমনকি মিশরও শান্তি চুক্তি নিয়ে ইজরায়েল সরকারের ভূমিকায় সন্দিহান হয়ে উঠেছে। প্যালেস্তিনীয় নেতারা বলেছেন, ওয়াশিংটনে শীর্ষ বৈঠকে আরাফত যোগ দিয়েছেন নিতান্তই অনিচ্ছাকৃতভাবে। এর আরও একটা কারণ ছিল। তাহলো, শীর্ষ বৈঠকে জর্ডনের বাদশা হুসেনের উপস্থিতি, যার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে বেশ প্রশ্ন রয়েছে। মিশরের রাষ্ট্রপতিও ওয়াশিংটনের ভূমিকায় আগে থেকেই অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। ইজরায়েল সরকার শান্তি প্রক্রিয়াকে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেবার উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছে। ইজরায়েলের বর্তমান শাসক দল, লিকুদ পার্টি নিশ্চিত যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপতির পক্ষে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কোন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হবে না। কারণ, নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সবচেয়ে বড় অর্থ যোগানদার হচ্ছে ইজরায়েলের সমর্থক বৃহৎ ব্যবসায়গোষ্ঠী।

নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে ইজরায়েলে নতুন সরকার গঠিত হবার পর থেকেই শান্তি চুক্তি রূপায়ণ নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। ইজরায়েলী নেতৃত্ব চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অগ্রাহ্য করে চলতে থাকে। এর প্রধান হচ্ছে, হেবরন থেকে ইজরায়েলী সেনা সরানো স্থগিত রাখা এবং অধিকৃত জর্ডন নদীর পশ্চিম প্রান্তে নতুন করে ইহুদি বসতি স্থাপন। এভাবে

প্ররোচনা দিয়ে ইজরায়েল সরকার প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দু'পক্ষই এখন কার্যত সংঘাতে। পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা এখন আর আলোচনার টেবিলে নেই, জটিল প্রক্রিয়া নিতে চলেছে। এর ইঙ্গিত কারও পক্ষেই শুভ হবে না। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন শান্তি প্রক্রিয়া ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকলে পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হবে।

আফগানিস্তান

জেনিভায় আফগান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে দুটি দেশের মধ্যে—পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান। প্রকৃতপক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে চারটি দেশের মধ্যে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই চুক্তির অংশীদার। চুক্তিতে উল্লিখিত বিষয় কোনভাবে লঙ্ঘিত হলে তা প্রতিহত করা এবং চুক্তির শর্তগুলি রক্ষা করার অঙ্গীকার দিয়েছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দুই দেশ চুক্তিতে সাক্ষী হিসেবে সই করেছে। আফগান চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম, তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এই চুক্তি কেবল যে, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যেকার ছ'বছরের তিক্ততা দূর করতে সাহায্য করবে তাই নয়—এই চুক্তি ভারত উপ মহাদেশে শান্তি স্থাপন করতেও যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। চুক্তি সম্পর্কে এই দুটি দেশ ইতিমধ্যেই যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে, এরা এই চুক্তি বানচাল কারার জন্য যে কোন ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করতে পারে। ইতিমধ্যেই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগান বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুজাহিদিনদের সাহায্য অব্যাহত রাখবে। আফগানিস্তানের প্রতিবিপ্লবীদের অস্ত্র সাহায্য করা সম্পর্কিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণাকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই দুঃখজনক এবং চুক্তি বানচাল করার ঘৃণ্য কৌশল বলে অভিহিত করেছে।

আফগান চুক্তি সই হবার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী সংক্রান্ত দপ্তরে সামনে প্রায় দু'শ আফগান উদ্বাস্তু বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আফগান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে। বিক্ষোভকারীরা এই চুক্তির বিরোধিতা করেন, চুক্তি বাতিলের দাবি জানান এবং বলেন এই চুক্তি আফগান সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে না। একই দিনে 'দি ইসলামিক ইউনিটি অব আফগান মুজাহিদিন' একটি বিবৃতি প্রচার করে। সেই বিবৃতিতে আফগানিস্তানের প্রতিবিপ্লবীদের এই সংগঠন আফগানিস্তান চুক্তি বাতিল করে দেয়। এই সংগঠনের মতে যেহেতু এই চুক্তি আফগান সমস্যার কোন সমাধান করবে না, যেহেতু এই সংগঠন চুক্তির অংশীদার নয়, তাই তাঁরা চুক্তি মানতে বাধ্য নন। এ কথার অর্থ খুবই পরিষ্কার। মুজাহিদিনরা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ঐ দেশে যথারীতি প্রতিবিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। সবচেয়ে উদ্বেগজনক এবং হতাশাব্যঞ্জক বিবৃতি দিয়েছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জেড নুরানি। তিনিই জেনিভা বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। তিনিই আফগান চুক্তিতে সই করেন। জেনিভা থেকে ফিরে বিমান বন্দরে তিনি বলেন ঃ আফগানিস্তানে বৈরিতা তখনই কমবে যখন সেখানে ব্যাপক ভিত্তিতে একটি সরকার গঠিত

হবে। কেউ যদি মনে করেন যে, নাজিবুল্লাহ্ আফগানিস্তানেব বাষ্ট্রপতি থাকবেন আবার দেশেব অভ্যন্তরে বৈরিতাও হ্রাস পাবে তবে তিনি মারাত্মক ভুল কববেন। পাকিস্তান একটি কাবণেই চুক্তি সই করেছেন। তা হলো এই চুক্তি বলে ঐ দেশ থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহৃত হবে। এই চুক্তি স্বাক্ষর আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। অথচ চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুনেজো বলেছিলেন এই চুক্তি 'যুক্তির বিজয়'। আফগানিস্তানের প্রতিবিপ্লবীদের বা পাকিস্তানকে এই ধরনের বিবৃতি দিতে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উৎসাহিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে এই চুক্তি আন্তরিকভাবে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি নাজিবুল্লাহ্। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ আফগানিস্তান হবে জোট নিরপেক্ষ, সার্বভৌম, স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশের জনগণই স্থির করবেন কী ধরনের রাষ্ট্র, সরকার তাঁরা চান, সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে তা স্থির হবে। তবে সন্দেহ নেই যে, জনগণের কোয়ালিশনই তাঁরা বেছে নেবেন।

মজার ব্যাপার হলো, তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগান মুজাহিদিনদের সাহায্য অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবৃতি দেবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানের সুর ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। চুক্তি সই হবার অব্যবহিত পরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হক বলেছিলেন, 'এই চুক্তি বিংশ শতাব্দীর এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা'। কেউ কখনও ভাবতেই পারে নি যে, সত্যি সত্যি সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারে সম্মত হবে। এই চুক্তি রাষ্ট্রসংঘের একটি সাফল্য। পাকিস্তানের লক্ষ্য পুরোপুরি সাধিত। সাবেক সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার, ৩০ লক্ষ উদ্বাস্তুর সম্মানজনক প্রত্যাবর্তনের মত পরিবেশ তৈরী, আফগান জনগণের স্বদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকারের স্বীকৃতির সবকটি লক্ষ্যই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে, জেনিভায় স্বাক্ষরিত পাক-আফগান চুক্তিতে আফগান সমস্যা সমাধানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আফগানিস্তানের যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। চুক্তির মুখবন্ধে বলা হয়েছে ঃ উভয় দেশ (আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান) একে অপরের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, জাতীয় ঐক্য, নিরাপত্তা এবং জোট নিরপেক্ষতা মেনে চলবে। উভয় দেশ একে অপরের সীমান্ত লঙ্ঘন করবে না। একটি সরকার অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা উচ্ছেদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আর্থ ব্যবস্থার কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করবে না। উভয় দেশ আরো একমত হয় যে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ভূমি ভাড়াটে সেনাদের প্রশিক্ষণ, সমরসজ্জা, রিক্রুট-এর জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। অথবা তাদের কোনরূপ অর্থ সাহায্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। অথবা তাদের কোনরূপ অর্থ সাহায্য করা থেকে দুটি দেশ বিরত থাকবে। আফগানিস্তান প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যে সমস্ত আফগান উদ্বাস্তু হয়ে বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন আফগান সরকার দ্রুততার সঙ্গে তাদের ফিরিয়ে নেবে। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আফগান উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে পাক সরকার আফগান সরকারকে সাহায্য করবে। চুক্তি রূপায়ণের প্রশ্নে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য দেখা দিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে সেই মতানৈক্য দূর করতে উভয় দেশকে সাহায্য করবে।

এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। চীন এবং সাবেক যুগোস্লাভিয়া

এই চুক্তিকে বিশ্বশান্তির পথে দৃঢ় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছে। রাষ্ট্রসংঘেব মহাসচিব পেরেজ দ্য কুইলার এই চুক্তিকে একটি উল্লেখযোগ্য জয়, আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিযে আনার পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ বলে অভিহিত কবেছেন।

আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার

সাবেক সোভিয়েত সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আফগানিস্তানেব সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক প্রশাসনেব প্রধান জেনারেল হাবিয়ুল্লা জিয়ারমল বলেন যে, "আমরা যুদ্ধবিরতি ৬ মাসের জন্য অর্থাৎ ১৫ই জুলাই পর্যন্ত পালন করবো—তবে একটা শর্তে যে অপরপক্ষও এই যুদ্ধবিরতি পালন করবে। যদি দু' পক্ষ থেকেই গোলাগুলি বর্ষণ ও যুদ্ধের তৎপরতা এই সময়ের মধ্যে বন্ধ থাকে, তবে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়নো হবে।" আফগান সেনাবাহিনী কিভাবে যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনটি পালন করবে তা তিনি বলেন এবং বর্তমানে জাতীয় সমঝোতার গুরুত্বের কথা উল্লেখ কবেন।

আফগান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি দেন।

তিনি বলেন যে সারা দেশজুড়ে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে জাতীয় সমঝোতার পর্যায় আরম্ভ হবে। আফগান সেনাবাহিনী একতরফাভাবে শত্রুপক্ষের ওপর সবরকমের সৈন্য চালনা, গোলাগুলি বর্ষণ এবং বিমান আক্রমণ থেকে বিরতি ঘোষণা করবে এবং সবরকমের যুদ্ধকালীন তৎপরতা বন্ধ রাখবে সেনাবাহিনীর সমস্ত ইউনিট তাদের আগেকার নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাবে এবং শান্তির সময় যেমন কাজ করে তেমন কাজই করবে।

সেনাবাহিনী এখন থেকে যে কাজ করবে তা হলো রাষ্ট্রের সীমানা সুরক্ষিত রাখা, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি রক্ষা করা এবং জনগণের জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন সব জিনিসপত্র বহনকারী গাড়িগুলির সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

আমরা আশা করি যে, এই শান্তির পদক্ষেপ অপর পক্ষ উপযুক্তভাবে সাড়া দেবে এবং শহর, গ্রাম অর্থনৈতিক কেন্দ্র, বিমান পরিবহন এবং আফগান সেনা কেন্দ্রগুলির ওপর যে কোন ধরনের গোলাগুলি বর্ষণ এবং অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ থেকে তারা বিরত থাকবে। আমরা আরও আশা করি যে বিদেশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্রের চোরাচালান এবং আফগানিস্তানের এলাকার মধ্যে সেগুলি মজুত করা বন্ধ থাকবে। শত্রুপক্ষ সব রকমের হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজ থেকে এখন বিরত থাকবে এটাও আমরা আশা করি।

আফগান সেনাবাহিনীর সমস্ত ইউনিটকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয় যে তারা যেন সবরকমভাবে সংযম রক্ষা করে এবং কোনকম প্ররোচনার ফাঁদে তারা যেন পা না দেয়।

একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতির এই ঘোষণার অর্থ এই নয় যে অন্য পক্ষ এইভাবে অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং আফগানিস্তানের মাটিতে ধ্বংস এবং হত্যালীলা অবাধে চালিয়ে যাবে। যারা এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলবে না তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ যেন না থাকে। আফগান সেনাবাহিনীকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো "সতর্কতা এবং চূড়ান্ত সতর্কতা।"

যুদ্ধবিরতির এই সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনীর সমস্ত জওয়ান এবং অফিসারদের যুদ্ধশিক্ষা

সংক্রান্ত কাজকর্মে ব্যাপৃত রাখা হবে। আফগান সেনাবাহিনীর যুদ্ধের দক্ষতা উচ্চতম স্তরে রাখা হবে এবং সমস্ত রকমের অপ্রত্যাশিত অবস্থার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখা হবে। আফগানিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক করার পথে এই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হচ্ছে প্রথম সুদৃঢ় পদক্ষেপ।

আফগানিস্তান পরিস্থিতি

জেনেভা চুক্তির ফলশ্রুতি হিসাবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। আফগানিস্তানের বুক থেকে শেষ সাবেক সোভিয়েত সৈন্যটিও প্রত্যাহৃত হয়। সেদিন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ১৩০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই পশ্চিমী দুনিয়ার সাংবাদিক। তাঁরা সেদিন এই আশা নিয়েই কাবুলে বসেছিলেন যে, তাঁরা 'রাজধানী কাবুলে' এর পতন ঘটার চমকপ্রদ সংবাদ পাঠিয়ে দেশে ফিরবেন। কিন্তু তাঁদের সেই আশা পূরণ হয় নি। তাঁদের দেশে ফিরতে হয়েছে আশাভঙ্গ হয়ে। কিন্তু সেখানে আফগানিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটাতে প্রতিবিপ্লবী শক্তি যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এটাও বাস্তব সত্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের মদতপুষ্ট এই প্রতিবিপ্লবী, মৌলবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কেবল কাবুল নয়, বলা চলে সমগ্র আফগানিস্তানেই তারা আক্রমণ সংঘটিত করে। আক্রমণ পরিচালিত হয় জালালাবাদ, কান্দাহার, হেরাত, খোস্ত, কুন্দুল এবং কাবুলের বড় বড় শহরগুলিতে। প্রকৃতপক্ষে একটা সময় প্রতিবিপ্লবীদের হাতে কাবুল প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অনেক বিদেশী কাবুল ছেড়ে চলেও যান। বিদেশী দূতাবাসগুলিও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় না। সবচেয়ে মারাত্মক এবং বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে জালালাবাদে। সেখানে তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আফগানিস্তানের পিপলস ডেমোক্রাটিক পার্টির মিলিশিয়ার সঙ্গে প্রতিবিপ্লবীদের সংঘর্ষ চলতে থাকে। এই সংঘর্ষ প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের রূপ নেয়। কয়েক হাজার নরনারী হয় নিহত অথবা আহত হন। প্রতিবিপ্লবীরা চেয়েছিল সমগ্র জালালাবাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে। সে অভিযানে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকাশ্য মদত ছিল তাও আজ স্পষ্ট। জালালাবাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ও ব্যর্থ হয়েছে প্রতিবিপ্লবীদের। আফগানিস্তান সরকারে সেনাবাহিনীই সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। আফগান সরকারের এই বীরত্বপূর্ণ অভিযানে সেখানকার নারীমুক্তি বাহিনীও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। জালালাবাদে প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সোভিয়েত সৈন্যের প্রয়োজন হয় নি। আফগানিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ এবং দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীই সাফল্যের সঙ্গে জালালাবাদ রক্ষার সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদত যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে নাক গলানো থেকে বিরত না হয় তবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুনরায় সেখানে সৈন্য পাঠাতে হতে পারে। আনন্দের কথা, সোভিয়েত ইউনিয়নকে সৈন্য পাঠাতে হয় নি। যাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সোভিয়েত সেনাদের সাহায্য ব্যতিরেকে একদিনও সেখানকার গণতান্ত্রিক সরকার টিকবে না — তাঁদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আফগানিস্তানের সেনাবাহিনী, সেখানকার দেশপ্রেমিক শক্তি সোভিয়েত' সাহায্য ব্যতিরেকেও দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্থায়িত্ব রক্ষায় সক্ষম। অথচ ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির এক সপ্তাহ পূর্বেও মার্কিন সমরবিদেরা বলেছিলেন যে, কাবুল থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তান সরকার তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়বে। আর প্রতিবিপ্লবীরা কবে কাবুল দখল করবে, কবে জালালাবাদের মুখে বিজয় পতাকা উড়াবে আর কবেই বা কান্দাহারে সাদা ঘোড়ায় চেপে বিজয় উৎসব পালন করবে তার দিনক্ষণও স্থির করে ফেলে। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা ক্ষেপণাস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহার করে।

যে ন'বছর ধরে সোভিয়েত সৈন্য আফগানিস্তানে ছিল সেই ন'বছরে সেখানকার বিরোধীদের একটিই ঐক্যবদ্ধ স্লোগান ছিল 'জিহাদ' অর্থাৎ বিধর্মী (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট)-দের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ। এই স্লোগানের ভিত্তিতেই সাতটি বিরোধী দল একজোট হয় আফগানিস্তান পিপলস ডেমোক্রাটিক পার্টির বিরুদ্ধে। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহৃত হবার পর এই 'জিহাদ'-এর ফানুষ ফেটে যায় এবং বিরোধী জোটের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতেই বহুজাতি, বহু-উপজাতি দেশ আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র তুলে দেয় উপজাতিদের হাতে, পাখতুনদের হাতে—যাতে এদের সশস্ত্র কার্যকলাপ বিরোধীদের মনে নতুন শক্তি সঞ্চার করতে পারে এবং বিরোধীদের ভাঙ্গা জোট জোড়া লাগে। এখানেও সেই বস্তাপচা মৌলবাদী স্লোগান কাজে লাগানো হয়। বলা হয় ঃ ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আফগানিস্তানের পিপলস ডেমোক্রাটিক সরকারকে উৎখাত করতে হবে। আফগান বিরোধীশক্তি তিনটি স্লোগানের ভিত্তিতে জনমত সংগ্রহ করার চেষ্টা করে ঃ (১) যত দ্রুত সম্ভব বর্তমান সরকারের পতন ঘটাতে হবে; (২) দেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম তীব্র থেকে তীব্রতর করে পিপলস মিলিসিয়ার ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে দিতে হবে; (৩) আফগানিস্তানের বাইরে থেকেও আফগান সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হব। প্রতিবিপ্লবীদের এই কৌশলে তাল দেয় পশ্চিমী দুনিয়ার সংবাদপত্রগুলি। তারা এই মর্মে নিরবচ্ছিন্নভাবে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে যে এখনও আফগানিস্তানে গোপনে দশ হাজার সোভিয়েত সৈন্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের সহযোগিতায়ত এই প্রতিবিপ্লবী শক্তি একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের কথাও ঘোষণা করে। এখানে উল্লেখ্য, জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানও ছিল। কিন্তু ১৫ই ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহৃত হবার পর তারা জেনেভা চুক্তির শর্তগুলি পালন করার চাইতে সেই শর্তগুলি লঙ্ঘন করার উপরই বেশি জোর দেয়। এতদসত্ত্বেও আফগানিস্তানে আজ দ্রুততার সঙ্গে উত্তেজনা হ্রাস পাচ্ছে, সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে আসছে, শহরে শহরে শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ ফিরে আসছে। আর এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে সেখানকার দেশপ্রেমিক শক্তি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইতিবাচক সাহায্যের ভিত্তিতে।

শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা

সাবেক সোভিয়েত সেনা অনেকদিন আগেই আফগানিস্তান ছেড়ে গেছে। কিন্তু কাবুল পরে বহুদিন পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির কাছে অনেক দূরেই থেকে গেছে। পাকিস্তানের

পেশোয়ারে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা আফগান বিদ্রোহীদের শিয়াপন্থী সাতটি গোষ্ঠী মিলে একটি আফগান অন্তর্বর্তী সরকার বা আফগান ইন্টারিম গভর্নমেন্ট (এ আই জি) বানায়। সেই সরকারে অবশ্য ইরানে আশ্রয় নেওয়া সুন্নিপন্থী গোষ্ঠীগুলি যোগ দেয়নি। পাক আশ্রিত এ আই জি-র যোদ্ধারা পাক সামরিক অফিসারদের নেতৃত্বে মার্কিন অস্ত্র ও অর্থ নিয়ে জালালাবাদ দখলের চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদী প্রচার যন্ত্রের দৌলতে বিশ্ববাসীর ধারণা হয় আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি ডঃ নাজিবুল্লার নেতৃত্বাধীন পি ডি পি এ (পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আফগানিস্তান) সরকারের পতন হ'ল বলে।

বেশ কিছুদিন লড়াই চালাবার পর এ আই জি-র পাণ্ডারা শুকনো মুখে পেশোয়ারে ফিরে আসে। শুরু হয়ে যায় এ আই জি-র শরিকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নানা কারণে। পেশোয়ারে বসে থাকা বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে আফগানিস্তানের ভিতরে সক্রিয় সশস্ত্র বিদ্রোহী নেতাদের দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট হয়। পেশোয়ারী নেতারা এবং তাঁদের চেলাচামুণ্ডারা মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের ফলাও চোরাকারবার ফেঁদে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। ঐ টাকায় মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করে। অনেকে পাকিস্তানে বাড়িঘর জমিজমা কিনে রাখে। স্বাভাবিক কারণেই "যুদ্ধক্ষেত্রে" থাকা "কমান্ডারদের" অনেকেই পি ডি পি এ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে। ডঃ নাজিবুল্লা এঁদের অনেকের সঙ্গেই একটা বোঝাপড়ায় আসতে সক্ষম হয়েছেন।

পেশোয়ারী গোষ্ঠীর মধ্যে গুলবুদ্দিন হেক্‌মতিয়ার গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্য গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। ওদিকে ইরানে আশ্রয়প্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে পাকিস্তানে আশ্রয়প্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলির এত তীব্র দ্বন্দ্ব যে ইরানী গোষ্ঠীগুলি তথাকথিত এ আই জি-তে যোগই দেয়নি।

মার্কিন সরকার পেশোয়ারে আশ্রিত গোষ্ঠীকেই অস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি সরবরাহ করে যায় পাকিস্তানের মাধ্যমে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত ছিল সৌদি আরব। ওদিকে তেহেরানে আশ্রয় প্রাপ্ত আটটি গোষ্ঠীর মদতদার ইরানের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্কের দ্রুত আবনতি ঘটে।

আফগান নীতি নিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও দ্বন্দ্ব ছিল। মার্কিন সরকার আফগান বিদ্রোহীদের মার্কিনী অস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি যাদের মাধ্যমে দেয় পাকিস্তানের সেই সামরিক বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর মতের মিল নেই। পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিসেস ইনটালিজেন্স আফগানিস্তানের বিদ্রোহীদের পরিচালনা করার জন্য পাক অফিসারদের পাঠাচ্ছিল। বেনজির ভুট্টো সেটা বন্ধ করেছেন। বেনজির চেষ্টা করছেন পেশোয়ার গোষ্ঠীর সঙ্গে তেহেরাণ গোষ্ঠীর মিলন ঘটিয়ে আফগান ইন্টারিম গর্ভনমেন্টের (এ আই জি) শক্তি বাড়াতে এবং কাবুল সরকারকে চাপ সৃষ্টি করে ভেঙে দিয়ে নতুন সরকার বসাতে।

এদিকে, সাবেক সোভিয়েত সীমান্তের কাছাকাছি সক্রিয় আফগান বিদ্রোহীরা নতুন খেলা শুরু করে। সাবেক সোভিয়েত সরকারের অভিযোগ ছিল, সোভিয়েত মধ্য এশিয়াতে মুসলিম জনগণকে প্রত্যক্ষ উসকানি ও প্রশিক্ষণ দেয় আফগান বিদ্রোহীরা। তাজিকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান ভ্লাদিমির পেটকেল সংবাদ সংস্থা 'তাস'-এর প্রতিনিধিকে বলেছেন, একটি গুপ্তচর সংস্থা তাজিকিস্তানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেটিকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আফগান বিদ্রোহীদের নিযুক্ত করছে। আফগানিস্তান সীমান্তে বাদাখশান ও কুন্দুজ প্রদেশের আফগান বিদ্রোহীরা তাজিকিস্তানের কিছু গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। মাদক দ্রব্য,

অস্ত্রশস্ত্র এবং নাশকতা চালাবার অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে আফগান বিদ্রোহীরা সাবেক সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় অনুপ্রবেশ করছে। এরকম কিছু লোকজন ধরা পড়ে স্বীকার করেছে যে তারা আফগানিস্তানের ইসলামিক পার্টির লোক। এঁদের পিছনে কাদের মদত সে বিষয়ে অবশ্য সোভিয়েত কর্মকর্তা মুখ খোলেন নি।

আবার গৃহযুদ্ধ

আফগানিস্তান কি আবার গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হতে চলেছে? সেখানকার ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এই ধরনের ইঙ্গিতই বহন করছে। আফগানিস্তানের বর্তমান রাব্বানি-মাসুদ সরকারকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা হয়। এই অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন এক সময়ের তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী তালিবন। কাবুল দখলের জন্য তালিবনের অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও কাবুল কিন্তু শান্ত হয় নি, শান্ত হয় নি আফগানিস্তানের অন্যান্য শহর বা নগর। কিছু বিদেশী শক্তি বিশেষ করে আমেরিকা এবং পাকিস্তান আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে নানা ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের পথ গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতিতেই আফগানিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ আফগানিস্তানে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে এবং যে অস্তিরতায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে সেই অস্থিরতার মূলে রয়েছে ধর্মীয় উন্মাদনা। রব্বানি-মাসুদ সরকার আফগানিস্তানে নমনীয় পথে ইস্লামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। কিন্তু তালিবান চায় আফগানিস্তান একটি উগ্র ইস্লামিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হোক। তালিবান কাবুলে আঘাত হানার পূর্বে আফগানিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলও দখল করে নেয়। বিশেষ করে পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর এলাকাগুলিতে তালিবান গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই গোষ্ঠী সাময়িকভাবে পিছু হঠে, বর্তমানে তালিবান গোষ্ঠী নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘর্ষ চলছে। কেবল মাত্র রাজধানী কাবুলই যুদ্ধাঞ্চল মানচিত্রের বাইরে রয়েছে। সেই কাবুলের বুকে যদি আজ নতুন করে কামানের গর্জন শুরু হয় তবে এই দেশের কোন অঞ্চল আর যুদ্ধাঞ্চল মানচিত্রের বাইরে থাকবে না।

প্রকৃতপক্ষে, আফগানিস্তানের গত ২০ বছরের ইতিহাসটাই হলো গৃহযুদ্ধের ইতিহাস। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানতে ও বুঝতে সেই ইতিহাসও প্রাসঙ্গিক। ১৯৭৩ সালের ১৭ই জুলাই মহম্মদ দাউদ রাজা জাহির শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং একটি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দাউদ আফগানিস্তানের অত্যাচারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হন। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে দাউদ খুন হন। দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এর অব্যবহিত পরেই পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আফগানিস্তান সরকার গঠন করে। এই সরকারই ছিল আফগানিস্তানের ইতিহাসে প্রথম বামপন্থী সরকার। ১৯৭৮ সালের এই সরকারের সাথে তদানিন্তন সোভিয়েত সরকার 'বন্ধুত্বের চুক্তি' সই করে। ১৯৭৯ সালের আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশ করে, প্রেসিডেন্ট হাফিজুল্লাহ আমিন অপসারিত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বাবরাক কারমাল। ১৯৮৬ সালে বাবরাক পি পি ডি এ-র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার ফলে সঈদ মহম্মদ নাজিবুল্লা দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে জেনেভায় তদানিন্তন সোভিয়েত

ইউনিয়ন এবং আফগানিস্তানের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্ত সৈন্য (এক লক্ষ পনেরো হাজার) প্রত্যাহার করে নেবে। ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আফগানিস্তানের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি মুজাহিদিন-র সমঝোতা হয়। রাশিয়া নাজিবুল্লাহ্ সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। মুজাহিদীন কাবুল অবরুদ্ধ করে। এক বছর ধরে দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ চলে। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে নাজিবুল্লাহ পদত্যাগ করেন। মোজাফেদ্দির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয় না। এর পর রব্বানি আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আহম্মদ শাহ মাসুদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করলেও আমেরিকা কিন্তু সেখানে আস্থিরতা জীইয়ে রাখতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। আফগানিস্তান যাতে কোন অবসথাতেই শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে সেজন্য পাকিস্তানেরও স্বার্থ রয়েছে। আমেরিকা এবং পাকিস্তান নতুন করে আফগানিস্তানে সঙ্কট সৃষ্টির জন্য সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যায়। অন্যদিকে রব্বানি-মাসুদ সরকারও জনগণের ·বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে জনগোষ্ঠীগত সমস্যা আজ খুবই প্রকট হয়ে ওঠে। তালিবান পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে চান। তাঁর পিছনে আমেরিকা এবং পাকিস্তান তো রয়েইছে। পরন্তু সেনাবাহিনীর একটা অংশ তাজিক জনগোষ্ঠী তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। এহেন পবিস্থিতিতে আফগানিস্তানে আবার নতুন করে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই সঙ্কট যে কোন মুহূর্তে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করতে পারে।

আমেরিকা-পাকিস্তানের মদতপুষ্ট তালিবান মিলিমিশিয়া দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সঈদ মুহম্মদ নাজিবুল্লাহ্ ও তাঁর ভাই শাহপুর আহ্‌মেদজি-কে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়। তালিবান মিলিশিয়ার প্রধান মোল্লা মুহম্মদ ওমর ৬ সদস্যের এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন। আফগান রাষ্ট্রপতি বুরহানুদ্দিন রব্বানি ও প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার কাবুল ছেড়ে পালিয়ে যান। নতুন সরকার ঘোষণা করেছে শরিয়তই হবে আফগানের মূল ভিত্তি। এই সরকার 'সম্পূর্ণভাবে এবং বিশুদ্ধ ইসলামী ব্যবস্থা' কায়েম করবে। মোল্লা মুহম্মদ ওমর পরিচালিত সরকারের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হয়েছেন মোল্লা মুহম্মদ রব্বানি।

আফগানিস্তানের বুকে যে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে তা পূর্বেই আঁচ করা গিয়েছিল। সেখানকার এই প্রতিবিপ্লবে বিস্মিত হবার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯২ সালে নাজিবুল্লা সরকারের পতন ঘটার পর থেকেই সেখানকার মৌলবাদী এবং উগ্র মৌলবাদীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। নানা ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসেই তালিবান মিলিশিয়া তদানীন্তন রব্বানি-মাসুদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু সেই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও কাবুল কিন্তু শান্ত হয় না। শান্ত হয় না আফগানিস্তানের অন্যান্য শহর। তালিবান বাহিনী বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকেই সরকার-বিরোধী অভিযান চালাতে থাকে। বিদেশ থেকেও প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র পায়। পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনী আই এস আই তাদের ট্রেনিং দিতে থাকে।

আফগানিস্তানে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং সে অস্থিরতায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, যে অস্থিরতার মূলে রয়েছে ধর্মীয় উন্মাদনা। রব্বানি-মাসুদ সরকার আফগানিস্তানে নমনীয় পথে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাব পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তালিবান চায় আফগানিস্তান একটি উগ্র ইসলামিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হোক। মার্চ-এপ্রিল মাসে তালিবান কাবুলে আঘাত হানার পূর্বে আফগানিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল দখল করে নেয়। বিশেষ করে পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর এলাকাগুলিতে তালিবান গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই গোষ্ঠী সাময়িকভাবে পিছু হটে, কিন্তু তখন থেকেই এই গোষ্ঠী নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ চলতে থাকে। কেবলমাত্র রাজধানী কাবুলই যুদ্ধাঞ্চল মানচিত্রের বাইরে রয়ে যায়। তালিবান মিলিশিয়ার একমাত্র লক্ষ্য ছিল কাবুল দখল করা।

রক্তাক্ত প্রতিবিপ্লবের পরও কি আফগানিস্তান শান্ত হবে? মনে হয় না। সেনাবাহিনীর মধ্যে রব্বানি-মাসুদ গোষ্ঠীর সমর্থনই বেশি। তাছাড়া, আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল এখনও মাসুদের কর্তৃত্বে রয়েছে। রব্বানি ইতোমধ্যেই তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর সেখানকার ভবিষ্যৎ যুদ্ধ যে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের, তাও প্রায় নিশ্চিত। তবে কি আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ দেশ বিভাজন?—যা এখন থেকে ২৫ বছর পূর্বে আমেরিকা চেয়েছিল।

তুরস্ক

যে সকল ঘটনাবলী সুদীর্ঘ কালের মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে — সম্ভবত ঃ এতটুকু অতিশয়োক্তি হবে না তুরস্কের সিগস শহরে লেখক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনা তার অন্যতম। ষোড়শ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্যে শোষণের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছিলেন অগ্রণী কবি পীর সুলতান আবদল। এই ক্ষমাহীন অপরাধের জন্য ক্ষিপ্ত হয়েছিল সম্রাট। কবিকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে শাসকগোষ্ঠী প্রমাণ করতে চেয়েছিল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস বরদাস্ত করা হবে না। বর্তমানে ঐ দেশে ধর্মান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে নির্ভীক সংবাদপত্র আয়দিনলিকের নিয়মিত প্রবন্ধকার আজিজ নেসিনের আহ্বানে সিগস শহরে মাদিমাক হোটেলে ঐ শহীদ কবির স্মৃতির সভায় মিলিত হয়েছিলেন তুরস্কের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রমুখ বুদ্ধিজীবীগণ। ইসলামী উগ্র মৌলবাদী শক্তি এতে আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। জুম্মার নমাজের পর তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ঐ হোটেলটি ঘিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড লেলিহীন অগ্নিশিখা সমগ্র হোটেলটি গ্রাস করে ফেলে — সমস্ত কক্ষগুলি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ৩৫ জন বুদ্ধিজীবী নিহত হন। বিভিন্নভাবে গুরুতররূপে আহত হন দেড় শতাধিক। এর দু-দিন আগে দক্ষিণপন্থী ইসলামী মৌলবাদীরা আয়দিনলিক সংবাদপত্র অফিসে আক্রমণ চালায় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। আক্রমণকারীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল আজিজ নেসিনকে শেষ করে দেওয়া। ঘটনাচক্রে তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। তাকে গোপনে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই বর্বরোচিত আক্রমণের অজুহাত হিসাবে বলার চেষ্টা করা হয় সালমান রুশদির গ্রন্থ 'স্যাটানিক ভার্সেস' এর জন্য দায়ী। আসলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে তুরস্ক কামাল আতাতুর্ক-এর সময় থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে আসছে। প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা, নারীর মর্যাদা বস্তুত এখানেই অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে স্থান পেয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিকেই মূলত উপড়ে ফেলার হীন উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পিত ও দানবীয় আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে। তুরস্কের ব্যাপক বুদ্ধিজীবী মহল ঐ দেশের প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং জনগণকে মৌলবাদী শক্তির প্রভাব মুক্ত করার এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। বুদ্ধিজীবীদের এই বলিষ্ঠ ভূমিকাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে ঐ দেশে প্রগতিশীল ও বামপন্থী আন্দোলন উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করছে। এতে ধর্মীয় মৌলবাদীরা উন্মত্ত হয়ে উঠছে।

তুরস্কে মৌলবাদীদের এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড কেবল মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের কাছে নয়, সমগ্র বিশ্বের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে খুবই উদ্বেগজনক। দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার দেশ তুরস্কের একাংশ ইউরোপে এবং একাংশ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত। সুপ্রাচীন ইতিহাসের ঐতিহ্যশালী তুরস্ককে অনেকে চিহ্নিত করেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু হিসেবে। এহেন দেশে জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলী। কিন্তু শতাব্দীর গোড়ার দিকে মধ্যপ্রাচ্যের যে সমস্ত দেশে মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয় তুরস্ক তার মধ্যে অন্যতম। অটোমান সাম্রজ্য ভেঙ্গে যাবার পর তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৯১১-২২) নেতৃত্ব দেন মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক। সেই সংগ্রাম পৃথিবীর নানা দেশে মুক্তি সংগ্রামকে প্রভাবিত করেছিল। এই সংগ্রামের বিজয়ের সূত্র ধরেই ১৯২৩ সালের ২৯ শে অক্টোবর তুরস্ক সাধারণতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয়। এর আগে ১৯২০ সালের এপ্রিলে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে রাজধানী আঙ্কারায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে। এর পূর্বে দেশে যে সংবিধান গৃহীত হয় সেই সংবিধানে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯২৪ সালে ইসলামী আদালত বাতিল হয়ে যায়। পূর্বে তুরস্কে ইসলাম ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম। ১৯২৮ সালে তা খারিজ করা হয়। ঘোষণা করা হয় রাষ্ট্রের কোন নিজস্ব ধর্ম থাকবে না। একই সঙ্গে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। অর্থাৎ তুরস্কে জাতীয় বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় মৌলবাদকে হঠিয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটানো। এটাই তুরস্কের গণসংগ্রামের প্রকৃত ঐতিহ্য।

কিন্তু ১৯৫২ সালে ন্যাটোর সদস্য হবার পর থেকেই ঐ দেশের সুমহান ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। ১৯৬০ সালে সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই নতুন করে মৌলবাদের অভ্যুত্থান শুরু হয়। সেখানে মার্কিন সেনা শিবির স্থাপিত হয়। সেই শিবির আজো তুরস্কে অবস্থান করছে। তারা সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিয়মিতভাবে প্রচণ্ড হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

তুরস্কের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য সেখানকার বামপন্থীরাই সরব। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬১ সালে গঠিত হয় টার্কিস ওয়ার্কাস পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টির অবলুপ্তি ঘটে সেখানে গঠিত হয়েছে সোস্যালিস্ট পার্টি অব টার্কি। ১৫ হাজার সদস্যবিশিষ্ট এই সোস্যালিস্ট পার্টির পতাকাতলে দেশের বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিজীবী সমবেত হয়েছেন। এই পার্টির নেতৃত্বেই সেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।

আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তাঁর সাধারণ ধর্মঘটের অধিকাব আদায় করেছেন। এই অধিকার প্রায় বিশ বছর ধরে স্থগিত ছিল।

বামপন্থীদের এই অগ্রগতিতে সেখানে সব থেকে বেশি আতঙ্কিত মৌলবাদীরা। এই আতঙ্কেরই বহিঃপ্রকাশ হলো গত ২রা জুলাইয়েব নৃশংস হত্যাকাণ্ডে।

আলজেরিয়া

আলজেরিয়ায় মৌলবাদী শক্তি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সাম্প্রতিককালে পরাজিত কবেছে। মৌলবাদীদের এই বিপুল সাফল্য কিন্তু রাতারাতি ঘটেনি। বেশ কয়েক বছর ধরেই মৌলবাদীরা লাগাতার ধর্মীয় প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন; তাঁদের ক্রিয়াকর্মকে আর্থিক ও অন্যান্য মদত যুগিয়েছে মূলতঃ সৌদি আরব এবং সঙ্গে বেশ কয়েকটি আরব আমীরশাহী। মৌলবাদী এফ আই এস তাঁদের প্রচারে কাজে লাগিয়েছেন আলজেরিয়ার সঙ্কটাপন্ন অর্থনীতিকে। ১৯৬২ সালে, দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে, এন এল এফ ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটায় আলজেরিয়ায়। পরবর্তীতে আলজেরিয়ায় স্থাপিত হয় একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র; সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনেও আলজেরিয়া এগিয়ে আসে। ১৯৮০-র দশক থেকে কিন্তু আলজেরিয়ার কেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সঙ্কটের মোকাবিলা করতে ক্রমাগত ব্যর্থ হতে লাগলো। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলো; জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বেড়ে যেতে লাগলো; বাড়লো কর্মহীনতা বিশেষতঃ যুবসমাজের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে শুরু করলো। আর মৌলবাদীরা পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নিলো। উল্লেখ্য, এফ আই এস'র সমর্থকদের বড়ো অংশই হলো ১৮ থেকে ৩০ বছরের যুবক-যুবতী।

মৌলবাদীদের প্রথম সাফল্য হলো দেশব্যাপী পৌর নির্বাচনে বিরাট জয়। ১৯৯০ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এফ আই এস, ৯০%-এরও বেশি আসনে জয়লাভ করলো। তখনো কিন্তু আলজেরিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি মৌলবাদের বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয়ে উঠতে পারেনি। তাই মৌলবাদের বিরুদ্ধে কোন যৌথ আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচী নিতে এগিয়ে এলো না তারা। ক্ষমতাসীন এন এল এফ-ও অদ্ভুত ঔদাসীন্য দেখায় মৌলবাদের জাগ্রত বিপদ সম্পর্কে। কেবল সমাজতন্ত্রী দল আঁহ্বান জানালো মৌলবাদ-বিরোধী জোট গড়ার জন্য। সেই আহ্বানে কিন্তু কেউই কর্ণপাত করলো না। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলো যখন আলজেরিয়ার প্রধামন্ত্রীর নির্দেশে পুলিস মৌলবাদীদের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করায় গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে। এটিকেও মৌলবাদীরা তাদের নির্বাচনী প্রচারে কাজে লাগায়। নির্বাচনে এফ আই এস-এর মূলতঃ দুটি স্লোগান ছিলো : 'হয় ঐস্লামিক রাষ্ট্র, নয় ধর্মযুদ্ধ; আর, 'শরিয়া' ছাড়া কোন আইন মানি না।'' এফ আই এস প্রধান আবদুল কাদের হাসানি হুঙ্কার ছাড়লেন : 'বাধা আসলে রক্তপাতে আমরা দ্বিধা করবো না'। নির্বাচনের ফল ঘোষিত হলে, আলজেরিয়ার আল-সুন্না মসজিদ থেকে ঘোষণা করা হলো যে, 'গণতন্ত্রের অন্ধকার' কেটে যাচ্ছে।

মৌলবাদীদের ভীতিপ্রদ সাফল্য আলজেরিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে। লিবিয়ার শাসক গদ্দাফি, দেশে মৌলবাদের অভ্যুত্থান সম্পর্কে সাবধানবাণী

উচ্চারণ করেছেন। তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি বেন আলি, মৌলবাদী 'হিজবুল নাহ্দা' দলের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য নির্দেশ জারি করেছেন। মিশরের 'আল-আহরাম' সংবাদপত্র সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেছে যে, দেশের মৌলবাদী দল-উপদলগুলি আলজেরিয়ার ঘটনায় নতুন উৎসাহ লাভ করেছে। এমনকি ফ্রান্সের তিরিশ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে এফ আই এস-এর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে কারণ প্যারি শহরের 'গ্রান্ড মস্ক্' মসজিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মীয় নেতাদের ওপর এফ আই এস'র প্রভাব বাড়ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফরাসী বর্ণবিদ্বেষী দল, 'ন্যাশনাল ফ্রন্টে'র নেতা, জাক্ লপঁ শোরগোল জুড়ে দিয়েছেন এই বলে যে, ফ্রান্সে যে সমস্ত কালো মানুষ রয়েছে 'তাদের সবাইকে তাড়াতে হবে'।

দেরীতে হলেও আলজেরিয়াতে মৌলবাদ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। সোস্যালিস্ট ফ্রন্টের ডাকে সম্প্রতি আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সের পথে নেমেছিলেনর কয়েক লক্ষ মানুষ, যাঁদের কণ্ঠে স্লোগান ছিল ঃ 'গণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক; ঐস্লামিয় ফ্যাসীবাদ নিপাত যাক"। সমাজতন্ত্রী নেতা হুসেন আইত্ আহমেদ বলেছেন ঃ মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এটা শুরুমাত্র; আন্দোলন আরো বৃহত্তর আকার ধারণ করবে শীঘ্রই।

ইউরোপ

সাম্প্রতিককালে পশ্চিম ইউরোপ তিনটি সঙ্কটের ধাবা বইছে। প্রথমতঃ ইউরোপীয ইউনিয়ন বা ই ইউ'র দখলদারী নিযে ব্রিটেন বনাম ফ্রান্স-জার্মান-ইতালীব পাঞ্জা কষাকষি। দ্বিতীয়তঃ দেশে দেশে আর্থিক দুর্নীতির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব। তৃতীয়তঃ পরবাষ্ট্রনীতিব ক্ষেত্রে 'ন্যাটো' বনাম বাষ্ট্রসঙ্ঘের মতবিরোধ।

প্রথমে গোলা ছুঁড়েছিলেন ব্রিটেনের জন মেজব-ই। মার্কিনী মদতে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করে ইউরোপীয় ইউনিযনের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিব ব্যাপারে বাগড়া দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন 'মূল নিয়ন্ত্রণের' প্রশ্নটি কোনোভাবেই উপেক্ষা করা চলবে না। অর্থাৎ ব্রিটেন ইউরোপীয অর্থনীতিব তথা বাজারের সবটুকু সুবিধা নেবে কিন্তু ফ্রান্স-প্রস্তাবিত শ্রম-কল্যাণ নীতি তথা শিশু-শ্রমিক সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ মানবে না। মানবেনা 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' কোনো নিয়ন্ত্রণ কাঠামোও। মেজরকে প্রথমেই ধাক্কা দিলেন ইউরো-কমিশনের বিদায়ী প্রধান, সমাজতন্ত্রী ফবাসী চিন্তাবিদ জাক্ দেলর। দেলর বললেন ঃ "যদি ব্রিটেনের জন্য ই ইউ গঠনে অচলাবস্থা দেখা যায়, তবে প্রয়োজনে ইউরো-সংসদে ভোটের মাধ্যমেই প্রারব্ধ কাজ করে যেতে বাধ্য হবে ই ইউ।" প্রমাদগুণে, মেজর তাৎক্ষণিক পিছু হটলেও, পরবর্তী কমিশন-প্রধানের নির্বাচনেব ক্ষেত্রে 'দেলর-পন্থী' বলে প্রথমে বেলজিয়ামেব প্রধানমন্ত্রী জ্যঁ-লুক দেহানের মনোনয়নে 'ভেটো' প্রয়োগ করে আনতে চাইলেন নিজের মনমত প্রার্থী লিওন ব্রিটান্‌কে। এবারে ফ্রান্স-জার্মানী একযোগে 'ভেটো' প্রয়োগ করল। অবশেষে 'সমঝোতা-প্রার্থী' হিসাবে নিয়ে আসা হয়েছে লুকসেমবুর্গের প্রধানমন্ত্রী জাক্ সাঁতে-কে। এখানেও কিন্তু মেজরের হতাশা হবার পালা, কারণ সাঁতে একেবারে প্রথম থেকেই কট্টর ব্রিটিশ বিরোধিতায় নেমেছিলেন। এদিকে, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন ই ইউ'র সদস্যভুক্তির ফলে, ইউরো-সংসদে বামজোটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৯৮ থেকে ২২১। সংসদের মোট সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৫০১ এবং বামজোটেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী।

ইতালীর রাজনীতিতে দুর্নীতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ও'দেশের অন্যতম বৃহৎ দৈনিক 'লাস্তামপা'র আরিগো লেভি মন্তব্য করেছেন ঃ 'দুর্নীতিগ্রস্তজনিত রাজনৈতিক অস্থিরতা কেবল 'ইতালীয় অসুখ' বলে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না, এ 'রোগ পশ্চিমী গণতন্ত্রের রোগ।" মজার কথা, লেভি একথা মন্তব্য হিসাবে ছেপেছিলেন ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে! অর্থাৎ "সেই ট্রাডিশন" সমানে চলছে পশ্চিমী দেশগুলোয়। ইতালিতে মাফিয়াচক্রের সঙ্গে, আর্থিক

কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সিলভিও বেরলুসকোনির দক্ষিণপন্থী জোট সরকার একগাদা বদনাম মাথায় নিয়ে পদচ্যুত হয়েছে। আগের প্রধানমন্ত্রী দু'জনেই কারাভ্যন্তরে রয়েছেন একই অভিযোগে। সংসদে হাতাহাতি, শহরে খুনোখুনির মতোই সহজলভ্য দৃশ্য। নতুন প্রধানমন্ত্রী, লামবাঁরতো দিনি অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে আছেন, তবে আছেন চরম অস্বস্তি নিয়ে। মাঝে থেকে কাগজগুলোয় গাদা-গাদা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির খবর ছাপা হচ্ছে আর বিক্রীর হার বাড়ছে হু-হু করে।

ফ্রান্সে এডওয়ার বালাদুর মন্ত্রিসভার চারসদস্য ঃ জেহার লঙ্গে, অ্যালাঁ কারিনিয়ঁ, ফ্রঁসোয়া লেওটার এবং অ্যালাঁ মাদেলাঁ, ঘুষ নেবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ফ্রঁসোয়া মিতেরঁ আর এক বোমা ফাটিয়েছেন এক টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন ঃ "আমি নাৎসি-অধিকৃত ফ্রান্সে 'পুতুল' ভিশি সরকারের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতা করেছিলাম — এবং এ ব্যাপারে কোনো দোষের দায়ে নিজেকে আমি দায়ী ভাবিনা।" 'আউসউৎস' কনসেনট্রেশন ক্যাম্প মুক্তির ৫০ বছর পূর্তি বৎসরে শ্রদ্ধেয় জননেতার একি ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি! ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রীরা বড়ই অস্বস্তিতে আছেন এইসব 'সোজা-সরল' স্বীকারোক্তিতে।

ব্রিটেনে কেলেঙ্কারি পর্ব শুরু হয়েছিল যখন মেজরের মন্ত্রিসভার সদস্য মাইকেল মেট্স, সাইপ্রাসের সুপরিচিত অপরাধী তথা মাফিয়া-চক্রের নেতা আসিল নাদিরের কাছে উপহার-স্বরূপ, 'কৃতজ্ঞতায় চিহ্নস্বরূপ' লক্ষ টাকা দামের 'রোলেকস' হাতঘড়ি পাঠিয়েছিলেন। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষাদপ্তরের অন্যতম উচ্চপদস্থ আধিকারিক এরপর বরখাস্ত হলেন এক মহিলাঘটিত কেলেঙ্কারিতে-মহিলা নাকি আসলে ছিলেন কোনো এক বিদেশী শক্তির বেতনভোগী গুপ্তচর। সর্বশেষ কেচ্ছার সঙ্গে যুক্ত তিন ব্রিটিশ মন্ত্রী ঃ অর্থমন্ত্রী কেন-ক্লার্ক, বাণিজ্যমন্ত্রী মাইকেল হেসেলটাইন, আর প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্যালকম্ রিফ্‌কিন্ড।

'ন্যাটো' বনাম রাষ্টসঙ্ঘের মতপার্থক্য দেখা গেছে আপাতত তিনটি ক্ষেত্রে।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়ার গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে মতবিরোধের প্রধান উপজীব্য বিষয় ঃ বসনিয়ার সরকারের ওপর যে অস্ত্র আমদানি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা' তুলে নেওয়া হবে কিনা, এ'ব্যাপারে দক্ষিণপন্থী রিপাবলিকান পার্টি প্রভাবিত মার্কিন দেশগুলির ওপর। অন্যদিকে 'ন্যাটো' জোটের যে অংশ এই অস্ত্রনিষেধাজ্ঞা তোলার বিপক্ষে, তাঁরা মদত পাচ্ছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি ইয়সুসি আকাসির কাছ থেকে।

দ্বিতীয়ত ঃ রাশিয়ার চেচ্‌নিয়াতে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কিনা এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এখানে 'ন্যাটো' জোট মনে করে 'মানবাধিকার' লঙ্ঘিত হচ্ছে — এই বলে আশু হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আবার, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মত হলো ঃ চেচ্‌নিয়া রাশিয়ার অন্তরীণ ব্যাপার — কি দরকার অযাচিত হস্তক্ষেপের!

তৃতীয়ত ঃ সাবেক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলি থেকে পারমাণবিক অস্ত্র হস্তান্তরের ব্যাপারে 'ন্যাটো' মনে করে এই ক্ষেত্রে কোনো সদস্যদেশই এককভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। আবার, মার্কিনী মদতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মনে করছে যে প্রয়োজনে জার্মানির মতো দেশ-ইউক্রেনের মতো দেশের সঙ্গে এ'ব্যাপারে আলোচনায় বসতেই পারে — 'আঞ্চলিক নিরাপত্তার' কথা মাথায় রেখে।

বৈপরীত্য বাড়ছে, বাড়ছে সংঘাত, বাড়ছে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এগোচ্ছে

সাবেক কমিউনিস্টরা (সম্প্রতি বুলগেরিয়ার নির্বাচনী ফল মনে রাখবেন)। জোটবদ্ধ হচ্ছে বামশক্তিগুলির নেতৃত্বদায়ী কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে। পরিবর্তন আসছেই — একটু সময়ের অপেক্ষা, একটু ধৈর্যের পরীক্ষা এইমাত্র।

ব্রিটেন

বৃটেনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনেব স্মৃতি অনেক ব্রিটিশের মনে আছে। কিন্তু তখন তারা যে বিষয়টি জানতেন না তা হল এইসব আগুন লাগার ঘটনার সঙ্গে ব্রিটেনের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রনকৌশলের যোগসূত্র ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আক্রমণের প্রস্তুতি গডেছিল গোপনে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্রদেরও তা জানতে দেওয়া হয়নি। ফলে মার্কিন নেতৃত্বের নীতির প্রতি লক্ষ লক্ষ ব্রিটেনবাসীর অনাস্থা শক্তিশালী হয়েছে। ব্রিটেনে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন ব্রিটেনকে পারমাণবিক সংঘর্ষে নিয়ে যেতে পারে, যা শুধু জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হবে না, এমনকি ব্রিটিশ সরকারের অজান্তেই হতে পাবে।

ইউরোপে মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস করার সাবেক সোভিয়েত প্রস্তাব হিটলারের বোমা এবং ভি-রকেট। লন্ডন মিউজিয়ামে লেখা আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লন্ডনে ২৯,৮৯০ জন নিহত, ৫০,৪৯৭ জন আহত, ১২ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু ক্রিস্টোফার রেনের এই সতর্কবাণী বুঝতে তাঁর উত্তরসূরীরা অক্ষম। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ব্রিটেনে তৈরি করেছেন মার্কিন ক্র্যুজ ক্ষেপণাস্ত্রের আস্তানা।

বিরোধীপক্ষের দাবির ফলে সংসদে বা হাউস অব কমন্সে এসব ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সময় লেবর পার্টির প্রতিনিধি বলেন, গ্রেনাডার ওপর মার্কিন সম্পর্কে বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মুখপাত্র ডেনিস হিলে বলেছেন, "এর ভিত্তিতে আলোচনা করতে অস্বীকার করাটা উন্মত্ততা।" তাঁর মতে, দ্রুত একটা ঐকমত্যে পৌছাতে সর্বশেষ সোভিয়েত প্রস্তাব এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল।

সংসদে টোরি সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কাজেই সংসদে ক্র্যুজ ক্ষেপণাস্ত্রের অনুমোদন পেতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ব্রিটেনে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনের পক্ষে লেবার পার্টির সদস্যদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে রক্ষণশীল দল ব্যর্থ হয়। সংসদে তৎকালিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাইকেল হেজেস্টাইন হুঁশিয়ারি দেন, গ্রীনহাম বিমানঘাঁটির সামনে যেসব মহিলা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে যাচ্ছেন, তাঁরা ক্ষেপণাস্ত্রগুলির দিকে এগুতে থাকলে তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হবে।

ক্র্যুজ ক্ষেপণাস্ত্রের বিভিন্ন যন্ত্রাংশবাহী বিমান গ্রীনহাম কমন বিমানঘাঁটিতে এসে অবতরণ করে। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেনই প্রথম মার্কিন ক্র্যুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্রিটেনের মাটিতে স্থাপন করতে দেয় এবং তা টোরি সরকার করে ব্রিটেনের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

গ্রীনহাম কমন বিমানঘাঁটির সামনে বিক্ষোভরত মানুষের মোকাবিলায় ছিল কয়েক হাজার পুলিস ও সৈন্য। তা সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীরা বিমানঘাঁটির চারপাশে দেওয়া কাঁটাতারের বেড়া প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত ধ্বংস করে। পুলিস ১৮৭ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন আগে পেন্টাগনের সমর বিশেষজ্ঞরা বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করে যায় এবং সামরিক প্রহরার জন্য কিছু সুপারিশ করে।

পুলিসের এক মুখপাত্র বলেন, গ্রীনহাম কমন বিমানঘাঁটিতে বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় খরচ হয় দশ লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ দেড় কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এখন খরচের দিকে তাকায়নি। পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সমৃদ্ধ ব্রিটিশ সাবমেরিন বসাতে খরচ হয় এক হাজার কোটি পাউন্ড। ১৯৭৯ সালে মার্গারেট থ্যাচারের টোরি সরকার ক্ষমতায় আসে তারপর থেকে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে ১৭ শতাংশ।

টোরি নেতারা ব্রিটেনের মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, ব্রিটেনকে রক্ষা করতে এই সামরিক ব্যয় অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে লন্ডন থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে তারা বসাচ্ছে ৯৬টি মার্কিন ক্র্যুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ক্যাম্ব্রিজের কাছে মোলসওয়ার্থ সামরিক ঘাঁটিতে বসান আরও ৬৪টি ক্র্যুজ ক্ষেপণাস্ত্র। লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায় ব্রিটেনে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে বর্ণনা দেয়। লন্ডনের 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা রেখাচিত্র দিয়ে দেখিয়েছে, গোটা ব্রিটেনই মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পরিপূর্ণ। পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ মার্কিন বোমারুর বিরাট ডিপো হয় ওয়ারিংটন, অ্যাকোনবারি, বেন্টওয়াটার্স, উডব্রিজ, কেয়ারফোর্ড, লেকারহীথ, মিল্ডেনহল এবং আপার হিফোডে। স্কটল্যান্ডের হোলি লছ্-এর ঘাঁটিতে রয়েছে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত মার্কিন সাবমেরিন।

এরপর মার্কিন ঘাঁটিগুলির সামনে বিরাট প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়। অসংখ্য মহিলা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে লন্ডনে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। একই সাথে গ্রীনহাম কমন সামরিক ঘাঁটিতে মহিলারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

তাঁরা বলেন, ভিন্‌দেশে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বেআইনী এবং তা মানবাধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও মার্কিন সংবিধানেরও পরিপন্থী। শান্তি প্রবক্তাদের বক্তব্য, ক্র্যুজ ক্ষেপণাস্ত্র আত্মরক্ষামূলক নয়, আক্রমণাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র। এই প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছে পোলারিশ ও ট্রিডেন্ট ক্ষেপণাস্ত্রের নির্মাতা রবার্ট অ্যালড্রিজ।

ব্রিটেনের মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলির সামনে শান্তি শিবির গড়ে ওঠে। নিউইয়র্কে তাঁরা সকলে পোস্ট কার্ড পাঠান। তাতে বলা হয়েছে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের সামনে গ্রেট ব্রিটেনের যে বিরাট মানচিত্র রয়েছে তাতে যে পোস্ট কার্ডগুলি লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে লোকে বোঝে যে, গোটা ব্রিটেনে কিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধঘাঁটি তৈরি করছে।

ব্রিটেনের নিরাপত্তার বদলে ব্রিটেনের মার্কিন ঘাঁটিগুলি ডেকে নিয়ে আসছে প্রতিশোধাত্মক আক্রমণের বিপদ। ব্রিটেনে অনেকেই এই বিপদের কথা উল্লেখ করছেন। লেবর পার্টির নিয়ন্ত্রিত গ্রেটার লন্ডন কাউন্সিল এক পুস্তিকায় ব্রিটেনের সামনে বিপদের নানা পরিসংখ্যান দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যদি ব্রিটেনের ওপর প্রতিশোধাত্মক পারমাণবিক আক্রমণ হয়, তা হলে ৪৫ থেকে ৫০ লক্ষ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ আহত ও বিকলাঙ্গের জীবনযাপন করবে।

পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে গঠিত চিকিৎসাবিদদের সংগঠন বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আর কিছুই করার থাকবে না। প্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ অক্সফোর্ড শহরে ধর্মীয় ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রচারিত এক ইস্তেহার, তাতে বলা হয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্রের বিধ্বংসী বিপদ থেকে এই প্রাচীন শহর ও ব্রিটেনকে রক্ষা করতে হবে। অক্সফোর্ডে চিকিৎসকদের সংগঠনের এক সক্রিয় কমকর্তা শ্রীমতী হিটলে বলেছেন, এই সংগঠনের মধ্যে ২০০ জন খ্যাতনামা চিকিৎসক রয়েছেন। অন্যান্য শহরেও চিকিৎসকদের এই সংগঠন

রয়েছে। লন্ডনে শান্তির সপক্ষে যে বিরাট সমাবেশ হয়, তাতে অক্সফোর্ডের এই চিকিৎসকরাও যোগ দেন। ডাক্তাররা প্রচার করেছেন, পারমাণবিক যুদ্ধের কী ভয়ঙ্কর বিপদ জনজীবনে আসতে পারে।

লন্ডনের বিপর্যয়ের স্মৃতিতে ক্রিস্টোফার রেন ৩০০ বছর আগে যে সুদৃশ্য মিনার গড়ে তুলেছেন তারই পাশে গ্রীনহাম কমন সামরিক ঘাঁটির সামনে শান্তিকামী বিক্ষোভরত মহিলাদের উদ্দেশ্যে তৈলচিত্র আঁকতে চারজন মহিলা শিল্পী উদ্যোগ নেন। গ্রেটার লন্ডন কাউন্সিল এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন। যুদ্ধ মিউজিযামের প্রাচীরে এই তৈলচিত্র প্রদর্শিত হবে। কে জানে, পারমাণবিক যুদ্ধের বিপক্ষে এই শিল্পীরা হয়তো ভবিষ্যতে বিলীন হয়ে যাবেন।

থ্যাচারের বিদায়।

সাড়ে এগারো বছর ধরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার পড় গত ২৭শে নভেম্বর, ১৯৯০ মার্গারেট থ্যাচারকে বিদায় নিতে হলো। শারীরিক কারণেও নয়, বা নির্বাচনে পরাজিত হয়েও নয় — থ্যাচারকে বিদায় নিতে হলো নিজ দল 'রক্ষণশীল দল'-এর চাপে। রক্ষণশীল দলের অভ্যন্তরে দলের নেতার প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের প্রশ্নে ২২শে নভেম্বর ভোট হলো। মার্গারেট থ্যাচারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তদানিন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাইকেল হেসেলটাইনের। থ্যাচার আস্থাভোটে জয়লাভ করতে পারেন না। অবশ্য প্রথম রাউন্ডে মাইকেল হেসেলটাইনও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান না। দ্বিতীয় রাউন্ড ভোটের কথা ঘোষিত হয়। কিন্তু থ্যাচার দ্বিতীয় রাউন্ড ভোটের মুখোমুখি হতে না হতেই রানী এলিজাবেথ (২) থ্যাচারকে পদ ছেড়ে দেবার পরামর্শ দেন। মার্গারটে থ্যাচার কিছুটা আকস্মিকভাবেই পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।

এই পটভূমিকায় দলের নতুন নেতা নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য রক্ষণশীল দলের অভ্যন্তরে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো — মাইকেল হেসেলটাইন, জন মেজর এবং ডগলাস হার্ড-এর মধ্যে। প্রথমে এই তিনজনের মধ্যে কেউই নির্বাচিত হতে পারেন না। ডগলাস হার্ড খুব কম সংখ্যক ভোট পাওয়ায় নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে বাদ পড়ে যান। আর হেসেলটাইন নাম প্রত্যাহার করে নেন। জন মেজর (৪৮) ব্রিটেনের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি মার্গারেট থ্যাচারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির অতীব সমর্থক বলে পরিচিত।

লৌহ মানবী নামে খ্যাত মার্গারেট থ্যাচার বিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। স্বভাবতই থ্যাচারের পদত্যাগের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াটা খুব প্রকটই হয়ে পড়ে। সবচেয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ইউরোপীয় গোষ্ঠী ঃ আমাদের কাঁধে দায়িত্বের বিরাট বোঝা চাপল। তৎকালিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেন ঃ আমি আমার একজন দায়িত্বশীল পরামর্শদাতাকে হারালাম।

১৯৭৯ সালে থ্যাচার গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে পশ্চিমী দুনিয়ার অর্থনীতিবিদেরা বলতে থাকেন যে, থ্যাচারের শাসনকালে গ্রেট ব্রিটেনে অর্থনৈতিক বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে। সেই অর্থনৈতিক বিস্ময়ের চাবিকাঠিটা কি? লন্ডন টাইমসের ভাষায় এই অর্থনৈতিক বিস্ময়ের চাবিকাঠি হলো, কর হ্রাস, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমন এবং রাষ্ট্রীয়

শিল্প কারখানাগুলি বেসরকারী ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেওয়া। ব্যক্তিগত পুঁজির বিকাশই ইউরোপীয় অর্থনীতিতে 'থ্যাচারিজম' নামে পরিচিত। ১৯৮০-র দশকে 'থ্যাচারিজম' গ্রেট ব্রিটেনে নতুন করে কয়েকলক্ষ পুঁজিপতি সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত পুঁজির বিকাশ একদিকে যেমন সেখানে অর্থনীতির ক্ষেত্রে গতিসৃষ্টি করে, অন্যদিকে নবসৃষ্ট পুঁজিপতিরা রক্ষণশীল দলের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচনে জয়ী হবার পরই মার্গারেট থ্যাচারের গৌরব ম্লান হতে থাকে। ১৯৮৭ সালে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে অর্থনৈতিক মন্দার তীব্রতা। মুদ্রাস্ফীতির হার যখন ১০৯ শতাংশ হয় ঠিক তখনই সরকার সুদের হার বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশে। গ্রেট ব্রিটেনে এই সুদের হার বৃদ্ধি সর্বকালীন রেকর্ড। যে হারে গ্রেট ব্রিটেনে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে তা ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক। এর অনিবার্য পরিণামে সেখানে বেকারী বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য থ্যাচার সরকার পোল ট্যাক্স আরোপ করে। পোল ট্যাক্সের দুটি প্রতিক্রিয়া দেশের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে : (১) যাঁরা নিজস্ব উদ্যোগে বাড়ি তৈরি করেছিলেন তাঁদের শতকরা ৭০ জনকে দেনা শোধ করার জন্য বাড়ি বন্ধক দিতে হয় (২) গ্রেট ব্রিটেনের বর্হিবাণিজ্য প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। পোল ট্যাক্সের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত হয়। স্কুল-কলেজে লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। অনেক স্থানে আন্দোলন হাঙ্গামার রূপ নেয়। ব্রিটেনের সমাজবিজ্ঞানীরা পোলট্যাক্স বিরোধী আন্দোলনকে দেশের অভ্যন্তরে বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম আন্দোলন বলে অভিহিত করেন। সরকারী ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। সঙ্কটের কবল থেকে মুক্তি পেতে, থ্যাচার সরকার এই দুটি ক্ষেত্রের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে জন-অসন্তোষ খুবই বৃদ্ধি পায়। থ্যাচারের নীতির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যে যতটা না অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, তার চেয়ে বেশি অসন্তোষ সৃষ্টি হয় নিজ দলের মধ্যে। একটা সময় দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ প্রায় বিদ্রোহের রূপ নেয়। থ্যাচার বেশ কিছু সময় নিজ ব্যক্তিত্বের দাপটে দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ চেপেও রাখেন। দলের বৈঠকে তিনি একাধিকবার মন্তব্য করেন, আপনারা পিছু হঠতে পারেন কিন্তু এই মহিলা কখনও পিছু হঠবে না। তবে তাঁকে পিছু হঠতেই হলো।

থ্যাচারের পিছু হঠার কাজকে ত্বরান্বিত করল ইউরোপীয় অর্থ ব্যবস্থায় 'থ্যাচাবিজম' প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা। এই প্রশ্নে ব্রিটেনের প্রাক্তন উপ্-প্রধানমন্ত্রী জাফ্রে হাও এর সঙ্গে থ্যাচারের প্রচণ্ড আদর্শগত সংঘাত হয়। হাও এ চেয়েছিলেন ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং সাধারণ অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠন। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে রোমে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর একটি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রোম বৈঠকে এই মর্মে পরিকল্পনা গৃহীত হয় যে, ১৯৯৪ সালের মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলির জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং ২০০০ সালের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে একই ধরনের মুদ্রা প্রবর্তন করা হবে। মার্গারেট থ্যাচার রোম শীর্ষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদেই জেফ্রি হাও ঐ বছর ১লা নভেম্বর পদত্যাগ করেন। হাও তাঁর পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেন : 'ইউরোপীয় অন্যান্য দেশগুলির প্রতি

প্রধানমন্ত্রী এমন অবুঝ মনোভাব গ্রহণ করেছেন যার ফলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।'

নানা বিষয়ে মতানৈক্যের দরুণ এরপূর্বে আরো তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। ১৯৮৬ সালে মাইকেল হেসেলটাইন প্রস্তাব দেন যে, ব্রিটেনের হেলিকপ্টার নির্মাণ শিল্প চাঙ্গা কবতে আমেরিকার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির সাথে সহযোগিতা বাড়ানো দরকার। থ্যাচার এই প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ায় হেসেলটাইন পদত্যাগ করেন। ১৯৮৯ সালে ব্রিটেনের চ্যানসেলর অফ্ এক্স্চেকার নিগেল ল'সন প্রস্তাব দেন, ব্রিটেনের 'এক্সচেঞ্জ রেট মেকানিজম' সংস্থার সদস্য হওয়া উচিত। থ্যাচার সে প্রস্তাব খারিজ করে দেন। ল'সন থ্যাচারকে স্বৈরতন্ত্রী বলে অভিহিত করে পদত্যাগ করেন। ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রমমন্ত্রী নরম্যান ফাওলার পদত্যাগ করেন। একের পর এক মন্ত্রীর পদত্যাগের ফলে সামগ্রিকভাবে থ্যাচার মন্ত্রিসভাতেই দেখা দেয় গভীর সঙ্কট। অবশেষে ১৯৯০ সালের ২২শে নভেম্বর থ্যাচার এক বিবৃতিতে তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বলেন ঃ 'আজ দলের সামনে বড় প্রশ্ন ঐক্য। কেননা নির্বাচনে দলকে জিততে হবে। দলের ঐক্যের স্বার্থে আমি পদত্যাগ করছি।' তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর প্রতিটি নীতির সমর্থক জন মেজর। তাই থ্যাচার বিদায় নিলেও থ্যাচারিজম কিন্তু তখনও বিদায় নেয় নি।

ফ্রান্স

ফ্রান্সে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের অসন্তোষ ক্রমেই প্রকাশ্যে ফেটে পড়তে শুরু করছে। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রয়ত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ধর্মঘট সহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করেছেন। সরকারী হাসপাতালের নার্সরা অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহার্য মুখোশ মুখে বেঁধে বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে মিছিল করেছেন। জেলখানার ওয়ার্ডেনরা দীর্ঘদিন ধর্মঘট করেছেন। ধর্মঘট করেছেন সরাকারী প্রচার মাধ্যম রেডিও, টেলিভিশনের কর্মীরাও। ১৯৮৬ সালে রেল ও বিদ্যুৎ কর্মীরা ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হন।

ফ্রাঁসোয়া মিতেঁর-এর সোস্যালিস্ট শাসনে ফ্রান্সের সরকার মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাবার জন্য ১৯৮২ সাল থেকে সরকারী ব্যয় সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করেছে। এই ব্যয় সঙ্কোচনের প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছেন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মীরা, কারণ ১৯৮৫ সাল থেকে সরকার ঐ কর্মীদের মজুরি সঙ্কোচনের নীতি নিয়ে চলেছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উপর ডাণ্ডা চালালেও বেসরকারী ক্ষেত্রকে ঢালাও সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এটাই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের আরও বেশি ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৮৫ সালে তৎকালীন স্যোস্যালিস্ট প্রধানমন্ত্রী লরেস্ট ফেবিয়াস দ্রব্যমূল্য সূচক থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের মজুরি/বেতনকে বিযুক্ত করেন। পরের বছর পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রী হন রক্ষণশীল জ্যাক শিরাক। ১৯৮৬ সালে রেল ও বিদ্যুৎ কর্মীদের ধর্মঘট দেড় মাস চলার পর শিরাকের অনমনীয় মনোভাবের পরিণতিতে ভেঙে যায়। শিরাক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে কঠোর নীতি নেবার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ঢালাও স্বাধীনতা দিয়ে দেন। এই কাজে তাঁর যুক্তি ছিল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের

কর্মীদের চাকুরির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, যেটা বেসরকারী ক্ষেত্রে নয়। তাই নিরাপত্তার বিনিময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

ওদিকে, সরকার নিজের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যয় সঙ্কোচনের নীতি নিলেও বেসরকারী ক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে ফ্রান্সের সমাজজীবনে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মজুরি/বেতন সঙ্কোচনের এই নীতির গোড়া থেকেই বিরোধীতা করে আসছে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি। যে সব কারণে কমিউনিস্ট পার্টি সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে গঠিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে ১৯৮৪ সালে বেরিয়ে এসেছিল তার অন্যতম কারণ এই মজুরি সঙ্কোচন নীতি। অর্থনীতির পুনরুন্নয়নের নামে ব্যয় সঙ্কোচনের ফলশ্রুতি ছাঁটাই, বেকারী, লে-অফ, কাজের বোঝা বৃদ্ধি সবই ফ্রান্সে ঘটেছে।

এদিকে ইউরোপ থেকে মার্কিন ও সাবেক সোভিয়েত মাঝারি পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র সরিয়ে নেবার জন্য আই এন এফ চুক্তির পর ইউরোপে পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করায় ফ্রান্স অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ব্রিটেনও ফ্রান্সের পথ গ্রহণ করে। ফ্রান্সের উদ্যোগে ন্যাটো জোটের একটি ইউরোপীয় অলিন্দ গড়ে তোলা হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মহাকাশ যুদ্ধ কর্মসূচীর রূপায়ণে মার্কিন প্রশাসন পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে সামরিক গবেষণা ইত্যাদি খাতে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করার চাপ দেয়। এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ফ্রান্স তার রাজস্বের ৪০ শতাংশ এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের দুই-তৃতীয়াংশ সামরিক গবেষণা ইত্যাদিতে ব্যয় বরাদ্দ করে। ফ্রান্সের সরকার একটি সামরিক কর্মসূচী আইন রচনা করে। এই বিধি অনুসারে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ফ্রান্স ৫০ হাজার কোটি ফ্রাঁ সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক খাতে এই ব্যয় পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে।

ফ্রান্স এখন পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে সংহত করে পশ্চিম ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

একদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের উপর ডাণ্ডা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমালিকদের মুনাফা লোটার ঢালাও সুযোগ দান এবং অন্যদিকে পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়া এবং সামরিক খাতে বিপুল ব্যয় বৃদ্ধি ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী মাথা পেতে করেনি।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ

১৯৯৫ সালের ৬ এবং ৯ই আগষ্ট বিশ্বব্যাপী যথাক্রমে হিরোসীমা এবং নাগাশাকি দিবস উদ্‌যাপিত হয়। জাপানের এই দুই শহরে মার্কিনী বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে দেশে দেশে এই দুটি দিবস উৎযাপিত হয়। আর সব দেশই দাবি তোলে আর নয় পারমাণবিক বোমা। কোন কোন দেশের পক্ষ থেকে এই দাবিও তোলা হয় যে, ১৯৯৬ সালে যদি পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তবে চুক্তি স্বাক্ষরের দিন হিসেবে ৬ই আগষ্ট দিনটি বেছে নেওয়া হোক। কিন্তু কে কার কথা শোনে? যে ফ্রান্স ১৯৮৬ সাল থেকে সম্পূর্ণ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য দাবি জানিয়ে এসেছে, সেই ফ্রান্স দু'দুবার পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। ফ্রান্সের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জাক্ চিরাকের শাসনকালের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে দু'দুবার পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ সকলকেই

হতবাক করেছে। সীমিতভাবে হলেও প্রতিবাদ আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছে। ফ্রান্স অবশ্য দু'দুবারই ঘোষণা করে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আর ঘোষণার মর্মবস্তু হলো ১৯৯৬ সালে যাতে সম্পূর্ণভাবে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ হয় সেই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্যই ফ্রান্স এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। চিরাক প্রশাসনের আরও ঘোষণা হলো ঃ পূর্বতন প্রেসিডেন্ট দ্য গল ১৯৯২ সালেই এই পরমাণু বিস্ফোরণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সরকার সেই ঘোষণা কার্যকর কারেছে মাত্র। নতুন করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। যদিও নির্বাচনী প্রচারের সময় চিরাক ঘোষণা করেছিলেন যে এই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা তিনি স্থগিত রাখবেন।

ফ্রান্সের পরমাণু বোমা বিস্ফোর'ণর বিরুদ্ধে প্রতিবাদটাও সংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়। ফ্রান্স যে আটটি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার প্রথমটির বিস্ফোরণ ঘটে তাহিতির উপকূলে। এই তাহিতি প্যারিস থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই তাহিতি দ্বীপটি এখনো ফ্রান্সের উপনিবেশ। বোমা বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই দ্বীপের সর্বত্র বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। দ্বীপের প্রায় শতকরা একশভাগ নরনারী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই বিক্ষোভ সব থেকে বেশি দানা বাঁধে। কোপেনহেগেন থেকে ক্যালবেরা অবধি ফরাসি দূতাবাসগুলিতে অবরোধ চলে। নিউজিল্যান্ড এবং চিলি প্যারিস থেকে নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী পল কেটিং বোমা বিস্ফোরণকে মূর্খের কাজ বলে অভিহিত করেন। চিরাকের সমর্থকেরা এই প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে আর একবার বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। আন্তর্জাতিক পরিবেশ রক্ষা কমিটিগুলি যখন বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে ফরাসি পণ্য বয়কটের ডাক দেয় তখন চিরাক সমর্থকেরা সেই ডাককে বিদেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। কিন্তু প্রতিবাদটা কেবল বিদেশের মাটিতেই সংগঠিত হয় নি, দেশের অভ্যন্তরেও গণ অসন্তোষ দেখা দেয়। তারই প্রতিফলন দেখা যায় এই বিস্ফোরণ সম্পর্কিত জনমত সমীক্ষায়। প্রথমবারের বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই দেশের অভ্যন্তরে জনমত সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সেই সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ফ্রান্সের ষাট শতাংশ নাগরিকই এই বিস্ফোরণ অনুচিত কাজ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও চিরাক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের এই পথ গ্রহণ করলেন কেন? কেনই বা তিনি কিছুটা সময় পর্যন্ত নিলেন না? এই প্রশ্নের জবাবে চিরাক প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা বলেছেন ফরাসি পরমাণু অস্ত্রের মান যাচাই করার জন্যই এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। সরকারী বক্তব্যের সার কথা হলো ঃ আমেরিকা, ব্রিটেন এবং রাশিয়ার তুলনায় ফ্রান্সের পরমাণু অস্ত্রের মান উন্নত নয়। কিন্তু পরমাণু বিজ্ঞানীরা সবশেষ যে পরমাণু বোমা তৈরী করেছেন তা ঐ সমস্ত দেশের পরমাণু বোমার চাইতে উন্নত মানের। সেটা বিশ্ব দরবারের সামনে উপস্থিত করার জন্যই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ফরাসি সরকারের এই বক্তব্য আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়। বিস্ফোরণের রহস্য রয়েছে অন্যখানে — দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মধ্যে।

ফ্রান্সের সংবিধান অনুযায়ী ঐ দেশে একবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারলে সাত বছর তিনি ক্ষমতায় থাকেন। চিরাক রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। তাও দ্বিতীয় রাউন্ডের নির্বাচনে। প্রথম রাউন্ডের নির্বাচনে তিনি

প্রকৃতপক্ষে হেরেই গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডের নির্বাচনে তিনি যে জয়লাভ করেন তার মূলে রয়েছে দেশের নয়া-ফ্যাসিস্ত নামে পরিচিত। ফ্রান্সের নয়া ফ্যাসিস্তরা সেখানে উগ্র ফরাসি জাত্যাভিমানের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এই সমস্ত চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হলো জোঁ-মেরি লা পেঁর ন্যাশনাল ফ্রন্ট রাজনীতিগতভাবে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী। বিগত নির্বাচনেও ন্যাশনাল ফ্রন্টের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল ইউরোপের বুকে ফরাসিদের মান মর্যাদা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে দুই জার্মানির মিলন ঘটার পর ইউরোপে জার্মানি আবার শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার ব্রিটেন ম্যাচট্রিক চুক্তির নেতা হিসেবে বিশ্বে নতুন মর্যাদা অর্জন করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ফরাসিরা জাতি হিসেবে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। অন্যদিকে ইউরেপের মধ্যে ফ্রান্সেই শতকরা হারে বেকারের সংখ্যা বেশি। চিরাক নির্বাচনের পূর্বে নতুন কর্ম সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি সেই প্রতিশ্রুতি তো রাখতেই পারেন নি, পরন্তু তাঁর শাসনকালের চার মাসে ফ্রান্সে ০.৮ শতাংশ বেকারী বৃদ্ধি পেয়েছে। চিরাক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই বৃদ্ধির হার খুবই উদ্বেগজনক। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন সংস্কার কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। কিন্তু ২০শে সেপ্টেম্বরের সংসদ অধিবেশনে তিনি কোন নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করতে পারেন নি। তাই শাসনকালের প্রথম পর্যায়ের ফরাসি জনগণের মধ্যে একটি উন্মাদা সৃষ্টি করে জনপ্রিয়তা অর্জনের পথ নেন। সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্য নিয়েই এই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

শ্রমিক ধর্মঘট

১৯৯৫ সালের ২৪শে নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর টানা ২১ দিনের শ্রমিক ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়েছিল ফ্রান্স। ১৯৬৮ সালের পরে ফ্রান্সের বুকে এত দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বব্যাপক ধর্মঘট দেখা যায়নি। কোনও কোনও পর্যবেক্ষক ধর্মঘটের দিনগুলিতে ফ্রান্সের অবস্থা দেখে ১৭৮৯,১৮৩০,১৮৪৮ সালের বিপ্লবে উত্তাল ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

ফ্রান্স শ্রমিকদের এই ধর্মঘট শুধু সেদেশের দক্ষিণপন্থী অ্যালেন জুপ্পে সরকারের সামনে বিপদ হয়ে হাজির হয়নি, ১৯৯৯ সালের মধ্যে অভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে বড় প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে।

১৯৯৫ সালের নভেম্বরে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী অ্যালেন জুপ্পে সংসদে ঘোষণা করেনে যে তিনি সরকারের সমাজকল্যাণ খাতে ৩০,০০০ কোটি ফ্রাঁ বরাদ্দ ছাঁটাই করবেন। জুপ্পে আরও ঘোষণা করলেন, পেনশনের পুরো সুবিধা পেতে হলে সরকারী কর্মচারীদের কাজের বোঝা বাড়বে, স্বাস্থ্য পরিষেবায় বরাদ্দ ছাঁটাই করা হবে, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকার তার দায়দায়িত্ব কমিয়ে ফেলবে। ১৯৯৯ সালে অভিন্ন ইউরোপীয় মুদ্রা চালু হবে, অতএব রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেও সরকার তার খরচ কমাবে। জুপ্পে জানালেন, সরকারী রেল ব্যবস্থায় কনট্রাক্ট প্রথা চালু হবে এবং শ্রমিক ছাঁটাই করা হবে।

এই ঘোষণার পর যে ফ্রান্সে বিরাট প্রতিবাদের ঝড় উঠবে তা আগেই আন্দাজ করা গিয়েছিল। কারণ সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে ১৯৯৫ সালের ১০ই অক্টোবর সারা দেশে

৫০ লক্ষ সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট করেছিলেন। কিন্তু ২৪শে নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট যে এতদিন স্থায়ী হবে এবং এত মানুষের সমর্থন পাবে তা অনেকেই অনুমান করতে পারেননি। ধর্মঘটের শুরু করেছিলেন রেল শ্রমিকরা। তাঁদের প্রতিবাদ করার প্রস্তাব বাতিলের দাবিতে। কিন্তু জুপ্পে সরকার প্রথম থেকেই অনমনীয় মনোভাব দেখানোয় রেল শ্রমিক ধর্মঘট চলতেই থাকে, অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শ্রমিকরাও শামিল হলেন ধর্মঘটে। ডাক ও টেলিকম কর্মীরা, হাসপাতাল কর্মচারীরা, শিক্ষক ও বিদ্যুৎ কর্মীরাও সক্রিয় আন্দোলনে নেমে পড়লেন। পিছিয়ে থাকলেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বরাদ্দ হ্রাসের সিদ্ধান্ত তাঁদেরও ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল। তাই ছাত্ররাও নামলেন রাস্তায়। সকল পর্যবেক্ষকই একথা স্বীকার করেছেন যে ঐ ধর্মঘটে ফ্রান্সের কিছু ধনী মানুষ ছাড়া সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। ধর্মঘটের ফলে প্যারিস, মার্সাই, লিঁঅ-র মস্ত বড় শহর সম্পূর্ণ অচল হয়ে গিয়েছিল। গোটা দেশেই বাস চলেনি। ট্রেন চলেনি, বন্ধ ছিল মেট্রো রেল। শহরগুলিতে ভয়ানকরকম যানজট লক্ষ্য করা গেছে প্রতিদিনই। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সি জি টি ইউনিয়ন এই ধর্মঘটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ধর্মঘটের সমর্থনে যে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল তার অন্যতম কারণ প্রধানমন্ত্রী অ্যালেন জুপ্পে ও রাষ্ট্রপতি জ্যাক শিরাকের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ। রাষ্ট্রপতি হবার আগে শিরাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি ক্ষমতায় এলে করের বোঝা কমাবেন, বেতন বাড়বেন, বিকাশের হার বাড়াবেন, সরকারী কাজকর্মের উন্নতি ঘটাবেন। কিন্তু শিরাক বা জুপ্পে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় শুধু ব্যর্থই হননি, ক্ষমতায় এসে রাতারাতি তিনি যেভাবে সম্পূর্ণ উলটোপথে যাত্রা শুরু করলেন তাতে সাধারণ ভাবে ফ্রান্সের মানুষ হতচকিত হয়ে পড়েন। তার উপর সংশিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই তিনি একতরফাভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ফলে আগুনে ঘি পড়ল।

ধর্মঘটের শুরুতে সরকার যে কোনও রকম আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যখন ধর্মঘট দ্বিতীয় সপ্তাহে এবং তারপর তৃতীয় সপ্তাহে পড়ল তখন জুপ্পে কিছুটা নরম মনোভাব দেখালেন। প্রথমে তিনি এক ব্যক্তিকে ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার জন্য নিয়োগ করলেন। কিন্তু শ্রমিকদের বক্তব্য ছিল তাঁরা একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কারোর সঙ্গে কথা বলবেন না। এর পর জুপ্পের সুর আরও নরম হলো। তিনি ঘোষণা করলেন পেনশন নীতির আপাতত পরিবর্তন হবে না, রেলকর্মীদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট প্রথাও চালু হবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতিতে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন ১৭ই ডিসেম্বর বিজয় সমাবেশের মধ্য দিয়ে।

ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে জুপ্পে সরকারকে কিছুটা হলেও যে পিছু হঠানো গেল একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সঙ্কট মিটে গেল একথা মনে করার কারণ নেই। কারণ জুপ্পে সরকারের সামনে তখন কঠিন পরীক্ষা। অভিন্ন ইউরোপীয় মুদ্রায় যদি ফ্রান্সকে যুক্ত হতে হয় তবে সরকারকে তার বাজেট ঘাটতি কমাতেই হবে, কমাতে গেলে সমাজ কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করতেই হবে। তখনই আবার দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে সন্দেহ নেই।

জাতীয় সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সক্রিয় মদত পেয়ে জুপ্পে ভেবেছিলেন তিনি তাঁর সংস্কার কর্মসূচী বিনা বাধায় এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই

কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই করে বর্তমান ঘাটতি পাঁচ শতাংশ থেকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তিন শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা। এই ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে শিরাক-জুপ্পে সরকার জার্মানি, ব্রিটেনের মত অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির পথকেই অনুসরণ করেছে। জুপ্পের প্রস্তাব থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভবিষ্যতেও শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর আঘাত হানতে তিনি সদাসচেষ্ট। বিরাট বিরাট বেসরকারী শিল্প সংস্থা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বক্ষায় তিনি সংকল্পবদ্ধ লড়াই করতে। শ্রমিক ধর্মঘটের প্রধান দাবিই ছিল জুপ্পে সরকারেব সামগ্রিক সংস্কাব নীতি বাতিল করতে হবে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি কোথায় যায় সেটা লক্ষ্য করার। কিন্তু ফ্রান্সে শ্রমিকদের ধর্মঘট একথা প্রমাণ করেছে, পুঁজিবাদীরা যা চাইবে সবকিছুই শ্রমিকশ্রেণী মুখ বুজে মেনে নেবেন একথা মনে করার কোনও কারণ নেই।

জার্মানি

১৯৯০ সালের পয়লা জুলাই থেকে দুই জার্মানির মধ্যে অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক ইউনিয়ন গঠনের চুক্তি কার্যকর হয়েছে। এর একদিন পূর্বে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী জার্মানি নিজস্ব সরকারী মুদ্রা প্রত্যাহার করে নেয়। ঘোষণা করে যে, পশ্চিম জর্মানির মুদ্রাই দুই জার্মানির সরকারী মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

একথা সত্য যে, দুই জার্মানিই মিলনের পথে দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু মিলন প্রক্রিয়ায় দুই জার্মানির মধ্যে মতানৈক্যের ক্ষেত্রটিও ছোট নয়। যে সমস্ত প্রশ্নে মতানৈক্যের এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে নি তার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় চুক্তির সময়কাল, দুই জার্মানির মিলনের পর সেনাবাহিনীর অবস্থান, জোট সদস্য। ফেডারেল জার্মানি বিশেষ করে চ্যান্সেলার হেলমুট কোল মিলনের প্রশ্নে কোনরূপ কালবিলম্ব করতে আদৌ রাজি নন। আবার গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী জার্মানির সরকারও দ্রুত মিলনের পক্ষপাতী। কিন্তু জি ডি আর সরকার সর্তকতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় — দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে। ঐ বছর ১৩ই জুন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী জার্মানির প্রধানমন্ত্রী লোথার দ্য মেজিয়েরে আমেরিকা সফর শেষে দেশে ফেরেন। দেশে ফিরেই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ইউরোপীয় ঐক্যের সময়সীমার সঙ্গে তাল রেখে দুই জার্মানির মিলন সম্ভব নয়। এই মিলন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে ধীরে ধীরে। তিনিও মনে করেন যে, ১৯৯০ সালের ৯ই ডিসেম্বরই দুই জার্মানিতে একই সঙ্গে সাধারণ নির্বাচন হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার একথাও মনে করেন যে, পূর্ব জার্মানির পাঁচটি রাজ্যের সীমানা পূর্ব জার্মানির সীমানার মধ্যেই থাকা দরকার।

এদিকে আর্থিক ইউনিয়ন গঠিত হবার পর উভয় জার্মানিতেই নতুন করে সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। পশ্চিম জার্মানির মুদ্রা অর্থাৎ দুচে মার্কের চাহিদা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই মুদ্রার স্থায়িত্ব সমস্যা লক্ষ্য করা গেছে, আর্থিক লেনদেন ও সামাজিক চাপের সমস্যা প্রকট হয়েছে। এর মধ্যেই দুচে বানদেচব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট কার্ল ওটো বলেছেন ইতিমধ্যেই যে সংখ্যক মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়েছে পশ্চিম জার্মানি সরকার যদি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে তবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের উপর

অর্থনৈতিক বোঝা চেপে বসবে। এজন্য তিনি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে সামরিকখাতে ব্যয় ববাদ্দ হ্রাস প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম জার্মানি সরকার সামরিকখাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস কবতে রাজি নয়। পশ্চিম জার্মানি সবকাবেব বক্তব্য হলো, যে শর্তে জি ডি আর-এর সঙ্গে আর্থিক চুক্তি হয়েছে তাতে এই মুদ্রা সঙ্কট দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সেই শর্ত হলো, জি ডি আর সরকার দেশের অর্থনৈতিক এবং আর্থিক সার্বভৌমত্ব পশ্চিম জার্মানি সরকারের কাছে হস্তান্তর করবে।

কিন্তু এর ফলে পূর্ব জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থাটা কি হয়? বেশ কিছুসংখ্যক শিল্প কারখানা এই মুহূর্তে বন্ধ করে দিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেবার প্রক্রিয়া পূর্ব জার্মানিতে চলে। বেকারী ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। জনগণের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়। তদানীন্তন পূর্ব জার্মানির ৬০ শতাংশ শ্রমিক কর্মহীন হবার আশঙ্কায় দিন কাটান। আর নারী শ্রমিকদের ৬৯ শতাংশই কর্মহীন হবার আতঙ্কে ভোগেন।

ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সেনাবাহিনীব মর্যাদা ও গঠন নিয়েও প্রচণ্ড মতানৈক্য রয়েছে। উভয় সরকারই মনে করে যে ঐক্যবদ্ধ জার্মানিব প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে একটি সেনাবাহিনী থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ব জার্মানির সর্বশেষ শর্ত হলো, এই সেনাবাহিনী ছাড়াও দ্বিতীয় একটি সেনাবাহিনী গঠনের অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই দ্বিতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব জার্মানির পাঁচটি রাজ্যের যৌথ কমান্ডে কাজ করবে।

প্রথমে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি আদৌ ন্যাটো'র সদস্য থাকবে কিনা সে প্রশ্নে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। সেই প্রশ্নের আপাত সমাধান ঘটেছে। স্থির হয়েছে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ন্যাটোর সদস্য হবে। কিন্তু আজ নতুন করে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা হলো ন্যাটো'র মর্যাদার রূপান্তর ঘটাতে হবে। কেবল পূর্ব জার্মানি নয়, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ডও দাবি করেছে যে ন্যাটো ব্যবহৃত হবে কেবলমাত্র ইউরোপীয় নিরাপত্তা বাহিনী হিসেবে। এখানেই শেষ নয়। জোট-এর প্রশ্নে আরো সমস্যা রয়েছে। পূর্ব জার্মানির সংসদে দাবি উঠেছে ওয়াবশ'র বিলুপ্তি ঘটানো যাবে না। ওয়ারশ' একটি বাজনৈতিক জোট হিসেবে কাজ করবে।

জার্মানির সঙ্কট

জার্মানির চ্যান্সেলার হেলমুট কোল সম্পর্কে ইউরোপীয রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে একটি কথা চালু আছে, তা হলো ভদ্রলোকের এক কথা। সেই কথাটি কি? হেলমুট কোল ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ১৯৯৯ সালের মধ্যে ইকনমিক অ্যান্ড মনিটারি ইউনিয়ন (ই এম ইউ) গঠন করবেনই। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের মনে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এক কথার মানুষ হেলমুট কোল আদৌ কথা রাখতে পারবেন কি? আবার এ প্রশ্নও দেখা দিয়েছে, ততদিন তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন তো? ইউরোপের দুই উন্নত রাষ্ট্র ফ্রান্স এবং জার্মানিতে আজ গণ-আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে পার্থক্যটা হলো ফরাসী সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদের অনেকগুলি দাবিই ন্যায্য বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু জার্মান-সরকার সেটুকুও করতে রাজি নয়। ফলে সেখানে গণ-অসন্তোষ দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণ-অসন্তোষের পাশাপাশি জার্মানিতে সামাজিক অস্থিরতাও বৃদ্ধি ঘটছে। ফরাসী সরকার যখন গণ-অসন্তোষ প্রশমিত করার

জন্য কতকগুলি সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচী পুনঃপ্রর্বতন করে তখন জার্মান সরকার নতুন করে সেগুলি প্রত্যাহার করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন এবং সামাজিক নিরাপত্তার দাবিতে সাম্প্রতিককালে বন-এ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নর-নারীর বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির ইতিহাসে এত বড় বিক্ষোভ মিছিল আর কখনও প্রত্যক্ষ করা যায়নি। বিক্ষোভের ফলশ্রুতিতে কোল-এর খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরেও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। দলের পক্ষ থেকে সংসদের নিম্নকক্ষে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং শিশুভাতা প্রবর্তনের দাবি তোলা হয়। কিন্তু হেলমুট কোল নিজে সেই দাবির বিরোধিতা করেন। বিরোধিতার স্বপক্ষে তিনি যুক্তি দেন যে, ঐ সমস্ত দাবি যদি মেনে নেওয়া হয় তবে সরকার সমাজকল্যাণমূলক অন্যান্য দাবিও মেনে নিতে বাধ্য হবে, তবে অর্থনৈতিক সংস্কারে যে গতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিঘ্ন ঘটবে। হেলমুট কোল একথাও গোপন রাখেননি যে, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ হবে ১৯৯৮ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে। তিনি স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন যে, ঐ নির্বাচনেও চ্যান্সেলার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং ই এম ইউ গঠনের স্লোগানকেই কেন্দ্রীয় স্লোগান হিসেবে বিবেচনা করবেন। জার্মানির উদারনীতিকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এই কথা ঘোষণা করে কোল আরও বলেছেন যে, এই উদারনীতিকরণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে তা এই প্রক্রিয়ার ছোট্ট সংশোধনী ছাড়া আর কিছু নয়। উদারনীতিকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি পাবলিক সেক্টরে মজুরি সংকোচন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র একের পর এক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। শ্রমিক ধর্মঘটের মুখে সরকার পাবলিক সেক্টরে কার্যরত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিবছর এক শতাংশ করে মজুরি বৃদ্ধিতে রাজি হন। কিন্তু এরই পাশাপাশি তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে, অসুস্থ শ্রমিকেরা বর্তমানে সরকারের কাছ থেকে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পান তার ৮০% হ্রাস করা হবে। জার্মান সরকার মজুরি বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার ফলে ৩২ লক্ষ শ্রমিক লাভবান হবেন। তবে অসুস্থ শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা কেটে নেবার ফলে এই মজুরি বৃদ্ধি শ্রমিকদের বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। ফলে জার্মানিতে গত যে শ্রমিক অসন্তোষ চলছিল তা প্রশমিত হবার কোন অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস করার জন্য কল নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন। তিনি নারী শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা ৬০ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬৫ বছর করেছেন।

সমগ্র ইউরোপে একই মানের মুদ্রা প্রবর্তনের প্রধান উদ্যোক্তা জার্মানি। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রশ্নেই ম্যাসট্রিক চুক্তির বিষয়ে জার্মানির সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতানৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে। হেলমুট কোল এখনও এই উদ্যোগ কার্যকর করার প্রশ্নে অটল রয়েছেন। কিন্তু জার্মানির মুদ্রা'র মান অতি দ্রুততার সঙ্গে নেমে যাচ্ছে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ৩৩০০ কোটি ডলার মুদ্রা ভাণ্ডারে সঞ্চয় করবেন। কিন্তু চলতি আর্থিক বছরেও জার্মান সরকার ৩ শতাংশ বাজেট ঘাটতি করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বে সরকারের অনুমান ছিল এই ঘাটতির পরিমাণ এক শতাংশের বেশি হবে না। এখন কোল বলছেন বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৯৯৯ সালের মধ্যে পূরণ করা সম্ভবপর হবে।

দুই জার্মানির মিলন

এগারো মাস ধরে নানা ঘটনা প্রবাহের পর ১৯৯০ সালের ৩রা অক্টোবর দুই জার্মানির মিলন ঘটল। প্রতিষ্ঠিত হলো ঐক্যবদ্ধ 'ইউনাইটেড রিপাবলিক অব জার্মানি'। জার্মানির ইতিহাসে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। দুই জার্মানির মিলন ও ঐক্যবদ্ধ জার্মানির ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার পূর্বে জার্মানি কীভাবে বিভক্ত হলো, কী তার ইতিহাস সেটা প্রথমে সাধারণভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে ১৯৪৫ সালের ৮ই মে। সেদিন জার্মান সেনাবাহিনী নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে মিত্র বাহিনীর কাছে। ১৯৪৫ সালের ৫ই জুন বার্লিন ঘোষণার মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্স জার্মানির কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। চারটি দেশের সেনাবাহিনীর কম্যান্ডার ইন চীফদের নিয়ে গঠিত হয় অ্যালায়েড কন্ট্রোল কাউন্সিল। ১৯৪৫ সালের ১৭ই জুলাই থেকে ২রা আগস্ট অনুষ্ঠিত পোটসডাম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জার্মানির নতুন সীমানা স্থিরীকৃত হয়। এই চুক্তির সূত্র ধরেই ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মান দ্বিধাবিভক্ত হয়। এ বছরের ৭ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী জার্মানি। আর ১৯৫৫ সালের ৫ই মে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মান। দুই জার্মানিব মধ্যে অনুপ্রবেশ ও অন্তর্ঘাত বন্ধ করতে ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে বার্লিনের মাঝ বরাবর প্রাচীর তোলা হয় যা বার্লিন প্রাচীর নামে খ্যাত।

বার্লিন প্রাচীর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেমন দুই জার্মান বিভক্ত হয়েছিল, তেমনি বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দুই জার্মানির মিলন প্রক্রিয়া। আর এক বছরের মধ্যে চার চারটি সরকারের অবসানের মধ্য দিয়ে দুই জার্মানির মিলন প্রক্রিয়া শেষ হয় ১৯৯০ সালের ৩রা অক্টোবর। ১৯৮৯ সালের ৯ই নভেম্বর বার্লিন প্রাচীর ভাঙার কাজ শুরু হয়। এক মাসের বেশি সময় ধরে চলতে থাকে বার্লিন প্রাচীর ভাঙার কাজ। আর এক একমাস ধরেই চলে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী জার্মানিতে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ। বিক্ষোভের তরঙ্গ পূর্বতন জি ডি আর-এর পাঁচটি অঙ্গরাজ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সমস্ত বিক্ষোভের পাশাপাশি সেখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে দ্রুততার সঙ্গে।

এই পরিবর্তনের আপাত সূত্রপাত ঘটে পূর্বতন সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির অভ্যন্তর থেকেই। সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির অভ্যন্তরে গঠিত হয় ডেমোক্র্যাটিক ফোরাম। সেই ফোরাম দাবি তোলে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারের। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সোসালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারি অধিবেশন হয় ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। অধিবেশনে হোনেকার সংখ্যালঘিষ্ঠতার পরিণত হন এবং পদত্যাগ করেন। দলের অভ্যন্তরে যে প্রশ্নে মত বিরোধ তীব্র হয় সেটি হলো, পার্টি সোস্যালিস্ট ডেমোক্র্যাসির স্লোগানে অবিচল থাকবে না ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম-এর তত্ত্ব গ্রহণ করবে। প্লেনারি অধিবেশনে এই তত্ত্বগত প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। তবে আপসের মধ্য দিয়েই সিদ্ধান্ত হয়, সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি সোস্যালিস্ট ডেমোক্র্যাসির মৌলিক নীতি পরিহার্য করবে না, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটাবে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কাঠামোগত পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়েই ক্ষমতাসীন হন এগন ক্রেনজ্। কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরীণ আন্দোলন নীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবির

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আর জি ডি আর এর জনগণের মধ্য থেকে দাবি ওঠে স্বাধীন নির্বাচনের। মাত্র সাড়ে তিন মাস ক্ষমতায় থাকার পর এগন ক্রেনজ্ পদত্যাগ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হ্যানস মডরো। তাঁর সময়েই সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির অবলুপ্তি ঘটে। গঠিত হয় পার্টি ফর ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম। প্রকৃতপক্ষে সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জি ডি আর-এর বুকে অবলুপ্তি ঘটে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কর্মসূচী। নতুন পার্টি গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কর্মসূচী। পদক্ষেপ নেয় অবাধ নির্বাচনের সময়টা ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে ১৯৯০ সালের ১৮ই মার্চ জি ডি আর-এ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনে পার্টি ফর ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম-এর বিপর্যয় ঘটল। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচনে আত্মপ্রকাশ করে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং অন্যান্যদের নিয়ে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। সরকারের প্রধান নির্বাচিত হন খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতা লোথার দ্য মিয়েজেরে। এই খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, দল যদি ক্ষমতায় আসে তবে দুই জার্মানির ঐক্য ঘটবে।

মিয়েজেরে ক্ষমতায় আসার পর জার্মানির মিলন প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগুতে থাকে। ১৯৯০ সালের ১লা জুলাই দুই জার্মানির মধ্যে একটি অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। আর ২রা জুলাই দুই জার্মানিতে প্রবর্তিত হয় একই ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থা। বারই সেপ্টেম্বর মস্কোতে সাক্ষরিত হয় পূর্বতন চার মিত্রশক্তির মধ্যে চুক্তি — স্থির হয় চার শক্তিই জার্মানির বুকে সমস্ত কর্তৃত্বের অবসান ঘটাবে। আরো স্থির হয়, জার্মানির বুকে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে তিন লক্ষ ষাট হাজার সৈন্য রয়েছে তা ১৯৯৪ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহৃত হবে।

৩রা অক্টোবর ৯৬ বছরের সেই পুরাতন রাইস্টাগ ভবনে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দুই জার্মানির মিলন কাজ সমাপ্ত হয়। আবার জার্মানি ইউরোপে জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় — ঐক্যবদ্ধ জার্মানির বর্তমান জনসংখ্যা দাঁড়ায় সাত কোটি চুয়াত্তর লক্ষে। জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ জার্মানি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে ধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করেছে। আর ধনবাদের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে পূর্বতন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী জার্মানির জনগণকে ইতিমধ্যেই সঙ্কটের শিকার হতে হয়েছে। জার্মানির ফেডারেল ব্যাঙ্ক পূর্ব জার্মানির সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকেই দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। এ বছরের পয়লা জুলাই অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠিত হবার পর পূর্ব জার্মানিতে ২০ লক্ষ নরনারী কর্মচ্যুত হয়েছেন। অথচ এই জি ডি আর-এর মোট কর্মরত জনসংখ্যাই ছিল ৮৯ লক্ষ। এখন প্রতি সপ্তাহেই জার্মানির পূর্বাঞ্চলে নতুন নতুন করে বেকারী সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানকার আট হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ হতে চলেছে। ঐ আট হাজার কল-কারখানা এতদিন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাধীনে চলছিল। এখন সেগুলি বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানার হাতে তুলে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তনের প্রাথমিক শর্ত হলো, কারখানা বন্ধ ঘোষণা করতে হবে, সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করতে হবে এবং কোন্ কারখানায় কী পণ্য উৎপন্ন হবে তা স্থির করবে ঐ বেসরকারী সংস্থা। এই পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে পূর্বতন সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির সংস্কারবাদী নেতারা বলেছেন যে, তাঁরা এমনটি চান নি।

কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড জটিলতা। ১৯৯০ সালেব ২বা ডিসেম্বব ইউনাইটেড রিপাবলিক অব জার্মানিব সাধাবণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বামপন্থীদেব অবস্থান খুবই দুর্বল। পার্টি ফব ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম এব নেতারা বলেছেন ঃ 'এটা দুই জার্মানির ঐক্য বললে ভুল হবে। ঐক্য প্রক্রিয়া চলেছে রাস্তাব একটি গতিপথ ধরে (ওয়ান ওয়ে স্ট্রীট)। এই মিলন পশ্চিম জার্মানির কাছে পূর্ব জার্মানিব বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার আত্মসমর্পণ'।

সংযুক্ত জার্মানিতে নির্বাচন

১৯৯৪ সালের ১৬ই অক্টোবব অনুষ্ঠিত সংযুক্ত জার্মানিতে কার্যতঃ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জিতেও শান্তি নেই চ্যান্সেলার হেলমুট কোলের নেতৃত্বাধীন খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক/খ্রীষ্টান সোস্যাল ইউনিয়ন (সি ডি ইউ/সি এস ইউ) ও এস ডি পি জোটের। কারণ, ৬৭২ সদস্যবিশিষ্ট নতুন সংসদে (বুন্দেসটাগ) মাত্র ১০টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে শাসকজোট। সি ডি ইউ/সি এস ইউ'র প্রাপ্ত ভোটের হার চারবছরে ১৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪১.৫ শতাংশ। এফ ডি পি-র ভোটের হার ১১ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৬ ৯ শতাংশ। জোটের মোট আসন হযেছে ৩৪১। প্রাক্তন কমিউনিস্টদেব দল 'পার্টি অব ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম' (পি ডি এস) ৪.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে দখল কবেছে সংসদের ৩০টি আসন। এর সঙ্গে গ্রিনদের নিয়ে নতুন সংসদে তিনপ্রধান বিরোধীদলের আসনসংখ্যা ৩৩১টি।

বস্তুতঃ সংসদে ১০টি আসনের গরিষ্ঠতা শাসকজোট পেয়েছে আনুপাতিক ভোট এবং সংসদীয় কেন্দ্রভিত্তিক প্রত্যক্ষভোটের জটিল অংকে ছোটদলগুলির পাওয়া ভোটের ভাগ বসিয়েই। তাছাড়া সংসদীয় নির্বাচনের পাশাপাশি ১৬ই অক্টোবর জার্মানির তিনটি রাজ্যে — পশ্চিমাংশের সারল্যান্ড এবং পূর্বাংশের মেকলেনবুগ — ফোরপোমার্ন ও থুরিঙ্গিয়ায় আইনসভার নির্বাচন হয়। তিনরাজ্যেই পরাজিত সি ডি ইউ। খোদ রাজধানী বন শহরেও একটানা পঁয়তাল্লিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর এস পি ডি-র কাছে পরাজিত হয়েছে কোলের সি ডি ইউ।

সব মিলিয়ে এবারের নির্বাচন কোলের কাছে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই বেশি। তাই খুব বেশি প্রতিবাদ ওঠে না যখন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট নেতা রুডলফ্ শাপিং বলেন, নতুন সরকার হবে 'পরাজিতদের সরকার'।

তবে শুধু কোলের জোটের ব্যর্থতা বা এস পি ডি'র অগ্রগতি নয়, সদ্য-সমাপ্ত নির্বাচনে পি ডি এস-র সাফল্যও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পূর্ব বার্লিনের চারটি সংসদীয় কেন্দ্রেই সরাসরি জয়ী হয়েছেন পি ডি এস প্রার্থীরা। এঁরা হলেন গ্রেগর গিসি, স্টেফান হাইম, ক্রিস্ট লুফ্ট ও মানফ্রেড ম্যলার। জার্মানির নিয়ম অনুসারে সর্বনিম্ন শতাংশ ভোট না পেলেও গতবারের ১৭ থেকে এবার মোট আসন সংখ্যা বাড়িযে ৩০ করিয়ে নেওয়ায় জার্মান রাজনীতির ইতিবাচক প্রবণতাই প্রতিফলিত। পাঁচ শতাংশের কম ভোট পেলে আনুপাতিক হিসেবে পাওয়া ভোট বড় দলগুলির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এই নিয়মে আসনসংখ্যায় পি ডি এস-র প্রতি জনসমর্থন সহজে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু

পি ডি এস-র এই বর্ধিত সাফল্যই অন্যদের চমকে দিয়েছে। সতর্ক হয়েছে প্রধান বিরোধীদল এস পি ডি-ও।

লক্ষ্যণীয় জার্মান জনগণ প্রত্যাখান করেছেন নয়া নাৎসিদেরও। নয়া নাৎসি রিপাবলিকান পার্টি নির্বাচনে ভোট পেয়েছে মাত্র ১.৯ শতাংশ, অর্থাৎ খুবই সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

অধুনা 'ইউরোপীয়' ঐক্যের প্রবলতম প্রবক্তা হেলমুট কোল। বার্লিন দেওয়ালের পতনে উচ্ছ্বসিত কোল দেশের জনগণের কাছ থেকে যে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলেও যেটা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি, তাহলো ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলন। কোল-সরকারের জনবিরোধী নীতি, জনকল্যাণমূলক ব্যয়ে ক্রমবর্ধমান ছাঁটাই, ব্যাপক বিরাষ্ট্রীয়করণের বিরুদ্ধে ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠা আন্দোলন। গণতান্ত্রিক জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতনের পর হেলমুট কোল যে 'স্বর্গসুখের' কামনা ফেরি করেছিলেন, তা যে জনগণ ধরে ফেলেছেন তা পরিষ্কার। ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, আট শতাংশের বেশি কর্মহীনতার হার, ৮ লক্ষ গৃহহীন মানুষের যন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-আন্দোলন, ধর্মঘট তথাকথিত 'ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর' ইউরোপের জার্মানিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। ইউরোপীয় রাজনীতি তথা আন্তঃসাম্রাজ্যবাদ দ্বন্দ্বের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী না হয়ে পারে না।

গ্রীস

গ্রীসের সাধারণ নির্বাচনে সোস্যালিস্টরা জয়ী হয়েছেন। ১৯৮১ সালের ১৯শে অক্টোবর এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। ফলাফলে দেখা যায়, গ্রীসের প্যানহেলেনিক সোস্যালিস্ট মুভমেন্ট (প্যাসক) গ্রীসের সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। তিনশ' আসন বিশিষ্ট সংসদে এই দল পেয়েছে ১৭৪টি আসন। পূর্বতন শাসক দল নিউ ডেমোক্রাসি পার্টি পেয়েছে ১১৩টি আসন। প্যাসক পেয়েছে ৪৮.০৮ শতাংশ ভোট এবং নিউ ডেমোক্রাসি পার্টি পেয়েছে ৩৫.৯৭ শতাংশ ভোট। গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টি (এক্সটেরিয়র) ১৩টি আসন এবং ১০.৮২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। প্যাসক সরকার গঠন করেছে এবং জর্জ পাপান্দ্রু নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

মার্কিন সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ

গ্রীসের মাটিতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির ভবিষ্যৎ কি হবে, এই প্রশ্নটি আজ গ্রীক-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক্তিয়ারের বাইরে এসে পড়ে। আসল ঘটনা হল—এই প্রথমবার দেখা যায়, উত্তর আটলান্টিক ব্লকের এক সদস্য রাষ্ট্র ন্যাটোর 'যৌথ প্রতিরোধে'র তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করে, নিজের দেশে বিদেশী সামরিক ঘাঁটির অবস্থান তাদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থে অপ্রয়োজনীয়। এ ছাড়াও বর্তমানের সংকটজনক বিশ্ব পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের সমস্ত প্রতিরোধ, দৃঢ়তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশকে অস্বীকার করে পেন্টাগনীয় রীতির আক্রমণকে সংহত করতে উত্তরোত্তর ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সামরিক প্রস্তুতিকে জোরদার করার জন্য

সহযোগী শক্তিগুলিকে আবও বেশি বেশি ভিড়িযে দিচ্ছিল, তখনই প্যাপাগুবো সবকাবের এই ঘোষণা।

মার্কিন সামরিক-ঘাঁটিব ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে—বর্তমানের গ্রীসে এটাই হযে দাঁড়িয়েছে সে দেশের রাজনৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ। সাম্প্রতিককালে জনমত যাচাই কবতে যে সব পার্লামেন্টাবী নির্বাচন গ্রীসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে কোন্ রাজনৈতিক দল কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কবছে, ভোটারদের কাছে তাই হচ্ছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

তা হলে গ্রীক ও মার্কিনীদেব দ্বন্দ্ব যে কোথায় এবং এথেন্স-আলোচনাকে ঘিরে যে তীব্র দ্বন্দ্বেব হাঁড়ি হাটে ভেঙ্গেছে তা বুঝে উঠতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, মার্কিন সামরিক ঘাঁটিকে নিজেদের দেশ থেকে উৎখাত করতে গ্রীসের এই তীব্র আগ্রহ কেন? যেখানে বিভিন্ন মহাদেশের ডজন ডজন দেশ আজ ন্যাটোর জালে জড়িয়ে পড়ছে, সেখানে গ্রীসের এই আগ্রহ বিস্ময়কব বৈকি।

এসব প্রশ্নের উত্তব পেতে হলে আমাদের একবার যুদ্ধোত্তর গ্রীসের ইতিহাস-ধারার প্রতি ফিরে আসতে হয়।

গ্রীসের ওপর সরকারীভাবে ওয়াশিংটনের নজর পড়ে ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন মার্কিন বাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান এক কুখ্যাত নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতির প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে গ্রীস প্রাধান্য পায়। পঞ্চাশ দশকের প্রথমে গ্রীস হয়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রীয় অস্ত্রক্রীড়ার আদর্শ লীলাক্ষেত্রও।

১৯৫২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি গ্রীস এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ন্যাটো গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়। ১৯৫৩ সালে মার্শাল প্যাপাগোস-এর দক্ষিণপন্থী সরকার সব মিলিয়ে ১০০টিরও বেশি চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। গ্রীসের সামরিক ঘাঁটিগুলি যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রয়োজনমত নিজেদের সশস্ত্র সেনাদের ব্যবহারের জন্য খোলা পায়। আকাশপথ, সমুদ্রপথ এবং স্থলপথ—মোট কথা গ্রীসের সব কিছুই আমেরিকা ভূমধ্যসাগরীয় সামরিক তৎপরতার জন্য ব্যবহার করতে থাকে।

১৯৫৬ সালে মার্কিনী সশস্ত্রবাহিনী এবং মার্কিনী চাকুরেরা—যারা গ্রীসে ছিল, তাদের অতিরাষ্ট্রিক মর্যাদা দান করে আইন রচিত হয় এবং সুযোগ-সুবিধার যাবতীয় কিছু তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

১৯৬৭-৭৪ সালের তমসাবৃত ঔপনিবেশিকতার কালে গ্রীসের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আধিপত্য আরও দৃঢ়মূল হয়।.সেদিনের সামরিক শাসকগোষ্ঠী পেন্টাগনকে গ্রীসের মাটিতে বিশেষ উদ্দেশ্য সামরিক ঘাঁটি গড়ার অনুমতি দিয়েছিল। হেরক্লিয়ন শহরের বাইরে, ক্রিটে যে ন্যাটো ট্রেনিং সেন্টার ছিল, তা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উত্তর আটলান্টিক ব্লকের প্রধান আণবিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালে আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এতে পিরেউসে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লিট-৬-এর জন্য স্থায়ী নৌ-ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা ঘটে। উপরোক্ত কারণেই, সেদিনের এথেন্সে অবস্থিত মার্কিনী রাষ্ট্রদূত হেনরী তুসকে এক গোপন রিপোর্টে কংগ্রেসকে জানিয়েছিল—গ্রীসের সামরিক সরকারের মত অন্য কোন দেশই যুক্তরাষ্ট্রকে এতখানি সাহায্য করেনি।

গ্রীসের ভূখণ্ডকে প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ

ব্যাপারেও ওয়াশিংটনের হস্তক্ষেপ ঘটছিল নানাভাবে। দেশের সাধারণ মানুষের জাতীয়তাবোধ এতে গভীরভাবে আহত হয়েছে। সামরিক সবকারেব বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের সংগ্রামে পেন্টাগনীয় রাজত্বের অবসানও অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীসের নাগরিক জীবনে গণতন্ত্রীকরণের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে সামরিক একনায়কত্বের শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু তবুও মার্কিনবিরোধী মনোভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমাগতই বেড়ে চলে।

শাসনক্ষমতায় আসে রক্ষণশীল নব-গণতন্ত্র দল (নিউ ডিমোক্র্যাসি পার্টি)। তারা সাধারণ মানুষের এই মার্কিনবিরোধী মনোভাবকে অবহেলা করতে পাবেননি। ফলে গ্রীসে আমেরিকার সশস্ত্রবাহিনীর গতিবিধির ওপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত হয়। বিশেষ করে উপরোক্ত মার্কিন নৌবহরের জন্য পিরেউসের নৌ-ঘাঁটি চুক্তিটি রহিত হয়ে যায়। এ ছাড়া অপরাপর সাহায্যের রাস্তাও কিছু কিছু বুদ্ধ হয়। ১৯৭৫ সালে মার্কিন চাকুরেদের অতিরাষ্ট্রিক মর্যাদার বিধানটিও তুলে নেওয়া হয়। আজ যদিও বা মার্কিন পতাকার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীসের পতাকাও সামরিক ঘাঁটিগুলির আকাশে উড়ছে, কিন্তু তা বলে গ্রীসের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণই সেই ঘাঁটিগুলির ওপর নেই। গ্রীকদের কাছে এই ঘাঁটিগুলির অস্তিত্বই দেশের নিরাপত্তা বোধে বিঘ্ন ঘটায়। গ্রীসে পেন্টাগনীয় সামরিক ব্যবস্থাকে দেয় সুযোগ-সুবিধার জন্য ব্যয়ভার বিশাল। দুর্গম এবং প্রান্তীয় অঞ্চলে ঘাঁটিগুলির জন্য যোগযোগ ব্যবস্থার নির্বাহী ব্যয় দেশের ওপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক ভূখণ্ডে এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রগতিশীল দেশগুলির ওপর আক্রমণ সংহত করার জন্য প্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলির জন্যও ব্যয়ভার প্রচুর। লেবানন ও প্যালেস্টাইনের ওপর ইস্রায়েলী হানা দিনের পর দিন চলছে। ইরানে মার্কিনী আধিপত্য শিথিল হয়। ভারসাম্য বজায় রাখতে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে; শক্তিশালী হচ্ছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ। পারস্য উপসাগরের তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলির ওপর মার্কিন আধিপত্য অনিবার্য। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রীস ও সাইপ্রাসের অমীমাংসিত সমস্যা নিয়ে সংঘাত এবং তৃতীয় বিশ্বের যে দেশগুলির সঙ্গে আগে থেকে সুসম্পর্ক ছিল, তাদের সঙ্গেও সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

এই সমস্ত ঘটনার ভেতর দিয়েই গ্রীসের জনগণ নিজেদের দেশের মাটি থেকে মৃত্যুর দূত এই ঘাঁটিগুলিকে উৎখাত করার জন্য সুদৃঢ় আন্দোলনে শামিল হয়। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সেনানায়ক কৌমানাকোসের নিতৃত্বে প্যানহেলেনিক (নিখিল গ্রীস) কমিটি নিজেদের দেশ থেকে সামরিক ঘাঁটিগুলিকে তুলে দেবার বহু ব্যাপক কাজকর্মে ১৯৭৬ সাল থেকে নিযুক্ত হয়। গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি সহ অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তি ঘাঁটিগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার দাবি নিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়। প্যানহেলেনিক সোস্যালিস্ট আন্দোলন (প্যাসোক) ১৯৮১ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে জনগণের কাছে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল যে, গ্রীসে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিকে তারা জাতীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের তুলে দেবে। নির্বাচনে প্যাসোকের বিপুল বিজয় ঘটেছে। আর এই বিজয়ের মধ্য দিয়েই পরিবর্তন হয়ে উঠেছে অনিবার্য।

নির্বাচনের পর ১৯৮২ সালের অক্টোবরে এক বছর পূর্ণ হতেই প্যাপান্ডরৌ সরকার আমেরিকার সঙ্গে দু দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে কথাবার্তা শুরু করে। এই কথাবার্তার প্রধান প্রশ্নটি ছিল—ভবিষ্যতে মার্কিন মিলিটারী গ্রীসে কোন্ মর্যাদায়

থাকবে? এই সঙ্গে গ্রীস ভূখণ্ডে যে চারটি বৃহৎ সামরিক ঘাঁটি, র‍্যাডার, বেডিও স্টেশন, যোগাযোগ ও তথ্যসংগ্রাহক কেন্দ্র সহ প্রায় দু'শটি কেন্দ্র বর্তমান, সেগুলিব ভবিষ্যৎ আলোচিত হয়। এই সঙ্গে যে তিন হাজারেরও বেশি মার্কিন চাকুরে গ্রীসে স্থায়ীভাবে বর্তমান, তাদের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

দেশ দুটির মৌলিক অবস্থান সকলেরই জানা। প্রধানমন্ত্রী প্যাপান্ডরৌ এবং অন্যান্য সরকারী মুখপাত্র বার বার বলছেন, বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলতে অন্তর্বর্তীকালীন কর্মসূচী এগিয়ে চলে, ঘাঁটিগুলিকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়। এ ছাড়া গ্রীসের বহু দেশগুলির ওপর যাতে আক্রমণ না হয়, সে বিষয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়। অন্যদিকে আমেরিকা নানাভাবে তার পূর্ব অধিকাব কায়েম রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—বার বার ঘাঁটিগুলিকে তারা বজায় রাখতে চায়।

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে, পূর্ববর্তী ৯ মাসে বার বার ভেঙ্গে যাওয়া আলোচনার পর গ্রীস-মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জানা গেছে, ১৯৮৪ সাল থেকে পাঁচ বছরের জন্য স্বাক্ষরিত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে। এ ছাড়া চুক্তি অনুসারে সামরিক ঘাঁটিগুলি বড় জোর আর ১৭ মাস গ্রীসের মাটিতে থাকবে।

গ্রীস সরকার দাবি করেছে, এই চুক্তিতে মার্কিন সরকারের স্বাক্ষরের অর্থ হল গ্রীসের জাতীয় স্বাধীনতার এক বিপুল বিশাল বিজয়। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে গ্রীস-মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক সমতার আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। এতে প্যাপান্ডরৌ সম্পর্কে তাঁর বিরোধী নব্যগণতন্ত্রীরা পর্যন্ত তাদের পূর্ব সমালোচনা স্থগিত রেখে নীরব হয়েছে। এই মীমাংসাকে প্রেসিডেন্ট কনস্টেনটাইন ক্যারাম্যেনলিসও যথার্থভাবেই গ্রহণ করেছেন।

দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি পূর্ব থেকেই স্বাক্ষরিত এই চুক্তির একটি পৃথক মূল্যায়ন করে এসেছে। এথেন্স, পিরউস, সালোনিকি এবং অন্যান্য গ্রীক নগরীগুলিতে দিনের পর দিন যে সমস্ত জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলের ঢেউ সমস্ত দেশকে ভরিয়ে দিয়েছি—তা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখে মনে হয় দেশের রাজনৈতিক জীবন এখন শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশের স্বেদসিক্ত দিনগুলিতে রাজপথ মুখরিত হয়েছিল স্লোগানে স্লোগানে। গ্রীসের মাটি থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিকে উৎখাতের দৃঢ় নিশ্চয়তা দাবি করে সেদিন গণ-কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল স্লোগানের আওয়াজ।

এই চুক্তি কিন্তু গ্রীসের সামরিক ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে সংগ্রামের অন্তিম যবনিকা নয়। এই চুক্তি পরবর্তীকালের আর একটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণশক্তি হিসাবে দেখা দেবে। তাই একথা বললে বোধহয় বাহুল্য হবে না যে, গ্রীসের আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রধানতঃ এই সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দেবে। মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নিয়ে সমস্যার পূর্ণ সমাধান লুকিয়ে আছে এই সংগ্রামেরই মধ্যে।

সাবেক যুগোস্লাভিয়া

মধ্য ইউরোপের যুগোস্লভিয়ায় যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ পর্ব চলেছে তা' প্রকৃতপক্ষে গৃহযুদ্ধেরই নামান্তর।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে যে আক্রমণ সংঘঠিত হয়েছে,

যুগোস্লাভিযার ঘটনা তার থেকে পুরোপুবি বিচ্ছিন্ন না হলেও, সেখানকাব ঘটনাবলীর পরম্পরার দিকে দৃষ্টি ফেরালে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যুগোস্লাভ সঙ্কটের একটা স্বাতন্ত্র বয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে যুগোস্লাভিয়ার সৃষ্টির মধ্যেই একটা স্ববিরোধ সুপ্ত ছিল।

দুই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রাজতন্ত্রের অধীন যুগেস্লাভিয়ায় ছিল মূলত তিনটি অঙ্গ রাজ্য, স্লোভানিযা ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে টিটোর নেতৃত্বাধীন লিগ্ অব কমিউনিস্ট দলের ফ্যসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ফসল হিসাবহে যুগোস্লাভ সাধারণতন্ত্র গড়ে ওঠে। যুগোস্লাভিয়া গড়ে উঠেছিল একাধিক জাতি সত্ত্বা সহ। এবং ওই জাতিগুলি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ঐক্যবদ্ধ হলেও, যুগোস্লাভিয়ায় মতাদর্শগত সংগ্রামের দৈন্যের ফলে, বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করছিল। প্রায় বাধ্য হয়েই টিটো ১৯৭৪ সালে দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংবিধান চালু করলেন। এই কাঠামোয় ছ'টি অঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এগুলি হলো ঃ সার্বিয়া, ক্রেয়েশিয়া, স্লোভানিয়া, বোসনিয়-হারজিগোভিনা, মন্টেনিগরো, এবং ম্যাসেগেনিয়া। অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে স্লেভানিয়া সবাধিক সম্পদশালী, এই রাজ্যটির-মাথা পিছু আয় দেশের গড় আয়ের দ্বিগুণেরও বেশী। এখানে তৈরি হয় বৈদ্যুতিক দ্রব্য এবং ভোগ্যপণ্য। সংবিধানকে লঙ্ঘন করে স্লোভানিয়াতে আছে ৩৬ হাজার সশস্ত্র জাতীয় রক্ষী বাহিনী। সার্বিয়া হলো আয়তনে ও জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড় যদিও তা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ। সার্বিয়ার রাজধানী বেওগ্রদ বা বেলগ্রেড, দেশেরও রাজধানী। ক্রোয়েশিয়ার রয়েছে ফ্যাসিবাদ-বিরোদী সংগ্রমের জ্বলন্ত ঐতিহ্য। বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা-র জনসংখ্যার মধ্যে যেমন সার্বিয় আছে তেমনি বহু সংখ্যক ক্রোয়েশিয়ও রয়েছে।

জাতিগত দিক দিয়ে দেখলে বোঝা দুষ্কর নয় যে, যুগোস্লাভিয়া অনেকাংশই ছিল "ভৌগোলিক সংজ্ঞা" মাত্র । দেশের ২ কোটি ৩৮ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে সাড়ে আট লক্ষ সার্বিয়, সাড়ে চার লক্ষ ক্রোয়াট, দু'লক্ষ মুসলমান, প্রায় দু'লক্ষ করে স্লোভানিয় ও আলবেনিয়, দেড় লক্ষ ম্যাসেডোনিয়, এবং অল্প সংখ্যক মন্টে নিগ্রো ও হাঙ্গরিয়। সেনা দলের প্রায় ৫২ শতাংশই সার্বিয়। অবশ্য সেনাধ্যক্ষদের প্রায় ৪০ শতাংশ ক্রোয়াট।

টিটোর মৃত্যুর (১৯৮০) পর দুটি সমান্তরাল ঘটনা প্রবাহ বইতে শুরু করল। প্রথমত বহুদলীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে সুপ্ত জাতি সত্ত্বার দাবি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আর, দ্বিতীয়ত নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের তথা অসম বিকাশের ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদের দাবি জোরদার হলো। বিশেষ করে 'দিনা' মুদ্রার অবমূল্যায়ন, সমৃদ্ধ রাজ্যগুলিকে উৎসাহ দিল স্বাধীনতা ঘোষণা করে, বিচ্ছিন্ন হবার। এর সঙ্গে যুক্ত হলো রাজনৈতিক সঙ্কট। টিটো দীর্ঘকাল, লিগ অব কমিউনিস্ট দলের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদীদের দাবিয়ে রেখে ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর, দুর্বল যুক্তরাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যর্থ হলো। বহিষ্কৃত পার্টি নেতা, ফ্রান্জো ক্রজ্মান হলেন ক্রোয়েশিয়ার রাষ্ট্রপতি, আর অপর ধিকৃত নেতা সটাইস্ মেসিচ্ পুনর্বাসন লাভ করলেন একেবারে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবেই।

মেসিচ্ বরাবরই উগ্র ক্রোয়াট জাতীয়াতাবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতি হবার পর থেকেই "সার্বিয় শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। এদিকে সার্বিয়ার নেতা, স্লোবোডান মিলোসেভিচ হুঙ্কার ছাড়লেন যে, কোন বিচ্ছিন্নতার স্লোগান সহ্য করা

হবে না। ক্রোয়েশিয়া এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বলল "বিচ্ছিন্নতাবাদ" দমনেব নামে সার্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার ক:., কোসোভো ও ভোজ্‌তোদিনা দখলে উদ্যত। ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে গলা মেলাল, সমৃদ্ধশালী স্লোভেনিয়া। বিগত জুন মাসের শেষের দিকে ক্রোয়েশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই, স্লোভেনিয়া "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুললো। সীমান্তে শুল্ক চৌকি স্থাপন নিয়ে সার্বিয়ার সঙ্গে বিবাদ্ হঠাৎ-ই যুদ্ধে পরিণতি লাভ করল।

সার্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ক্রোয়েশিয়ার ওপর জলে-স্থলে-আকাশে আক্রমণ চালাল। ক্রেয়েশিয়ার সশস্ত্র জাতির রক্ষী বাহিনী যথাসাধ্য প্রতিরোধ গড়ে তুললো। যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর ছাউনিগুলি ক্রোয়েশিয়া অবরোধ করল। যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল ব্ল্যাগোজে আদজিচ্ বেসামরিক প্রশাসনকে প্রকৃতপক্ষে অগ্রাহ্য করেই ক্রোয়েশিয়াকে "শিক্ষা" দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। যুদ্ধ চললো। কয়েক হাজার লোক নিহত হলেন। কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হলো।

যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রথম দিকে কোন আন্তর্জাতিক উদ্যোগই নেওয়া হলো না। অস্ট্রিয়ার চানসেলর বলেন ঃ ট্যাঙ্ক দিয়ে কি করে এরা দেশকে এক রাখবে জানিনা। সবচেয়ে খুশি হলেন "নয়া বিশ্বব্যবস্থার" স্বঘোষিত কারুকৃত জর্জ বুশ। তিনি খালি এ'টুকুই বললেন ঃ যুগোস্লাভিয়ায় যা দাঁড়াবে তাকেই আমরা সমর্থন করবো। একটি মার্কিনী সাপ্তাহিক বুশের কথাই একটু ঘুরিয়ে মন্তব্য করলো ঃ পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে আগে যুযুধান দু'পক্ষ নিরস্ত হোক্ তারপর দেখা যাবে কি হয়।

ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের তরফে প্রাক্তন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যারিংটন, একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন অস্ত্র সংবরণের। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, সার্বিয়া অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী তার ক্রেয়েশিয়ার অবরোধ তুলে নেবে। আর ক্রেয়েশিয়ার সেনা ছাউনির অবরোধ প্রত্যাহার করবে। কিন্তু কোন পক্ষই প্রস্তাব মানতে রাজি হলেন না। সুতরাং, যুদ্ধ চলছে এবং ইতোমধ্যেই মার্কিনী যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানগুলিতে দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলেছে কারণ দুই যুদ্ধরত পক্ষ থেকেই অস্ত্র কেনার কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। বুশ প্রশাসন উল্লসিত এই ভেবে যে, রণনীতির দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলকান অঞ্চল শীঘ্রই তাদের কব্জায় আসতে চলেছে। খুশি জার্মানি ও ইতালি — ঐতিহাসিক কারণেই এই দুটি দেশ ঐক্যবদ্ধ যুগোস্লাভিয়ার ঘোর বিরোধী। কেবল ব্রিটেন ও ফ্রান্স চিন্তিত। কারণ "ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের" সম্ভাবনা একটা চড় আঘাত পেতে চলেছে। ইতোমধ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে ক্রোয়েশিয়ার নতুন নতুন অঞ্চলে।

গৃহযুদ্ধ

একদিকে যখন 'ইউরোপীয় গোষ্ঠী'র উদ্যোগে সার্বিক ইউরোপীয় ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়, ঠিক তখনই রক্তাক্ত যুগোস্লাভ গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে এক আশ্চর্যজনক দ্বিধাগ্রস্ততা ইউরোপীয় নেতৃবর্গকে পেয়ে বসে। যুগোস্লাভিয়ায় সংঘর্ষ শুরু হওয়া থেকেই কোনো সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি সমস্যার এমনকি তাৎক্ষনিক সমাধানকল্পেও। স্পষ্টতঃই 'ইউরোপীয় গোষ্ঠী' একটা কোন ঘটনার জন্য অপেক্ষা

করছিলেন। কি সেই ঘটনা সম্প্রতি তা' বোঝা গেল যখন বুশ সাহেবের ফতোয়ায় সজ্জিত হয়ে প্রাক্তন মার্কিনী পররাষ্ট্রসচিব সাইরাস ভানস্ রাষ্ট্রসঙ্ঘের দূতের অবতারে বেওগ্রাদে হাজির হলেন। ততদিনে হিংস্র গৃহযুদ্ধে বিবদমান পক্ষ দুটি-ই নীরক্ত হয়ে এসেছে। এর আগে এক এক করে চৌদ্দটি অস্ত্রসংবরণ ব্যর্থ হয়েছে। আবার যুদ্ধ শুরু হয়—বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। হাজার হাজার মানুষ মারা গেছেন। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ভুখোভার, দুব্রভ্নিকেব মতো পটে আঁকা, গোছানো, শহরের পব শহর। অসিয়েক শহরে তো আর একটিও দোতলা বা তার চেয়ে উঁচু বাড়ী খাড়া নেই। আশ্রয় শিবিরের ওপরও আক্রমণ হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে হাসপাতাল, স্কুল বাড়ী, অনাথাশ্রমও। কিন্তু তাও পরস্পরকে মরণ কামড় দিয়ে চলেছে 'স্বাধীন' ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়ার নেতৃত্বাধীন যুগোস্লাভ যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনী। সাইরাস ভানসের সফর নিয়ে হালকা চালে মন্তব্য করেছে 'টাইম' পাক্ষিক। বলেছে ঃ রবার্ট ব্রুসের কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে; বার বার চেষ্টা করে যাওয়া হোক; যুদ্ধ হয়তো আবার শুরু হতেই পারে, কিন্তু শান্তির দূতরা যা করবেন তা হলো 'ট্রাই, ট্রাই, এগেইন'। আসলে মার্কিনী 'বিশ্ববীক্ষার' কাছে যুগোস্লাভিয়ার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাজারদর খুবই কম; বুশ নিশ্চয়ই অঙ্ক কষেছিলেন যে যদি সংঘাত বন্ধ হয়ে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য খণ্ডে দেশটা ভেঙ্গে যায় তা হলেই বা কি লাভ? কারণ, নতুন দেশগুলো তো দৌড়বে 'ইউরোপীয় গোষ্ঠী'র দরজায়। আর, একথা তো এখন আর নতুন করে বলবার দরকার নেই যে, অবসন্নপ্রায় মার্কিন অর্থনীতির অন্যতম অস্বস্তির কারণ হলো ইউরোপীয় জাতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির আর্থনীতিক-বাণিজ্যিক ঐক্যপ্রয়াস। কিন্তু তাই বলে 'নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার' জনক কি করে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন আগাগোড়া? তাই, যুদ্ধরত দুটি পক্ষ যখন সর্বাধিক রণক্লান্ত, তখন ভান্স্ সাহেবের শান্তি কপোতরূপে আগমন। ছক অনুযায়ীই কাজ হলো। ভান্সের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবার পরপরই সার্বিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান স্লোবোডান মিলোসেভিচ এবং ক্রোয়েশিয়ার রাষ্ট্রপতি ফ্রান্জো ক্রজম্যান অস্ত্রসংবরণে রাজি হয়েছেন। সার্বিয়া বলেছে যে, তার সেনা ক্রোয়েশিয়ার অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে আসবে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, যে কাজ ভান্স্ করতে পারলেন, ইউরোপীয় নেতৃবর্গ সে কাজ করতে এগোলেন না কেন? একটা সন্দেহ থেকেই যায় এ ব্যাপারে। আর, তা'হল ঃ মার্কিনী 'সবুজ সংকেত না পেলে ইউরোপের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যুগোস্লাভিয়ার বিষয়ে কোন সদর্থক উদ্যোগ নিতে চাইছিলেন না। তবে, গোপনে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল ঠিকই — অবশ্য, শান্তি প্রচেষ্টার জন্য নয়। জার্মানি ক্রোয়েশিয়াকে মদত দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে পুরনো শত্রু সার্বিয়ার দাপট কিছুটা অন্তত কম করা যায়। অন্যদিকে, ইতালি উৎসাহ যুগিয়ে গেছে সার্বিয়াকে — কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে ইতালির দুটি ছোট অংশ যুগোস্লাভিয়ার সার্বিয়া রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিলো।

সাইরাস ভান্সের গর্বোদ্ধত উক্তি—''যতটুকু আমার করার করেছি, এবার ওখানকার নেতারা বুঝুক'—তা সত্ত্বেও শান্তি কিন্তু এখনো আসেনি যুদ্ধদীর্ণ যুগোস্লাভিয়ায়। সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়া, উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের। দুঃখজনক আরো একটি ঘটনা অতিসম্প্রতি ঘটে গেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কয়েকজন পর্যবেক্ষক যখন হেলিকপ্টারে করে সার্বিয়ার অভ্যন্তর ভাগে উড়ে যাচ্ছিলেন তখনই এক রকেট আক্রমণে হেলিকপ্টারটি ভেঙ্গে পড়ে। কোন আরোহী-ই বাঁচেন নি। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে

যুগোস্লাভ সরকার বিমান বাহিনীর প্রধানকে পদচ্যুত করেছেন; একজন গোলন্দাজকে সামবিক আদালতের সামনে হাজির করারও নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা যে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, তা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, 'ইউরোপীয় গোষ্ঠী' ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভানিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে, সার্বিয় জনজাতি গোষ্ঠী ও সংগঠনগুলি স্বতন্ত্র একটি কনভেনশন আহ্বান কবে যেখানে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওযা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করে। অন্যদিকে, বোস্নিয়া-হাবনিযোভিয়া রাজ্যের সার্বগোষ্ঠী স্বাধীনতা ঘোষণা করে, সেখানকার রাজ্য সরকার হুংকার ছেড়েছেন যে, "সর্বশক্তি প্রয়োগ করে" ওই উদ্যোগকে বুখতে সরকার "বদ্ধপরিকর"।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, কোন পরিস্থিতিতেই যে শান্তির স্বপক্ষে দাঁড়াবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনা (কেবল, বোধহয়, নিজেদের পরিস্থিতি গুছিয়ে নেবার সময় বার করার উদ্দেশ্যে) তা, যুগোস্লাভ গৃহযুদ্ধ আবার প্রমাণ করে দেয়। আগ্রাসন ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের কোন দিকদর্শন থাকে না। যদি বলকান অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হতো, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা তখন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অঞ্চলে শান্তি আনয়ন করে (অবশ্যই প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে) নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতো। কিন্তু তাতো নয়। সুতরাং ঔদাসীন্য আর বীতশ্রদ্ধ মনোভাবই পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে প্রাপ্য, দুর্দশাগ্রস্ত যুগোস্লাভ জনগণের। হ্যাঁ, আরো একটা কারণে যুগোস্লাভিয়া তথা বলকান অঞ্চল বুশ সাহেবের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারতো। কিন্তু সেই কারণটার তো মূলসহ উৎপাটনই করে দিয়েছেন "শান্তি প্রচেষ্টার" জন্য নোবেল পুরস্কারে ধন্য, 'দশকের সেরা' মানুষটি'।

বসনিয়া

পয়তাল্লিশ বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক পথে চলে ১৯৯০ সাল থেকে একদার যুগোস্লাভিয়া .টুকরো টুকরো ভাঙতে শুরু করে। ভাষা, ধর্ম ও জাতিত্বের অনৈক্য মারত্মক হয়ে এই ক্ষুদ্র বলকান যুক্তরাষ্ট্রটির রাষ্ট্রগুলিকে পরস্পরের নির্মম প্রতিদ্বন্দ্বী করে রক্তক্ষয়ী ভাই-বিরোধে মাতিয়ে তোলে। যে ছ'টি সাধারণতন্ত্র ও স্বশাসিত প্রদেশ নিজেদের বিবাদ ভুলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯৪৫ সালে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় এসে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও বিদেশী শক্তির প্রভুত্বকে কাটিয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে ইউরোপের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তা শুধু অন্তর্হিতই হয়নি, যে উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা এসেছিল তা-ও দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে বসে। অথচ সেভিয়েতের প্রভাবকে সরাসরি অস্বীকার করে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে দেশের অখণ্ডতা ও সমৃদ্ধিকে সুসংহত করে এই সেদিন যুগোস্লাভিয়া ছিল একটি অগ্রগণ্য সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র। আজ এরই একটি অঙ্গরাষ্ট্র বসনিয়া-হেরচেগোভিনা রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির দুশ্চিন্তার কারণ। মানবাধিকার লঙ্ঘন এখানকার বাতাসকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। এক জনগোষ্ঠীর প্রভুত্ব বিস্তারের শিকার হয়েছে অন্য দুর্বল জনগোষ্ঠী। ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি এর ভিত্তি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কায়েম করাই মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বাবাসী স্তম্ভিত।

এর শুরু ১৯৯০ সালে যখন দুটি অঙ্গরাষ্ট্র স্লোভেনিযা ও ক্রোটিয়া নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ত্যাগ করে (২৫ জুন, ১৯৯১), রাষ্ট্রসংঘ এদের স্বীকৃতি দেয় ১৯৯২-র ফেব্রুয়ারিতে, আমেবিকা আগষ্ট ১৯৯২-এ। বসনিয়া-হেরচেগভিনা পৃথক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে ১৯৯১-র অক্টোবরে, স্বাধীনতা ঘোষণ করে পরের বছরের এপ্রিলে; মাসেডোনিয়া ১৯৯১-র সেপ্টেম্বরে একই পথ বেছে নেয। সার্বিয়ার অধীন স্বশাসিত কোসোভার আলবিয়ানরাও স্বাধীন হতে ছিল। রাষ্ট্র সঙ্ঘেব স্বীকৃতি এদের কারও মেলে না। ১৯৯২-তে সার্বিয়া পৃথক হলেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে অসমর্থ হয়। সার্বিয়া ও সনটেনেগ্রো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে ছিল, কয়েকটি রাষ্ট্র পৃথক হয়ে গেলে নিজেদের 'নতুন যুগোস্লাভিয়া' বলে ঘোষণা করে। প্রথমদিকে রাষ্ট্র সঙ্ঘ একে স্বীকার করেনি। স্লোভেনিয়া ও ক্রোটিয়ার স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই শুরু হয় ক্রোটিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রোট ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সার্বদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ। ১৯৯২-র জানুয়ারিতে যখন তা প্রশমিত হয় তখন দশ হাজারটি প্রাণহানি ঘটে গেছে; দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এরপর এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ তথা আগ্রাসী অক্রমণ ছড়িয়ে যায় বসনিয়া-হেরচেগোভিনা-তে, এবার এই মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রটির সার্বজনগোষ্ঠীর লক্ষ্য মুসলিমরা। এতে প্রত্যক্ষ মদত যোগায় সর্বপ্রধান রাষ্ট্র সার্বিয়া। ১৯৯২-র আগস্টে সার্বরা দেশের তিন-চতুর্থাংশ দখল করেই ক্ষান্ত থাকেনি উগ্র জাত্যাভিমান থেকে চালায় দেশ থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিতারণের 'পরিষ্কার অভিযান'। শতাব্দীর পর শতাব্দী একসঙ্গে বাস করে ও প্রায় একই দেশজ সংস্কৃতিক অংশীদার হয়েও একটি অঙ্গরাষ্ট্রের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিতে অসমর্থ হয়; তথাকথিত 'নোংরা' এই জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালায় সবরকম মানবাধিকার ও রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে। অন্য সম্প্রদায়রাও রেহাই পেল না। শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সর্ববৃহৎ বিতরণ পর্ব — নৃশংস হত্যা, লুঠতরাজ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অত্যাচার বিশ্ববিবেককেও স্তম্ভিত করে দিল। যুগোস্লাভিয়ার কুড়ি লক্ষ মানুষ দেশছাড়া হল যার অর্ধেক বসনিয়ার মুসলিম ও ক্রোট সম্প্রদায়ভুক্ত। আজ সুসভ্য ইওরোপের বুকের উপর বসনিয়া-হেরোজেগোভিনা প্রায় অবিশ্বাস্য জাতিযুদ্ধের নরকে পরিণত হয়েছে। অনেকের মতে এর সূত্রপাত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে স্লোভেনিয়া ও ক্রোটিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণাকে ইউরোপীয় কম্যুনিটির তড়িঘড়ি স্বীকৃতি দানের অত্যুৎসাহ থেকে। অন্যদিকে রাষ্ট্র সংঘ এই স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে বৈষম্য করে অবস্থাকে জটিলতর করে।

যুগোস্লাভ জাতিযুদ্ধের ফলে সন্ত্রস্ত ও বিতাড়িত প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে মরীয়া হয়ে ওঠে। টনক নড়ে এইসব দেশ ও তাদের মুরুব্বি আমেরিকার।

অ্যাড্রিয়ান সাগরের কোনছোঁয়া উত্তর ও পশ্চিমদিকে ক্রোটিয়া, পূর্বে সার্বিয়া ও পূর্ব-দক্ষিণে মেনটেনেগ্রোর সীমান্তকে ধরে ৫১ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বসনিয়া-হেরচেগোভিনা-র লোকসংখ্যা মাত্র ৪৪ লক্ষ। যুগোস্লাভিয়ার এক পঞ্চমাংশ অঞ্চল এখানে, লোকসংখ্যার অনুপাতও কাছাকাছি। দেশের অনেকটাই পার্বত্য অঞ্চল এবং অনুর্বর। জীবিকা কৃষি ও পশুপালন। শিল্পোন্নয়নের গতি ধীর। ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে বসনা, সাভা, উনা, ড্রিনা, নেরেতভা প্রভৃতি নদী। বন সম্পদে ও খনিজে সমৃদ্ধ এই দেশ অন্যদের তুলনায় অনুন্নত। এর অধিবাসীদের শতকরা ৪০ ভাগ মুসলিম, ৩২ ভাগ সার্ব, ১৮ ভাগ ক্রোট,

অন্যান্য সম্প্রদায় ১০। দুই ধরনের খ্রীষ্টান - ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স এবং মুসলিম এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ে এরা বিভক্ত। রাজধানী সারাজেভো খ্রীষ্টান ও মুসলিম ধর্মগুরুদের পীঠস্থান। বসনিয়া ৭ম শতাব্দীতে সার্বদের বসতি দিয়ে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দীতে হাঙ্গেরির আধিপত্যে আসে ও অনিবার্যভাবে রোমন ক্যাথলিক ধর্মের প্রসার ঘটে। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের প্রত্যক্ষ শাসনে এসে এর অঙ্গরাজ্য বলে পরিগণিত হয়। তুরস্কের শাসনাধীন থেকেই বসনিয়া-হেরচেগোভিনার সমৃদ্ধির সূচনা হয় এবং এখানকার বিত্তশালীরা অবস্থার বিপাকে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করে। অস্ট্রিয়ার রাজার সৈন্যরা ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বসনিয়ায় ঢুকে যায় যার ফলে এর এক অংশ তুরস্কের অধিকারে থেকে যায় অন্য অংশের উপর অস্ট্রিয়ানদের আধিপত্য কায়েম হয়। ১৭৩৯-এ তুরস্ক পুরো দেশের উপর কর্তৃত্ব বজায় করতে সক্ষম হয়। ১৯০৮-এ বসনিয়া-হেরচেগোভিনা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির দখলভুক্ত হয়ে যায়। ধর্মভিত্তিক সংবিধান প্রবর্তিত হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। যুগোস্লাভিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলির সাথে যুক্ত হয় ১৯১৮-তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ও ইটালীর মদতপুষ্ট ক্রোটিয়ার পুতুল সরকারের অধীনে ছিল। জার্মানির পরজয়ের পর যুগোস্লাভিয়া সাধারণতন্ত্রের অঙ্গ রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি পায়। নাম হয় সোসালিস্ট রিপাবলিক অব বসনিয়া-হেরচেগোভিনা। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতি গোষ্ঠী ও ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের বাসভূমি বলে বসনিয়া হেরচেগোভিনা বলকান অঞ্চলের স্থায়িত্বের খুঁটি বলে পরিচিত ছিল। সুদূর অতীত থেকেই ভাষা-জাতি-ধর্মগত বিরোধের মধ্য দিয়ে এই ক্ষুদ্র বলকান অঞ্চলটি এসেছে। বসনিয়ার মুসলিম ও ক্রোটরা জোটবদ্ধ হয়ে স্বাধীন হওয়ার পক্ষে মত দেয় ১৯৯১-র অক্টোবরে; যুগোস্লাভিয়া ছেড়ে আসে ছ'মাস পরে। এখানকার সার্বরা তা মেনে নিতে রাজি ছিল না ইউরোপীয় কম্যুনিটির স্বীকৃতি না আসার সুযোগে সার্বিয়ার মদতে এখানকার সার্বরা সার্ব-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে 'সার্ব-সাধারণতন্ত্র' গঠন করে; বসনিয়া-হেরচেগোভিনার তিন-চতুর্থাংশে সার্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চলে মুসলিম বিতারণ। অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবোধ দেখা দেয়, চার লক্ষ বসনিয়ান-মুসলিমদের তাড়ানো হয়। এদের অনাশ্রয়, অনাহার, নির্মম নির্যাতন চরমে উঠে। কাগজে প্রচার শুরু হয়। কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের নিষ্ঠুরতার খবর আসতে থাকে। ১৯৯২-র আগষ্টে আমেরিকা বসনিয়া-হেরচেগোভিনাকে স্বীকৃতি দেয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের চাপে দখলদারী সার্বরা সুবিধেজনক অবস্থায় থেকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাতে অরাজী ছিল। সার্ব-ক্রেট-বসনিয়া মুসলিমদের এই রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের এক পক্ষের কুশীলব সার্বিয়ার রাষ্ট্রপতি স্লোবোদান মিলোসেভিক, বসনিয়ার সার্বনেতা রাদোভান কারাদ্জিক; অন্যদিকে ক্রোটনেতা মেইট বোবান ও বসনিয়ার মুসলিম নেতা আলিজা ইজেত্‌বেগভিক। যুগেস্লাভিয়ার বিবাদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমঝোতা আনতে ও সার্বদের আগ্রাসী মনোভাবকে সংযত করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও নিরাপত্তা পরিষদ উদ্যোগ নেয় যুগোস্লাভিয়া সংক্রান্ত জেনেভা কনফারেন্স-র যুগ্ম সভাপতি সাইরাস ভ্যান্স ও লর্ড ডেভিড ওয়েনের নেতৃত্বে। এবছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চের প্রথমদিকে নিউইয়র্কে দু'দফার আলোচনা বসে। বসনিয়ান সার্বদের তরফে তেমন সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়নি। ইতিমধ্যে সার্বরা বসনিয়া-হেরচেগোভিনার উপদ্রুত অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর রাষ্ট্রসঙ্ঘের চেষ্টাকে বাধা দিয়ে চলেছে। এবং শান্তির আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিদ্বয় সম্প্রতি প্যারিসে সার্বিয়ার রাষ্ট্রপতি মিলোসেভিক-কে ডেকে সমঝোতা চুক্তি মেনে নিতে চাপ দেওয়ার চেষ্টা

করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তু-সংক্রান্ত রাষ্ট্রদূত মিস্ সাদাকো ওগাতা অভিযোগ করেছেন জাতিশুদ্ধিকরণের নামে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা, অত্যাচার, অঙ্গবিকৃতি ও ধর্ষণ বসনিয়ার মুসলিমদের উপর সার্বরা চালিয়ে যায়। আমেরিকা বসনিয়ার যুদ্ধোপরাধের উপর যে ষষ্ঠ দলিলটি অতিসম্প্রতি প্রকাশ করেছে তাতেও সার্বদের কৃত নিষ্ঠুরতার নির্মম চিত্র আছে। এ থেকে জানা যায়, কেরাটার্স ক্যাম্পেই ১৯৯২-র জুলাই মাসে চারশ' বসনিয়ান মুসলিমকে গণহত্যা করা হয়। যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট রাদোজে কনটিক মার্চের প্রথমদিকে সরকারের দায়িত্ব নিয়েই শান্তিপূর্ণ ও সার্বিক সমাধানের ব্যাপারে তাঁর চেষ্টা থাকবে বলে ঘোষণা করেন। তবে তাঁর টান যে সার্বদের পক্ষে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ৪ এপ্রিল ১৯৯২ ছিল সায়াজেভো আক্রান্ত হওয়ার বর্ষপূর্তি। সর্বশেষ অনাক্রমন চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ঐদিন সারাজেভোতে অন্ততঃ ৭ ব্যক্তি প্রাণ হরায় গোলাগুলিতে। অবরুদ্ধ হয়ে আছে হউক। ফলে এখানকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যে আশায় সমঝোতা বৈঠক নিউইয়র্কে আনা হয়েছিল তা আবার জেনেভাতে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবা হয়। বসনিয়া-হেরচেগোভিনার রক্তপাত বন্ধ করতে বিবাদমান গোষ্ঠীগুলির সাথে সরাসরি আলোচনা করতে আমেরিকান রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন-এর বিশেষ প্রতিনিধি যুগোস্লাভিয়াতে আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। বিশ্ববাসী বসনিয়া তথা বলকান রাজ্যগুলিতে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসছে দেখতে অধীর আগ্রহী।

সুইডেন

সুইডেনের পার্লামেন্ট নির্বাচনের শাসক বামপন্থী মোর্চা জয়লাভ করে তাদের শাসন অব্যাহত রেখেছে। আরও তিন বছর এই মোর্চা সরকার চালাবার দায়িত্ব পেল। এই মোর্চার প্রধান শরিক বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইংভার কার্লসনের নেতৃত্বাধীন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ১৫৮টি আসনে এবং কমিউনিস্ট পার্টি ২১ টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। ৩৪৯টি আসনবিশিষ্ট পার্লামেন্টে এই মোর্চা পেয়েছে ১৭৯টি আসন। সোস্যাল ডেমোক্রটিক পার্টি মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৩.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। আগের বারের তুলনায় ভোটের হার ১.৩ শতাংশ কমে গেলেও আগের বারের তুলনায় সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা দু'টি বেশী আসন পেয়েছে। অন্যদিকে, কমিউনিস্টদের আসনও দু'টি বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনের আগে বেশ কিছু তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন কমিউনিস্টদের আসন কমে যাবে। যথারীতি সেই সব মতলববাজ পন্ডিতদের অভিলাষ চরিতার্থ হয় নি। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২ এই ছ' বছর বাদ দিলে বিগত ৫৬ বছরের ইতিহাসে ৫০ বছরই ক্ষমতা থেকেছে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের হাতে।

স্মরণ থাকতে পারে যে ১৯৮৬ সালে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট নেতা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রগতিশীল নেতা ওলফ পামে প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় আততায়ীর হাতে নিহত হন। অনেকেই ভেবেছিলেন পামে মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং জনপ্রিয় নেতার অভাবে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা দিশাহারা হয়ে যাবে। নতুন প্রধানমন্ত্রী ইংভার কার্লসন একজন টেকনোক্র্যাট, ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছেন।

বিরোধী দক্ষিণপন্থী মোর্চা এবাবকাব নির্বাচনে ২১টি আসন হারিয়েছেন। তাদের মোট আসন ১৫০। গত ৪০ বছরের মধ্যে দক্ষিণপন্থীরা এত দুর্দশায় পড়েনি। এই মোর্চাব নেতাবা তাঁদের ব্যর্থতার দায় কম সংখ্যক ভোট পড়ার ঘটনার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। সুইডেনে এবার মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৬৩ লক্ষের মত। ভোট পড়েছে ৮৫.৯ শতাংশ, গতবাবেব তুলনায় ৪ শতাংশ কম।

সুইডেনের নির্বাচনের এবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পরিবেশ দূষণবিরোধী এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য (ইকলজি) রক্ষার পক্ষপাতী নতুন দল গ্রন ইকলজি পার্টি ২০ টি আসনে জয়ী হয়েছে। এই দল পেয়েছে ৫.৪ শতাংশ ভোট। ১৯২০ সালের পর এই প্রথম নতুন একটি দল সুইডিশ পার্লামেন্টে স্থান পেল। গ্রীন পার্টি অবশ্য আশা করেছিল কোন মোর্চাই গরিষ্ঠতা পাবে না এবং তারাই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ সরকার। কিন্তু তা হয়নি। কিন্তু গ্রীন ইকলজি পার্টির জয় নিঃসন্দেহে দক্ষিণপন্থী মোর্চার বিনিময়েই হয়েছে। ভোটের ফলাফলের হিসেব থেকেই এটা স্পষ্ট। গ্রীন পার্টির নেতারা তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেদের বরং একটু বামঘেঁষা বলেই চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং এই দলের পার্লামেন্টে প্রবেশ বামপন্থীদের সহায়ক হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

গ্রীন পার্টির জয় প্রমাণ করে সুইডেনের মানুষ পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে কতখানি চিহ্নিত। আর কোনো দেশের নির্বাচনে ঠিক এই ধরনের কোনো দল এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বলে মনে হয় না।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাট কমিউনিস্ট মোর্চার জয়লাভের কারণ সম্পর্কে একজন রক্ষণশীল নেতা উলফ্ অ্যাডেলসন বলেছেন, সন্তোষজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্ষমতাসীন মোর্চাকে সাহায্য করেছে। 'ড্যাগনেস নায়েটার' পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার হান্স বের্গস্ট্রম শাসক মোর্চার জয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, সুইডেনের অর্থনীতি এখন বেশ ভাল অবস্থায় আছে। তাছাড়া এবার নির্বাচনী প্রচারে সোস্যালিজম্ নিয়ে মাতমাতিটাও ছিল না।

পর্যবেক্ষকদের মতে ইউরোপের অন্য অনেক দেশের মত সুইডেনের সোস্যালিস্টরা বড় বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে ঘাটাতে যায়নি। বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী সুইডেনে নিরাপদে ব্যবসা করে যাচ্ছে। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে অর্থনৈতিক সাফল্যের বিষয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। লক্ষণীয়, গত ৫৬ বছরের মধ্যে ৫০ বছর ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও সুইডেনেব সোস্যাল ডেমোক্রাটরা সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সমাজিক ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি প্রয়োগ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। স্পেন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশেও সোস্যাল ডেমোক্রাটরা সামজতন্ত্রের কথা বললেও তার মৌল বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি রূপায়ণে আদৌ আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সুইডেন বর্তমানে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর শরিক নয়। কিন্তু ই ই সি ১৯৯২ সালের মধ্যে সদস্য দেশগুলিকে অর্থনৈকি, সামরিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করার যে উদ্যোগ নিয়েছে সুইডেন তাতে যোগদানে আগ্রহী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুইডেনের নির্বাচন সম্পর্কে ভারতে কিছুটা আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল কারণ সুইডেনের বোফর্স কোম্পানির কামান কেনা নিয়ে ভারতে অনেক তোলপাড় হয়েছে। সুইডিশ সরকার তাদের পক্ষ থেকে বোফর্স কেলেঙ্কারি উদঘটনে দৎপরতা দেখিয়েছিল কিন্তু রাজীব সরকারের অনাগ্রহ এবং অসহযোগিতার কারণে সুইডিশ তদন্ত বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি।

ইতালী

সাম্প্রতিক নির্বাচনে ইতালিতে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করেছে সাবেক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন 'ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব দ্য লেফট' (পি ডি এস) -এর বাম-মধ্যপন্থীদের জোট। নির্ব্যাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান ওস্কাব লুইগি স্কালফেরো নতুন জোট সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মধ্য-বাম জোটের নেতা, অর্থনীতিবিদ রোমানো প্রোদিকে। প্রোদি যে জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তার নাম 'অলিভ ট্রি' জোট, যার অন্তর্গত রয়েছে 'পি ডি এস'-এর মূল চালিকাশক্তি হলো পুনর্গঠিত কমিউনিস্ট রিফাউন্ডেশন পার্টি। প্রাপ্ত ফলাফলে জানা গেছে: ৩১৫টি সিনেট আসনের ১৫৭টি জিতেছে, 'অলিভ ট্রি'-র প্রার্থীরা। নিম্নকক্ষ বা ' চেম্বার অব ডেপুটি'-র ৬৩০টি আসনে এ পর্যন্ত পাওয়া ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, 'অলিভ ট্রি' জোট পেয়েছে ৩২০ টি আসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে প্রোদি-র নেতৃত্বাধীন সরকার হবে ৫৫তম জোট সরকার।

ইতালির সংবিধানে সিনেটে ৬৩০ জন প্রতিনিধি পাঁচ বছরেব জন্য নির্বাচিত হন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। সিনেট সদস্যরাও পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচিত হন 'এলাকা' বা 'রিজিওন'-এর ভিত্তিতে। প্রতি 'এলাকায়' অন্ততপক্ষে সাতটি সিনেট আসন রয়েছে। রাষ্ট্রপতি পাঁচজন সিনেট সদস্য মনোনীত করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সিনেট ও চেম্বার অব ডেপুটি-এর যৌথ ভোটে — প্রতিটি এলাকাভিত্তিক কাউন্সিল থেকে তিনজন করে প্রতিনিধিরাও ভোটদানের ক্ষমতা থাকে। রাষ্ট্রপতি হতে গেলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। তবে তিনবার পরপর নির্বাচনের পরেও কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

নির্বাচনের জয়ের পর 'পি ডি এস' নেতা মাসিমো দ্য থালেমা বলেছেন ঃ "যারা সরকার গড়তে চলেছে, তারা আগে কখনো সরকার চালায়নি।" 'মিডিয়া ব্যারন' সিলভিও বেরলুসকোনির নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী জোট পেয়েছে ২৯৫টি আসন। তুরিন থেকে প্রকাশিত 'লা স্টামপা' কাগজে 'ব্যানার' হেডলাইন দেওয়া হয়েছে ঃ "অলিভ ট্রি নতুন সরকার চালাবে। রোম থেকে প্রকাশিত 'ইল-জিওরনো' কাগজে লেখা হয়েছে ঃ ইতালির পছন্দ মধ্য-বাম জোটের সরকার।" এদিকে নির্বাচনে মধ্য-বাম জোটের জয়ের ফলে ইতালির আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগে তেজীভাব দেখা দিয়েছে। শেয়ার বাজার মন্দাভাব কাটিয়ে উঠেছে এবং ডলারের দামের তুলনায় লির-র দাম চড়তে শুরু করেছে।

ইউরোপীয় অখণ্ডতার হাল

গত বার বছর ধরে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ঐক্যের প্রক্রিয়া, অখণ্ড ইউরোপ প্রতিষ্ঠার নানা উদ্যোগ চলেছে। অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা, মুদ্রার সমমূল্য, ম্যাসট্রিস চুক্তি বলে অখণ্ড বাজার সৃষ্টি, এক দেশ থেকে অন্য দেশে অবাধভাবে যাতায়াত ইত্যাদি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম এবং পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলে এবং এখনও চলছে। কিন্তু রাজনৈতিক স্তরে যত বেশি বেশি করে

ঐক্যের উদ্যোগ নেওযা হচ্ছে, বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশেব মধ্যে অনৈক্যের পরিবেশটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অনৈক্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক — এক কথায় সর্বক্ষেত্রে ব্যাপৃত। বর্তমানে ইউরোপে পাঁচটি রাষ্ট্র অতি ক্ষুদ্র — যাদের গড লোকসংখ্যা বিশ লক্ষেব কম। অখণ্ড ইউরোপ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ যত দ্রুতগামী হচ্ছে. ছোট ছোট দেশগুলিব সমস্যা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপের অন্যান্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ এই সমস্ত ছোট ছোট দেশকে কার্যত উপনিবেশে পরিণত করতে চাইছে।

অখণ্ড ইউরোপ গঠনের প্রশ্নে নতুন কবে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে' তাহলো, ফ্রান্স এবং জার্মানির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হতে পারে যে, দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলে তো ইউরোপীয় ঐক্য শক্তিশালীই হবে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা উলটো। এই ঐক্যের লক্ষ্য হলো ব্রিটেনকে কোণঠাসা করা; ইউরোপীয় ভুখণ্ডে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব খর্ব করা। সম্প্রতি তুরিনে আন্তঃইউরোপীয় সরকারী পর্যায়ের সম্মেলন (অই জি সি) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেই সম্মেলনে জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট কোল এবং নবনির্বাচিত ফরাসী রাষ্ট্রপতি জ্যাকুইস শিরাক অখণ্ড ইউরোপ প্রতিষ্ঠার জন্য এক নতুন ধরনের নীতি ঘোষণা করেন। কোল-শিরাক একটি যৌথ প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবের মর্মবস্তু হল, অবাধ বাণিজ্য জোনের নীতির উপর ভিত্তি করে একটি ফেডারেল ইউরোপ গঠন করতে হবে। এই প্রস্তাবে ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা, বিশেষ করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজব হতবাক হয়ে যান। কেননা, এই ধরনের ফেডারল ইউরোপ গঠনের প্রস্তাব ম্যাসট্রিস চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ম্যাসট্রিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পূর্বে জার্মান প্রথম ফেডারেল ইউরোপ গঠনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করায় জার্মানিব প্রস্তাব অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফ্রান্সের নতুন সবকার পূর্বতন সিদ্ধান্ত কেবল যে পরিবর্তন করে তাই নয়, তুরিন সম্মেলনে শিরাক ফ্রাঙ্কো-জার্মানি ঐক্যের কথাও ঘোষণা করেন। ম্যাসট্রিস চুক্তি ইউরোপীয় দেশগুলির মুদ্রা-মানের সমতার যে সনদ তৈরি করেছিল, এক কথায় তিন বছর পূর্বে অখণ্ড ইউরোপ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ব্রিটেন ফ্রান্সের সহযোগিতায় যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তার প্রায় প্রত্যেকটিই আজ অকার্যকর হতে চলেছে।

কোল-শিরাক বোঝাপড়াকে আজ অনেকেই 'কোর ইউরোপ' ধারণা বলে চিহ্নিত করছেন। ফলে ইউরোপীয়ান কমিশন, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এবং সর্বোপরি ইউরোপীয়ান সিকিউরিটি সিস্টেমে এই দু' দেশের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য অনিবার্যভাবেই বৃদ্ধি পাবে। এই সমঝোতার আর একটি দিক রয়েছে। অখণ্ড ইউরোপ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ১৯৮৫ সালে একটি আইন তৈরি হয়। সেই আইনে ইউরোপের ছোট বড় সকল দেশের সমান মর্যাদার কথা বলা হয়। কিন্তু জ্যাকুইস শিরাক স্পেন ও পর্তুগালকে ইউরোপীয় কমিশনের সদস্য রাখতেই রাজি নন। তুরিন সম্মেলনে সেকথা তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়েও দিয়েছেন। ঐতিহাসিক কারণেই জার্মানির সঙ্গে স্পেন ও পর্তুগালের বৈরিতা দীর্ঘদিনের। ফলে ফ্রান্সের এই মনোভাব জার্মানিকে উৎসাহিত করে। আবার একই ঐতিহাসিক কারণে, স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে ইতালির বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। ফলে ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সের পূর্বতন বন্ধুত্বের সম্পর্কে চিড় ধরার আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠেছে। অখণ্ড ইউরোপ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আজ প্রায় ভাঙতে বসেছে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

'আত্মরক্ষার সামর্থ না থাকলে কোনো বিপ্লবেরই কোনো অর্থ নেই', রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবার প্রায় এক বছর পরে, ১৯১৮ সালের অক্টোবরে লেনিন এ-কথা বলেছিলেন। তার পর থেকে প্রায় ৭০ বছর পার হয়েছে। মার্কসবাদের এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বেরই অভ্রান্ততা ও সারবত্তা এই ৭০ বছরের ইতিহাস একাধিকবার প্রমাণ করেছে। এটা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। যারা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সমাজজীবন বদলাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা বারংবার এই সত্য উপলব্ধি করেছে।

লেনিনের থিসিস নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করা এবং তাকে বাস্তবায়িত করার উপরেই বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। বিপ্লবের অস্তিত্ব রক্ষা, সমাজতন্ত্রের বিকাশ—এটাই ছিল সেদিনকার প্রধান বিষয়।

বিপ্লব বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ন্যস্ত করলো জনসাধারণের হাতে ঃ বন্ধ করলো মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ, জমি তুলে দিল কৃষকদের হাতে, পুঁজিবাদী মালিকানাধীন বড়ো বড়ো কল-কারখানা করা হলো রাষ্ট্রায়ত্ত, ঘোষণা করলো রাশিয়ার সকল জাতি-অধিজাতির শান্তি ও সমতার নীতি, বাতিল হয়ে গেল জার আমলের যাবতীয় বৈষম্যমূলক চুক্তি ও মকুব করা হলো শোষণকারী ঋণ। গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শের উপর নির্ভর করে শুরু হলো নতুন সমাজ নির্মাণের কাজ। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল নতুন জীবন নির্মাণের এই অধিকার রক্ষা করার কাজটা খুব সহজ নয়। প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো গৃহযুদ্ধে ভিতরে ও বাইরের প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির অনুপ্রবেশ—যাদের লেলিয়ে দিয়েছিল শোষক শক্তি।

গৃহযুদ্ধকে, অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের জন্য বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সংগঠিত সামরিক লড়াইকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার অপরিহার্য শর্ত বলে গন্য করে না। অবশ্য, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে শোষকরা লড়াই না করে কখনও আত্মসমর্পণ করেনি। রাশিয়াতেও তাই ঘটলো। পেত্রোগ্রাদে অক্টোবর অভ্যুত্থানের প্রায় রক্তপাতহীন সাফল্যের ঠিক পরেই, একের পর এক আছড়ে পড়লো প্রতিবিপ্লবী বিক্ষোভের ঢেউ, যার নাটের গুরু ছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেরেন্‌স্কি এবং দুই জেনারেল ক্রাসনভ ও কালেদিন। প্রতিবিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করছিল পূর্বতন পুঁজিপতি ও জমিদার, উচ্চপদস্থ আমলা, প্রাক্তন রাজকীয় সেনাবাহিনীর অফিসার, ধনী কৃষক এবং যাজকদের একটা অংশ। সত্য বটে, বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই 'প্রতিবিপ্লব ও অন্তর্ঘাতবিরোধী সংগ্রামের জন্য গঠিত বিশেষ কমিশনের' সক্রিয় কর্মতৎপরতার মাধ্যমে ১৯১৭ সালের শেষ দিককার ও ১৯১৮ সালের গোড়াকার সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহ খুব তাড়াতাড়ি দমন করা হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জড়িয়ে পড়েছিল গৃহযুদ্ধে; এই ভাবেই শুরু হয়েছিল বিদেশী হস্তক্ষেপ।

১৯১৮ সালে রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় (উত্তর, দূরপ্রাচ্য, ট্রান্সককেশিয়া, মধ্য এশিয়া, ক্রিমিয়া) ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনী হামলা চালালো। এরা সকলেই একটি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছিল। এদের প্রত্যেকের

লক্ষ্যই ছিল এক। লক্ষ্যটি হলো ঃ বিশ্বের প্রথম প্রলেতারীয় বিপ্লবের টুঁটি টিপে ধবা, বুর্জোযা সমাজব্যবস্থা ফিবিয়ে আনা, বাশিয়াকে নিজেদের 'প্রভাবের ক্ষেত্রে' পবিণত কবা এবং দেশটিকে নিজেদেব নীতি রূপায়ণেব এক গুণগত যন্ত্রে পরিণত করা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, একেবারে শুরু থেকেই বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-কৃষক বাষ্ট্রটিকে তার আত্মরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। জার আমলের পুবোনো সেনাবাহিনীব সাহায্যে এই কাজ করা সম্ভব ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পবে তারা অত্যন্ত ক্লান্ত হযে পড়েছিল। সৈন্যবা মনেপ্রাণে চাইছিল ঘরে ফিবতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিবার-পরিজনেব কাছে ফিরে যেতে। অনেকেই এটা বুঝতে পারেনি যে বিপ্লবের সব কাজ এখনো শেষ হয়নি এবং বিপ্লবের সাফল্য রক্ষা করার কাজ এখনো বাকি। অক্টোবব বিপ্লবের সাফল্যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল শ্রমিকদের লাল রক্ষীবাহিনী। কিন্তু তাবা সংখ্যায় ছিল অল্প এবং প্রয়োজনীয় সামরিক দক্ষতাও তাদের ছিল না। এই কারণেই ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে লেনিন, কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন, এক নতুন ধরনের সেনাবাহিনী গঠন করা হবে—তা হলো শ্রমিক ও কৃষকদের লাল ফৌজ।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে ফেলে তার জায়গায় নতুন বৈপ্লবিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করার যে প্রয়োজনেব কথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী থিসিসে বলা হয়েছে, লালফৌজ গঠন কবে তা বাস্তবায়িত করা হলো। নতুন সেনাবাহিনী গঠনের কাজটা কি ভাবে অগ্রসর হয়েছিল?

প্রথমে গড়ে তোলা হলো স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। পুরোনো সেনাবাহিনী একেবারে ছত্রখান হয়ে গেছে। এই অবস্থায় মোটামুটি চলনসই বাহিনী গড়ে তোলার এ ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা ছিল না। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ চালু করা হলো। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী শ্রমজীবী মানুষ সামরিক জ্ঞান অর্জন করলো এবং অস্ত্র ব্যবহারের কায়দাকানুন ও যুদ্ধের কলাকৌশল শিখলো। লালফৌজের কম্যান্ডার পদ লাভ করলেন সবচেয়ে করিৎকর্মা শ্রমিক ও কৃষকরা। জার আমলের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক, বিপ্লবে যোগদানকারী অফিসারদের একটা অংশ থেকেও কম্যান্ডার নিয়োগ করা হলো। শ্রমিকশ্রেণী এবং পোড়খাওয়া কমিউনিস্টদের মধ্যে থেকে বাছাই করা লোক নিয়ে সেনাবাহিনীতে সামরিক কমিশার গঠন করা হলো। গোড়ার দিকে তাঁরা প্রাক্তন সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাজকর্ম পরিদর্শন করতেন। পরে তাঁদের কর্মক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছিল। সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক ক্ষমতা বাড়াবার কাজ তারা হাতে নিয়েছিলেন। কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষার ভারও নিয়েছিলেন।

ভিতরের এবং বাইরের প্রতিবিপ্লব অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তাদের পক্ষে ছিল সুদক্ষ নিয়মিত সেনাবাহিনী। অতএব ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হলো। তবে, যারা শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি সেনাবাহিনীতে তাদের ঢুকতে না দেবার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ফলে সরকার ও পার্টির পক্ষে অসংখ্য ইউনিট ও ডিটাচমেন্ট একত্রিত করে নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। বছরের শেষে লালফৌজে কর্মী সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০ লক্ষ।

সাংগঠনিক দিক থেকে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হলো, শত্রু মোকাবিলা করার কাজে তার দক্ষতা বাড়ানো হলো। গঠন করা হলো প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ

সামরিক সংস্থা—বৈপ্লবিক সামবিক পর্যদ। সেনাবাহিনী গড়ে তোলার এবং তাকে শত্রুর মোকাবিলা করার উপযোগী করে তোলাব সমস্ত দায়িত্ব তাব উপর ন্যস্ত করা হলো। লালফৌজ নিয়মিত সেনাবাহিনীতে পরিণত হলো এবং শত্রুর বিরুদ্ধে একের পর এক সাফল্য অর্জন করতে লাগলো। লেনিন লিখেছিলেন, একেব পব এক 'সব সংকটই আমবা কাটিযে উঠেছিলাম, তবু প্রবল গৃহযুদ্ধের মধ্যে সেনাবাহিনী গঠন করার কাজটা ছিল খুবই কঠিন। সেনাবাহিনী গঠন করা হলো।'

এর ফলে গৃহযুদ্ধেব বছরগুলিতে (১৯১৮-১৯২০) এক শক্তিশালী গণবিপ্লবী সেনাবাহিনী তৈরি হয়েছিল। ১৯২০ সালের শেষে এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫৫ লক্ষ। এই বাহিনীর এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যার দ্বারা একে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া যেত। যেমন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, সচেতন শৃঙ্খলাবোধ উচ্চ নৈতিক শক্তি এবং যে আদর্শ রক্ষার জন্য লড়াই করছে তার প্রতি অটুট অঙ্গীকার।

দেশে তখন চলছে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ। এই ব্যবস্থায় সেনাবাহিনী গঠন করে তাদের অস্ত্র ও খাবার জোগান দেবার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্র, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে প্রচণ্ড কর্মোদ্যোগের পরিচয় দিতে হয়েছিল। তখন দেশের সমগ্র জীবনের মর্মবাণী ছিল ঃ সবকিছু রণাঙ্গণের জন্য, সবকিছু সেনাবাহিনীর জন্য।

কমিউনিস্ট পার্টির বিপুল সাংগঠনিক এবং শিক্ষামূলক কাজ, বৈপ্লবিক কর্মোন্মাদনা এবং জনসাধারণের বীরত্ব ভিতরের ও বাইরের প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিজয় সম্ভব করেছিল। লেনিনের ভাষায়, একটি জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক এবং কৃষক যখন উপলব্ধি করে, অনুভব করে এবং দেখতে পায় যে তারা লড়াই করছে তাদের নিজস্ব সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য, শ্রমজীবী মানুষের শাসন কায়েম করার জন্য, যার জন্য তারা লড়াই করছে তা সফল হলে সংস্কৃতির যাবতীয় আশীর্বাদ, মানুষের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট সবকিছুর সুফল তারা এবং তাদেব শিশুরা ভোগ করতে পারবে—তখন সে জাতিকে কিছুতেই পরাভূত করা যায় না।

লেনিনের এই উক্তি যে কত সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের সবচেয়ে কঠিন ও মর্মান্তিক কালপর্বে।

গরবাচ্যভের নির্বাচনী সংস্কার

পশ্চিমী দেশগুলির নির্বাচনী ব্যবস্থায় সহজাত অনেক বিধি-নিষেধ থেকে সাবেক সোভিয়েত অনুরূপ ব্যবস্থা মুক্ত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন কোন আবাসিক সংক্রান্ত যোগ্যতা ছিল না ঃ নিয়মটা ছিল, কোন নির্বাচন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সমস্ত ভোটদাতাকেই ভোটার তালিকাভুক্ত করতে হবে। কোন শিক্ষাগত যোগ্যতাও নেই। জাতিগত, নৃকুলগত ও সমাজিক উৎপত্তি, নারী-পুরুষ, ধর্ম ও সম্পত্তিগত মর্যাদা বা অতীত ইতিবৃত্ত নির্বিচারে ১৮বছর বয়ঃপ্রাপ্ত সমস্ত নাগরিককেই সোভিয়েত সংবিধান ভোটাধিকার দিয়েছিল।

প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারেও প্রার্থীদের সামাজিক বা সম্পত্তিগত মর্যাদা, অতীত ইতিবৃত্ত, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক পটভূমি বা নারী-পুরুষ বিচার সংক্রান্ত কোন বাধা-নিষেধও ছিল না। একমাত্র যোগ্যতা ছিল বয়স ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে নির্বাচনে প্রার্থীর

বয়স হতে হবে ২১ বছর এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে বা জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতগুলিতে নির্বাচনে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ বছর।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের খরচ, দেশে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, এবং টেলিভিশন ও বেতার সম্প্রচারে সময় বরাদ্দ করা সবই রাষ্ট্র করতো।

পূর্বতন নির্বাচন ব্যবস্থায় সমাজের সকল অংশের ও জনসাধারণের সমস্ত গোষ্ঠীর সরকারে প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত হত, স্থানীয় সোভিয়েত থেকে একেবারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত পর্যন্ত সর্বত্রই এদের দেখা যেত। সব মিলিয়ে ডেপুটির সংখ্যা ছিল ২৩০০০০০-এর বেশি। তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ কারখানার শ্রমিক ও কৃষক, এবং বাকিরা ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী কর্মী, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক কর্মী প্রভৃতি। এদের প্রায় অর্ধেক নারী এবং এক তৃতীয়াংশের বেশি তরুণ-তরুণী (৩০ বছরের কম)। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত নৃজাতির মানুষ ওদের মধ্যে ছিলেন এবং এরা সমগ্র জনসাধারণের ব্যাপক পরিসরের স্বার্থসমূহ প্রতিফলিত করেন। সেটাই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এক বিপুল সাফল্য।

তা হলেও অন্য যে কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি দিন ধরে নির্বাচন ব্যবস্থা আর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। যে সব পরিবর্তন ঘটছে তা থেকে এই ব্যবস্থা দূরে সরে থাকতেও পারে না; পরিবর্তন ঘটছে জনতথ্য প্রসারের ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব রেওয়াজ বন্ধ করা এবং প্রতিটি ব্যাপারে প্রতিযোগিতার মনোভাব বাড়ানোর ক্ষেত্রে। এই প্রক্রিয়ার সারবস্তুকেই পরিকল্পিত সংস্কারে প্রতিফলিত করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো নির্বাচন প্রচারের সময় নির্বাচকমণ্ডলীকে মত জানানোর আরো ব্যাপক সুযোগ দেওয়া।

আমি যা বলতে চাইছি তা পরিষ্কার করার জন্য নির্বাচনের সময় এ যাবৎ এই দেশের লোকজন যেভাবে তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে এসেছেন, সংক্ষেপে আপনাদের তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক। এই বাছাই ভোটের দিন অতটা হয় না যতটা হয় তার অনেক আগেই এবং কয়েক দফায় — গোটা নির্বাচন অভিযানের মধ্যে দিয়ে। বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা কি রকম দাঁড়ায়?

আইন অনুযায়ী কারোরই, তিনি যেই হোন না কেন, নিজেকে মনোনীত করার অধিকার নেই। এটা জনসাধারণের সংগঠনগুলির, কল-কারখানার কর্মীদের সাধারণ সভার বিশেষাধিকার; ট্রেড ইউনিয়নের মত সংগঠনগুলি কিংবা স্বতন্ত্র ব্যক্তি উভয়ের পক্ষে থেকেই প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করা যেতে পারত। স্বভাবতই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের মধ্যে থেকে যাদের তারা ভালভাবেই জানতেন এবং যারা লোকহিতকর কাজের প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তাদেরই প্রার্থী ঠিক করতেন। যে প্রার্থীকে মনোনীত করা হবে তার সম্পর্কে যে কেউ স্বাধীনভাবে নিজের মত জানাতে পারতেন, কোন প্রার্থীকে বাদ দেওয়ার এবং অন্য কাউকে মনোনয়নদানের দাবি জানাতে পারতেন। এরকম সর্বাঙ্গীণ আলোচনার পর কারখানার, যৌথ খামারের, অফিসের কর্মীদের সাধারণ সভা থেকে তারা সবাই যে প্রার্থীকে যোগ্যতম বলে মনে করে সেই প্রার্থীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে রায় জানাতেন।

এর পর নির্বাচন ক্ষেত্রের ভিত্তিতে জনসাধারণের সংগঠনের এবং কারখানা ও অফিস

কর্মীদের প্রতিনিধিদের সভায় আবার তাদেব নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত প্রার্থী সম্পর্কে আলোচনা হতো এবং পুরোপুরি ও খোলাখুলি আলোচনার পর যে প্রার্থীকে তারা সমর্থন করবে তাকে বেছে নেওয়া হতো। তাঁর নাম স্থানীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হতো ভোট পত্রে রাখার জন্য। বাকি প্রার্থীরা হয় নিজেরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতেন, নয়েতো যে সংগঠন বা সমাজিক গোষ্ঠী থেকে তাদের নাম প্রস্তাব কবা হয়েছিল তারাই তা বাতিল করে দিতেন।

এই রকম পর্যায়ক্রমে প্রার্থী বাছাই-এর একটা নিজস্ব সুবিধা আছে, কারণ ভোটের দিনের বাছাই-এর চেয়ে এতে ভুল বাছাই-এর সম্ভবনা থেকে রক্ষা পাওয়ার অনেক বেশি সুযোগ থাকে। তাহলেও, একই সঙ্গে ভোটদান পদ্ধতিটা বহুলাংশে নামমাত্র ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় কেন না সোভিয়েতের প্রতিটি আসনের জন্য কেবল একজন করে প্রার্থীই থাকতেন। তাছাড়া আগাম বাছাই-এর ব্যাপারে অনেক ভোটদাতাই মনে করেন যে তাদের অধিকার প্রয়োগে কিছুটা "বাধা সৃষ্টি' করা হচ্ছে কেন না ব্যক্তিগতভাবে তারা নিজেরা নয়, নির্বাচন সভাগুলিতে তাদের প্রতিনিধিরা তাদের হয়ে সে কাজ করেন, তাই তাদের যেটুকু করার থাকে সেটা হলো ভোট দিয়ে তাদের হয়ে করা এই বাছাইকে সমর্থন করা (বা না করা)।

এই সব ত্রুটি দূর করার জন্য নির্বাচন পদ্ধতিকে আরো গণতান্ত্রিক করা হয়। অনেকে মনে করেছেন যে একটি নির্বাচন ক্ষেত্রের সমস্ত প্রার্থীর নামই ভোটপত্রে রাখতে হবে। কেবল জনসাধারণের সংগঠন এবং কারখানা ও অফিস কর্মীদেরই নয়, এলাকার অধিবাসীদের সভাগুলিকেও প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার দিতে হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। আর একটা চিন্তাধারা হলো "প্রতিদ্বন্দ্বী" নির্বাচন মঞ্চগুলিকে জনসাধারণের যাচাই করে দেখার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

"প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের অনেক সুবিধা হবে ঃ লোকজন কেবল প্রার্থীদের জীবনী ও সাংগঠনিক প্রতিভাই নয় তাদের কর্মসূচীকেও তুলনা করতে পারবে", এস্তোনীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি আর্নোল্‌দ রুতেল মস্কো নিউজ পত্রিকায় এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রার্থীর কর্মসূচীতে দেখানো হতে পারে যে শহরের বাজেটের অর্থ সে কিভাবে ব্যয় করতে চায়। তাহলে লোকজন কেবল বিশেষ একজন ব্যক্তির পক্ষেই নয়, তাদের জেলা বা শহরের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হবে বলে তাঁরা যেটা মনে করবেন এমন এক বিশেষ উন্নয়নের পথে স্বপক্ষেও তাঁরা ভোট দেবেন।"

সঙ্কটজনক অবস্থা

১৯৯১ সালের প্রথম থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়। সুপ্রিম সোভিয়েতের তদানীন্তন চেয়ারম্যান দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে যে ধরনের খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে তা দেশের ৭৪ বছরের ইতিহাসে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় নি। মানুষ খাদ্যের সন্ধানে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে

যাচ্ছেন। গণ-অসন্তোষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দেশের বিশ লক্ষ শ্রমিক, যাঁদের একটা বড় অংশ খনি-শ্রমিক, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করেন। ১৯৯১ সালের ২৭শে এপ্রিল বৃশ ফেডারেশনের ৫০ লক্ষ শ্রমিক এক ঘণ্টার প্রতীক ধর্মঘট করেন।

দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা পূর্বের তুলনায় এই সময়ে আরো বৃদ্ধি পায়। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি রিপাবলিকের মধ্যে ন'টি রিপাবলিকই স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের দাবি তোলে। এই দাবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকার নতুন ইউনিয়ন চুক্তির কথা বলে। নতুন ইউনিয়ন চুক্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সকল নীতি-নির্ধারক ক্ষমতা রিপাবলিকগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তা ছাড়া আরো বলা হয় যে, কোন রিপাবলিক যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে চায় তবে সেই রিপাবলিককে গণভোট নিতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার সপক্ষে যদি সেই রিপাবলিকের ৭৫ শতাংশ নাগরিক অভিমত ব্যক্ত করেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রিপাবলিকের স্বাধীনতা মেনে নেবে। এই নতুন ইউনিয়ন চুক্তির প্রশ্নে ১৯৯১ সালের ১৭ই মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সেই গণভোটের রায় ইউনিয়ন চুক্তির সপক্ষে যায়। ২৩শে এপ্রিল সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গরবাচ্যভের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ন'টি রিপালিকের প্রেসিডেন্টের নতুন ইউনিয়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গণভোটের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও ৬টি বিপাবলিক নতুন ইউনিয়ন চুক্তিতে সই করতে অস্বীকার করে। যে ছ'টি রিপাবলিক নতুন ইউনিয়ন চুক্তিতে সই করতে অস্বীকার করে সেগুলি হলো ঃ লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া, জর্জিয়া, মোল্ডাভিয়া এবং আর্মেনিয়া। ফলে নতুন ইউনিয়ন চুক্তি প্রকৃত পক্ষে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট নিরসনে কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকার সঙ্কট বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু সেই সঙ্কট বিমোচন কর্মসূচীর রূপটা কি হবে সে বিষয়ে সরকারের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। পরন্তু, এই সঙ্কট বিমোচন কর্মসূচী রূপায়ণের প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নে সুস্পষ্ট দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ডেমোক্রাটিক ফোরাম এবং র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠী চায় দ্রুতগতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত সংস্থাগুলির কর্তৃত্বভার বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হোক, যে সমস্ত শিল্প সংস্থা রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক, দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়া হোক, অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হোক এবং শিক্ষা ও চিকিৎসার ভার সরকারের হাত থেকে বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হোক।

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে ঃ দেশের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধ করতে অবিলম্বে দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হোক, যে ছটি রিপাবলিক ইউনিয়ন চুক্তিতে সই করেনি সেই ছটি রিপাবলিকের সরকার খারিজ করে দিয়ে ঐ সমস্ত রিপাবলিককে রাষ্ট্রপতি শাসনের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হোক, রুগ্‌ণ শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, শহর থেকে মানুষ যাতে খাদ্যের সন্ধানে গ্রামে না চলে যান সেজন্য খাদ্যশস্যে ভরতুকির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

দেশের এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ১৯৯১-এর ২৪

ও ২৫শে এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এরপূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি রিপাবলিকের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসে। এই ১৫টি রিপাবলিকের মধ্যে ১১টি রিপাবলিকের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিই মনে করেন যে, ১৯৮৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে সমাজতান্ত্রিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য মিখাইল গরবাচ্যভ যে পেরেস্ত্রৈকা চালু করেন আজকের দেশের ভয়াবহ সঙ্কটের মূলে রয়েছে গরবাচ্যভের সেই পেরেস্ত্রৈকা নীতি। ১৯৮৫ সালে গরবাচ্যভ যে সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করেন তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। আর এই ব্যর্থতার পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র-বিরোধীরা, কমিউনিস্ট-বিরোধীরা। তাঁরা দেশে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত রিপাবলিকের কেন্দ্রীয় কমিটি আরো অভিমত ব্যক্ত করে যে, মিখাইল গরবাচ্যভের আর কালবিলম্ব না করে পতদ্যাগ করা উচিত।

কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকটিও হয় খুবই উত্তপ্ত। ঐ অধিবেশনে যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের শতকরা ৭০ জনই মিখাইল গরবাচ্যভের কঠোর সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে দাঁড়িয়ে মিখাইল গরবাচ্যভ পদত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি তা প্রত্যাখ্যান করে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৮তম কংগ্রেসের গৃহীত কর্মসূচী কার্যকর করার পথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশে বাজারভিত্তিক অর্থনীতি, পাঁচশ দিনের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয়গুলি পরবর্তীকালে জনগণকে বেশি বেশি করে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে চলে। সব কিছু মিলিয়ে মিখাইল গরবাচ্যভের ভাষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন দাঁড়ায় বিস্ফোরণের মুখে।

বিপর্যয়কর পরিস্থিতি

প্রকৃত অর্থেই সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ১৯৯১ সালের ১৯শে আগষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরাষ্ট্রপতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য গেন্নাদি ইয়ানায়েভের নেতৃত্বে আটজনের একটি আপৎকালীন কমিটি দেশের ক্ষমতা দখল করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি মিখাইল গরবাচ্যভ তখন ক্রিমিয়ায় ছুটিতে ছিলেন। কিন্তু এই আপৎকালীন কমিটি চারদিনের বেশি সময় ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি। ২৩শে আগষ্ট মিখাইল গরবাচ্যভ মস্কোয় ফিরে আসেন এবং পুনরায় নিজের হাতে দেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু ইত্যবসরে দেশের প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় রুশ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বোরিস ইয়েলৎসিনের হাতে। আপৎকালীন কমিটির ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে একের পর এক অত্যন্ত গুরুতর এবং উদ্বেগজনক ঘটনাবলী ঘটে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐক্য প্রায় বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। বাল্টিক অঞ্চলের তিন রিপাবলিক — লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া এবং লাতভিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন

থেকে বেরিয়ে গেছে। এই তিন রিপাবলিক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ৫০টির বেশি রাষ্ট্র এদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছে। আরো দশটি রিপাবলিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এক কথায়, শক্তিধর সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন খণ্ড-বিখণ্ড। সেখানকার সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সব রকমের প্রক্রিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলীর গতি প্রকৃতি দেখে সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উল্লসিত। তারা গরবাচ্যভ-ইয়েলেৎসিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ১৯শে আগস্টের ঘটনার পর সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেরও হুমকি দিয়েছিল।

১৯শে আগষ্টের ঘটনার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে শুরু হয়েছে কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান। আর এই উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানের পুরোভাগে রয়েছেন সেখানকার পূর্বতন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতারা। মিখাইল গরবাচ্যভ নতুন করে দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ২৪শে আগষ্ট, ১৯৯১, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। একতরফাভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর একদিন পরেই প্রথমে রুশ ফেডারেশনে এবং তার অব্যবহিত পরেই সারা দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সারা দেশে কমিউনিস্ট পার্টির বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। লেনিন প্রতিষ্ঠিত 'প্রাভদা'র প্রকাশ এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। নভেম্বর বিপ্লবের স্মারক চিহ্নগুলি এবং মূর্তিগুলি সর্বত্র আক্রান্ত ও বিকৃত করা হতে থাকে। কে জি বি ভেঙে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে দেবার চেষ্টা হয়। মস্কোতে জারঝিন্স্কি এবং সাভের্দলভের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় বলশেভিক নেতাদের মূর্তিগুলি অপসারণ করা হয়। কার্ল মার্কসের আবক্ষ মূর্তি বিকৃত করা হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লেনিনের মূর্তি উপড়ে ফেলা হয়েছে। রক্তপতাকা পদদলিত হচ্ছে। তার স্থান দখল করছে জারের আমলের পতাকা। এই হচ্ছে লেনিনের দেশের মর্মান্তিক পরিস্থিতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে প্রায় প্রতিনিয়ত চলছে জনগোষ্ঠী ও জাতিগত দাঙ্গা। এই দাঙ্গা থামাতে জর্জিয়ায়, মোলদাভিয়ায় এবং কাজাখস্থানে সেনা নামাতে হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক অপরাধ, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয়েছে সে ধরণের সঙ্কট গত ৭৪ বছরের ইতিহাসে কখনও সেখানে দেখা যায়নি। খাদ্যের হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী ভাবেই বলা হয়েছে যে খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে তাতে কোনক্রমে ১৯৯১ সালটা কাটবে। আর ১৯৯২ সাল শুরু হবে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে। মিখাইল গরবাচ্যভ দেড় বছর পূর্বে বলেছিলেন দু'বছরের মধ্যে সঙ্কটের সুরাহা করতে না পারলে তিনি পদত্যাগ করবেন। এখন বলছেন দেশে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ১৫ বছর লাগাবে। গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের পটভূমিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট হয়ে সংখ্যবদ্ধ হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ফ্যাসিস্ত শক্তি মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠছে। অন্যদিকে দেশের নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন গ্রুপ একটি ঐক্যমঞ্চ গঠন করেছে। তাঁরা আত্মগোপনে গেছেন। আত্মগোপন অবস্থায় সমাজতন্ত্র রক্ষা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কর্মসূচী প্রকাশ করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি

অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটল। ১৯৯১ সালের ২১শে ডিসেম্বর আলনা-আটা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ৬৯ বছরের সোভিয়েত ইউনিয়ন বৃপান্তরিত হয় স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহেব কমনওয়েলথে। নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যেদিয়ে গঠিত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ বিলুপ্ত। সমগ্র দেশ টুকবো টুকরো। যে রাশিয়া ঘিরে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই রাশিয়া এই মুহূর্তে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে অস্থির। সারা দেশে চলেছিল সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা।

আলমা আটা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে সেই কমনওয়েলথ-এর মূল ঘোষণাগুলি হলো ঃ

১) প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্র যারা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে কমনওয়েলথ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে অংশগ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির কমনয়েলথ উন্মুক্ত থাকছে।

২) সাধারণ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল এবং সারা ইউরোপীয় ও ইউরো-এশিয় বাজার গঠন ও বিকশিত করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে।

৩) স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির কমনওয়েলথ গঠন করার মধ্যবর্তিতায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের আর অস্তিত্ব থাকছে না।

৪) নিজ নিজ সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমনওয়েলথ-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি, প্রাক্তন ইউ এস এস আর-এর চুক্তি ও সমঝোতার ফলশ্রুতিতে বর্তিত আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব প্রতিপালনের নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

সনদে আরো বলা হয়েছে ঃ কমনওয়েলথ সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা পরিচালিত হবে সমতার ভিত্তিতে গঠিত কো-অর্ডিনেটিং সংস্থার মাধ্যমে এবং কমনওয়েলথ সদস্যদের সমঝোতার ভিত্তিতে। এটি একটি রাষ্ট্রও নয়, আবার উপরি রাষ্ট্রকাঠামোও নয়।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১১ টি রিপাবলিক এই সনদে সই করে। সেই এগারোটি রিপাবলিক হলো ঃ ১) আজারবাইজান ২) আর্মেনিয়া ৩) বাইলোরাশিয়া ৪) কাজাখাস্তান ৫) কিরঘিজিয়া ৬) মোল্ডাভিয়া ৭) রাশিয়ান ফেডারেশন ৮) তাজিকিস্তান ৯) তুর্কমেনিস্তান ১০) উজবেকিস্তান এবং ১১) ইউক্রেন।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের যে চারটি রিপাবলিক কমনওয়েলথ চুক্তিতে সই না করে কমনওয়েলথ বহিভূত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করে সেগুলি হলো ঃ ১) লিথুয়ানিয়া ২) লাতভিয়া ৩) এস্তোনিয়া এবং ৪) জর্জিয়া। আলমা-আটা সম্মেলন আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের আসনটি গ্রহণ করবে রাশিয়া।

কমনওয়েলথ চুক্তির এক মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই মধ্যে রাশিয়ায় খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৫ শতাংশ, মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে ২৩ শতাংশ। এই শতাব্দীতে এত অল্প সময়ে কোন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ বা উন্নয়ণশীল দেশে এ ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় নি। বুশ প্রেসিডেন্ট বোরিস ইয়েলৎসিনের 'নতুন নতুন বিজয়' এর প্রাথমিক সাফল্য

ছিল : পশ্চিমী দুনিয়া থেকে ৬শ' কোটি ডলাব সাহায্য ব্যতিরেকে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু কিসের বিনিময়ে পশ্চিমী দুনিয়া থেকে রাশিয়া এই সাহায্য দাবী করতে পারতো? মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ প্রকাশ্যেই বলেছেন, ত্রিশ বছরেব বেশি সময় ধরে যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল সেই লড়াইয়ে আমেরিকা জয়ী হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার অভিযান কি শেষ হয়েছে? সঙ্কটাপন্ন 'বন্ধু রাশিয়া'কে পশ্চিমী দুনিয়ার আর্থিক সাহায্যদানের প্রধান শর্ত হলো রাশিয়াকে পরিপূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকরণ করা। বরিস ইয়েলৎসিন ও রাশিয়াকে নিরস্ত্রীকরণ করার 'বলিষ্ঠ পদক্ষেপ' গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা বাজেটের দশ শতাংশ হ্রাস কবা হবে; পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং মজুত পারমাণবিক অস্ত্র পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা হবে। কিন্তু এতেও কি পশ্চিমী দুনিয়া সন্তুষ্ট হতে পেরেছে? না আমেরিকা আরো দাবি জানিয়েছে ইউক্রেন এবং কাজাখস্তান যাতে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করে তার দায়িত্ব বহন করতে হবে রাশিয়াকে।

আর ভৌগলিক দিক থেকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে? লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক জেফ্রি হসকিং ২৩শে ডিসেম্বরের 'দ্য টাইমস' পত্রিকায় লিখেছেন : 'গরবাচ্যভের গ্লাসনস্ত রাশিয়াকে ১৫৫২ সালের ভৌগলিক সীমারেখায় নিয়ে যেতে চলেছে। ১৫৫২ সালে জার ইভান-৪ তাতারদের উপর বিজয় অর্জন করে রুশ ভাষাভাষী জনগণের জন্য একটি দাসভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাশিয়ার নির্বাচন

১৯৯৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর রাশিয়ার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটার পর এটা ছিল দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি অব রাশিয়ান ফেডারেশন ২২ শতাংশ ভোট পেয়ে দেশে অগ্রণী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৯৩ সালে সেখানে যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি যে ভোট পেয়েছিল এবারে কমিউনিস্ট পার্টি তার দ্বিগুণ ভোট পেয়েছে। এই নির্বাচনে ঝিরনোভস্কি'র উগ্র জাতীয়দাবাদী দল লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি পেয়েছে ১১.২ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রী চেরনোমিরদিনের সরকার পন্থী 'আওয়ার হোম ইজ রাশিয়া' পেয়েছে ৯.৫ শতাংশ এবং লিবারেল ইয়াবলক পেয়েছে ৮.৪ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, রুশ সংসদের নির্বাচন এক জটিল প্রক্রিয়া, ডুমা'র ৪৫০টি আসনের অর্ধাংশ পূরণ করা হয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দিয়ে। দলের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের ভিত্তিতে ডুমা প্রতিনিধি স্থিরীকৃত হয়। তবে প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নামের তালিকা পূর্বেই ঘোষণা করতে হয়। বাকি আসনগুলি পূরণ হয় সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে। রাশিয়ার বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি এতই জটিল যে সেখানে কোন একক দলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা প্রকৃতপক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার। এছাড়া রাশিয়ার সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোটাও খুব দুর্বল। ১৯৯৩ সালে রুশ সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে গোলাবর্ষণের ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছিল। সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই গোলাবর্ষণের ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছিল গণতন্ত্রের স্বার্থবাহী ঘটনা হিসেবে। সংবিধান খারিজ করার পর ইয়েলৎসিন ডিক্রী জারি করে কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। নিজেকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসন ব্যবস্থা। নতুন সংবিধান অনুযায়ীই ১৯৯৩ সালে প্রথম এবং ১৯৯৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন পবিবর্তন ঘটবে তা নয়। নির্বাচনী ফলাফল রাশিয়ার বুকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ইঙ্গিতও বহন করছে না। সেখানকার জনগণ যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের বোঝা বহন করে চলেছেন নির্বাচনী ফলাফল তারও কোন নিরসন ঘটাতে সাহায্য করবে না। রাষ্ট্রপতি প্রধান রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির কথাই শেষ কথা। ১৯৯৩ সালের নতুন সংবিধান অনুযায়ী ডুমা বা সংসদ একটি সংসদীয় কাঠামোর ছায়া মাত্র। তথাপি রাশিয়ার নির্বাচনী ফলাফলের গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এই নির্বাচনের তাৎপর্য সদূর প্রসারী। নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যদিয়ে যে সত্যটি সব থেকে পরিস্ফুট হয়েছে তা হলো, রাশিয়ার বুকে কমিউনিস্ট পার্টির শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত। সেখানে ধনবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর যাঁরা ভেবেছিলেন রাশিয়ার বুক থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা একেবারে মুছে গেছে তাঁরা আজ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছেন। যাঁরা এখন থেকে তিন-চার বছর পূর্বেও মনে করেছিলেন যে ইউরোপীয় ভূখণ্ড থেকে লাল পতাকা চিরতরে অপসারিত হয়ে গেল তাঁরাও আজ বুঝতে পারছেন তাঁদের মূল্যায়ন কত ভ্রান্ত। রাশিয়ার নির্বাচনের পূর্বে ইউক্রেন, বাইলোরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং আজারবাইজানে নির্বাচন হয়। সেই সমস্ত নির্বাচনেও কমিউনিস্টরাই জয়লাভ করে। কেবল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতেই নয়—পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত নির্বাচন হয়েছে সেই সমস্ত দেশেও তথাকথিত গণতন্ত্রীদের ঘটেছে চরম বিপর্যয়। হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং সর্বশেষ পোল্যান্ডে প্রাক্তন কমিউনিস্টদের বিজয়লাভ এবং মঙ্গোলিয়া, ইতালি ও জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দেয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অতীতের গবেষণা'র বিষয়বস্তু নয়। এই আদর্শই হলো প্রকৃত ভবিষ্যৎ।

রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির এই বিরাট অগ্রগতি আর একটি নির্মম সত্যও উদঘটন করেছে। তা হলো ধনতন্ত্রীরা তথাকথিত গণতন্ত্রের স্লোগান দিয়ে যে উন্নত সভ্যতা গঠনের কথা বলেছিলেন তা নিছক মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। জনগণ নিজেদের জীবনে অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছেন যে ঐ সভ্যতা তাঁদের কাছে এক নিষ্ঠুর ও কদর্য ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাঁরা চান পরিবর্তন। নির্বাচনের পূর্বে রাশিয়ার বুকে যে সমীক্ষা হয়েছিল সেই সমীক্ষা থেকে দেখা যায় সেখানকার ৭০ শতাংশের বেশি নরনারী মনে করেন যে বর্তমান ইয়েলৎসিন সরকারের চেয়ে পূর্বতন সোভিয়েত সরকার ঢের গুণ ভালো ছিল। এই সমীক্ষারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে রাশিয়ার সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনী ফলাফলে।

আট বছর পূর্বে ধনবাদী তাত্ত্বিকেরা ঘোষণা করেছিলেন যে 'সমাজতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে', 'মতাদর্শের অবসান ঘটেছে', সেদিন সি পি আই (এম) দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিল যে, পুঁজিবাদ কখনই মানুষের সামাজিক বিবর্তনের শেষ ধাপ হতে পারে না, কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি হলো মানুষের উপর শোষণ। যতদিন এই শোষণ থাকবে, ততদিন এই শোষণ

থেকে মুক্তির সংগ্রামও থাকবে। এই মুক্তি দেরিতে হতে পারে, এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু মানবসমাজ কখনই এই বঞ্চনা মেনে নিতে পারে না। আবার যতদিন এই লড়াই থাকবে, ততদিন মার্কবাদ-লেনিনবাদ এবং তার বৈপ্লবিক তত্ত্ব এই লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাবার ভিত্তি হিসাবে গণ্য হবে। কমিউনিস্ট পার্টিই পারে এই বৈপ্লবিক তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দিতে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি রাশিয়ার জনগণের এই বিরাট সমর্থন আর একবার প্রমাণ করল শোষিত জনগণকে ধনবাদীরা কখনই দীর্ঘস্থায়ীভাবে প্রতারণা করতে পারে না।

ইয়েলৎসিনের জয়

রাশিয়ার বহু প্রতীক্ষিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন হলো। রুশ সংসদ 'দুমা'-র নির্বাচনে কমিউনিস্টদের উল্লেখযোগ্য জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রতি বিশ্বের বহু মানুষের দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল। আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিল রাশিয়ার অভ্যন্তরে ইয়েলৎসিন-শিবির এবং রাশিয়ার বাইরে পশ্চিমী-শিবির। চূড়ান্তপর্বের নির্বাচনে বোরিস ইয়লেৎসিন জয়ী ঘোষিত হলেও, কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী গেন্নাদি জুগানভের পিছনে বিপুল সংখ্যক রুশ জনগণের সমর্থন দেখিয়ে দিয়েছে যে, তাদের আশঙ্কা অমূলক নয়। নিশ্চিত নয় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও। বিশেষত, ইয়েলৎসিনের জয়ে হোয়াইট হাউস ও ন্যাটো শিবির যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তা থেকেই তাদের আশঙ্কা চাপা থাকেনি। চূড়ান্ত দফার নির্বাচনে বোরিস ইয়েলৎসিন পেয়েছেন ৫৩.৭০ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী জুগানভ পেয়েছে ৪০.৪১ শতাংশ ভোট। সরকারী হিসেবে, দুই প্রার্থীর মধ্যে ভোটের ফারাক হয়তো এমনিতে যথেষ্ট মনে হয়। কিন্তু নির্বাচনে সরকারী ক্ষমতার ন্যক্কারজনক অপব্যবহার ও পরিকল্পিত কারচুপির স্পষ্ট অভিযোগ সত্ত্বেও কমিউনিস্ট প্রার্থীর পক্ষে এই পরিমাণ জনসমর্থন, জিতেও স্বস্তিহীন রেখেছে ইয়েলৎসিন শিবিরকে। কমিউনিস্ট-বিরোধী সমস্ত শিবির একজোট হওয়া সত্ত্বেও জুগানভ ঐ ভোট পেয়েছেন।

প্রথম দফার ফলাফল ইয়েলৎসিন ও তাঁর পশ্চিমী সহযোগীদের খুবই চিন্তায় ফেলে দেয়। ফলে যে কোনো মূল্যে জুগানভ ও দেশপ্রেমিক জোটকে কোণঠাসা করার চেষ্টা শুরু হয়। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কার্যত 'ধর্মযুদ্ধের' ডাক দেওয়া হয়। বিশেষ করে পরাজিত তিন প্রার্থী লেবেদ, ইয়াভলিনস্কি ও ঝিরিনোভস্কিকে পক্ষে টানার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা শুরু করেন ইয়েলৎসিন। সরকারী প্রাচারমাধ্যম এবং ধনী শিল্পপতি মহল ও মাফিয়ারাজ একযোগে নামে ইয়েলৎসিনের পক্ষে। প্রথম দফার ভোটের দ্বিতীয়দিনেই লেবেদকে দেশের নিরাপত্তা পরিষদের প্রধানপদে নিযুক্ত করেন ইয়েলৎসিন।

এই নির্বাচনে দেখা গেছে, মস্কো, সেন্ট পিটার্সবুর্গ-সহ বড় শহরগুলিতে ইয়েলৎসিন ভালো ভোট পেলেও, মফস্বল এলকাগুলিতে জুগানভের পক্ষেই ঢালাও ভোট পড়েছে। শহরাঞ্চলে মূলত মাফিয়ারাই ভোট নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে কমিউনিস্টদের। নতুন পরিস্থিতিতে মানুষের কাছে সঠিকভাবে বক্তব্য তুলে ধরা ও মানুষকে পক্ষে টেনে আনা সহজ কাজ নয়। নির্বাচন-পববর্তী সময়ে ইয়েলৎসিন সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত বামপন্থী দেশপ্রেমিক শক্তিকে সংহত করার উপরই রাশিয়ার ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে যাবে, তা নির্ভর করবে।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ কংগ্রেস

১৯৯৩ সালের ১৩ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী মস্কোয় রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির এক বিশেষ কংগ্রেস হয়ে গেল। ৭৫০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেস থেকে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কর্মসূচী ও ১০০ জন সদস্যবিশিষ্ট এক কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি এস ইউ)-র কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিট ব্যুরোর সদস্যরাই এই বিশেষ কংগ্রেসের উদ্যোক্তা ছিলেন। উদ্যোক্তারা এই বিশেষ কংগ্রেসকে প্রথম কংগ্রেস হিসাবে চিহ্নিত করতে নারাজ। তাঁরা মনে করেন নবগঠিত রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনের রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টিরই উত্তরসূরী।

১৯৯১ সালের ২৪শে আগস্ট সি পি এস ইউ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বলা চলে সি পি এস ইউ নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর এই প্রথম সেখানকার কমিউনিস্ট সংগঠিতভাবে এবং প্রকাশ্যে সম্মেলনের মঞ্চে সমবেত হলেন। পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিরা অবশ্য আদর্শগতভাবে চিন্তার দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না ফলে বিশেষ কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে যে পুনর্গঠিত নতুন কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলো সেই কমিউনিস্ট পার্টি কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেনি। কেবলমাত্র একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে। এই ঘোষণাপত্রে ৬টি রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। সেই ৬টি রাজনৈতিক লক্ষ্য হলো : ১) দেশে পুনরায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ২) উগ্র জাত্যাভিমান এবং ফ্যাসিবাদ পর্যুদস্ত করতে হবে। রাশিয়া তার সপ্তদশ শতাব্দীর সীমান্তে সঙ্কুচিত হয়েছে। রুশ ফেডারেশন আরো টুকরো টুকরো হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সোভিয়েত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে রুশ ফেডারেশনের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে। উগ্রজাতীয়তাবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকতাবাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটাতে হবে। ৩) দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে, এরজন্য সরকারী কাঠামো এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৪) প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য স্বনির্ভরতা নীতি গ্রহণের পাশাপাশি রুশ সীমান্তে কোন বিরোধী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হবে না। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ সাধারণতন্ত্রগুলিতে বসবাসকারী রুশদের অধিকার রক্ষায় উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। ৫) ক্রমান্বয়ে, সম্ভবত একটি কনফেডারেশন হিসাবে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিযনের পুনরুদ্ধার ঘটাতে হবে। ৬) এগারোই এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ইয়েলৎসিনের প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গণভোটের উদ্দেশ্য হলো রাশিয়ার প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটানো। এই প্রচেষ্টা পরাস্ত করতে হবে।

রাজনৈতিক ঘোষণা ব্যতিরেকে এই বিশেষ কংগ্রেস কমিউনিস্ট ঐক্যের জন্য একটি বিশেষ সাংগঠনিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই সাংগঠনিক প্রস্তাবের মূল কথা হলো, যে সমস্ত সদস্য বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তারা নিজ নিজ গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন, পাশাপাশি তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিরও সভ্য থাকবেন। অর্থাৎ প্রত্যেকে দ্বৈত সদস্যপদ বজায় রাখতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি বিলোপ ঘটার পর রাশিয়ার বুকে চারটি কমিউনিস্ট গ্রুপ হলো : ১) অল রুশিয়া কমিউনিস্ট পার্টি অব বলশেভিকস, ২) ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পীজান্টস সোস্যালিস্ট পার্টি, ৩) রুশিয়ান

কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি এবং ৪) ইউনিয়ন অব কমিউনিস্ট। উল্লেখিত চারটি কমিউনিস্ট গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশব্যাপী প্রচারের জন্য সাতদফা যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সাতদফা কর্মসূচী হলোঃ- ১) ২১শে ডিসেম্বর সম্পাদিত আলমা-আটা চুক্তি (১৯৯২ সালের ২১শে ডিসেম্বর সম্পাদিত আলমা-আটা চুক্তির মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থার অবসনা ঘটানো হয় এবং গঠিত হয় কমনওয়েলথ অব ইন্ডেপেন্ডন্ট স্টেটস) অবৈধ ঘোষণা করতে হবে। পূর্বতন সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। ২) নির্বাচিত কংগ্রেস অব দ্য পিপলস ডেপুটিজ এর হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে। ৩) কমিউনিস্ট পার্টির বাজেয়াপ্ত সকল সম্পত্তি এই মঞ্চের (কমিউনিস্ট মঞ্চ) হাতে তুলে দিতে হবে। ৪) ১৯৯০ সালের ২রা এপ্রিলের পূর্বের জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিতে হবে। (এদিনই তদানীন্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গরবাচ্যভ ডিক্রি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বণ্টন ব্যবস্থা বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেন। সেদিন থেকে ১৯৯২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের গড় মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে চারশ গুণ, ৫) ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটের রায় কার্যকর করতে হবে। ৬) কংগ্রেস অব দ্য পিপলস ডেপুটিজ নতুন সরকার গঠন করবে, ৭) শ্রমিক-কৃষক ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের মিলিত প্রয়াসে অনুষ্ঠিত বিশেষ কংগ্রেস যে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে তা পূর্বতন যৌথ কর্মসূচীর সংশোধিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে মতাদর্শগত প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও সমস্ত গ্রুপ এবিষয়ে একমত যে রাশিয়া বর্তমানে যে ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে তা সপ্তদশ শতাব্দীর পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে সোভিয়েত ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে — তবে সেই সোভিয়েত ব্যবস্থা পূর্বতন ধাঁচে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

বিশেষ কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র ভবিষ্যতে কী ফল বহন করবে সেজন্য আমাদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। তবে এবিষয়ে নিশ্চিত যে কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমান রুশ সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ইয়েলৎসিন সরকারের অপসারণের জন্য মূল রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কৌশলগত দিক থেকে এটা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক এজন্য যে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের প্রতিনিধিই বর্তমান রুশ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৮৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাশিয়াতে ১২০ টি রাজনৈতিক দল বা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই স্থায়িত্ব অর্জন করেনি। প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিনের প্রকৃতপক্ষে কোন নিজস্ব রাজনৈতিক দল নেই। পাঁচ লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টিই আজ রাশিয়ার বৃহত্তম ও সংগঠিত রাজনৈতিক দল। পার্টির নবগঠিত নেতারা দাবি করেছেন, শীঘ্রই এই পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়াবে পনেরো লক্ষে। পূর্বতন সি পি এস ইউ-র সংগঠকেরাই বর্তমান রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক। তাই দেশের অভ্যন্তরের যে কোন রাজনৈতিক গ্রুপের তুলনায় নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক শক্তি অনেক বেশি।

রাশিয়ার বাইরে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রিপাবলিকে (বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্র) রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণাপত্রের প্রভাব পড়বে। ঐ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রেও বর্তমানে

সংগঠিতভাবে কমিউনিস্ট পার্টি বা গ্রুপ ব্যতিরেকে অন্য কোন রাজনৈতিক দল নেই—রয়েছে বিভিন্ন ফোরাম। আর এই সমস্ত ফোরামেই সেখানে সরকার পরিচালনা করছে। বিশেষ করে লিথুয়ানিয়ায় কমিউনিস্টরা নির্বাচনে জয়লাভ করার পর লাতভিয়া এবং এস্তোনিয়ায় কমিউনিস্টরা সংগঠিত হচ্ছেন। জর্জিয়া, মল্ডেভিয়া এবং তাজাকাস্তানে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপ মিলিতভাবে কমিউনিস্ট মঞ্চও গঠন করেছে। এই সমস্ত কমিউনিস্ট মঞ্চেরও মূল স্লোগান হলো সোভিয়েত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে উৎসাহজনক ঘটনা। কিন্তু নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি দেশের বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পরিবর্তনে কী ভূমিকা পালন করবে বা কতটা ভূমিকা পালন করতে হবে তা নির্ভর করছে ঐ কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেকার ঐক্য-আর এই ঐক্য নিছক সাংগঠনিক ঐক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, দরকার রাজনৈতিক আদর্শগত ঐক্য বা বোঝাপড়া। আনন্দের কথা রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ কংগ্রেস এই রাজনৈতিক-আদর্শগত বোঝাপড়ার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। আর এই প্রক্রিয়ার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন দেশের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতারা—যাঁরা সি পি ইউ-র ২৮তম কংগ্রেসে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হয়েছিলেন, দল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ-এর তলবি অধিবেশন করার দাবি জানান রুশ সুপ্রিম সোভিয়েতে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা। সুপ্রিম সোভিয়েত কংগ্রেস অব দ্য পিপলস ডেপুটিজ-এর জরুরী অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুপ্রিম সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৩ সালের ১০-১২ই মার্চ কংগ্রেস অব দ্য পিপলস ডেপুটিজ-এর অধিবেশন বসে। কিন্তু এই অধিবেশনে অভাবনীয় নাটকীয় ঘটনা ঘটে। কংগ্রেসে ভোটাভুটিতে হেরে যাবার পর রাষ্ট্রপতি বোরিস ইয়েলৎসিন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা ওয়াক-আউট করেন। সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে সরকার পক্ষের সংসদ থেকে ওয়াক-আউট করার ঘটনা নজিরবিহীন।

রুশ কংগ্রেস অব দ্য পিপলস ডেপুটিজ এ বিরোধী কারা? বোরিস ইয়েলৎসিনের সঙ্গে তাঁদের বিরোধের প্রধান প্রধান বিষয়ই বা কি? রুশ কংগ্রেস অব দ্য পিপলস ডেপুটিজেব ৬০ শতাংশই পুনর্গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কিন্তু ইয়েলৎসিনের নীতির বিরোধীতায় যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা কিন্তু কমিউনিস্ট নন। এই বিরোধীতার পুরোভাগে রয়েছেন রুশ সংসদের অধ্যক্ষ রাসলান খাসবুলাতভ তিনি একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি দেশের রাজনৈতিক কাঠামো বিন্যাসের প্রশ্নে যে সমস্ত বিষয় উত্থাপন করেছেন কমিউনিস্টরা সেগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আর রুশ সংসদে সাম্প্রতিক ভোটাভুটিতে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে এই সংসদে ইয়েলৎসিন সংখ্যালঘু। সদ্য অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে ভোটাভুটির হিসাবে দেখা যায়, এই অধিবেশনে ইয়েলেৎসিনের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৮২ এবং সর্বনিম্ন ১৮৪ ভোট পড়েছে। অন্যদিকে ইয়েলৎসিনের বিপক্ষে ভোট পড়েছে সর্বোচ্চ ৬৫৬ ও সর্বনিম্ন ৪২০ ভোট। গণ-প্রতিনিধি কংগ্রেসের মোট সদস্য সংখ্যা হলো ১০৪০ জন।

রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলায় ব্যর্থ ইয়েলৎসিন আরো রাজনৈতিক

সংস্কারেব নামে নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকাবগুলি আবো সঙ্কুচিত করতে চান। সেই উদ্দেশ্য সাধনে ইয়েলৎসিন ১৯৯৩ সালের ১১ই এপ্রিল দেশে গণভোট গ্রহণেব উদ্যোগ নিয়েছিলেন? ইয়েলৎসিন প্রস্তাবিত গণভোটে কোন কোন বিষয়ের উপর মতামত চাওয়া হয়েছিল? চারটি প্রশ্নের উপর তিনি গণভোট নিতে চেয়েছিলেন। সেই চারটি প্রশ্ন হলো ঃ (১) আপনি কি একমত যে রুশ ফেডারেশন রাষ্ট্রপতি প্রধান সাধারণতন্ত্র হোক? (২) আপনি কি একমত যে, আইনসভার চূড়ান্ত ক্ষমতা দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের উপর বর্তানো উচিত? (৩) আপনি কি একমত যে, একটি গণ-পরিষদ গঠন করে নতুন সংবিধান রচনা করা হোক? (৪) আপনি কি একমত যে, প্রতিটি নাগরিক জমির মালিকানা, ভোগ দখল ও বেচাকেনার অধিকার পাক?

অন্যদিকে গণ-প্রতিনিধি কংগ্রেস যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার মূল কথা হলো ঃ ১) গণপ্রতিনিধি কংগ্রেস, সুপ্রিম সোভিয়েতসহ কোন নির্বাচিত সংস্থাকে ভেঙে দিতে পাববেন না রাষ্ট্রপতি। ২) রাষ্ট্রপতির ডিক্রি জারি করার ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। ৩) সুপ্রিম সোভিয়েতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতি ও উভয় সংসদের মধ্যবর্তী নির্বাচন করা যায় কিনা তার আইনী দিকগুলি খতিয়ে দেখার জন্য। ৪) জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচাবিত এক আবেদনে সংসদ বলেছে, 'অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচীর আঘাত এসে পড়েছে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর'।

রাষ্ট্রপতি এবং রুশ গণপ্রতিনিধি কংগ্রেসের পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত ও ঘোষণার ফলে দেশে সৃষ্টি হয়েছে গভীর সাংবিধানিক সঙ্কট। রাশিয়ার এই মুহূর্তে কোন সক্রিয় শাসন ব্যবস্থা নেই। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে পুনর্গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি কতটা হস্তক্ষেপ করতে পারবে তাবই উপর নির্ভর করছে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ, পার্টির ভবিষ্যৎ।

রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলীর সাধারণ বিশ্লেষণের জন্যও প্রথমেই যেটা মনে রাখা দরকার তা হলো যে, সেখানকার পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। ১৯৯৩ সালের ১২ এবং ১৩ই মার্চের কংগ্রেস অব দ্য ডেপুটিজ-এর অধিবেশনের পর মাত্র পনেরো দিনের মাথায় ২৬-২৯শে মার্চ আবার কংগ্রেস অব দ্য পিপলস ডেপুটিজ-এর অধিবেশন ডাকতে হয়। সেটি কংগ্রেস অব দ্য পিপলস ডেপুটিজ-এর নবম অধিবেশন বলে পরিচিত। এই অধিবেশনেও একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। এই উত্তপ্ত অধিবেশনে প্রথমে রাষ্ট্রপতি বোরিস ইয়েলৎসিনকে ইমপিচ করা এবং কংগ্রেসের স্পীকার খাসবুলাতভকে অপসারিত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কংগ্রেস অব দ্য পিপলস ডেপুটিজ একদিকে যেমন রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবিত গণভোটের প্রস্তাবে সায় দেয়, অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও সঙ্কুচিত করে। রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বোরিস ইয়েলৎসিন যে ডিক্রি জারি করেছিলেন সেটিও খারিজ করে দেওয়া হয়।

রাশিয়ার বর্তমান সঙ্কট আপাতদৃষ্টিতে সাংবিধানিক সঙ্কট হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সঙ্কটে হস্তক্ষেপ করার মত কোন সংগঠিত রাজনৈতিক দল সেখানে নেই। নতুন করে সেখানে যে রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করেছে সেই কমিউনিস্ট পার্টিই সেখানকার এখনও প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। আর রাশিয়ার রাজনৈতিক দলের নামে দুটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী রয়েছে ঃ ১) সিভিক ইউনিয়ন, ২) সিভিক ফোরাম। সিভিক ইউনিয়নের একমাত্র লক্ষ্য হলো দেশে কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করা। রাশিয়ার বুকে একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের

বিকাশ ঘটানো। সিভিক ফোরামের মূল কথা হলো যে, বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটানো। কিন্তু তাঁরাও এই বাজার অর্থনীতির কোন সুস্পষ্ট রূপ বা চিত্র দিতে পারেনি। রাশিয়ার বুকে সমাজতন্ত্রিরা ক্ষমতা চ্যুত কিন্তু সেখানে এখন প্রধান বিরোধটা রয়েই গেছে সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাথে সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তির।

ইয়েলৎসিনের অভিনব 'গণতন্ত্র'।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' করতে গিয়ে সমাজতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়েছিলেন মিখাইল গরবাচ্যভ। পশ্চিমী-মার্কিনীদের পূর্ণ মদত পেয়ে 'গণতন্ত্র' কায়েমে কোমর কষে নেমেছিলেন বোরিস ইয়েলৎসিন! পশ্চিমীদের মাপে ছাঁটা 'গণতন্ত্র' কিন্তু কী তার আসল চেহারা, তা নগ্ন হয়ে পড়লো ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ ক'দিন ও অক্টোবরের প্রথম ক'টা দিনে। তবে এতেই যে ইয়েলৎসেনীয় 'গণতন্ত্রের' পুরো পরিচয় মিললো, তা নয়। রাশিয়ার জনগণের ওপর গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিস্ট ফতোয়ার আরো কিছু যে বাকি আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই আরো যে, রুশ জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত থামাতে সক্ষম হবে বর্বরতার এই পর্ব।

রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান সঙ্কটে হিমসিম জনগণ যে পুঁজিবাদী পথে অবনমনের প্রক্রিয়াটি মেনে নিচ্ছেন না, তা বেশ কিছুদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল। পশ্চিমীদের একটানা মদত সত্ত্বেও ইয়েলৎসিন তাঁর সঙ্কট চাপা দিতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। ক্রমশঃ শাসকচক্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধও প্রকাশিত হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। যারা ইয়েলৎসিনের পক্ষেও ছিলেন, তারা দূরে সরে যেতে শুরু করেছিলেন। ইয়েলৎসিন যে ক্রমশ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পড়ছেন, তা স্পষ্টতর রূপ নিচ্ছিল। ক্রমশ বেশি করে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছিল তাঁর তথাকথিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 'সংস্কার'। আর ঠিক ততই রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছিল পশ্চিমী-মার্কিনীরা ইয়েলৎসিনকে 'তুরুপের তাস' হিসেবে সামনে রেখে।

ঘটনাবলীর সূত্রপাত বলা যেতে পারে ১৯৯৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। ঐ দিনই ইয়েলৎসিন তাঁর উপরাষ্ট্রপতি আলেকজান্দার রুৎস্কোই ও প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ভলিদিমির শুমেইকোকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু ৩রা সেপ্টেম্বর সংসদ সরাসরিই খারিজ করে দেয় ইয়েলৎসিনের রায়। সংসদের অধ্যক্ষ খাসবুলাতভ সরাসরি মুখ খোলেন ইয়েলৎসিনের বিরুদ্ধে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচীসহ নানা প্রশ্নে নির্বাচিত সংসদের সঙ্গে ইয়েলৎসিনের বিরোধ ক্রমশঃ বাড়ছিলই। কিন্তু এ ঘটনার পরে ইয়েলৎসিন তাঁর স্বৈরতন্ত্রী চেহারাটা আর আনুষ্ঠানিকভাবে আড়াল করতে পারলেন না। সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখে 'ডিক্রি' জারি করে বোরিস ইয়েলৎসিন ভেঙে দিলেন নির্বাচিত সংসদ। একই পথে তিনি ঘোষণা করলেন যে, আগামী ১১-১২ই ডিসেম্বর সংসদের নতুন করে 'নির্বাচন' হবে। কিন্তু সেদিন রাতেই সংসদের জরুরী অধিবেশন ইয়েলৎসিনের 'ডিক্রি' খারিজ করে দেয়।

এ সব ঘটনায় আরো মরীয়া হয়ে ওঠে ইয়েলৎসিন। ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি শুমেইকোকে ফের 'উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে' ফিরিয়ে নেন এবং সাংসদদের পাল্টা হুমকি দিতে শুরু করেন। পরদিনই সংসদ ভবন হোয়াইট হাউসের টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ এবং

গবম জলের লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর ইয়েলৎসিন আরো ঘোষণা কবেন যে, রাশিয়ায় নতুন কবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে আগামি ১২ই জুন।

কিন্তু শুধু সাংসদবাই যে ইযেলৎসিনেব স্বৈবাচাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাই নয়। সাধাবণ মানুষের মধ্যে এ ঘটনার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইয়েলৎসিন 'ডিক্রি' জাবি কবার পরদিন থেকেই শীতের দাপট উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ সংসদ ভবনের চাবপাশে জড়ো হয়। ব্যারিকেড গড়ে তোলেন। যাতে ইয়েলৎসিন অনুগত্য সশস্ত্রবাহিনী সংসদ ভবনে আক্রমণ চালাতে না পারে। পুলিস ও সেনাবাহিনীর একাংশও সংসদীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য জানায়। ২৪শে সেপ্টেম্বর মস্কোয় সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তর দখলের চেষ্টা হয়। লুঠ হয়ে যায় ৩০০ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সি আই এস-র সামরিক কম্যান্ড থেকে। ইয়েলৎসিন স্বৈরশাহীর প্রকাশ্য প্রতিবাদে এগিয়ে আসে মোট ৮৮টি আঞ্চলিক সোভিয়েত (পরিষদ) গুলির বেশিরভাগই। ২৩শে সেপ্টেম্বর ৫৩টি আঞ্চলিক সোভিয়েত সাংসদের জরুরী অধিবেশনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর ২৮টি আঞ্চলিব সোভিয়েত তেল ও শস্য অববোধেব হুমকি দেয় ইয়েলৎসিনকে। এর পরদিনই ইয়েলৎসিন ব্রিন্স্ক আঞ্চলিক সোভিয়েতের প্রধানকে 'বরখাস্ত' করেন। বস্তুতঃ দেখা গেল যে, আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলির সঙ্গেও প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে গেলেন ইয়েলৎসিন। ২৭শে সেপ্টেম্বর ৪৯টি আঞ্চলিক সোভিয়েত প্রতিনিধিরা বৈঠক করে 'মীমাংসা প্রস্তাব' পেশ করে। আপোসপন্থী হিসেবে তাঁরা ডিসেম্বরে সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একসঙ্গে কবার প্রস্তাব দেয়। এটাও মানতে ইয়েলৎসিন রাজি হননি।

২৮শে সেপ্টেম্বর ইয়েলৎসিন 'নির্দেশ' দেন যে, ২৪ঘণ্টার মধ্যে সাংসদদের 'হোয়াইট হাউস' ছাড়তে হবে। মস্কোর মেয়র ইয়ুরি লুঝকভও এক্ষেত্রে ইয়েলৎসিনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। কিন্তু এই হুমকি কেউ মানেন নি। ঐদিন গভীর রাতে সংসদ ভবনের সামনে ব্যরিকেড করে-থাকা জনগণের সঙ্গে ইয়েলৎসিনের অনুগত সেনাদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ৩রা অক্টোবর রক্তাক্ত সংঘর্ষ বড় আকার নেয়। শুধু তাই নয়, জনতা দখল করে নেয় টিভি কেন্দ্র, মেয়রের অফিস। পরদিনই ৪ঠা অক্টোবর ইয়েলৎসিনের অনুগত সেনারা ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, এমনকি সামরিক হেলিকপ্টার নিয়ে সংসদ ভবন আক্রমন করে। মুহুর্মুহু গোলা চালিয়ে সংসদ ভবনকে তারা ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ে।

নির্বিচারে তারা গণহত্যা চালায়। পশ্চিমী সংবাদ সংস্থাগুলিই জানিয়েছে যে, পাঁচশোর বেশি মানুষ এই গণহত্যার বলি। বি বি সির প্রতিবেদকের মতে — 'বলশেভিক বিপ্লবের পর এত বড় রক্তাক্ত সংঘর্ষ মস্কোতে দেখা যায়নি।' সেনা আগ্রাসনের পর রুৎস্কোই, খাসবুলাতভ সহ বহু সাংসদকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েকজন সেনা-অফিসারকেও।

স্বৈরাচারী ইয়েলৎসিন চক্র প্রাভদা, সোভিয়েতস্কায়া রোশিয়া - দেজ প্রভৃতি সাংবাদপত্র দপ্তরে তালা লাগিয়ে দেয়। এমনকি টিভি ও সংবাদসংস্থার ওপর পর্যন্ত সেন্সরশিপ কায়েম করা হয়েছে। মস্কোর গণ-বিক্ষোভ সামাল দিতে জারি করা হয় জরুরী অবস্থা। ভেঙে দেওয়া হয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত সাংবিধানিক আদালত। ৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে। হুমকি দেওয়া হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টি তো বটেই, ইয়েলৎসিনের বিরোধী অন্যান্য দলগুলিকেও নিষিদ্ধ করে দেওয়া, হবে এবং 'রাষ্ট্রপতি নির্বচনে' অংশ নিতে দেওয়া হবে না।

মস্কোয় এই নৃশংস গণহত্যার সময় আরো যেটা প্রকট হয়ে গেল তা হলো, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলিয়ে যাবার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতিনীতিব ধার বিশেষ ধারবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি, ইয়েলৎসিন-চক্রের চরম স্বৈরতান্ত্রিক আচরণকেও তারা 'গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করেছে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে। ইয়েলৎসিন সংসদ 'ভাঙা' থেকে শুরু করে সেনা অভিযান চালানো পর্যন্ত সব কটি পর্বেই নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেছে ওয়াশিংটন সহ পশ্চিমী শিবিরের সঙ্গে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জনমেজর, জার্মান সরকার, ফরাসী সরকার, জাপান সরকার সরাসরি ঘোষণা করেছেন যে, ইয়েলৎসিনই 'রুশ গণতন্ত্রের একমাত্র প্রতীক'।

তবে এরই মাঝে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাশিয়ায় পুঁজিবাদ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা ক্রমশ প্রবলতর প্রতিরোধের সম্মুখীন। গণক্ষোভ যেভাবে বাড়ছে, তাতে গণতন্ত্রের এ ভাঁওতা অব্যাহত রাখার সুযোগ ইয়েলৎসিন খুব বেশিদিন বোধহয় পাবেন না।

কমিউনিস্ট পার্টি অব্ রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রকাশ্য অধিবেশন

বিশ্ব কিউবা-সংহতি সম্মেলন মঞ্চ থেকে, কমিউনিস্ট পার্টি অব্ রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রতিনিধি যে ঘোষণা করেছিলেন, তার বাস্তব প্রতিফলন আমরা অতি সম্প্রতি দেখেছি পার্টির প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনে যেখানে সুগভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রতি, বিশাল সমাবেশ থেকে আহ্বান করা হয়েছে ইয়েলৎসিন- জমানার অবসানের। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন হিসাবে পার্টির সঙ্গে রয়েছেন অ্যাগ্রারিয়ান পার্টি এবং উইমেন অব্ রাশিয়ার সদস্য-সমর্থকরা। এদিকে, রুশ অর্থনীতির চরমতম দুর্দশা পবিলক্ষিত হয়েছে। বেকারী লাগামছাড়া। মাফিয়া চক্রের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়েই চলেছে। খোদ মস্কোতেই ব্যবসায়ী মহল এই অন্ধকারের জীবদের 'প্রাপ্য' মিটিয়ে তবেই দৈনন্দিন কাজকর্মে হাত দিতে সাহস পান। বাজেট-ঘাটতি ঠেকেছে পাঁচ হাজার রুবল। এদিকে, অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটে রাজধানীতে। ইয়েলৎসিন তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর সাহায্যে একাধিক ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়ে বিপুলসংখ্যক নথিপত্র আটক করেছেন। রুশ ব্যাঙ্ক ফেডারেশনের সভাপতি, সের্গেই ইয়েগোরভ এক বিবৃতিতে বলেছেন ঃ "এই ধরণের দস্যুতার ধৃষ্টতা যাঁরা দেখাচ্ছেন, তাঁরা সত্য গোপনে তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন করলেও, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেব কাছে এঁরা ভয়াবহ প্রশাসনিক নজির রেখে যাচ্ছেন — জনগণ এঁদের মাফ্ করবেন না"। এদিকে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জেনারেল পাভেল গ্যাচেভের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, তাঁরই ভাড়াটে গুণ্ডার দল, তরুণ সাংবাদিক দমিত্রি খলোদফ্কে নৃশংভাবে হত্যা করেছে। দমিত্রি একের পর এক প্রতিবেদনে, ওঁর কাগজ 'মস্কোফস্কি কম্সমোলেৎসে', রুশ সেনাবাহিনীর নানা কুকীর্তির কথা ফাঁস করে চলেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে ককেশীয় অঞ্চলের চেচ্নিয়াতে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন জেনারেল ঝোকার দুদায়েফ্। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯১ সালের জুন মাসেই, আঞ্চলিক পরিষদকে 'বাতিল' ঘোষণা করে দুদায়েফ্ একনায়ক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মস্কোর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। চেচ্নিয়ার 'স্বাধীনতা ঘোষণা'কে ইস্যু করে, দেশপ্রেম জাগ্রত

কবার সহজিয়া পথ আঁকড়ে, সঙ্কটাপন্ন ইয়েলৎসিন সরকার বাঁচতে চাইছেন বলেই মনে হয়। ছোট্ট চেচনিয়া কিন্তু অর্ধ লক্ষেরও বেশি রুশ সেনা, হাজার হাজার ট্যাঙ্ক এবং ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান-নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রের ধাক্কা সামলে এখনো প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে।'রাজধানী' গ্রোজ্নি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও এখনো প্রতিটি রাস্তার মোড়ে, প্রতিটি আবাসনে রুশ সেনাদের প্রবল প্রতি-আক্রমণ সামলাতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন দশ হাজার চেচেন সেনা এবং প্রায় দেড় লক্ষ অসামরিক ব্যক্তি। মারা গেছে কয়েক হাজার রুশ সেনাও। এবং পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরা বড়ই চিন্তায় পড়েছেন যে, এই দুর্বিপাক থেকে আদৌ ইয়েলৎসিন বেরিয়ে আসতে পারবেন তো?

অপর রুশ রাজ্য আজেরবাইজান এখনো 'নাগরনোকারাবাখ' অঞ্চলের 'বিতর্কিত' অবস্থান নিয়ে আরমেনিয়ার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে আছে। এদ্দিকে, বাকু অঞ্চলের শহর জেন্‌সে সেনা-বিদ্রোহ আজেরী রাষ্ট্রপ্রধান হায়দার আলিয়েভকে আশঙ্কচিত্ত করে তুলেছে। 'বিদ্রোহী'দের 'মদতদাতা' আখ্যা দিয়ে তিনি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সুরেৎ হুসেইনফ্‌কে প্রথমে বরখাস্ত করলেও সংসদের চাপে তাঁকে আবার পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়েছেন। বেলারুশও আপাতত সঙ্কটের মধ্যেই রয়েছে। আর্থিক দুর্দশার রাহু গ্রাস থেকে দেশকে বাঁচাতে উপ-প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মায়াস্‌নিকোভিচ্ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছে ৭২ কোটি ডলার 'স্বল্পমেয়াদী' ঋণ চেয়েছেন। রাজধানী মিন্‌সোক খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। রমবম করছে কালো বাজার। মুদ্রামূল্য দ্রুত পড়ছে। আশঙ্কা এই ছিল যে, বেলারুশে না একটা সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়।

পোল্যান্ড

১৯৮০ সালেব জুলাই-আগষ্ট মাসে পোল্যান্ডের বুকে যে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু হয় সেই কার্যকলাপ চরম পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৯৮১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। অক্টোবর মাসে সলিডারিটি ইউনিয়নের যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় সেই কংগ্রেস গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকাশ্য তিনটি শর্ত দেওয়া হয়। এই তিনদফা শর্ত হলো : (১) সরকারী বণ্টন ব্যবস্থায় যৌথ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ, বণ্টন ব্যবস্থায় সরকারী প্রশাসন সংস্থার সাথে সলিডারিটি ইউনিয়ানকে যুক্ত করতে হবে। (২) উৎপাদন ব্যবস্থায় সলিডারিটি ইউনিয়নের অংশীদারী মেনে নিতে হবে। (৩) ধর্মঘট করার অধিকারসহ সমস্ত রকমের অধিকার ইউনিয়নকে দিতে হবে। এটা ছিল প্রকাশ্য ঘোষণা। কিন্তু এই ঘোষণা আড়ালে আরো সিদ্ধান্ত ছিল। সলিডারিটি ইউনিয়নের গোপন সিদ্ধান্ত ছিল ডিসেম্বর মাসে কোন এক সময়ে তাঁরা পোল্যাণ্ডের শাসন ক্ষমতা দখল করবে। মোটামুটি ভাবে তাঁরা ক্ষমতা দখলের দিনক্ষণও স্থির করে ফেলেন। সেই দিন ছিল ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮১।

স্বভাবতঃই পোল্যান্ডের ইউনাটেড ওয়ার্কার্স পার্টির সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পোলিশ সরকার ১৯৮১ সালের ১২ই ডিসেম্বর রাতে দেশে সামরিক শাসন ও সামরিক আইন জারি করা হয়। পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক এডওয়ার্ড গিয়েরেক ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিওতর জায়োরোউইস্ত-সহ ছ'শ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, এডওয়ার্ড গিয়েরেক

পার্টি থেকে অপসারিত হবার পর তাঁর বিরুদ্ধে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। সেই কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে গিয়েরেগ নিজেই বলেছিলেন ঃ পোল্যান্ড যে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেই সংকটের জন্য তিনি বিশেষভাবে দায়ী। তাঁরই অনুসৃত নীতির জন্য পোল্যান্ডে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এজন্য তিনি অনুশোচনাও প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই গিয়েরেকই অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীদের সাথে হাত মেলান এবং গোপনে ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে শামিল হন।

বারই ডিসেম্বর রাতেই পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেরুজালেস্কি এক বেতার ভাষণে দেশের পরিস্থিতি বিবৃত করেন। তিনি তাঁর বেতার ভাষণে বলেন ঃ "আমরা যথেষ্ট ধৈর্য ধরে ছিলাম। কিন্তু র‍্যাডম ও দানশ্‌ক সলিডারিটির প্রকৃত মুখোশ আমাদের শাসনে খুলে দিয়েছে। গৃহযুদ্ধ এড়াতে এবং পরিস্থিতি ক্রমশঃ সংঘর্ষমুখী হতে থাকলে এর বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেওয়াই হল কমিউনিস্টদের কর্তব্য। দেশে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই না এবং সামরিক পরিষদ সংবিধানও পরিবর্তন করবে না। আমরা জীবিত থাকতে পোল্যান্ডের ক্ষতি ঘটতে দেব না"। ১২ই ডিসেম্বর সকালেই সলিডারিটি ইউনিয়নের নেতারা তাঁদের তিনদিনব্যাপী অধিবেশনের পর ঘোষণা করেন যে, ১৭ই ডিসেম্বর তাঁরা দেশব্যাপী জাতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন করবেন। ইউনিয়ন নেতারা অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের হুমকিও দেন। তাছাড়া রাজধানী ওয়ারশসহ অন্যান্য শহরে গণপ্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করার কর্মসূচীও ইউনিয়ন নেতারা গ্রহণ করেন। এই একই দিনে দানশ্‌কে একজন সলিডারিটি নেতা বলেন ঃ "আমাদের ক্ষমতা দখল করতেই হবে এবং এটা খুবই তাড়াতাড়িই করতে হবে কারণ রাজনীতি ক্ষেত্রে এটাই এখন আমাদের কাছে উপযুক্ত সময়"।

এই ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে সলিডারিটি নেতা ওয়ালেসা টাইমস পত্রিকার সঙ্গে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ঃ আমি উন্নত পোল্যান্ড গঠন করতে চাই। পোল্যান্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পোল্যান্ডের হাজারগুণ যেমন উন্নতি হয়েছে, তেমনি হাজারগুণ অবনতি ঘটেছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। কোন সমস্যারই পূর্ণাঙ্গ সমাধান হয়নি। আমাদের লক্ষ্য হলো, দেশের সমস্যার সামগ্রিক সমাধান করে। আমরা আমাদের দেশকে প্রভু নির্দেশিত পথে নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছি"। এডওয়ার্ড গিয়েরেকও প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "ইতিহাসের গতি একধারায় চলে না। পোল্যান্ডের ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে"।

ওয়ালেশা এবং গিয়েরেগের এই বক্তব্যের পরই সলিডারিটি ইউনিয়ন তিন-দফা প্রস্তাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে সাত দফা প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সাত-দফা প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে ঃ দেশে অবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে; অর্থনৈতিক সংস্কার করতে হবে; অর্থনীতিতে সলিডারিটির নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে; একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন আইন প্রবর্তন করতে হবে ইত্যাদি। এই সমস্ত ঘটনা থেকে এটা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, সলিডিরিটি ইউনিয়ন দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। আর সেই চক্রান্ত কার্যকর হবার ঠিক প্রাক-মুহূর্তে পোলিশ সরকার হস্তক্ষেপ করে এবং চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ

করতে হয়। পোল্যান্ডের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে দেশেব অভ্যন্তরে পোলিশ চার্চ বিশেষভাবে লিপ্ত হয়। ২রা ডিসেম্বর পোলিশ ক্যাথিলিক চার্চের প্রধান পোপ নেল্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন ঃ যিশুকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলাব চেষ্টাব অর্থ হলো মানব জাতিকে মুছে ফেলা। পোলিশ জনগণ ভয়েব প্রাচীর ভেঙে ফেলেছেন। তাঁর মার্কসবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে যিশুকে বক্ষা করবেন। দেশের প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে চূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে ১২ই ডিসেম্বর পোলিশ সরকাব যে বলিষ্ঠ মনোভাব ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে, অল্প সময়ের মধ্যেই তার সুফল পাওয়া যায়। যে ১৭ই ডিসেম্বর প্রতিবিপ্লবী সলিডারিটি ইউনিয়ন পোল্যান্ডের ক্ষমতা দখলেব ষড়যন্ত্র করেছিল সেই ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৮১) ওয়ারশ-র খবর হলো ঃ পোল্যান্ডের পরিস্থিতি এখন সবদিক থেকে স্বাভাবিক। প্রতিবিপ্লবী শক্তি দেশের বর্তমান সমাজব্যবস্থা পাল্টে দেবার যে চক্রান্ত করেছিল, দেশের সার্বভৌমত্ব ও সরকারের প্রতি অনুগত সেনাবাহিনী সেই চক্রান্ত গুঁড়িয়ে দিতে সার্বিকভাবে সক্ষম হয়েছে। বিনা রক্তপাতেই তারা একাজে সফল হয়েছে। বাজধানী ওয়ারশ-তে প্রতিবিপ্লবী শক্তি ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংবাদিক সংঘের অফিসে কেন্দ্রীভূত হয়। তারা সেখান থেকে ওয়ারশ-র নানাস্থানে সশস্ত্র হামলা চালানোব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই দুটি কেন্দ্র থেকে তারা দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করে। সেখান থেকে ওয়ারশ-তে একটা পাল্টা প্রশাসন স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৫ই ডিসেম্বর রাতে পুলিশ এই দুটি অফিস সীল করে এবং প্রতিবিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে। এই দুটি কেন্দ্র থেকেই ৩৮০ জন প্রতিবিপ্লবীকে গ্রেপ্তার কারা হয়। অফিস থেকে অনেক গোপন দলিল উদ্ধার করা হয়। এই সমস্ত দলিল থেকে প্রতিবিপ্লবীদের একজন নায়ক ময়কুলস্কিকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে বহু কাগজপত্র এবং দলিল উদ্ধার করা হয়। ঐ দলিল থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, "দেশের বর্তমান উত্তেজনাময় পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করার ডাক দেওয়া হয়েছিল। যে কোন মুহূর্তে এই অভ্যুত্থান সংগঠিত হতে পারত। দলিলে যা বলা হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, দেশে একটা সার্বিক গৃহযুদ্ধ শুরু করার জন্য সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী দল দিয়ে অন্তর্ঘাত এবং সন্ত্রাসবাদী কাজ চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সলিডারিটি নেতারা আশা করেছিল সেনাবাহিনী অফিসারদের অমান্য করে এ ব্যপারে তাদের সাহায্য করবে।" প্রতিবিপ্লবীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে সাফল্য অর্জন করার পর ১৯৮১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পোলিশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়। ঐ বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ "পোল জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থন নিয়ে পোল্যান্ডের সশস্ত্র বাহিনী ধর্মঘটের চেষ্টা ব্যাহত করেছে। বাল্টিক উপকুল এবং লুবলিন কয়লা খনি অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমিত করা সম্ভব হয়েছে। পোল্যান্ডের সশস্ত্র বাহিনী শ্রমিকদের ক্রমশঃ বেশি সমর্থন পাচ্ছে"।

এই সাফল্য বিবৃত করতে গিয়ে একজন সামরিক মুখপাত্র বলেন ঃ "প্রতিবিপ্লবীরা ভেবেছিল তারা শ্রমিকশ্রেণীর সাথে সেনাবাহিনীর বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। সেনাবাহিনীর সাথে শ্রমিকশ্রেণীর বিভেদ সৃষ্টির কোন চক্রান্তই সফল হয়নি। পরন্তু প্রতিবিপ্লবীদের চক্রান্ত চূর্ণ করার অভিযানের মধ্যে দিয়ে সেনাবাহিনী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মৈত্রী বন্ধন আরো দৃঢ় হয়েছে। মাত্র চারদিনে যে সাফল্য

অর্জিত হয়েছে তা অভূতপূর্ব। শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের সমর্থন না পেলে সেনাবাহিনীর পক্ষে এই সাফল্য অর্জন করা আদৌ সম্ভব হতো না। চারদিনের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীদের যেভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে তা খুবই গৌরবজনক। পোলিশ বিপ্লব সময়োপযোগী হস্তক্ষেপে রক্ষা পেয়েছে''।

১৯৮১ সালের ২০শে ডিসেম্বর প্রচারিত ইস্তেহারে বলা হয় ঃ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সলিডারিটির প্রস্তুতিমূলক তথ্য সম্বলিত দলিল প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে দেখে পোলিশ জনগণ আজ খুবই খুশি হয়েছেন। দিনের পর দিন প্রতিবিপ্লবী ধর্মঘটের একটানা সন্ত্রাসে পোল জনগণ তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল, সামরিক আইন জারির ব্যাপারটি পোল জনগণের সামনে সংকটত্রাণের শুভ সূচনা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। পোল শ্রমিকেরা নিজেরাই নিজ নিজ কারখানার উসকানিদাতাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছে। কলকারখানা থেকে উসকানিদাতাদের বিতাড়ন করেছেন। শ্রমিকেরা এই সঙ্গে নিজেদের কাজেও যোগ দিয়েছে। দক্ষিণ পোল্যান্ডে অন্তর্ঘাতীরা ১৩শ' শ্রমিককে খনির অভ্যন্তরে আটক রাখে। এই সমস্ত খনি শ্রমিকের 'অপরাধ' তাঁরা সলিডারিটি ইউনিয়ন নেতাদের আবেদন অগ্রাহ্য করে কাজে যোগদান করেন। সলিডারিটি ইউনিয়ন নেতারা এই সমস্ত শ্রমিককে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এটা খুবই সুখের কথা সেনাবাহিনী এবং শ্রমিকশ্রেণী প্রতিবিপ্লবীদের এই ষড়যন্ত্র পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ করে দেয়।

একটি বিমান ফ্যাক্টরিতেও সলিডারিটির অন্তর্ঘাতীরা এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। সেখানেও তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। একটি জাহাজ মেরামতি কারখানায় গাদা করা বহু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। সলিডারিটি ইউনিয়ন নেতারা এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র মজুত করে রেখেছিল। তাদের আরো অপচেষ্টা ছিল ঃ এই কারখানাটি উড়িয়ে দেবার। শ্রমিকশ্রেণী এবং সেনাবাহিনী কারখানাটি রক্ষা করে। এদিন পোল্যান্ডের ৯৫ শতাংশ কলকাবখানায় স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরায় চালু হয়। দেশের নানা স্থান থেকে কার্ফু এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয়। শিল্পসমূহে কাজের মান ও মাত্রা উন্নত হয়। শ্রমিক শ্রেণী অভূতপূর্ব শৃঙ্খলার নজির স্থাপন করেন। সলিডারিটি ইউনিয়ন নেতারা এখানে ওখানে ধর্মঘটের উসকানি দিয়ে চলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও হতাশা ও অনৈক্য দেখা দেয়। এক সপ্তাহে প্রায় সাড়ে চার হাজার সলিডারিটি নেতা ও কর্মী এই সংগঠনের সাথে তাঁদের সংস্রব ত্যাগ করেন। এইভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে পোলিশ সরকার ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত চূর্ণ হয়ে যায়। সলিডারিটি ইউনিয়ন নেতারা গর্বভরে ঘোষণা করেছিলেন, কোন শক্তিই তাঁদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারবে না। অবশ্য প্রথম থেকেই সলিডারিটি নেতারা তাঁদের শক্তি বড় করে দেখিয়ে আসছিলেন। সলিডারিটি নেতারা বারে বারে দাবি করেন যে, তাঁদের সদস্য সংখ্যা ৯৫ লক্ষ। কিন্তু আসলে ঐ সদস্য ৪৫ লক্ষের বেশি নয়। এখানে, আর একটি বিষয় উল্লেখ্য, বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিবিপ্লবী পোল্যান্ডের ইউনাইটেড পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পোল সরকার যখন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তখন তাদের মুখোশ খুলে পড়ে। তারা নানা কৌশলে প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে ওকালতি করতে থাকে। পার্টি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক সপ্তাহে ২৪০০ জনকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

পোল্যান্ডের ঘটনাবলী পিছনে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে তা বহু তথ্যের মধ্যে দিয়ে উদঘাটিত হয়েছে। এই সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের

মুখোশ আরো নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। পোল্যান্ডে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে দু'দেশে মধ্যে যে অর্থনৈতিক চুক্তি ছিল তা বাতিল হয়ে যায়। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পোল্যান্ডেব বিবুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকৃত মুখোশ জনসমক্ষে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পায়। একই দিনে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব আলেকজান্ডার হেগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বন্ধুদের' প্রতি আহ্বান জানান ঃ "পোল্যান্ডের ঘটনাবলীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগীদের আর নীরব থাকা ঠিক হবে না। ন্যাটো শক্তিকে এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে"। আলেকজান্ডার হেগ এখানেই ক্ষান্ত থকেন না। তিনি পোল্যান্ডে সামরিক হস্তক্ষেপেরও হুমকি ছাড়েন। তিনি দাবি করেন, অবিলম্বে পোল্যান্ডে সামরিক শাসন রদ করতে হবে এবং ধৃত সলিডারিটি নেতাদের মুক্তি দিতে হবে। গত এক বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পোল্যান্ডের প্রতিবিপ্লবীদের গোপনে দু'শ কোটি ডলার বেশি আর্থিক সাহায্য দেয়। এই সমস্ত ঘটনা পোল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল সেখানে চিলির মত প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করতে। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাওযায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই অর্থনৈতিক অবরোধের পরিস্থিতিতে সাহায্যেব জন্য এগিয়ে এসে ১৯৮১ সালের ২০শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে ঃ পোল্যান্ডের এই দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়ানোর মত বন্ধুর সংখ্যা অনেক। তারা পোল্যান্ডকে কোন অবস্থাতেই অনাহারে মরতে দেবে না"।

পরিস্থিতি অবনতি

১৯৮১ সালের জুলাই মাসে পোল্যান্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পব পোল্যান্ডের ঘটনাবলীর আরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই কংগ্রেসে আহ্বান জানানো হয়েছিল ঃ "আমরা পোল্যান্ডে সমাজতন্ত্র রক্ষা এবং তাকে শক্তিশালী করতে কৃত সংকল্প। পোল্যান্ডের বুকে ইতিহাসের চাকা যাঁরা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ আপোষ নয়। পোল্যান্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি দেশের যে সমস্ত শক্তি জাতীয় স্বার্থ এবং সমাজতন্ত্র রক্ষা করতে চায় তাদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন অটুট রেখে চলবে। দেশে প্রতিবিপ্লব প্রতিহত করতে ইউনাইটেড পীজান্টস পার্টি এবং ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে মঞ্চ গড়ে তুলবে। পোল্যান্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কাস পার্টি কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারে না। পোল্যান্ডের জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনও খর্ব হতে দিতে পারেন না।"

এর পরই পোল্যান্ডের সলিডারিটি ট্রেড ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সলিডারিটি ইউনিয়নের বয়স তিন বছর। প্রথম কংগ্রেসেই সলিডারিটি ইউনিয়নের নেতারা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন এবং কংগ্রেস থেকে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে এটা সুস্পষ্ট যে, সলিডারিটি ইউনিয়নের নেতারা প্রতিবিপ্লবের পথ ধরেই এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই ইউনিয়নের নেতারা সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করেছেন, তাঁরা দেশে গৃহযুদ্ধ ঘটিয়ে পোল্যান্ডের জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং সমাজতন্ত্র ধ্বংস করতে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রথমে এই ইউনিয়নের নেতারা

বলেছিলেন যে, তাঁদের অন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো, গণতন্ত্র বক্ষা করা এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা। কিন্তু সলিডাবিটি কংগ্রেস থেকে যে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই প্রস্তাবের মর্মার্থ কি? প্রথম প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহ্বান জানানো হয় স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার জন্য। এই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্যও বিবৃত করা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে ঃ শ্রমিকদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে অবিলম্বে পোল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচনের দাবি জানানো হয়েছে। এই প্রস্তাবে পোল্যান্ডের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলেব হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

প্রথমে সলিডারিটি ইউনিয়ন যখন গঠিত হয় তখন এই ইউনিযনের নেতারা বলেছিলেন যে, তাঁরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী নন। কিন্তু এখন কংগ্রেস থেকে স্লোগান দেওয়া হয়েছে ঃ জাতীয় গণভোটের ব্যবস্থা করতে হবে, উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থায় তাঁদের অংশীদার করতে হবে, স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের পরিবর্তন করতে হবে এবং গণমাধ্যমগুলিতে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিতে হবে। আরো দাবি করা হয়েছে যে, পোল্যান্ডের বর্তমান সংসদ বাতিল করতে হবে। এর পরও কি কেউ বিশ্বাস করবেন যে, সলিডারিটি ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের শত্রু নয়? এর পরও কি কেউ বিশ্বাস করবেন যে, এঁরা প্রতিবিপ্লবী নন? সমগ্র কংগ্রেসে ইউনিয়নের নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মুখ থেকে একবারের জন্যও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। এর পরও কি কেউ বলবেন যে, সলিডারিটি ইউনিয়নের নেতারা সাম্রাজ্যবাদীদের হতের পুতুল হিসাবে কাজ করছেন না? সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহের রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঢালাও প্রচার করা হয় এই সলিডারিটি ইউনিয়ন নেতাদের বক্তব্য এবং কংগ্রেসের প্রস্তাব সমূহ। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করা হয় ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের শ্রমজীবি জনগণ সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পতাকা তুলে ধরেছেন। কিন্তু পোল্যান্ডের বুকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা কি কারো অজানা রয়েছে? হিটলারের ফ্যাসিস্টবহিনী যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করে তখন সোভিয়েতের ছয় লক্ষ লাল ফৌজ সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে জীবন বিসর্জন দেয়।

আজ পোল্যান্ডে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পোল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা যাতে কোন অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ হতে না পারে সেদিকে কঠোর দৃষ্টি দিতে হবে রাজনৈতিকভাবে এবং পোল্যান্ড সরকার ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, দেশের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি রোধ করতে সেনাবাহিনী নামানো হতে পারে। অন্যথায় পোল্যান্ডের মারাত্মক ঘটনাবলীর কুপ্রভাব অন্য দেশেও পড়তে বাধ্য। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির উপর এই কুপ্রভাব পড়তে শুরু করেছে। স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন পলিটব্যুরো সদস্য দাবি জানিয়েছেন সেখানে সলিডারিটি ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দেওয়া হোক। এদিকে শাসক দল ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি সবতোভাবে প্রয়াস চালিয়ে যায় যাতে দেশ গৃহযুদ্ধের আবর্তে প্রবেশ না করে। কিন্তু এই প্রয়াস কোন কোন ক্ষেত্রে আপসনীতিতে পরিণত হয়। স্তানিশল কানিয়া পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে আপসের মনোভাবে উৎসাহ যোগান। কিন্তু দলের কেন্দ্রীয়

কমিটির অধিকাংশ সদস্যই এই আপসনীতির বিরোধীতা করেন। কত ১৬ এবং ১৭ অক্টোবর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকে স্তানিশল' কানিয়া দলেব প্রথম সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর পদত্যাগপত্র ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। নতুন পার্টি প্রধান নির্বাচিত হন জারুজেলস্কি। তিনি পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় কমিটি দলের নতুন নীতি এবং কর্মসূচীর কথাও ঘোষণা কবেন। দলের নতুন নীতিতে সলিডারিটি ইউনিয়নের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয় এবং বলা হয় প্রয়োজনে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে হবে এবং ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে হবে।

পোল্যান্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির অপেক্ষাকৃত এই কঠোর মনোভাবের প্রভাব পার্টির অভ্যন্তরেও পড়েছে। ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির এগারোজন নেতা সলিডারিটি ইউনিয়নের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেছেন। এঁদের মধ্যে একজন পলিটব্যুরো সদস্য, নয়জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং একজন কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য রয়েছেন।

এই প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও পোলিশ সমাজতন্ত্রকে বাঁচানো যায়নি। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পোল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। নির্বাচনী ব্যবস্থা বদলে ফেলা হয়। ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি ভেঙ্গে পড়ে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এর অগ্রভাগে থাকে সলিডারিটি।

সলিডারিটি সরকার

পোল্যান্ডে ১৯৮৯ সালে সলিডারিটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতঃ অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক সেখানে কোয়ালিশন সরকার কিভাবে চলেছে, সেখানকার জনগণের অবস্থাটাই বা কি? পোল্যন্ডের জনগণকে প্রথম দিকে জেমস ব্রাইসের ঐতিহাসিক উক্তিকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করতে হচ্ছে ঃ সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হলো আত্মত্যাগ, কষ্ট স্বীকার। প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে পোল্যান্ডের জনগণএক যে এতটা সংকটের মধ্যে পড়তে হবে সে কথা ঐ দেশের বর্তমান শাসক দল সলিডারিটি সরকারে যাবার অব্যবহিত পরেই সলিডারিটি নেতারা বলেছিলেন ঃ 'আমাদের সমাজ সমাজতান্ত্রিক রোগে আক্রান্ত। দ্রুততার সঙ্গে এই রোগ সারাতে হবে। অন্যথায় সমগ্র পোলিস জনগণের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।' কিন্তু সেই নেতারাই বলছেন যে, সরকারে যাওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে। অবিলম্বে যদি আমেরিকা একশ' কোটি ডলার আর্থিক সাহায্য না দেয় তবে সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে তেরো কোটি ডলার সাহায্য পাঠিয়েছে। হোয়াইট হাউসের বৈদেশিক পরামর্শদাতা কমিটি পরিষ্কার জানিয়েছে যে, নিকারাগুয়ার নির্বাচনের পূর্বে পোল্যান্ডকে নতুন করে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। কেননা ঐ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকাকে চল্লিশ কোটি ডলার ব্যয় করতে হবে। আমেরিকা পোল্যান্ডকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে কার্পণ্য করলেও একথা অনেকেরই জানা যে, পোল্যন্ডে সলিসিডারিটি যাতে ক্ষমতায় আসতে পারে সেজন্য আমেরিকা ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ৬৩ কোটি ডলার সলিডারিটির পিছনে ঢেলেছে। পোল্যান্ডে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতিতে আতঙ্কিত যে সলিডারিটি

নেতারা তাই নয়—আতঙ্কিত খোদ মার্কিন রাজনীতিবিদেরা। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জেমস বেকার প্রকাশ্যেই এই উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'আমরা পোল্যান্ডকে সাহায্য করতে পারি, আমাদের সাহায্য করা উচিত এবং আমরা সাহায্য করব।'

অল্প সময়ের মধ্যেই পোল্যান্ডের অর্থনৈতিক জীবনে কি ধরনের বিপর্যয় নেমে এসেছে? সলিডারিটি নেতা তাদেউস মাজোভিয়েৎস্কি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এক রাতে ওয়ারশ শহরে দুধের দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়। কেন এই আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধি? ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে সলিডারিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এই দল যদি সরকার গঠন করে তবে সেই সরকার খাদ্যশস্যের খুচরা বিক্রীর উপর থেকে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেবে। যুক্তি হিসাবে দেখানো হয়, অত্যাবশ্যক পণ্যের যদি মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সলিডারিটি সরকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের কর্মসূচী কার্যকর হয়। ফলে কেবল দুধ নয়, প্রতিটি অত্যাবশ্যক পণ্যের দামই বেড়ে যায়। ক্রয়ক্ষমতা অনেকেরই নাগালের বাইরে চলে যায়। খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। সরকারও যথারীতি বিপাকে পড়ে। এই মূল্যবৃদ্ধির বহু পূর্বেই সরকার খাদ্যশস্যে ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

এদিকে শিল্প ক্ষেত্রেও এই সংকটের ছাপ পড়েছে। বিশেষ করে কয়লাশিল্পে ইতিমধ্যেই সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। কয়লার বাজারের সঙ্গে কয়লা উৎপাদন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। সরকার থেকে বলা হচ্ছে, খনিতে শ্রমিক ছাঁটাই না করলে খনি চালু রাখা যাবে না। আর শ্রমিক ছাঁটাই প্রশ্নে সলিডারিটি পরিচালিত ইউনিয়নেই ফাটল ধরেছে। এই প্রস্তাব যদি কার্যকর হয় তবে পোল্যান্ডের ৪১বছরের ইতিহাসে প্রথম সেখানে শ্রমিক ছাঁটাই হতে চলেছে। নতুন সরকার যে ধরনের সংকট সৃষ্টি করেছে তার জালে জড়িয়ে সরকার ছেড়ে দেবার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু পোলিস, ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি ঘোষণা করেছে ঃ সে কোন কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব দেবে না।

জনগণের রায়

১৯৯৩ সালের পরবর্তী নির্বাচনে পোল্যান্ডের গণতান্ত্রিক-বাম মোর্চা বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। পোল্যান্ডের পূর্বতন কমিউনিস্ট পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির নেতারা এই মোর্চা গঠন করেন। এই মোর্চা ডেমোক্রাটিক পিজান্টস পার্টির সঙ্গে ফ্রন্ট গঠন করে পোল্যান্ডে নতুন সরকার গঠন করেছে। আলেকজান্ডার কাওসনিয়েস্কি এই ফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। অর্থাৎ তিনিই পোল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী।

১৯৮৯ সালে পোল্যান্ডে সলিডারিটি-র নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হবার পর চার বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক-বাম মোর্চার এই বিরাট জয় নিঃসন্দেহে তাৎপর্যবাহী ঘটনা। ১৯৮৯ সালের পর ১৯৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরের নির্বাচন ছিল দেশে সংবিধান প্রণীত হবার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে বামপন্থীদের বিজয় তাৎপর্যবাহী ঘটনা হলেও আকস্মিক বা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। নির্বাচনের দেড় মাস পূর্বে গণতান্ত্রিক-বাম মোর্চার নেতা, পূর্বতন পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী আলেকজান্ডার কাওসনিয়েস্কি ঘোষণা করেছিলেন যে পোলিশ জনগণের মোহভঙ্গ ঘটছে। নির্বাচনে বামপন্থীরা জয়যুক্ত হবেন। পোলিশ জনগণের মোহভঙ্গ ঘটেছে কিনা তা এখনই

বলা যাবে না। তবে ভোটের ফলাফলে এটা পরিষ্কার যে তাঁরা নতুন পথের সন্ধান করছেন। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে সলিডারিটি নিয়ন্ত্রিত যে সিভিল ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করেছিল সেই ইউনিয়ন এবারের নির্বাচনে দশ শতাংশের মত ভোট পেয়েছে। চরম দক্ষিণপন্থী বলে পরিচিত খ্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টির এই নির্বাচনে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছে। নির্বাচনের ফল ঘোষিত হবার পূর্বেই বামপন্থীদের জয়ের আভাস পেয়ে ফ্রান্স এবং জার্মানি মন্তব্য করেছিল ঃ পোল্যান্ডে অশুভ বিপদের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। পোল্যান্ডের বুকে অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের কেন বিপর্যয় ঘটলো? কীভাবে বামপন্থীরা সেখানে জয়লাভ করলেন তা বুঝতে হলে এই নির্বাচনের প্রেক্ষাপটটা জানতে হবে। জানতে হবে গত চার বছরে পোল্যান্ডের বুকে কী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮৯ সালে যখন পোল্যান্ডে প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয় তখন প্রতিবিপ্লবীদের নেতা এবং দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি লেচ ওয়ালেসা বলেছিলেন পোল্যান্ডকে উন্নত এবং সভ্য দেশে উন্নীত করতে হবে। গত চার বছরে সেই প্রতিশ্রুত উন্নত ও সভ্য দেশের হালটা কি হয়েছিল? সেই প্রেক্ষাপটেই বিচার করতে হবে পোল্যান্ডের নির্বাচনী ফলাফল।

১৯৮৯ সালে যখন পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট - সলিডারিটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় তখন থেকেই সেখানে সংস্কারের নামে বাজার অর্থনীতি চালু হয়। অর্থাৎ কমিউনিস্ট নেতা জারুঝেলস্কি যখন পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তখন থেকেই পোল্যান্ডে ধনবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। সে সময় থেকেই পোল্যান্ডের অর্থনৈতিক - সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয়। চার বছরে প্রতিবিপ্লবীদের শাসনকালে বিপর্যয় ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। দেশে বর্তমানে মোট বেকারীর সংখ্যা ৩৪ লক্ষ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ। ১৯৮৯ সালের পূর্বে ধনবাদী অর্থনীতিবিদেরা সমাজতন্ত্রেও বেকার সমস্যা রয়েছে এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ করতো পোল্যান্ডের দিকে। কিন্তু তখন পোল্যান্ডের বেকারীর সংখ্যা কি ছিল? ১৯৮১ সালে "আমেরিকার শ্রম পরিসংখ্যান" সারা বিশ্বে বেকারীর যে তথ্য দেয় তাতে পোল্যান্ডের বেকার সংখ্যা দেখানো হয় আঠারশো। অর্থাৎ তখন পোল্যান্ডে বেকারীর হার ছিল দেশের জনসংখ্যার এক শতাংশের কম। পূর্বতন সমাজে বেকারদের জন্য অদক্ষ শ্রমিকদের বেতনের সমহারে বেকারভাতা দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে পোল্যান্ডের বেকারেরা বছরে মাত্র ছ'মাসের জন্য বেকার ভাতা পেয়ে থাকেন। এই বেকারভাতার পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৫০ হাজার জ্লোতি (পোল্যান্ডের মুদ্রা)। পোল্যান্ডে এখন শ্রমিকদের মাসিক ন্যূনতম বেতন হচ্ছে ১২ লক্ষ জ্লোতি। কেবল বেকারদেরই যে বেহাল অবস্থা তাই নয়, কর্মরত শ্রমিকেরাও কঠিন অবস্থার মধ্যে দিন-যাপন করছেন। জ্লোতি'র অবমূল্যায়ন ঘটছে প্রতিদিন। ১৯৮৯ সালে পূর্বে একটি মার্কিন ডলার কিনতে দিতে হতো ৩২৫ জ্লোতি। আজ এক ডলারের বিনিময়মূল্য হলো ১৩ হাজার ৪ শ' জ্লোতি। পোল্যান্ডে যখন ন্যূনতম মজুরি হলো ১২ লক্ষ জ্লোতি তখন সেখানে অত্যাবশ্যক পণ্যের দরটা কি? পোল্যান্ডে কয়েকটি অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম এখানে ক্রাকো'র (১০০ ক্রাকো = ১ জ্লোতি) হিসেবে দেওয়া হলো ঃ এক কিলোগ্রাম রুটির দাম ৫ হাজার ৭ শ' ক্রাকো; এক কিলোগ্রাম আলুর দাম ৩ হাজার ক্রাকো (১৯৮৯ সালের পূর্বে তা মিলতো ৫০ ক্রাকোয়)। এক কিলোগ্রাম টম্যাটোর দাম ৩ হাজার ক্রাকো (১৯৮৯ সালের পূর্বে দাম ছিল ৯০ ক্রাকো); এক কিলোগ্রাম মাংসের দাম ৯ হাজার ক্রাকো (১৯৮৯ সালের পূর্বে এই দাম ছিল ১ হাজার ৮ শ' ক্রাকো,

এক ডজন ডিমের দাম ১৩ শ' ক্রাকো। ৪০ বর্গমিটার কামরা বাবদ বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের চার্জ দিতে হয় তিন লক্ষ জ্লোতি। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পোল্যান্ডের বর্তমান রাষ্ট্রপতি লেচ ওয়ালেশ ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ক্ষমতায় এলে পোল্যান্ডের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাবেন। পোলিশ নরনারীর জীবনযাত্রার মান পশ্চিম ইওরোপে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানের সমতুল্য করবেন। আজ পোল্যান্ডে প্রতিটি অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারের সমতুল্য কিন্তু তাঁরা মাসে বেতন পান মার্কিন ডলারের হিসেবে মাত্র ১৩৪ ডলার। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল জারেম্বকা মন্তব্য করেছেন, পোল্যান্ডে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের ৪০ শতাংশ অবনতি ঘটেছে। তিনি পোল্যান্ড সফরের পর ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত মান্থলি রিভউয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ আমি পোল্যান্ডের বহু মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে মন্তব্য করেছেন, পোল্যান্ডে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর ধনবাদ। একজন পোল্যান্ডকে আধুনিক আফ্রিকার সঙ্গে তুলনা করেন। আমি যখন ১৯৮৫ সালে পোল্যান্ড সফরে গিয়েছিলাম তখন আমি এক মহিলাকে ধনবাদের পর্যালোচনা বইটি উপহার দিয়েছিলাম। এবারেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মন্তব্য করেন "আমি স্বচক্ষে ধনবাদে মানুষের হাল দেখতে পাচ্ছি।"

পোল্যান্ডে সব থেকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে শিল্প ক্ষেত্রে। দেশে বর্তমান কোন শিল্পনীতি নেই। বাজার অর্থনীতি চালু হয়েছে, কিন্তু বাজার ব্যবস্থার একপেশে প্রয়োগ ঘটেছে। শিল্পে কাঁচামালের যাতে অভাব না ঘটে সেজন্য শুরুতেই রেল মাসুল ও ট্রাকের ভাড়া এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শহরের শিল্পাঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় না। গত চার বছরে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থার ২৮ শতাংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যখন এই সমস্ত শিল্প কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন বলা হয়, এই সমস্ত বৃহৎ কারখানা বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেওয়া হবে। কিন্তু গত চার বছরে পোল্যান্ডের বুকে কোন বড় কারখানা ক্রয়ের জন্য কোন বিদেশী কোম্পানি এগিয়ে আসেনি। ১৯৮৯ সালে লেচ ওয়ালেশা ঘোষণা করেছিলেন, যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বড় শিল্প কারখানা লোকসানে চলছে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার স্থলে নতুন শিল্প কারখানা বিদেশী সংস্থার সাহায্যে স্থাপন করা হবে। কিন্তু এই চার বছরে পোল্যান্ডে একটিও নতুন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কেবল যে রাষ্ট্রায়ত্ত ভারী শিল্পের এই হাল তাই নয় — একই ধরনের বিপর্যয়কর অবস্থা বেসরকারী শিল্প সংস্থাগুলিতে। পরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্প সংস্থার হাল আরো খারাপ। গত চার বছরে আটশ'র বেশি বেসরকারী শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার এই সমস্ত শিল্প কারখান চালু রয়েছে সেগুলিতে চলছে ব্যাপকহারে শ্রমিক ছাঁটাই। একটি কারখানার উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে পোল্যান্ডে কী হারে শ্রমিক ছাঁটাই চলছে। মিসকোয় অবস্থিত একটি সুতাকল দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত সুতাকল। ১৯৮৯ সালের পূর্বে এই সুতাকলের শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১৮০০ জন। বর্তমানে সেই সুতাকলের শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫০ জনে। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এই সুতাকলের এক জন ছাঁটাই মহিলা শ্রমিকের মন্তব্য হলো ঃ "জাবুঝেলস্কি সরকার ছিল একটি মূর্খ সরকার, আর ওয়ালেশা সরকার হল মূর্খ-শয়তান সরকার।"

দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, একের পর এক শিল্প

কারখানা যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন ১৯৯১ সালে নির্বাচিত সেজ-এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো গর্ভপাতজনিত সমস্যা। যেহেতু পোল্যান্ডের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব সব থেকে বেশি তাই সেখানে গর্ভপাত নিষিদ্ধ। সরকারী হাসপাতালে গর্ভপাত নিষিদ্ধ হলেও বেসরকারী হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে ব্যাপকহারে গর্ভপাত ঘটানো হচ্ছে। এজন্য অর্থব্যয় কবতে হচ্ছে বিশ লক্ষ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ জ্লোতি পর্যন্ত। পোল্যান্ডে ৬শ' নতুন গীর্জা স্থাপিত হয়েছে। ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের রাজনৈতিক সংগঠন খ্রীস্টান ডেমোক্রাটিক পার্টির উপরও ক্যাথলিকদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজনীতিতে ক্যাথলিকদের এই ব্যাপক হস্তক্ষেপ সেখানকার লিবারেল ডেমোক্রাটরাও মেনে নিতে পারছেন না।

দেশের এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের শ্রমজীবী জনগণ প্রথম থেকেই আন্দোলন সংগঠিত করে আসছেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯২ সালে যে দুটি দেশে নিজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর রূপ নেয় সে দুটি দেশ হলো ঃ পোল্যান্ড এবং ইরান। পোল্যান্ডে শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য পূর্বতন পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির (কমিউনিস্ট পার্টি) ও পি জেড জেড নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গঠন করেছে। পাঁচ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতেও পি জেড জেড আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে। এই পাঁচ দফা কর্মসূচী হলো ঃ (১) জাতীয় স্বার্থে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে (২) বেকারীর অবসান ঘটাতে হবে (৩) বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে। (৪) বিদেশীদের কাছ কারখানা বিক্রি বন্ধ করতে হবে (৫) দেশীয় উৎপাদিত পণ্যের জন্য দেশেব অভ্যন্তবেই বাজার সৃষ্টি করতে হবে। পূর্বতন কমিউনিস্ট একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশও শুরু করেছেন। এই পত্রিকার নাম নিয়ে (না) যার অর্থ পোল্যান্ডে ধনবাদ নয়।

পোল্যান্ডের মানুষ ধনবাদ চান না। তাঁরা চান সমাজতন্ত্র। কিন্তু নতুন গণতান্ত্রিক-বাম মোর্চা কি ধরনের সমাজতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠা করবেন তার উপরই নির্ভর করছে এই জয়ের সাফল্য - অসাফল্য। নির্বাচনে জয়ের পর কাওসনিয়েস্কি বলেছেন, সংস্কার অব্যাহত থাকবে। মানবমুখী সংস্কার হবে পোল্যান্ডের পরবর্তী পদক্ষেপ। সেই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে কী রূপ নেয় সেটাই লক্ষ্য করার বিষয়।

হাঙ্গেরি

গত ২৩শে অক্টোবর হাঙ্গেরির অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান মটিউস সুরজ ঘোষণা করেন যে, দেশে বুর্জোয়া রিপাবলিক স্থাপিত হলো। এই রিপালিকের আদর্শ হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র।

এর পূর্বে ৬ এবং ৭ই অক্টোবর হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্তে হাঙ্গেরিয়ান ওয়ার্কার্স সোস্যালিস্ট পার্টির বিশেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেই কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, দেশে কমিউনিস্ট পার্টির অবসান ঘটলো। নতুন পার্টি গঠিত হলো—হাঙ্গেবিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি। কংগ্রেসে উপস্থিত ১,৩০০ প্রতিনিধির প্রায় সকলেই নতুন পার্টি গঠনের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান—বিরোধিতা করেন মাত্র ১৫৯ জন প্রতিনিধি। কেবল যে হাঙ্গেরিতে একটি রাজনৈতিক দলের নামের পরিবর্তন ঘটলো তাই নয়। একটি শাসক দল তার

রাজনৈতিক কর্মসূচীর গুণগত পরিবর্তন ঘটালো। হাঙ্গেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি সেই ১৯৭৮ সালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দুই মৌলিক স্লোগান—সর্বহারার একনায়কত্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি পরিত্যাগ করে। সেদিন হাঙ্গেরি কমিউনিস্ট পার্টি এ যুক্তি দেখিয়েছিল যে, সমাজতন্ত্র উন্নত স্তরে প্রবেশ করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাতে হবে। সর্বহারার একনায়কত্ব আঁকড়ে থাকার অর্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ স্বীকৃত এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশে ক্ষতিসাধন করা। আজ সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি তুলে দেবার প্রাক্কালে ঘোষণা করা হয় যে, দেশের জনগণকে মার্কবাদ-লেনিনবাদ আকৃষ্ট করছে না। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির জনগণ চলে গেছেন। তাঁরা চান পশ্চিমী দেশসমূহে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে সেই ধরনের একটা শাসন ব্যবস্থা হাঙ্গেরিতে প্রতিষ্ঠা করতে। অর্থাৎ দেশে প্রয়োজন বহুদলীয় নির্বাচনী ব্যবস্থা। এখানেই শেষ নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হলো রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি—ব্যক্তিগত মালিকানার মালিক। নবগঠিত হাঙ্গেরিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির বিলোপ ঘটানো হবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। এক কথায় হাঙ্গেরিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টির নতুন কর্মসূচীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ দেশে সমাজতন্ত্রের পুরোপুরি অবসান ঘটিয়ে ধনবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

হাঙ্গেরিয়ান ওয়ার্কার্স সোস্যালিস্ট পার্টি বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম পুরাতন পার্টি। নভেম্বর বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই পূর্ব ইউরোপের যে সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে হাঙ্গেরি অন্যতম। ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরিয়ান ওয়ার্কার্স সোস্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পার্টি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্মসূচী গ্রহণ করে। এটা সত্য যে সেখানে সমাজতান্ত্রিক গঠন কাজ শুরু হবার অব্যবহিত পর থেকেই প্রতিবিপ্লবী শক্তি সেই সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্ত করে। আর এটাও সত্য যে হাঙ্গেরিতে কোনদিনই সমাজতন্ত্র দৃঢ় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজের সাহায্যে হাঙ্গেরি সরকার সেই প্রতিবিপ্লব ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়। এরপর দু' দশকের বেশি সময় ধরে হাঙ্গেরিতে সুষ্ঠুভাবে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন চলতে থাকে।

১৯৭৮ সালে ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ইউরোপীয় কমিউনিজমের নীতি গ্রহণ করলে অন্যান্য ইউরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টির মত হাঙ্গেরির ওয়ার্কার্স সোস্যালিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে আদর্শগত সংঘাত শুরু হয়। পার্টির অভ্যন্তরে সরকারীভাবেই তিনটি গ্রুপ বা ক্লাব গঠিত হয়—(১) দ্য রিফর্মস ক্লাব, (২) দ্য মার্কিস্ট ক্লাব এবং (৩) জানোস কাদার ক্লাব। রিফর্ম ক্লাবই কমিউনিস্ট পার্টির অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার ব্যবস্থা অনুযায়ী পার্টি গঠনের প্রবক্তা। আর এই ক্লাবের প্রধান বা মূল স্লোগান হলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার। কিন্তু তারা যে কোন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কারে বিরোধী। জানোস কাদার ক্লাব চেয়েছিল হাঙ্গেরিয়ান ওয়ার্কার্স সোস্যালিস্ট পার্টির পুরাতন ঐতিহ্যের অক্ষুণ্ণতা। আদর্শগত সংগ্রামে দ্য রিফর্মস ক্লাবই জয়ী হয়। হাঙ্গেরিতে ধনবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

বিপর্যয়ের কারণ ও ফলাফল

১৯৮০'র দশকের শেষেব দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপর্যয় গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও অনুমান করতে পারেননি, এতো দ্রুত এ'ঘটনা ঘটে যবে। তারপর শুরু হলো সমাজতন্ত্র-বিরোধী কুৎসা—অপপ্রচারের দুর্গন্ধ স্রোত। অর্বাচীন ইতিহাসকারদের কেউ কেউ — 'বৈপরীত্য শেষ তো ইতিহাস-ও শেষ' — বলে নাম কিনতে উঠে পড়ে লাগলেন। গাদা গাদা বই বেরোতে লাগলো সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকে আক্রমণ করে। বলা হলো : সামাজতন্ত্র শেষ — পুঁজিবাদের জয়ের রথ এবার মসৃণ পথে দ্রুত অগ্রগামী হবে।

তারপর.........

তারপর ভল্‌গা, নীপার, ওডার, রাইন দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রের পতনে আনন্দিত, উচ্ছ্বসিত পুঁজিবাদী দেশনেতারা আর অতটা খেয়াল করেননি : পুঁজিবাদের, খোলা বাজারের, মুক্ত-অর্থনীতির গতি কি হলো। যখন খোয়াল হলো, দেখলেন অনাবিল প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করে শ্রমিকশ্রেণী তাৎক্ষণিক মোহের আবরণ দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে ফিরে আসেছেন মূল স্রোতে — মানব বিকাশের, সমাজ বিকাশের মূল ধারায়। এবার তাঁদের বাড়তি সুবিধা : আগেকার ভুল-ভ্রান্তি'র বোঝা তাঁরা পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন। তারপর এগিয়ে এসেছেন সঙ্কটাকীর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার করাল গ্রাস থেকে পিতৃভূমিকে রক্ষা করতে। নয়া উপনিবেশবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে।

রাশিয়া : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে 'রাশিয়ান ফেডারেশন' বা 'রোসিস্‌কায়া ফেদেরাতসিয়া', যার আয়তন সতেরো কোটি বর্গ কিমি, যার বর্তমান জনসংখ্যা পনেরো কোটি ছুঁয়েছে, আর যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২৫ টি সাধারণতন্ত্র, চারটি স্বশাসিত 'অঞ্চল', এবং চারটি স্বশাসিত 'এলাকা'।

১৯৯০-এর শুরুতেই রাশিয়ার জনসাধারণ পুঁজিবাদী, খোলা বাজারের অর্থনীতি এবং গ্লাস্‌নস্তীয় 'মুক্ত মনের' কুৎসিত চেহারা সম্পর্কে বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছিলেন। পশ্চিমী শক্তিসমূহের কাছে ইয়েলেৎসিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের দাসসুলভ মনোভাব নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ, এবং প্রশাসনের নামে দানবীয় স্বৈরাচারের শৃঙ্খলে রাশিয়ার সাধারণ মানুষকে বেঁধে রাখার কুৎসিত প্রচেষ্টা অতি দ্রুত, ভোগ্যপণ্যের বৈভবের সাথে রাশিয়ার মধুচন্দ্রিমার অবসান ঘটালো। ততদিনে অর্থনীতির ক্ষেত্রে নৈরাজ্য নেমে এসেছে। মুদ্রস্ফীতি 'হাইপার-ইন্‌ফ্লেলসনের' রূপ পরিগ্রহ করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে অভাব এবং অনটন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দুটি প্রাগ্রসর বৈশিষ্ট্যে পরিণতি লাভ করেছে : প্রতি দশজনের মধ্যে ছয়জনেরই আজ প্রয়োজনীয় খাবার ক্রয়ের ক্ষমতা নেই; দেশের ৭০% মানুষ আয়ের ৯০% খরচা করেও খাদ্য সংগ্রহে পরাজয় মেনে নিচ্ছেন। কালোবাজারের হাত ধরে আবির্ভাব ঘটেছে 'মাফিওসি' চক্রের। ফটকাবাজি, মজুতদারিতে হাত পাকিয়ে এঁরা ক্রমশ আমলাতন্ত্রের ওপর লৌহদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছেন : প্রশাসন চলছে প্রকৃতপক্ষে এই 'ব্যান্ডিট-ব্যুরোক্রেসি' বা 'ব্যান্ডো-ক্রেসির' আনুকূল্যে। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে একেবারে নিচেরতলা পর্যন্ত দুর্নীতি গোটা দেশটাকে গ্রাস করেছে। বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়ার মূললাভ কুড়োচ্ছেন নতুন গজিয়ে ওঠা 'আর্থনীতিক স্বৈরাচারীকূল' যাঁরা 'মাফিওসি' ও 'ব্যান্ডোক্রেসির' প্রত্যক্ষ

সহায়তায় শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং এবং ইনস্যুরান্স ক্ষেত্র পুরোপুরি নিজেদের কব্জায় নিয়ে এসেছেন। শেয়ার বাজারের দ্রুত ওঠানামার সুযোগ নিচ্ছেন এঁরাই। অসংখ্য 'চিট ফান্ড' এঁরাই চালাচ্ছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, রেশন ব্যবস্থা, পরিবহনের মতো ক্ষেত্রে বেসরকারী দাপট গোটা দেশটাকে এক অসহায়ত্বের অতলে ঢেউ তুলে দিয়েছে।

এই প্রবল মুদ্রাস্ফীতির কুপ্রভাব সম্পর্কে রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যম যথেষ্ট সরব। এ'বছর এক জনমত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, দেশের ৯০% মানুষ মনে করেন যে, দেশের অবর্ণনীয় আর্থিক দুর্গতির কারণ হলো এই মুদ্রাস্ফীতি। বিশেষ করে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমানের বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এই মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক হারে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে চলেছে সাধারণ জনগণের মধ্যে।

এর সঙ্গে শিল্পোৎপাদনের কিছু মৌল পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পুঁজিবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বাতাবরণে দ্রুত পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করলো ১৯৯০-এর প্রথম থেকেই। নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমও চেপে রাখতে পারলো না কীভাবে সাবেক কমিউনিস্টরা এবং সহযোগী বাম শক্তিসমূহ ক্রমশ জনসাধারণের মনে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধার স্থান গড়ে তুলছিলেন। এর একাধিক রাজনৈতিক-মতাদর্শগত ব্যাখ্যা ইতোমধ্যেই উপস্থাপিত হতে শুরু হয়েছে।

১) একতরফা মার্কিনী দস্যুতা এবং বিশ্বব্যাপী বৃহৎ পুঁজির দাপটের হাত থেকে রাশিয়া রক্ষা পায়নি। অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিসর্জিত হয়েছে মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার-বিশ্বব্যাঙ্কের পদপ্রান্তে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সামান্যতম 'বেচাল' দেখলেই ইয়েলেৎসিনকে ধমক খেতে হচ্ছে আর্বাচীন ক্লিন্টন এবং আশক্ত ওয়ারেন ক্রিস্টোফারের। 'জি-৭' বৈঠকে রাশিয়ার নতমস্তক উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে 'হতমান ভিক্ষুকের যথার্থ গতি' বলে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাশিয়ার ভূমিকা ক্রমশ প্রান্তিক চেহারা নিচ্ছে। রাশিয়ার মানুষ বুঝেছেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের বৈপরীত্য লোপ পেয়েছে ধরে নিয়ে কি মারাত্মক ভুল তাঁরা করেছিলেন। এ পরিস্থিতিতে সাবেক কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আবার পুনর্মূল্যায়নে বসেছেন রাশিযার খেটে-খাওয়া মানুষ। একাধিক রাশিয়ান রাজনৈতিক বিশ্লেষক খেদোক্তি করেছেন : "ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হয়েছে বলা মহা ভুল : আমরা ওই লড়াই-এ হেরে গিয়ে তাব ক্ষতিপূরণ দিয়ে চলেছি।" সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদার আসন সম্পর্কে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন রাশিয়ার মানুষজন যাঁরা আশার আলো দেখতে প্রস্তুত কমিউনিস্ট ও বাম শক্তিসমূহের উত্থানের মধ্যে।

২) যে মাটিতে মার্কিনী নেতৃত্বে পুঁজিবাদ গড়ার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছিল ১৯৮৯ থেকে, সে মাটিটাকেই চিনতে যথারীতি ভুল হয়েছিল ক্ষমতাগর্বী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের। তারা ভুলে গিয়েছিলেন যে, বিগত ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিপুল আত্মত্যাগ ও শ্রমের মধ্য দিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বদায়ী ভূমিকায় যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তা এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত পাকা করেছিল যার প্রাণবন্ত উৎপাদনী শক্তি দেশের অন্যান্য অংশের মতই রাশিয়াকে, রাশিয়ার মানুষের জীবনকে আমূল পরিবর্তনের পথে নিয়ে গিয়েছিল। নভেম্বর বিপ্লব যদি সামন্ত কাঠামোকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করে থাকে তো একই সঙ্গে তা জাতীয় বুর্জোয়াদের সন্তর্পণ উপস্থিতির মূলেও কুঠারাঘাত করেছিল, আর, দেশের মানুষকে

দিযেছিল, প্রাচুর্য না হলেও, স্বচ্ছল জীবনযাত্রাব স্থিতিশীলতা। আর আজ? 'মাফিওসি', আর্থ-সামাজিক অপরাধ, জীবনেব প্রতিটি স্তরে রুবেলের জায়গায় ডলাবেব দাপট, রাশিয়ান নারীব পণ্যোপকরণের ভয়াবহ পবিণতিতে অসংলগ্ন সামাজিক-পাবিবারিক কাঠামো, এই কদর্য পরিস্থিতিব-ই নাম, খোলা বাজারেব পুঁজিবাদী অর্থনীতি? বাশিয়াব মাটিতে পুঁজিবাদী প্রতীক বরিস ইয়েলেৎসিন সম্পর্কে ১৯৯২ সালের জনমত সমীক্ষার পরিসংখ্যান স্মর্তব্য। তাঁকে 'পুরোপুরি অথবা আংশিক' সমর্থন কবেছিল রাশিয়ার জনসংখ্যার ২৮% , ৩৪% তাঁকে বর্জন করেছিল সরাসরি; আব, বাকিবা ইয়েলেৎসিন ও তাঁর সরকার সম্পর্কে কোন মতামত দেবারই প্রয়োজনবোধ করেনি। মার্কিন অধ্যাপক রজার বারবাক্ তাঁর প্রকাশিতব্য **দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড ডিসঅর্ডার** গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "আজ রাশিয়ার মানুষের চোখে চক্রান্তকাবী খলনায়ক হলেন — না, সাবেক কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা নন — বিরাষ্ট্রীয়করণের হোতা, মাফিয়ারাজের মদতদাতা, ইয়েলৎসিনেব মত জনসমর্থনহীন গোষ্ঠীপতিবা।"

৩) ১৯৯৩ সালের গোড়ার দিকে নেওয়া আর একটি জনমত সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে যে, রাশিয়ার ২০% -এরও কম মানুষ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমর্থন করেন। ৬০% মনে করেন যে, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন ও পরিবহন ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন আছে। এবং প্রায় ৯০% কাজের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এককাট্টা সমর্থক। এঁরা মনে করেন ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা থাকা প্রয়োজন; এবং ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে মুক্ত অর্থনীতির কোন প্রয়োজন নেই। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি এই ধরনের গভীর আস্থা একদিকে যেমন খোলাবাজারের সমর্থকদের ক্রমশ কোণঠাসা করে তুলছে, অপরদিকে তা অনাবিল উৎসাহ যোগাচ্ছে সাবেক কমিউনিস্ট এবং বাম শক্তিগুলিকে।

৪) রাশিয়া বহুজাতিক রাষ্ট্র। ওখানে আছেন রুশ ৮১.৫%, তাতার (৩.৮%), ইউক্রেনীয় (৩.০%), চুভাশ (১.২%), বাশকির (০.৯%), বেলারুশ (০.৮%), মোর্ডোভীয় (০.৭), চেচেন্ (০.৬%), জার্মান (০ ৬%), অন্যান্য (০.৬৯%)। অর্থাৎ যে ১৫ কোটি মানুষ রাশিয়াতে বসবাস করেন তাঁদের মধ্যে চার কোটি রুশ নন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বদায়ী ভূমিকার প্রেক্ষাপটে জাতিগত বোঝাপড়া এবং বর্তমান সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রটি কখনই বড় রকমের কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের রুশদের তুলনায় অধিক আর্থা-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। অন্তত জাতিগত কারণে কোনরকম বৈষম্যের শিকার হতে হয়নি কাউকেই। ভাষাগত দিকটিও যত্নের সঙ্গে সমানাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতেই গড়ে তোলা হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সচেতনতার মূলস্রোতে মিশে যেতে জাতিগোষ্ঠীগুলির বেশি সময় লাগেনি। এখানে মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক কাঠামো অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৫) যে মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙে দেওয়া হলো, পুরনো, কায়েমী স্বার্থবাহী ধ্যান-ধারণাকে মাথাচাড়া দিতে উৎসাহিত করলো "আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল" নামধারী কিছু মৌলবাদী গোষ্ঠী। প্রাথমিকভাবে এঁরা ১৯৯২-র যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের কার্যকরী এককেন্দ্রীয়কতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। বাসকোরতাস্তান, খাকাসিয়া, দাগেস্তান, বস্তভ, বেলগোগ্রাডের মত ১৬টি অঞ্চল সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিল। ১৯৯৩-ব গণভোটের সময় রুশ ফেডারেশনের অনৈক্য একটা স্পষ্ট ছকে দেখা দিল। পেছিয়ে পড়া এলাকাগুলি (যারা সংখ্যায় বেশি) ইয়েলেৎসিনের বিরুদ্ধে

মতপ্রকাশ করল, একই সঙ্গে শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলিও ইয়েলেৎসিনের দুর্বল ও পশ্চিমী প্রভাবযুক্ত রাজনীতির বিরোধীতায় এগিয়ে এলো। "ইউরোপীয়" রাশিয়াতেই একমাত্র ইয়েলেৎসিনের পক্ষে বড় ধরনের সমর্থন চোখে পড়ে। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে এলাকা অঞ্চলগুলির মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল দেখা দিল। প্রথম দিকে ইয়েলেৎসিনীয় সংস্কারের পক্ষপাতী এই এলাকা ও অঞ্চলসমূহের একটা বড় অংশ স্থানীয় নির্বাচনে ভোটে জয়যুক্ত করলো সাবেক কমিউনিস্ট ও বামদলগুলিকে। মোট ৩৭টি স্বশাসিত এলাকা ও প্রদেশ ক্ষমতায় এলেন বিভিন্ন কমিউনিস্ট জোট।

৬) এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য ১৯৯৩ সালের নির্বাচন। রাষ্ট্রীয় ডুমার ভোট গণনা করলে দেখা গেল প্রাপ্ত ভোটেরর শতাংশে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন কমিউনিস্ট ও বামদলগুলি। তবে এঁরা এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ফলে নির্বাচনী ফলাফল এই উল্লেখ্য ঘটনার সে রকম প্রতিফলন দেখা যায় না।

৭) রাশিয়া জুড়ে অসম বিকাশ, স্থানীয় রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগত বৃদ্ধি, এবং তথাকথিত নির্দল প্রার্থীর বাড়বাড়ন্ত গোটা দেশজুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিচ্ছে। অসম বিকাশকে জোরদার করেছে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ধরন-ধারণ। যেমন, ধরা যাক বিরাষ্ট্রীকরণের ধারা। যেখানে সাবেক লেনিনগ্রাড, মস্কো, রস্তভ, ক্রাসনোদর ও স্বোয়ের্ডল্ভ্সক্ প্রদেশে ১৯৯৪-এর প্রথম ক'মাসেই ৫০০-এর বেশি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে ব্যক্তি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতারস্তান, কালিমিইকা, সাইগেন, আলতেয়, তথা দাগেস্তানের মত প্রদেশে এই হার নগণ্য বলা যেতে পারে। বিরাষ্ট্রীকরণের পন্থা-পদ্ধতিরও পার্থক্য বৈষমেযর সৃষ্টি করছে ঃ কোথাও শেয়ার বিক্রয় চলছে; কোথাও সাবেক 'কোল্খোজ্' ও 'সোভ্খোজ্' সমবায়গুলির হাতে পুঁজি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সিংহভাগ রয়ে গেছে; আবার কোথাওবা সংস্থাগুলিকে ঢেলে নতুন করে গড়া হয়েছে। এ পর্যন্ত যা' হিসাব পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতি মানা হয়েছে ৮২% ক্ষেত্রে। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে, অধিকাংশ প্রদেশ/অঞ্চল/এলাকা পুরোপুরি বিরাষ্ট্রীকরণেব সোজাসুজি বিরোধীতা করছেন। কমিউনিস্ট ও বাম শক্তিগুলির আরো একটি বাড়তি সুবিধা হলো এই যে, বর্তমানের অনৈক্যদায়ী সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে, রাজনৈতিক স্তরে, এঁদের প্রদেশ-অঞ্চল-এলাকাগুলির তৃণমূলস্তর পর্যন্ত একটা দেশব্যাপী যোগযোগ কাঠামো আজও বিদ্যমান। স্বভাবতই বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে যখন রাশিয়ার চেচেন্ বা চেলিবিন্স্ক্ অঞ্চল রক্তাক্ত হয় তখনই স্থানীয় মানুষ সমাধান সূত্রের জন্য আসেন সাবেক কমিউনিস্ট পার্টির কার্যালয়গুলিতেই। প্রাভদা ছাড়াও রসিককায়া ভেস্টি, নেজাভিসিমায়া গেজেটা, ইজ্বেস্তিয়া, এবং সেভোদনায়ার মত বহুল প্রচারিত দৈনিক ও পাক্ষিকগুলিতে এ ধরনের একাধিক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। 'ঐক্যের জন্যই কমিউনিস্টদের দরকার' — ধ্বনি উঠেছে কাগজগুলির সম্পাদকীয় কলামে। এবং অবাক লাগে যখন আমরা দেখি যে এইসব তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী' কাগজেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশাসনের ক্ষেত্রে বছর কয়েক আগেকার বহুনিন্দিত 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা'র নীতি প্রয়োগের কথা বলার- চেষ্টা হচ্ছে।

কমিউনিস্টদের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে সহায়তা করছে আর একটি পরিস্থিতি। ১৯৮৯ সালের দুঃখবহ ঘটনাবলীর পরবর্তীতে রাশিয়াতে শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে সমুন্নত শিল্পবিকাশ সাবেক সোভিয়েত

ইউনিয়নে ঘটেছিল, তারই প্রেক্ষাপটে শ্রমিকশ্রেণী আজও একটি কেন্দ্রীয় আর্থ-সামাজিক শক্তি হিসাবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। কমিউনিস্ট পার্টি অব রাশিয়ান ফেডারেশন সম্প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিদেশী টেলিভিসন নেটওয়ার্কের দৌলতে আমরা দেখেছি কীভাবে অতি অল্প সময়ের নোটিসে কমিউনিস্ট পার্টি মস্কো এবং সাবেক লেনিগ্রাদের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের জমায়েত অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম।

উপরোক্ত রাজনৈতিক-মতাদর্শগত প্রেক্ষাপটেই কমিউনিস্ট ও বাম শক্তিগুলির পুনর্জাগরণ আমরা দেখেছি। ১৯৯৪-এর ২১-২২শে মে, মস্কো শহরে ১৯টি কমিউনিস্ট পার্টির এক কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করেছেন যার মধ্যে আছে ঃ সোভিয়েত সমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশসাধন, পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা, সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথকে মসৃণ করা, স্বেচ্ছাভিত্তিক সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তোলা, এবং সমস্ত কমিউনিস্ট গোষ্ঠী/দল/ফোরামগুলিকে একত্রিত করে সি পি এস ইউ'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মতাদর্শগত দিকটি সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, পার্টিগত নৈতিকতা ও নীতি মেনে মতাদর্শগত বিতর্ক আন্তঃপার্টি স্তরেই অনুষ্ঠিত হবে এবং যতদিন না পর্যন্ত ওই বিতর্কের মধ্যে সাধারণ সূত্রায়ন প্রতিষ্ঠা না করা যাচ্ছে, ততদিন কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে মিলিতভাবে। ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন ঃ কমিউনিস্ট পার্টি অব রাশিয়ান ফেডারেশনের চেয়ারম্যান গেন্নাডি জুগানফ্, রাশিয়ান কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির প্রথম সচিব, ভিকটর তিউলকিন্, এবং ইউনিয়ন অব কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান, ওলেগ্ শাইনিন্, রাশিয়ান পার্টি অব কমিউনিস্টের নেতা আনাতোলি ক্রুচকফ্ এবং স্ব-ঘোষিত 'স্তালিনপন্থী' অল ইউনিয়ন বল্‌শেভিক পার্টির নেত্রী নিনা আন্দ্রেয়েভা।

বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে সোস্যালিস্ট পার্টি অব্ ওয়ার্কার্স এদের সাম্প্রতিক কিছু ঘোষণাপত্র এবং কর্মসূচী-সংক্রান্ত কিছু পুস্তিকায় দেখা যাচ্ছে যে, এঁরা সাবেক সি পি এস ইউ-র কর্মনীতি ও কর্মসূচী থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র, একধরনের সোস্যাল ডিমক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে দলকে পরিচালনা করছেন। দলের অন্যতম কর্ণধার, আলেকজান্ডার মল্‌ত্‌সেফ্ বলেন, "রণনীতির দিক দিয়ে আমরা কমিউনিস্ট যদিও রণকৌশলগতভাবে আমরা সোস্যাল ডেমোক্রাট"। অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণে এঁরা কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাস রাখেন কিন্তু ওই লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য এঁদের পথ হলো সংসদে ও সংসদের বাইরে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করা। এঁরা বারবার নির্বাচনকে আন্দোলন-সংগ্রামের অংশ বলেই চিহ্নিত করেছেন। এঁদের কর্মসূচীতে বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কোনো কথা নেই। এছাড়া আছেন পার্টি অব্ লেবরের সমর্থকগণ। এই দলে অন্তর্ভুক্ত আছেন সাবেক কমিউনিস্টদের একাংশ, কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, এমনকি কিছু 'অ্যানার্কো-সিনডিকালিস্প'। লেনিনবাদী অগ্রগামী পার্টির কথা এঁরা বলেন না, ওয়ার্কার্স পার্টি অব্ ব্রেজিলের ধাঁচে এঁরা 'মধ্যপন্থায়' বিশ্বাসী—এঁরা আবার সাবেক সি পি এস ইউ-র ঘোর বিরোধী। মস্কো, সাবেক লেনিনগ্রাদ ইত্যাদি কয়েকটি শিল্পোন্নত শহরে এঁদের পৌরসভাস্তরে বেশ কিছু সমর্থন রয়েছে।

বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলি নিজেদের 'বামপন্থী' বললেও সরাসরি 'কমিউনিস্ট' বলতে নারাজ। এঁদের কাছে 'কমিউনিজ্‌ম এবং 'গোঁড়াপন্থী' মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' বর্তমান যুগের পক্ষে 'অনুপযুক্ত'। 'সমাজতন্ত্র' অর্থে এঁরা বোঝেন 'যুক্তি সঙ্গত এবং উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা'। এঁরা কিন্তু ইউরো-কমিউনিস্টদেব মতো 'সোস্যাল ডিমক্র্যাট নন' বলে আবার প্রায়ই সচিৎকার ঘোষণা করেন। তবে এঁরা দৃঢ়ভাবে বিরোধীতা করেন সংস্কারপন্থীদের। এঁরা বিশ্বাস করেন যে, দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত ব্যবস্থার ভিত্তি আজও সমানভাবে শক্তিশালী ও কার্যকর। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে একমাত্র একমাত্র ঐক্যদায়ী শক্তি। যদি কোনো সংস্কার আদৌ প্রয়োজন হয় তবে তা সীমাবদ্ধ থাকবে ''গোঁড়াপন্থার অবসানের মধ্যে। দলগতভাবে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি আইনী ও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই কাজ করতে আগ্রহী। এঁরা মনে করেন যে, খেটে খাওয়া মানুষজনই 'সমাজতান্ত্রিক বামপন্থী' দলগুলির গণভিত্তি তৈরি করে। এঁরা তথাকথিত 'মানবতাবাদ'কে প্রত্যাখ্যান করে আসছেন বরাবর। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি 'রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে-যৌথক্ষেত্র-ব্যক্তিগত ক্ষেত্র' ভিত্তিক 'মিশ্র অর্থনীতি'তে বিশ্বাসী যেখানে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা থাকবে রাষ্ট্রের। সীমাবদ্ধ, 'নিয়ন্ত্রিত অর্থে এঁরা সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি'র সমর্থক। বিশেষ করে গণ সাধারণতন্ত্রী চীনের অনুকরণে এঁরা অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে আগ্রহী।

অন্যান্য পূর্বতন সোভিয়েত প্রদেশ ঃ এ'কথা আজ আর অজানা নয় যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একাধিক অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছেন কমিউনিস্টরা—কোথাও এককভাবে, কোথাও বা বামগণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাহায্যে। ইতোমধ্যেই ইউক্রেন, লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়াতে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। আজেরবাইজানে হায়দর আলিয়েফের নেতৃত্বে সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট ও বাম জোট বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। জর্জিয়া, তাজিকিস্তান এবং আর্মেনিয়ায় সাবেক কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক শক্তি এবং গণভিত্তি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বেলারুশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইয়েলৎসিনপন্থী প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনঃস্থাপনারর একাগ্র সমর্থক আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো। ইউক্রেনে বাম কমিউনিস্ট জোটের সমর্থনে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ফ্যাসিপন্থী বর্তমান রাষ্ট্রপতি লিওনিদ ক্রাভচুককে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন লিওনিদ কুচমা যিনি লুকাশেঙ্কোর মতোই সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনরুত্থানের পক্ষপাতী। কাজাখস্তানে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে চলেছে সেখানেও কমিউনিস্ট-বাম গণতান্ত্রিক জোট উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

উজবেকিস্তান ঃ যে ধরনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নবগঠিত বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলি সাবেক কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতার কর্মসূচী নিয়েছে আর্থিক উন্নতির পর তার উদাহরণ হিসাবে আমরা বেছে নিয়েছি উজবেকিস্তানের শাসকদল ও রাষ্ট্রপ্রধান ইসলাম কারিমফের উদ্যোগকে। বলা যেতে পরে, নতুন পরিস্থিতিতে কি ধরনের অর্থনৈতিক নির্মাণে সাবেক কমিউনিস্ট তথা বামশক্তিগুলি ব্যাপৃত আছেন তার একটা আঁচ আন্দাজ উজবেকিস্তানের উদাহরণ থেকে পাওয়া যাবে। কারিমফ্, বলা প্রয়োজন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমর্থক এবং তাৎক্ষণিক, 'অন্তর্বর্তী' ভিত্তিতে 'কমনওয়েলথ্ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস'-এর কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী।

কাবিমফ্ মনে করেন, বিশ্বব্যাঙ্ক-আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মতো প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলির সাহায্য হলো এক ধরনের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কিছু নয়। অর্থনীতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে না গেলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হতে বাধ্য। আর দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই প্রান্তিক পরিবর্তন এনে তাকে, কারিমফের নিজের ভাষায় "আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির উপযুক্ত করা যেতে পারে — আমরা সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছি"। প্রাভ্দা, ইজভেস্তিয়া ও রসিস্কায়া গেজেটার নানা সংখ্যা থেকে জানা যায় কোন্ কোন্ পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে উজবেকিস্তান তার অর্থনীতিকে শক্তিশালী, 'নতুন' রূপ দিতে চলেছে।

১) উজবেকী নেতৃত্ব মনে করেন যে, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা থাকবে। সংস্কারকার্যে একমাত্র নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক থাকবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র অগ্রাধিকার স্থির করবে, উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, এবং অর্থনৈতিক সুফল বণ্টনের বিষয়ে শেষ কথা বলবে।

২) সংস্কারে জন্য প্রয়োজনীয় আইনী ও সাংবিধানিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইতোমধ্যেই যৌথ ক্ষেত্র, সমবায় ক্ষেত্র ও অল্প কিছু বিষয়ে ব্যক্তিপুঁজি ক্ষেত্র নির্মানকার্য শুরু হয়েছে। অবশ্যই, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র থাকবে সর্বাধিক শক্তিশালী, নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র। মূল ও ভারী শিল্প, সামাজিক পরিষেবা, এবং কৃষি ক্ষেত্র রয়েছে রাষ্ট্রীয় আওতায়।

৩) দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিকাঠামো বিবেচনা করে অনগ্রসর ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণ ও উচ্চহারে আমদানী শুল্ক কাঠামো বজায় থাকবে। অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অশক্ত ব্যক্তিদের জন্যও থাকবে বিশেষ সুযোগ সুবিধা।

৪) পুরোন ধাঁচের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির 'সার্বিক নিয়ন্ত্রিত কাঠামো' বা 'কম্যান্ড স্ট্রাক্চার' পরিবর্তন করে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যৌথ ক্ষেত্র, সমবায় ক্ষেত্র ও ব্যক্তিপুঁজি ক্ষেত্র গড়ে তোলা হবে—তবে আইনী কাঠামো মেনেই তা পরিচালিত হবে। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে প্রান্তিকভাবে বিদেশী পুঁজিকে ব্যবহার করা হবে—তবে তার ফলে দেশের অর্থনীতিতে স্বনির্ভরতা যেন বৃদ্ধি পায়, এটা সুনিশ্চিত করতে হবে—ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার সংখ্যা ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করতে হবে—প্রতিস্তরেই গভীর পর্যালোচনার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৫) কৃষিক্ষেত্রে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কৃষি খামারগুলিকে যথোপযুক্ত উৎসাহ দেওয়া হবে। পাশপাশি থাকবে রাষ্ট্রায়ত্ত 'সোভ্খোজ' খামার ও সমবায়ভুক্ত 'কোল্খোজ' খামার ও কৃষি-বিপণনকেন্দ্র। উৎপাদনের ১৬-২০% খোলা বাজারে বিক্রয়যোগ্য। পরিবারভিত্তিক, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কৃষিব্যবস্থা চালু করা হয়েছে ইতোমধ্যেই।

৬) কঠোর ব্যয়সঙ্কোচের নীতি মেনে চলা হচ্ছে ঃ ১৯৯৪-এর প্রথমার্ধে বাজেট বরাদ্দকৃত ব্যয়ের চাইতে ১৫% কম ব্যয় হয়েছে। মোট জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে ৯.৫% হারে যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৭.৭%।

৭) এখনো পর্যন্ত বাজার অর্থনীতির উপস্থিতি যৎকিঞ্চিত। প্রাভদায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রাধীনে রয়েছে অর্থনীতির ৯৫%, আর শ্রমশক্তির মাত্র ১% নিয়োজিত আছে বেসরকারী ক্ষেত্রে।

পূর্ব ইউরোপ ঃ বিপর্যয়-উত্তর দশকে সাবেক পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে

আবাব কমিউনিস্টদেব সবকাবে ফেবা পশ্চিমী শক্তিগুলিকে যথেষ্ট চিন্তায ফেলেছে। সাম্প্রতিককালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হযে গেলো তাতে সাবেক কমিউনিস্টবা জযী হযেছেন পোল্যান্ড, হাঙ্গেবি এবং বোমানিযায। ইতোমধ্যেই সাবেক যুগোস্লাভিযাব একাধিক অঙ্গবাজ্য ছাডাও কমিউনিস্টদেব প্রত্যাবর্তন ঘটেছে বুলগেবিযায। এখানেও, কমিউনিস্ট-গোষ্ঠীগুলিব সহযোগী শক্তি হিসাবে দেখা দিযেছে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি। এবং বিপর্যযপূর্ব ধ্যান-ধাবণাব একটা অংশকে বিসর্জন দিতে দেখছি আমবা প্রায প্রতিটি কমিউনিস্ট প্রত্যাবর্তনেব ক্ষেত্রে। এবং প্রায প্রতি ক্ষেত্রেই কমিউনিস্টদেব গণভিত্তিকে সংহত কবতে সাহায্য কবেছে পূর্বতন 'গণতান্ত্রিক' 'বাজাবপন্থী' সবকাবে অর্থনৈতিক দৌবাত্ম যা দেশগুলিকে সর্বনাশেব দোব গোডায ঠেলে দিযেছিলো। পোল্যান্ড এক্ষেত্রে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেছে।

পোল্যান্ড ঃ লেখ ভালেসাব নেতৃত্বে 'দলবিহীন' শ্রমিক সংগঠন 'সলিডাবিটি' যখন 'বাজনীতিবিহীন' 'গণতান্ত্রিক' সবকাব প্রতিষ্ঠা কবেছিলো তখনই অনেক বোদ্ধা আন্দাজ কবতে শুবু কবেছিলেন যে পূর্ব ইউবোপে সমাজতন্ত্রেব পতন আসন্ন। সেটা ১৯৮৯ সালেব কথা। তাবপব অনেক জল গডিযেছে নীপাব নদী দিযে। ১৯৯৩ সালেব সেপ্টেম্বব মাসেব নির্বাচনে আলেকজান্ডাব কোযাসনিউস্কিব নেতৃত্বে সাবেক কমিউনিস্টবা পোলিশ পেজেন্ট পার্টি ও ইউনিযন অব লেববেব সহাযতায বিপুল ভোটে জযী হলো। পূর্বতন সবকাবেব আমলে ধর্মীয মৌলবাদ মাথা চাডা দিযেছিলো, শুবু হযেছিল উগ্রজাতীযতাবাদী গোষ্ঠীগুলিব বলদর্পী আচবণ, নযা ফ্যাসিবাদীবা পথে নামতে আবম্ভ কবে দিযেছিলো ঘৃণিত বর্ণশ্রেষ্ঠতাব স্লোগানকে হাতিয়াব কবে। কিন্তু সবচেযে বড কথা, বাজাব অর্থনীতিব শক-থেবাপিব' দাপটে দেশেব হাল সঙ্গীন হযে পডেছিলো।

লক্ষ্য কবাব মতো বিষয হলো যে, ভালেসাব দখলদাবীব আগে কর্মহীনতা ছিলনা পোল্যান্ডে। আব নতুন সবকাব ক্ষমতায আসাব কয়েক মাসেব মধ্যেই কর্মহীনতাব হাব দৃশ্যত কমতে শুবু কবেছে। সবকাবেব এসে কোযাসনিউস্কি যে বাজেট পেশ কবেছেন তা অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতি বিবোধী এবং এক্ষেত্রে মোট জাতীয উৎপাদনেব ৪% ঘাটতি দেখানো হযেছে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে। ইতোমধ্যেই মজুবীব হাব ও অবসবকালীন ভাতাব হাব বাডানো হযেছে। বাষ্ট্রাযত্ত ক্ষেত্রকে জোবদাব কবা হযেছে এবং বিবাষ্ট্রীকবণেব প্রক্রিযা গতিকে কবা হযেছে শ্লথ। তবে, এক্ষেত্রেও পুবোনো 'কম্যান্ড ইকোনমি'তে ফিবে যাওযাব কোনো কথা বলা হচ্ছে না। মতাদর্শগত ভাবে সোচ্চাব না বলা হলেও, বাষ্ট্রীয ক্ষেত্রেব পাশাপাশি যৌথ ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্র ও ব্যক্তিমালিকানাব অধিকাব স্বীকৃত বযেছে। পোল্যান্ডেব সংসদ 'সেজম্'-এ দেওযা সাম্প্রতিক বক্তৃতায কোয়াসনিউস্কি "গোঁডাপন্থা" পবিত্যাগেব কথা বলেছেন। তবে কোনো অর্থেই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য পবিহাব কবাব কোনো ইঙ্গিত তিনি দেননি— পশ্চিমী পত্র-পত্রিকাব অমৃতভাষণ এক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকবী ভূমিকা নিতে পাবেনি জনমতকে বিভ্রান্ত কবাব ক্ষেত্রে।

হাঙ্গেরী ঃ ১৯৯৪ সালেব মে মাসে হাঙ্গেবিব নির্বাচনে ৫৪% ভোট পেযে জযী হয়েছেন জিউলা হর্নেব নেতৃত্বাধীন সোস্যালিস্ট পার্টি। সাবেক কমিউনিস্ট পার্টিব বড অংশই এই দলেব সঙ্গে যুক্ত। প্রবল বেকাবীব স্রোত, আকাশছোঁযা বাজাবদব এবং সমাজিক অপবাধেব বোঝা, পূর্বতন 'গণতান্ত্রিক' সবকাবকে অসহনীয় কবে তুলেছিলো হাঙ্গেবীয়দেব কাছে। ২২% মুদ্রাস্ফীতি ও ৩২% কর্মহীনতাব পবিস্থিতি হাঙ্গেবিকে নিববিচ্ছিন্ন গতিতে ঠেলে

দিচ্ছিল এক সর্বব্যাপী আর্থ সামাজিক সঙ্কটের দিকে। হর্ন পরবর্তীতে যে বাজেট বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানে তিনি শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, কোনো ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে পুরোনো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও তাঁর দলের অনীহার কথা হর্ন বলেছেন। সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মসূচী অনুসারে জোরদার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পাশে থাকবে ব্যক্তিমালিকাধীন ক্ষেত্র। বিদেশী পুঁজিও আনতে দেওয়া হবে তবে তা হবে শর্তাধীন। ইতোমধ্যেই হাঙ্গেরি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছেন এবং তা শীঘ্রই অনুমোদিত হতে চলেছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। বিপর্যয়-উত্তর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে চলছে নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বাস্তব পরিস্থিতি মেনে চেষ্টা চলেছে নতুন আঙ্গিকে অর্থনৈতিক নির্মাণ কার্য। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পিছু হটলেও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কি আদৌ এগোচ্ছে—জবাব ইতিহাসের পাতায় অমোঘ নিয়মে ফুটে উঠবে। আমরা অপেক্ষায় রাজি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগের শেষ দিকে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম জোরদাব হয়ে ওঠে। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট রেগানের আমলে ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে ধরনের বিরাট বিরাট বিক্ষোভে-সমাবেশ সংঘটিত হয়েছে তা পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। এই সমস্ত যুদ্ধ বিরোধ বিক্ষোভের একটি বৈশিষ্ট্য তা হলো ঃ এই সমস্ত বিক্ষোভ সমাবেশে সর্বস্তরের মানুষের যোগদান।

ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সাম্প্রতিক কালে বৃহত্তর যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ ঘটে। এই সমাবেশ পাঁচ লক্ষাধিক নরনারী যোগদান করেন। এতবড় সমাবেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আর কখনোও সংঘটিত হয়নি। রাষ্টসংঘের সদর দপ্তরের সামনে থেকে এই যুদ্ধবিরোধী মিছিল বের হয়। মিছিলের মূল শ্লোগান ছিল ঃ অবিলম্বে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করতে হবে। মিছিল গিয়ে সেন্ট্রাল পার্কে সমবেত হয়। মিছিল ও সমাবেশে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট চিত্রতারকা, সিনেটের সদস্য, প্রাদেশিক গভর্নর চিকিৎসক, আইনজীবী এবং অন্যান্য স্তরের বুদ্ধিজীবীরা। সমাবেশে গৃহীত এক প্রস্তাবে মার্কিন প্রশাসনের যুদ্ধ প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয় এবং মার্কিন জনগণকে যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ্য, এই দিনই রাষ্ট্রসংঘে নিরস্ত্রীকরণের উপর আলোচনার জন্য বিশেষ অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন উপলক্ষেই যুদ্ধবিরোধী একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মার্কিন প্রশাসন এতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেই আদেশ বলে ফরমান জারি করা হয়, শান্তি মিছিলে যোগদানকারী কোন বিদেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। এর ফলে জাপান থেকে আগত ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেননি। গ্রীসের অলিম্পিয়া শহর থেকে যে বিশাল শান্তি মশাল মিছিল সমগ্র ইউরোপ পরিক্রমা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার কথা ছিল তাঁদেরও বাইরে আটকে দেওয়া হয়। চারিদিকে প্রহরা বসানো এবং বিদেশীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে না দেওয়া সত্ত্বেও পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাবেশ কম ব্যাপার নয়। পর্যবেক্ষকদের ধারণা নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করে কমপক্ষে এক লক্ষ নরনারীকে সমাবেশে যোগদান করা থেকে বিরত করা হয়েছিল। এই মিছিলের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ নিউইয়র্কের নৃত্যশিল্পীরা "বেঁচে থাকার আমন্ত্রণ"

শিরোনামায় পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিলে যোগদান করেন। এই প্ল্যাকার্ড সকলের মন জয় করে।

কেবল মিছিল নয়। সে সময়ে আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যুদ্ধ সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ অভিযান চলেছিল। ৩০শে মে নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান তথ্যে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮৭ জন মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তারা পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার পক্ষে।

এরপর ক্যালিফোর্নিয়ায় পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের সামনে পাঁচ হাজারের বেশি নরনাবী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের দাবি ছিল ঃ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। রেগান প্রশাসন এই মিছিল ও বিক্ষোভ যাতে না হতে পারে সেজন্য প্রথম থেকেই প্রচণ্ড দমন-পীড়নের পথ গ্রহণ করে। পারমাণবিক কেন্দ্রের সামনে সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমাবেশ করায় ১৬০০ বিক্ষোভকারী গ্রেপ্তার হন।

পশ্চিম জার্মানির বন এবং মিউনিখে এক লক্ষ সত্তর হাজার নরনারীর শান্তি মিছিল বের হয়। এই মিছিলও ছিল পশ্চিম জার্মানির ইতিহাসে বৃহত্তম মিছিল। এই মিছিলের ডাক দিয়েছিল পশ্চিম জার্মানির বিরোধী দলগুলি, খ্রীশ্চান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন এবং খ্রীশ্চান সোস্যাল ইউনিয়ন। এই মিছিল সংঘটিত হয় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগানের পশ্চিম জার্মানি সফরের প্রাক্‌কালে—যখন রেগান বনে অনুষ্ঠিত ন্যাটো সামরিক জোটভুক্ত দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে রেগান পুনরায় ইউরোপ ভূখণ্ডে যুদ্ধের হুমকি দেন এবং ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলিকে যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

মিছিলকারীদের হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল ঃ রেগান ফিরে যাও, যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই; মার্কিন জনগণের সাথে বন্ধুত্ব চাই কিন্তু অবিলম্বে নিরস্ত্রীকরণ চাই।

বনে সংঘটিত হয় এক লক্ষ মানুষের সমাবেশ। এই সমাবেশে খ্রীশ্চান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেলমুট কোল ঘোষণা করেন ঃ পশ্চিম জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায়। পশ্চিম জার্মানি পশ্চিমী জোটের অন্তর্ভুক্ত। এ সবই সত্য। তথাপি রেগানকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, তিনি দাঁতাতের অমর্যাদা ঘটাবেন না এবং নিরস্ত্রীকরণের দাবি মেনে নেবেন। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানি ক্ষত-বিক্ষত। পশ্চিম জার্মানির জনগণ আর জীবন বিসর্জন দিতে রাজী নন। এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে ন্যাটোর বহু সৈন্যও যোগদান করেন।

একই দিনে মিউনিখে সত্তর হাজার নরনারীর মিছিল বের হয়। এই মিছিল ছিল খুবই বৈচিত্র্যময়। মিছিলে পশ্চিম জার্মানির অনেক চিত্রতারকা যোগদান করেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খ্রীশ্চান সোস্যাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফাঞ্জ জোশেফ। তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিরোধিতা করি। আমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরোধী। আমাদের রণধ্বনি হলো ঃ অস্ত্র চাই না শান্তি চাই, অস্ত্র চাই না কাজ চাই।

একই দিনে পশ্চিম জার্মানির দুই বড় শহরে বিশাল বিশাল মিছিল সমগ্র ইউরোপের গণতান্ত্রিক জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইতালির রোমে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে বিশাল মিছিল বের হয়। এই মিছিলে দুই লক্ষাধিক নরনারী যোগদান করেন। খুব সকালেই দশটি স্পেশাল ট্রেন এবং

চারশ' বাস এসে রোম শহরে ভেড়ে। এই সমস্ত স্পেশাল ট্রেন এবং বাস আসে একদিকে যেমন উত্তরের ভেনিস থেকে তেমনি আসে দক্ষিণের সিসিলি থেকে। এই মিছিলে সর্বস্তরের মানুষ যোগদান করেন।

শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত রিপাবলিক স্কোয়ার থেকে মিছিল বের হয়। এরপর মিছিল মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং পরে পিপ্‌লস স্কোয়ারে জমায়েত হয়। মিছিলে কেবল যে ছাত্র-যুব, মহিলা-শিশু এবং বৃদ্ধরাই যোগদান করেন তাই নয়—এই মিছিলের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শারীরিক দিক থেকে অক্ষম অনেকেই মিছিলে যোগদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এঁদের অনেকের হাত-পা কাটা যায়। বহু বিদেশীও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

মিছিল যখন মার্কিন দূতাবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে ঃ যুদ্ধ ও দারিদ্র্যের নায়ক রেগান প্রশাসন ধ্বংস হোক।

এ দিনের মিছিল ও সমাবেশের ডাক দিয়েছিল ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি, ইতালিয়ান ইউনিয়ন অব কমিউনিস্ট ইয়্যুথ এবং অন্যান্য গণসংগঠন।

মার্কিন নির্বাচন ঃ রাজায় রাজায় লড়াই

মার্কিন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয় একটি নির্বাচকমণ্ডলী। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচিত করবেন রাষ্ট্রপতিকে। ১৯৮৮ সালের ৮ই নভেম্বর প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে। সংবিধান প্রণেতাদের মনে যাই থাক, বাস্তবে নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের পর্যায়টাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে যাবে রাষ্ট্রপতি কে হবেন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা। তার জন্য আরও একমাস অপেক্ষা করতে হবে। নতুন রাষ্ট্রপতি কার্যভার নেন ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে।

কমিউনিস্টদের এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এর আট বছর আগে রোনাল্ড রেগান রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। ধনতন্ত্রী দুনিয়ার এবং বিশেষ করে মার্কিন অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান সঙ্কট সামাল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রেগান। কিন্তু আট বছরে মার্কিন সঙ্কট আরও ঘনীভূতই হয়েছে। ধনতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে মার্কিন অর্থনীতির মাতব্বরির ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে সমানে পাল্লা দেয় পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপান। বাণিজ্যিক ঘাটতি সামাল দিতে মার্কিন প্রশাসনকে বার বার ডলারের দাম কমাতে হয়েছে। মার্কিন বাজারে অন্যান্য ধনতন্ত্রী দেশের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মার খেয়ে মার্কিন প্রশাসন নানারকম সংরক্ষণ নীতির পথে যাচ্ছে। অর্থনীতির মারপ্যাঁচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বের সব থেকে বেশি ঋণী দেশ। নজিরবিহীন বাজেট ঘাটতি তাকে এই অবস্থায় নিয়ে গেছে। ঘাটতি মেটাবার তাগিদে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচী ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। মহাকাশ যুদ্ধের কর্মসূচীর মত অবাস্তব উন্মাদ পরিকল্পনা মার্কিন সম্বলকে গ্রাস করেছে।

রেগানপন্থীদের দাবি ছিল, মার্কিন অর্থনীতি তার সংকট কাটিয়ে উর্ধ্বমুখি হয়েছে।

বিগত ছ'বছর যাবৎ অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা অব্যাহত ছিল। আশির দশকের গোড়ার তুলনায় মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধির হার কমে এক-তৃতীয়াংশ ছিল। গত চব্বিশ বছবেব মধ্যে বেকারীর হার নাকি এত কম কখনও ছিল না বলে দাবী।

কিন্তু মার্কিন অর্থনীতিবিদরাই বলেছেন, রেগান শাসনে ধনী আরও ধনী হয়েছে, মধ্যবিত্ত আর গরিব আরও গবিব হয়েছে। মধ্যবিত্তদের সংসার চালাবার জন্য অতিরিক্ত রোজগার করতে হয়। একজন বিশেষজ্ঞ গ্যারি শিলিং-এর মতে ২০ হাজার থেকে ৬০ হাজাব ডলার বার্ষিক আয় ছিল এমন পরিবারের সংখ্যা ১৯৭৩ সালে ছিল মোট পরিবারের ৫৩ শতাংশ। এখন সেই সংখ্যা ক্রমে দাঁড়ায় ৪৯ শতাংশে। ১৯৮৮ সালের হিসেব অনুযায়ী এই সব পরিবারের আয় (মুদ্রাস্ফীতি ধরে) গত ১৫ বছবে একদম বাড়েনি। গৃহনির্মাণ ছিল মধ্যবিত্তের কল্পনার বাইরে। শিক্ষার ব্যয় এত বাড়ে যে পরিবারের মোট আয়ের ৪০ শতাংশই এই খাতে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। ধনীদের ওপর চাপানো কর কমে যায় অন্তত ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে গরিবদের ওপর করের বোঝা আগের তুলনায় তাদের আয়ের অতিরিক্ত আরও অন্তত ২০ শতাংশ গ্রাস করেছে।

এই তো গেল মধ্যবিত্তের হাল। গরিবদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্রতম ১০ শতাংশ মানুষের আয় কম করেও ১০ শতাংশ হ্রাস পায়। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১৯৭৩ সালে ছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষের মত। ১৯৮৩ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষের মত। রেগান শাসনের আট বছরে এই সংখ্যার বিন্দুমাত্রও হ্রাস ঘটেনি।

অথচ, মার্কিন বিশেষজ্ঞরাই বলেছেন, রেগান শাসনে দেশের মোট পরিবারের অতিধনী এক শতাংশ পরিবারের আয় বেড়েছে প্রায় ৭৪ শতাংশ।

রেগান শাসন মার্কিন ইতিহাসে কেলেঙ্কারির রেকর্ড স্থাপন করেছে। রেগান প্রশাসনের আট বছরে দুর্নীতি এবং নিয়ম-বহির্ভূত ও বে-আইনী কার্যকলাপের দায়ে আদালত কর্তৃক নিন্দিত হয়েছেন শতাধিক উচ্চপদস্থ আমলা। প্রাক্তন শ্রমসচিব রেমন্ড ডোনোভান জুয়াচুরির দায়ে অভিযুক্ত হন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রিচার্ড অ্যালেন অভিযুক্ত হন ঘুষ নেবার অপরাধে। ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারির দায়ে সরে যেতে হয়েছে জন পয়েনডেক্সটার, অলিভার নর্থ, রিচার্ড সেকর্ড প্রভৃতি আমলাদের। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ষড়যন্ত্র, সরকারী সম্পত্তি চুরি, ন্যায় বিচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, মিথ্যা বিবৃতি দান, দলিলপত্র জাল করা, সরিয়ে ফেলা, নষ্ট করে ফেলা এবং আরও কত কি। প্রেসিডেন্ট পদের চেয়ারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করলেও মার্কিন এবং বিশ্ববাসীর আদালতে ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারির মহানায়ক রেগান নিন্দিত, ধিকৃত হন। পানামার শক্ত মানুষ নোরিয়েগাকে সরাবার চেষ্টায় রেগান প্রশাসন সেখানে তাঁবেদারদের দিয়ে অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা করে গোটা বিশ্বে উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়েছে।

১৯৮১ সালে রেগান রাষ্ট্রপতি হবার পর বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যক্ষ মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের ঘটনা বেশ কয়েকটি ঘটেছে। ১৯৮৩ সালে মার্কিন ফৌজ গ্রেনাদা দখল করে। তার আগে ১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনার সঙ্গে ব্রিটেনের ফকল্যান্ড (মালভিনাস) যুদ্ধে রেগান ব্রিটেনকে পুরো মদত দেন। ১৯৮৬ সালে রেগানের আদেশে মার্কিন যুদ্ধবিমান

লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি গদ্দাফিকে হত্যার জন্য নজিরবিহীন বোমাবর্ষণের আক্রমণ চালায়। ১৯৮৭ মার্কিন রণতরী ইরাক-ইরান যুদ্ধের অজুহাতে পারস্য উপসাগরে ঘাঁটি গাড়ে। নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অবরোধ এবং পরোক্ষে সামরিক হামলা লাগাতার চালিয়ে যাওয়া হয়। মার্কিন আর্থিক ও সামরিক মদত ছাড়া কন্ট্রা প্রতিবিপ্লবীরা একদিনও টিকে থাকতে পারত না। দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন বর্ণবিদ্বেষী সরকারের প্রধান সহায় মার্কিন প্রশাসন। অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, জাম্বিয়া, জিম্বাবোয়ে প্রভৃতি দেশে হামলা ও অন্তর্ঘাতের আসল নায়কও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। পাকিস্তানকে আশ্রয় করে আফগানিস্তান, ভারত সহ এতদঞ্চলে উত্তেজনা বজায় রাখার যাবতীয় কুকীর্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের।

অস্ত্র প্রতিযোগিতা জীইয়ে রাখা ধনতন্ত্রের বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত। নিজেদের শোষণ ও শাসন টিকিয়ে রাখা এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার স্বার্থে নিজেদের দেশে এবং অন্যত্র সামরিক উত্তেজনা বজায় রাখা প্রয়োজন। এছাড়া আর্থিক ও সামরিক সাহায্য ইত্যাদির এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপও ধনতন্ত্রের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই নীতিগুলিকে পরিত্যাগ করতে পারে না। তাছাড়া সামরিক অস্ত্রনির্মাণ শিল্প একটি বিরাট লাভজনক শিল্প। মার্কিন সময় শিল্প মালিকদের সঙ্গে অসামরিক প্রশাসনের গাঁটছড়াও তাই অবিচ্ছেদ্য।

এই পটভূমিতে দেখতে হবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল রিপাবলিকান পার্টি এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। দলগতভাবে এই দুটি দলের মৌলিক কোন মতাদর্শগত বা কৌশলগত পার্থক্য নেই। বহুদিন আগেই 'মডার্ন ডেমোক্র্যাসি' গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত ব্রিটিশ মনীষী লর্ড ব্রাইস বলে গেছেন আমেরিকায় রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাট একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। আসলে আমেরিকায় দল একটিই—ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকান্‌স অথবা রিপাবলিকান ডেমোক্র্যাট্‌স। ক্ষমতায় যেই আসুক, বিশেষ কিছু আসে যায় না কারণ উভয় দলেরই টিকি বাঁধা আছে মার্কিন পুঁজিবাদ ও শিল্প-সামরিক জোটের হাতে। ওঁদের হাত থেকে কারও মুক্তি নেই।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কে জিতবেন, ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। মার্কিন প্রচার মাধ্যমগুলি অবশ্য অনেক চেষ্টা চরিত্র করে এই লড়াইকে "উদারনীতিবাদ (ডুকাকিস)" বনাম "স্থিতাবস্থা (বুশ)" এই রূপ দিয়েছে। প্রকৃত সত্য হলো প্রথম দিকে মাইকেল ডুকাকিস কিছু কিছু উদারনৈতিক পদক্ষেপের কথা বললেও ধনতন্ত্রী প্রচার মাধ্যমের বিরূপ সমালোচনায় খানিকটা সরে গেছিলেন। অন্যদিকে জর্জ বুশ রেগানের প্রতিমূর্তি এই সমালোচনা এড়াতে কিছু উদার হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ও জাতীয় ব্যক্তিত্বের বিচারে দুই প্রার্থীই কমদরি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পশ্চিম ইউরোপের দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি

১৯৮৭ সালের ১১ই জুন থেকে তিনদিন ধরে পশ্চিম জার্মানির বন শহরে ন্যাটো জোটভুক্ত ষোলটি দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপূর্বে ভার্সাই শহরে সাতটি ধনবাদী দেশের প্রতিনিধিরা এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে রাষ্ট্রপতি রেগান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কানাডা, ব্রিটেন ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীগণ, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির

রাষ্ট্রপতিদ্বয় ফ্রাসোঁয়া মিঁতেরা ও হেলমুট স্মিথ। প্রথম বৈঠকেব প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলঃ ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো। আর দ্বিতীয় বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক সংকট মোচনে পাবস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমিত করে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়ানোর ব্যবস্থা। কিন্তু এই দুটি বৈঠকেই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তা যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে, এই দুটি বৈঠকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। ভার্সাই বৈঠকে রেগান প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি প্রয়োজনীয় ঋণ এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা পশ্চিমী ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে পেতে থাকে তাহলে ঐ দেশের পক্ষে আরও দ্রুত বিধ্বংসী অস্ত্র মজুত করা সম্ভব হবে। তাতে পশ্চিম ইউরোপ সমেত দুনিয়ার বিপদ বাড়বে। এই বৈঠকে মিঁতেরা পশ্চিম ইউরোপেব দেশগুলির সমস্যা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে বাজার নিয়ে খেয়োখেয়ির ফলে পশ্চিমী দেশের অর্থনীতিতে বিকৃতি এসেছে। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটছে। মুদ্রার মূল্য স্থিতিশীল না হলে সংকট আরো বৃদ্ধি পাবে।

এখানে উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রতে বেশি ব্যয় বরাদ্দের ফলে বাজেটের ঘাটতি অনেক বেড়েছে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের পরিমাণ অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে তার চাপ পড়ছে। মিঁতেরা এবং স্মিথ উভয়েই এই ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের হার হ্রাস করার দাবি জানিয়েছিলেন।

বৈঠকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেংকো সুজুকি সতর্কতার সাথে ভাষণ দেন। বেশ কিছুদিন ধরেই জাপানের উৎকৃষ্টমানের পণ্যাদি ইউরোপের বাজারে ঢুকতে পারছিলনা। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করার ফলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এতে জাপানের কিছু যায় আসে না একথাই প্রধানমন্ত্রী আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, পশ্চিম ইউরোপের চাইতে জাপান চীনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতেই বেশি আগ্রহী। বৈঠক শেষে একটি ইস্তেহারও প্রকাশ করা হয়। ইস্তেহারে প্রকাশিত বক্তব্য নিজেদের মধ্যেকার রেষারেষির চিত্রটা আরো প্রকট করে তোলে। সোভিয়েতের সঙ্গে লেনদেন হ্রাস সংক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সুপারিশ কোন দেশই মেনে নিতে পারেনি। সোভিয়েতকে ঋণ দেবার প্রশ্নেও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

যৌথ ইস্তেহারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সম্পর্কে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মনোভাব। এই আন্তর্জাতিক অথভাণ্ডারের পুরো কর্তৃত্ব রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। পশ্চিম ইওরোপের অধিকাংশ দেশই দাবি জানায়, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ক্ষেত্রে যৌথ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে। বৈঠকের সভাপতি খুবই খেদের সাথে মন্তব্য করেন ঃ বন্ধু রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমানে যেভাবে অর্থনৈতিক যুদ্ধ চলছে তার ফলে অবস্থা দুঃসহ হয়ে উঠছে। পশ্চিমী গণতন্ত্রের সামনে যে বিপদ তা তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। আমরা মনে করি, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করে, শ্রমজীবী জনগণের চাকুরির সংস্থান করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারলে তবেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা জোরদার করা যাবে, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখা যাবে।

বন এবং ভার্সাই বৈঠকের পূর্বে পশ্চিম জার্মানির রাষ্ট্রপতি হেলমুট স্মিথ সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের কাছে যে বক্তব্য রাখেন তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পশ্চিম জার্মানির মতবিরোধের চিত্রটি খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন : পশ্চিম ইওরোপ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী কিছু অংশের কিছু উপলব্ধিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি প্রসঙ্গত মার্কিন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংস্থার ডিরেক্টর ইউজিন রস্টোর এক বিবৃতির কথা উল্লেখ করেন। রস্টো ঐ বিবৃতিতে বলেন : যুদ্ধোত্তরকালে বাস করছি, এই বিভ্রান্তিতে পশ্চিমীরা যেন না ভোগে। তাদের মনে রাখা উচিত, তারা এক প্রাক্-যুদ্ধের কালে এসে হাজির।

স্মিথ বলেন : এ এক অসম্ভব কথা। এ ধরনের কথা কোন দায়িত্বশীল মার্কিন নাগরিক বলতে পারেন তা ভাবা যায় না।

ক্লিন্টনের মধ্যপ্রাচ্য নীতি :

জর্জ বুশের পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন কি মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে নতুন কোন ভাবনা-চিন্তা করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মধ্যপ্রাচ্য নীতির কি কোন পরিবর্তন ঘটতে চলেছে? ঘটনাবলী অন্ততঃ সেই ইঙ্গিতই দেয়। ক্লিন্টন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরপরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন সেটি হলো মধ্যপ্রাচ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র সচিব ওয়ারেন ক্রিস্টোফার মধ্যপ্রাচ্যে যান। পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে ক্রিস্টোফারের এটাই ছিল প্রথম বিদেশ সফর। তিনি মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা এবং সেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিভিন্ন পন্থা নিয়ে আরব দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেন।

মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হলো আরব-ইজরায়েল বিরোধ—যে বিরোধ প্রায়শঃই সংঘাত ও সংঘর্ষের রূপ নেয়। আরব-ইজরায়েল বিরোধের নিষ্পত্তি কল্পে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু সেই শান্তি আলোচনা বেশি দূর এগুতে পারে না। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইজরায়েল সরকার চার শতাধিক প্যালেস্তাইনীকে বিতাড়ণ করে। এই ঘটনার পর শান্তি আলোচনার অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ওয়ারেন ক্রিস্টোফারের মধ্যপ্রাচ্য সফরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আবার নতুন করে আলোচনা শুরু করা।

ক্রিস্টোফারের মধ্যপ্রাচ্য সফরের পর এটা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। এই প্রথম আমেরিকার একজন পররাষ্ট্র সচিব বলেন যে, প্যালেস্তাইনীদের নিজ এলাকা থেকে বিতাড়ন করে ইজরায়েল আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলে দেন যে, প্যালেস্তাইনীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি রাষ্ট্র সঙ্ঘের ৭৯৯ নম্বর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে আমেরিকা মনে করে। দ্বিতীয়তঃ ক্রিস্টোফারের বক্তব্য থেকে এটাও পরিষ্কার যে, ক্লিন্টন প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধানের জন্য দ্রুততার সঙ্গেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। মার্কিন

পবরাষ্ট্র সচিব একথাও ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনায় আমেবিকা প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে চায়। তিনি বলেন ঃ 'মধ্য প্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য আমেরিকাকে যদি কিছু সক্রিয় পদক্ষেপ ও পূর্বের তুলনায় আরো বেশি কিছু করতে হয় আমেরিকা তার জন্যও প্রস্তুত।

আরব-ইজবায়েল বিরোধেব নিষ্পত্তি কল্পে ওয়ারেন ক্রিস্টোফার মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের যে প্রস্তাব দেন মিশর, সিরিয়া এবং জর্ডন সেই প্রস্তাবের প্রতি কেবল যে সমর্থন জানায় তাই নয়, প্রস্তাবকে পরিপূর্ণভাবে স্বাগত জানায়। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আসাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, মধ্য-প্রাচ্যের শান্তি আলোচনায় যাতে রাষ্ট্র সঙ্ঘের ২৪২ এবং ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী অগ্রগতি ঘটতে পারে আমেরিকা যেন সে বিষয়ে উদ্যোগে নেয়। আরব দেশগুলি প্রথম থেকেই এই মনোভাব পোষণ করে আসছে যে ইজরায়েল যাতে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে সেজন্য আমেরিকা যেন প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে।

ক্রিস্টোফারের মধ্যপ্রাচ্য সফরে কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও এতে খুব একটা আশান্বিত হবার কিছু ছিলনা। যে চারশ জন প্যালেস্তাইনীকে ইজরাযেল সরকার বিতাড়ণ করেছে তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে ইজরায়েলকে কোন অতিরিক্ত চাপ দিতে আমেরিকা অস্বীকার করেছে। আমেরিকার অভিমত হলো, যেহেতু ইজরায়েল বিতাড়িত চারশ' প্যালেস্তাইনীদের মধ্যে ১০১ জনকে অবিলম্বে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাই এই সমস্যাকে বকেয়া সমস্যা হিসেবেই দেখা উচিত। কিন্তু ক্রিস্টোফারের বক্তব্যের সাথে জর্ডনের রাজা হুসেন একমত হতে পারেননি। তিনি স্পষ্টতঃই মনে করেন যে বর্তমান মুহূর্তে বিতাড়িত প্যালেস্তাইনীদের পুনর্বাসনের সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। সেজন্য এই সমস্যাটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হওয়া দরকার। তাঁর এটাও দৃঢ় অভিমত যে, প্যালেস্তাইনী সমস্যার সুষ্ঠু নিষ্পত্তি ব্যতিরেকে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আলোচনার প্রশ্নে আমেরিকার দ্বিধাদ্বন্দ্বের একটা প্রধান কাবণ হল আমেরিকা এমন কিছু করতে চায় না যাতে ইজরায়েল নিরাপত্তার দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। ক্রিস্টোফার নিজেও একথা লুকিয়ে রাখেননি। তিনি বলেছেন ঃ 'ইজরায়েলের পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যতিরেকে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি একেবারেই অসম্ভব।' তবে অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো এটাই যে ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিমন পিয়ার্স নিজেও বলেছেন, 'বিতাড়ণ করা ইজরায়েলের নীতি নয়। প্যালেস্তাইনীদের বিতাড়ণ করার যে ঘটনা ঘটেছে তা নির্ধারিত নীতি বহির্ভূত কাজ।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ক্লিন্টন প্রশাসনের উদ্বেগের আরো একটি কারণ ছিল। ক্লিন্টন নির্বাচনী প্রচারের সময় দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন। আর আমেরিকার বর্তমান অভ্যন্তরীণ সমস্যার সব থেকে প্রকট দিকটি হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা করতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের বাজার। কিন্তু গত কয়েক বছরে অশান্ত মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বাণিজ্য প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই হৃত সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্য ক্লিন্টন প্রশাসনের এত উদ্বেগ।

ব্রাউন সংশোধনী

১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন কংগ্রেস ব্রাউন সংশোধনী গ্রহণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে তিনশ সত্তর কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রায় ছ'মাস ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিতর্ক চলে। পাকিস্তানকে মার্কিনী অস্ত্র সরবরাহের অর্থ যে ভারত উপমহাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হওয়া, এক অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি হওয়া এবং সর্বোপরি যুদ্ধের বিপদ সৃষ্টি হওয়া একথা সর্বজনবিদিত। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই বিপদকে অস্বীকার করে নি। আর এজন্যই প্রেসলার সংশোধনীর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। ব্রাউন সংশোধনী সেই নিষেধাজ্ঞা কেবল যে প্রত্যাহার করে নেয় তাই নয়, যখন কাশ্মীর প্রশ্নকে ঘিরে এক মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তখনই পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমেরিকা সেই জটিলতা আরও তীব্র করে তোলে। পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রি করার মার্কিনী সিদ্ধান্তের রহস্য বুঝতে কারো কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উপমহাদেশে তার সামরিক ঘাঁটি শক্তিশালী করতে পাকিস্তানকেই প্রধান এবং মূল শক্তি হিসেবে বেছে নিয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তের সব থেকে মারাত্মক প্রভাব যে ভারতের উপরই পড়বে তাও সন্দেহাতীত। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপ ঘটার পর যাঁরা মনে করেছিলেন যে দক্ষিণ এশিয়াতে ভারত আমেরিকার কাছে প্রিয় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং আমেরিকা তার রাজনৈতিক-সামরিক প্রভাব ভারতকে ঘিরেই বিস্তার করবে ব্রাউন সংশোধনী তাঁদের হৃদয়ে একটা বড় ধরনের আঘাত হেনেছে। তাঁরা একথাও মনে করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপ ঘটার পর এবং বিশেষ করে আফগানিস্তানে নাজিব সরকারের পতন ঘটার পর একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তাঁরা এ যুক্তিও দেখিয়েছিলেন যে ভারত সরকার অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে উদারনীতি গ্রহণ করেছে সেই উদারনীতির ফলে যেহেতু আমেরিকা সব থেকে বেশি লাভবান হবে তাই অতি সঙ্গতকারণেই আমেরিকা ভারতকেই বড় বন্ধু হিসেবে বেছে নেবে।

কিন্তু বাস্তবে ভারত সরকারের এই উদারনীতির পরিণতিটা কি দাঁড়িয়েছে? ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে আমেরিকার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকার চাপে পড়ে নরসিমা রাও সরকার একের পর এক শর্ত মেনে নিয়েছেন, নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছেন। ভারতকে এই চাপের মধ্যে রেখেই আমেরিকা ভারতের স্বাধীন পারমাণবিক এবং প্রতিরক্ষা টেকনোলজি হ্রাস করার জন্য সব রকমের পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষার প্রশ্নে সর্বাধুনিক টেকনোলজি ভারত যাতে আমদানি করতে না পারে তার জন্য আমেরিকা মরীয়া প্রয়াস চালিয়ে যায়। এমন কী ভারতের অভ্যন্তরীণ টেকনোলজি যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজে না লাগানো হয় সে জন্য এই টেকনোলজিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সব থেকে মারাত্মক ব্যাপার হলো, ১৯৯১ সালে মার্কিন সমরবিদ কিকলাইটারের ভারত সফরের পরবর্তী কয়েকটি ঘটনাবলী। এই সফরের পরই ভারত-মার্কিন সামরিক সহযোগিতার প্রশ্নটি বড় আকারে দেখা দেয়। এরই পরিণতি স্বরূপ ১৯৯৫ সালে ভারত-মার্কিন সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ভারতের মার্কিনী লবি উৎসাহিত হয়েছিল, কিন্তু সেদিন যে সত্যটি আড়াল ছিল তা হলো যে আমেরিকা

পাকিস্তানের সঙ্গেও একই ধরনের ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সালের ঘটনাবলীর যদি সাধারণ পর্যালোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই সমরবিদ বা একই কূটনীতিবিদ একই সময়ে ইসলামাবাদ এবং নয়াদিল্লি পরিদর্শন করছেন। আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় একই বিষয়ে এবং একই ধরনের সমঝোতা করেন।

সবথেকে পরিতাপের বিষয় হলো, আমেরিকার ভারত বৈরীতা সম্পর্কে ভারত সরকারের কাছে কিছুই অজানা নয় তা সত্ত্বেও ভারত সরকার এই মার্কিনী বৈরীতা সম্পর্কে কোন টু শব্দটি করতে করে নি, পরন্তু ব্রাউন সংশোধনীর পর নরসিমা রাওয়ের আমেরিকা সফর এবং ব্রাউন সংশোধনী সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করা জনমনে বিরাট বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল। এটা ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতির দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই দুর্বলতার পুরো সুযোগ যে আমেরিকা গ্রহণ করেছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ থাকার কারণ নেই। আবার সেই সুযোগ ব্যবহারের প্রকৃষ্ট হাতিয়ার হলো পাকিস্তান। আমেরিকা পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়েই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই ব্রাউন সংশোধনী এবং পাকিস্তানকে আমেরিকার অস্ত্র সরবরাহেব বিষয়টি বিচার করা দরকার। এই ঘটনার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য কেবলমাত্র পাকিস্তানকে আমেরিকার অস্ত্র সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, থাকবেও না। ভারত সরকারের মার্কিনী তোষণ নীতির পরিবর্তন না ঘটলেও এ ধরনের বিপজ্জনক ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সরকার ব্রাউন সংশোধনীর পর ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি বহাল রাখতে পারে না। আজ ভারতের উপর আমেরিকার চাপ যে হাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে প্রকৃত অর্থেই ভারতের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। আর এজন্যই জরুরী যা প্রয়োজন তা হলো ভারত সরকারের উচিত চীন, ইরান, রাশিয়ার মত দেশগুলির সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করা। ব্রাউন সংশোধনী আমাদের সামনে এই জরুরী কর্তব্যই হাজির করেছে।

লাতিন আমেরিকা

ক্লিন্টন-প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বাড়ির পেছনেব উঠোন' বলে পরিচিত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। হাইতিতে বলপূর্বক আরিস্তিদ ব্রিঁয়াকে ক্ষমতাসীন করলেও মার্কিনীরা কোনো সহানুভূতি আদায় করতে পারেনি দ্বীপবাসীর কাছে। বরং হাইতির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ উঠেছে হাইতি ছাড়াও পাশের ক্যারিবীয় দেশগুলি থেকে। যে সাত হাজার মার্কিনী সেনা এখনও হাইতিতে রয়েছে, তাদের সেখান থেকে তুলে আনতে পারলে বাঁচেন ক্লিন্টন। কিন্তু রাশিয়া তাকে সে সুযোগ দিতে গররাজি। নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে যে, আরো কিছুদিন মার্কিন সেনারা হাইতির হাওয়া খাক — আর, ক্লিন্টনেব ভাবমূর্তিতে আরো কিছু কালি লাগুক! লাতিন আমেরিকার অন্যত্রও মানুষজন সুখে-শান্তিতে নেই। ভেনিজুয়েলার কথাই ধরুন। ওখানে অর্থনীতির বেহাল এতটাই যে, দুধের চাইতে পেট্রোল অনেক সস্তা! দুধের দাম

যেখানে লিটার-প্রতি ৪৫৯০ ক্রুজেইরো সেখানে পেট্রোল মিলবে লিটার পিছু মাত্র ১৯৬ ক্রুজেইরো'তে। এদিকে দেশের অর্থনীতির বিকাশ দূর থাকুক তা সঙ্কুচিত হচ্ছে বার্ষিক তিন শতাংশ হারে। বেতনের প্রকৃত হার গত বছরের তুলনায় এ'বছর আরো ৩০% কমবে, আর বেকারত্বের হার ১৫%। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৮.৭%-র সমতুল্য। রাষ্ট্রপতি রাফায়েল কালদেরা বলছেন ঃ এভাবে যতদিন চলে চলুক, তারপর না হয় আবার হাত পাতবো 'ফান্ড-ব্যাঙ্কের' কাছে! কলম্বিয়ার অবস্থা তথৈবচ। সেখানে আবার 'কালি' এবং 'মেদেইন্' ড্রাগ-চক্রই প্রশাসনের পিছনে আসল শক্তি। একমাত্র ভরসা কিছু বামপন্থী গেরিলাগোষ্ঠী, যাঁরা নিজেদের কায়দায় ড্রাগ এবং মাফিয়াচক্রের বিরুদ্ধে, 'বুলেটের-বদলা-বুলেট' রণনীতিতে লড়ে যাচ্ছেন। ব্রাজিলের নতুন রাষ্ট্রপতি ফের্নানদো হেনরিক্ কারদোসো তাঁর 'মধ্য-দক্ষিণ' জোট সরকারের মুখ ফিরিয়েছেন খোলাবাজার অর্থনীতির দিকে। কিন্তু ইতোমধ্যে দেশটার হাল কি দাঁড়িয়েছে! মুদ্রাস্ফীতির হার ১,৫০০% ছাড়িয়েছে এবং তা প্রতিমাসেই ১০% হারে বাড়ছে! বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ঠেকেছে দশ হাজার কোটি ডলারে! গোটা দেশজুড়ে সামাজিক অপরাধের তাণ্ডবনৃত্য চলেছে। ভাড়াটে গুণ্ডারা রাস্তায় রাস্তায় পিস্তল হাতে ঘুরে রাতের অন্ধকারে কাগজ-কুড়োনী বাচ্চাদের গুলি করে মারছে — কারণ "বড় হলে এরাই তো অপরাধ জগতে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে"! কারদোসো এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছেন আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে আর প্যারাগুয়ের সঙ্গে একজোটে আঞ্চলিক বাণিজ্য সমবায় গড়ে তুলতে। এই উদ্যোগ ব্রাজিলের ডুবন্ত অর্থনীতিকে কতটা ভাসবার শক্তি দেবে বলা খুবই কঠিন।

এই অবক্ষয়ী পটভূমিতে ছোট্ট কিউবার সাহসী সংগ্রাম এক প্রত্যয়ী ব্যতিক্রম। সর্বাত্মক অবরোধ, সঙ্কুচিত বৈদেশিক বাণিজ্য, লাগাতার ষড়যন্ত্রের সামনে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে লড়ে যাচ্ছে কাস্ত্রোর কিউবা, সমাজতান্ত্রিক কিউবা। কিউবা বিশ্ব সংহতি সম্মেলনে উপস্থিত শতাধিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিউবা একা নয়। পরপর তিন বছর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিনী অবরোধ তুলে নেওয়ার পক্ষে প্রস্তাব পাশ হয়েছে — হয়েছে বিপুল ভোটাধিক্যে। বিপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ভোট দিয়ে নির্লজ্জ প্রভু-তোষণের নজির রেখেছে ইজরায়েল। গতবছর এই পরিস্থিতিতে আরো চারটি দেশের সাথ পেয়েছিল মার্কিনীরা — একে একে নিভেছে দেউটি? অবশ্য যথারীতি প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদে এলে এবারেও 'ভেটো' প্রয়োগ করেছে ক্লিন্টন-প্রশাসন। এদিকে কাস্ত্রোর কিউবা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কোনো প্রয়াসই বাদ রাখেনি। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির কাছে 'আঞ্চলিক বাণিজ্য জোন্' গড়ে তোলার যে প্রস্তাব কিউবা রেখেছিল, তাতে অধিকাংশ লাতিনী দেশই ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ইতোমধ্যে, মন্ত্রিসভায় সামান্য রদবদল ঘটিয়ে কিউবার প্রশাসনকে আরো গতিশীল করার কথা কাস্ত্রো ঘোষণা করেছেন।

পেরু এবং ইকোয়াডরের মধ্যে প্রবল সীমান্ত-সংঘর্ষে ২০০-র বেশি সেনা নিহত হয়েছে। ১৯৪১ সালের 'রিও চুক্তি'র অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল হিসাবে এই দুই দেশের সীমান্ত এলাকার একটা অংশ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়নি এবং এই নিয়ে, চল্লিশের দশক থেকে, কমপক্ষে দশবার দুই দেশ এলাকা দখলের লড়াইয়ে নামলো। ইকোয়াডরের সরকার প্রকাশ্য বিবৃতি জারি করে বলেছেন ঃ পেরুর আগামী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি আলবেরতো ফুহিমোরি'র

পরাজয় নিশ্চিত জেনেই, নির্বাচকমণ্ডলীর দৃষ্টি অন্যত্র ঘোরানোর এই প্রচেষ্টা — যাতে করে 'দেশপ্রেম' ও 'স্বাধীনতার' স্লোগানে ভেসে, ফুহিমোরি রাষ্ট্রপতি পদে পুর্ননির্বাচিত হতে সক্ষম হন। ফুহিমোরির বাজার-অর্থনীতির প্রতি সম্মোহনী টানের কথা মনে রেখে, এই যুদ্ধের পিছনে মার্কিন তথা অন্যান্য বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকাকে অকিঞ্চিৎকর বলে দেখাটাও অনৈতিহাসিক হবে বোধহয়। বাজার অর্থনীতির আর এক লীলাক্ষেত্র নিকারাগুয়াতে সম্প্রতি 'কন্ট্রা' বনাম 'কন্ট্রা' সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। ভিওলেতা শামোরো সরকারের জনপ্রিয়তা যেমন কমছে (অন্ততঃ খোদ মার্কিনী 'ওপিনিয়ন পোল'-ই তাই বলছে!) তেমনি সানদিনিস্তা দলের প্রভাব গ্রাম ছাড়িয়ে শহরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক অসুস্থতা থেকে উঠে দিবারাত্র রাজনৈতিক প্রচারে গোটা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন দানিয়েল ওরতেগা। পাশের দেশ এল সালভাদোরে সম্প্রতি পূর্বতন 'জুন্তা'র ভাড়াটে গুণ্ডাদলের সঙ্গে ও'দেশের পুলিসের দফায় দফায় সংঘর্ষের খবর এসেছে! এদিকে 'ফ্রন্টফারাবুন্দো মার্তি লিবেসিয়ঁ নাসিওনাল' বা 'এফ এম এল এন' আগামী নির্বাচনের জন্য জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

লাতিন আমেরিকার বর্তমান পরিস্থিতি সার্বিকভাবে আশাব্যঞ্জক বলা যায় না। ব্রাজিলে সামাজিক অপরাধের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সরকারী দুর্নীতি। ক্যাথলিক চার্চের বিশপ পদের যৌথ উদ্যোগে চেষ্টা চলছে সামাজিক অস্থিরতার—প্রতিদিনকার যন্ত্রণা থেকে নাগরিকদের অন্তত কিছুটা মুক্তি দিতে। ফরাসী সংবাদপত্র 'লা নুভেল অবসারভেত্যুর'-এ প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে ঃ সংগঠিত মাদক-চক্রগুলি আগের চাইতেও বেশি সক্রিয়; বহুক্ষেত্রে বাঁচার তাগিদে শহরাঞ্চলের কিশোর-তরুণদের একটা বড় অংশ মাদক-চক্রের কার্যকলাপের সঙ্গে স্বেচ্ছায় নিজেদের যুক্ত করছে।

ভেনেজুয়েলাতে মূল সমস্যা গরিব মানুষজনের শহরমুখী স্রোত। গ্রামে কৃষি উৎপাদন কমতির দিকে; গ্রামীণ শিল্পও মৃতপ্রায়। অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন ভেনেজুয়েলার শহরগুলিতে ভিড় বাড়াচ্ছেন। একেবারে একই পরিস্থিতি গুয়াতেমালায়। দারিদ্র্য আর ক্ষুধার হাত থেকে ত্রাণ পেতে সেখানেও দেখা যাচ্ছে শহরে-শহরে বিপুল জনসমাগম বৃদ্ধি। শহরে অপরাধচক্রগুলিও নতুন-নতুন শিক্ষানবিস সংগ্রহ করছে হতশ্রী, নিরূপায় গ্রামীণ মানুষজনের মধ্য থেকে। নিকারাগুয়ার গ্রামাঞ্চলে জমিদার-জোতদারদের অত্যাচার বাড়ছে। বিশেষ করে, ভিওলেতা শামেরো সরকার শহরায়নের ওপর জোর দেওয়ায় গ্রামাঞ্চল শিকার হচ্ছে অবহেলার। প্রশাসন বলতে গ্রামে এখন বড় জমির মালিকদের অপশাসন। সানদিনিস্তা দলের নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলন ও খেতমজুর আন্দোলন ততটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি।

এরই মধ্যে মেক্সিকোতে 'চিয়াপাস' আন্দোলনকে ঘিরে কমিউনিস্ট ও বাম দল তথা গোষ্ঠীগুলি চেষ্টা চালাচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে জনমত একত্র করার। প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা 'সাব্-কমানডান্‌টে' মার্কোস সম্প্রতি 'এল মাশেতে' পত্রিকায় জানিয়েছেন যে, মার্কিনী-মদতপুষ্ট মেক্সিকো সরকারের আইন-কানুন মেক্সিকোর গ্রামাঞ্চলের একটা বড় অংশে শীঘ্রই আর কার্যকর করা যাবে না। দক্ষিণে ইকুয়াডর ও পেরু দেশদুটি সীমান্ত সংঘর্ষের পরবর্তীতে সামাজিক অস্থিরতায় ভুগছে। কলম্বিয়াতে 'ক্যালি' মাদকচক্র এখনও সক্রিয় এবং রাজনৈতিক বাহুবলের অধিকারী। সাধারণ মানুষ যে এইসব দেশে সুখে দিন কাটাচ্ছেন না, বলাই বাহুল্য।

আশার আলো কিউবা। হেম্‌স্ বার্টন্ আইন অগ্রাহ্য করে অন্তত তিরিশটি ইউরোপীয় ও কানাডীয় প্রতিষ্ঠান কিউবার সঙ্গে যৌথ ক্ষেত্রে বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুতিকরণ শুরু করে দিয়েছে। 'বি বি সি'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোবেরতো রোবাইনা জানিয়েছেন ঃ মার্কিনী হুমকিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আরও একাধিক সংস্থা কিউবাতে অর্থ বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে। এদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি চলতি 'ই-ইউ-' অধিবেশন থেকে হেম্‌স্ বার্টন্ আইনকে তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে একতরফা সিদ্ধান্ত করে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে'র মূল কথা, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যস্থাপন এই নীতির উল্লঙ্ঘন করতে পারে না। এবং ক্লিন্টন প্রশাসন যদি জোর করে তা করে, তা হলে 'ই-ইউ'-ভুক্ত দেশগুলি তা মানতে বাধ্য নয়।

লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী নীতি সমগ্র লাতিন আমেরিকাকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এবং মধ্য-আমেরিকার বুকে চলছে প্রচণ্ড উত্তেজনা।

যেদিন আমেরিকার দ্বারপ্রান্তে সমাজতান্ত্রিক কিউবা প্রতিষ্ঠিত হয় সেদিন থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা সমাজতান্ত্রিক কিউবাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক চক্রান্ত-জাল বিস্তার করেছে। এমনকি কিউবার বিরুদ্ধে রাসায়নিক যুদ্ধের অপচেষ্টাও তারা চালাচ্ছে। কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত বার বার ব্যর্থ হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মত্ত করে তুলেছে। তারা এখন লাতিন আমেরিকার বুকে সামরিক হস্তক্ষেপ কবার জন্য মরিয়া প্রয়াস শুরু করেছে। মেক্সিকো উপসাগরীয় এলাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ন্যাটো সহযোগীরা নৌ-মহড়া দেয়। এই নৌ-মহড়ায় অন্যান্য যে সমস্ত রাষ্ট্র ছিল সেগুলি হল ঃ কানাডা, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, গ্রেট ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি। এই নৌ-মহড়ার নাম রাখা হয় 'সেফ পাস-৮২'। এই নৌ-মহড়া সাম্প্রতিকালের বৃহত্তম নৌ-মহড়া। এতে ছিল ৩০টি যুদ্ধজাহাজ, ৮০টি বিমান এবং ১০ হাজার সৈন্য। এই নৌ-মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল নিকারাগুয়ার বামপন্থী সরকারকে সন্ত্রস্ত করে তোলা। এল সালভাদোরে সামরিক একনায়কতন্ত্রীদের ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেখানকার মুক্তিবাহিনী যে জীবন-মরণ সংগ্রাম করে চলে সেই সংগ্রাম বানচাল করা। যেদিন নিকারাগুয়ার স্বৈরতন্ত্রী সমোজা সরকার উৎখাত হয়েছে সেদিন থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিকারাগুয়াতে সানডিনিস্তা সরকারের প্রতি বৈরী মনোভাব গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ হলো, নিকারাগুয়া সরকার কিউবা এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ছিল। নিকারাগুয়ার তৎকালীন সরকার জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ জিনিস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ্য করতে পারেনি। নিকারাগুয়ায় বিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য মার্কিন প্রশাসন তখন আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কোস্টারিকায় ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। উদ্দেশ্য ছিল নিকারাগুয়ার সরাসরি আক্রমণ হানা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৯৩টি পদাতিক বাহিনী ২৪টি হেলিকপ্টার নিয়ে কোস্টারিকায় অবস্থান করছিল। ক্ষমতাচ্যুত সামোজা'র অনুগতদের

হন্ডুরাসে তালিম দেওয়া হয। সান্ডিনিস্তা বিরোধী আব একটি গ্রুপকে ফ্লোবিডার মিয়ামিতে ট্রেনিং দেওয়া হয়। হন্ডুরাসে মার্কিনী উপদেষ্টাব সংখ্যা বৃদ্ধি পায। হন্ডুরাস সীমানা দিযে নিকারাগুয়ায় প্রতিবিপ্লবীদের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পায়। ইজবায়েলী সামরিক উপদেষ্টাবা নিকারাগুয়ায় প্রতিবিপ্লবীদের হন্ডুরাসে ট্রেনিং দেয়। নিকারাগুয়া এবং এল সালভাদোরেব নিকটবর্তী ফোনেস্কা উপসাগরীয় এলাকায় আধুনিক অস্ত্র সজ্জায সজ্জিত হয়ে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করা হয়।

ওয়াশিংটন পোস্ট মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ফাঁস করে দেয়। ওয়াশিংটন পোস্টের এক খবরে জানা যায়, সি-আই-এ নিকারাগুযায় অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য পাঁচশ জনের একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করে। এ জন্য ব্যয় হয় ১৯০ কোটি ডলার। ঐ বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল নিকারাগুয়ার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করা। প্রতিবিপ্লবীরা একটি ব্রীজ উড়িয়ে দেয়। তারপর নিকারাগুয়া সরকার দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অজুহাত ছিল ঃ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কিউবা নিকারাগুয়ার মাধ্যমে এল সালভাদোরে গেরিলাদের জন্য অস্ত্র প্রেরণ কবেছে। এই অজুহাতের সপক্ষে মার্কিন প্রশাসন নিকারাগুয়ার ১৯ বছরের যুবক অরল্যান্ডো জোসে টারডেন সিলস এসপিনোসাকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির করে। বলা হয়, এই যুবক কিউবা এবং ইথিওপিয়ায় ট্রেনিং নিয়ে এল সালভাদোরে যুদ্ধে নেমেছে। ঐ যুবক সাংবাদিকদের বলেন : "আমাকে জোর করে এখানে ধরে আনা হয়েছে। আমি কখনও কিউবা বা ইথিওপিয়ায় যাই নি।" নিকারাগুয়া সরকার এই যুবককে পরে বীরের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

এল সালভাদোরে সামরিক খ্রীশ্চান ডেমোক্র্যাটিক জুন্টার ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামের দ্রুত বিস্তার ঘটে। এল সালভাদোরের সামরিক জুন্টা ৩০ হাজার দেশ-প্রেমিককে হত্যা করে। এই সামরিক জুন্টা চারজন ডাচ সাংবাদিককে হত্যা করেছে। মধ্য আমেরিকার দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ফ্যাসিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর এই সমস্ত দেশের দেশপ্রেমিক জনগণ সেখানে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান। জনগণই কিউবার বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটিয়ে সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনগণই নিকারাগুয়ায় সামোজা সরকারের পতন ঘটিয়েছেন।

বেলিজ

মধ্য আমেরিকার ক্ষুদ্র দেশ বেলিজ ২১শে সেপ্টেম্বব, ১৯৮১, স্বাধীনতা অর্জন করে। একান্নটি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ২১শে সেপ্টেম্বর গভীর রাতে বেলিজের গভর্নর জেনারেলের দপ্তর থেকে নেমে যায় ব্রিটিশ পতাকা—উত্তোলিত হলো স্বাধীন বেলিজের পতাকা। ব্রিটিশ রানীর প্রতিনিধি প্রিন্স মাইকেল বেলিজের নতুন প্রধানমন্ত্রী জর্জ প্রইসের কাছে দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। চার শ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন বেলিজের বুকে স্পেনীয় উপনিবেশের পত্তন করে। ১৮৬২ সালে বেলিজ ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়।

ক্যারিয়ান উপত্যকায় এবং মেক্সিকো ও গুয়েতামালা সীমান্তে বেলিজের অবস্থান।

এখানকার জনগণের প্রধান ভাষা ইংরেজী। অবশ্য অনেকেই স্পেনীয় ভাষায় কথা বলেন। এই নতুন রাষ্ট্রের বেলিজ নামকরণ হয় ১৯৭৩ সালে। এর পূর্বে নাম ছিল মেয়স।

বেলিজের ৬০ শতাংশ জনগণই কৃষি নির্ভরশীল। বন দেশের প্রধান সম্পদ। বেলিজ থেকে একমাত্র রপ্তানিজাত দ্রব্য হলো চিনি। আফ্রিকা থেকে যে সমস্ত ক্রীতদাসকে বিদেশে চালান দেওয়া হতো প্রধানতঃ তাদের নিয়ে বেলিজ গঠিত হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে বেলিজ রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ অর্জন করে। বেলিজ ছিল রাষ্ট্রসংঘের ১৫৬তম সদস্য এবং রাষ্ট্রসংঘেব সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম দেশ। বেলিজের লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫ হাজার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিজয় অভিযান অব্যাহত রয়েছে সেই বিজয় অভিযানের এক স্বাক্ষর বহন করে বেলিজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেলিজ ছিল ৮৯তম স্বাধীন রাষ্ট্র।

গ্রেনাদা

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট দ্বীপ গ্রেনাদা। এই দ্বীপের লোকসংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজার। ১৯৮৩ সালের ২৫শে অক্টোবর গ্রেনাদা আক্রান্ত হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। ২৫ শে অক্টোবরের পূর্বে ১৯ শে অক্টোবর গ্রেনাদার প্রধানমন্ত্রী মরিস বিশপ নিহত হন। অনুসন্ধানমূলক খবরে জানা গেছে এই হত্যাকাণ্ডের পিছনেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ছিল। সি আই এ-র গভীর চক্রান্তের পরিণতিতে মরিস বিশপকে নিহত হতে হয়।

গ্রেনাদায় মার্কিনী অভিযানের এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানকার সর্ববৃহৎ ধনী পরিবার একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে। এটিই ছিল দেশের একমাত্র বে-সরকারী সংবাদপত্র। সংবাদপত্রটি প্রকাশে মার্কিন সেনাবাহিনী সর্বতোভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়। এই সংবাদপত্রের প্রথম সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয় ঃ "প্রেসিডেন্ট রেগান যেভাবে গ্রেনাদায় উদ্ধার মিশনের কাজ পরিচালনা করেছেন সেজন্য তাঁকে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন।"

২৫ শে অক্টোবর গ্রেনাদা আক্রান্ত হবার পর সেখানে ৩ হাজার একশো সৈন্য অবস্থান করে। গ্রেনাদায় মার্কিনী সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল জ্যাক ফ্যারিস। এছাড়া "ক্যারিবিয়ান শান্তিরক্ষা বাহিনীর ৩৯২ জন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। এই সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন জামাইকার কর্ণেল কেন বারনেস। এখানেই শেষ নয়। গ্রেনাদার পার্শ্ববর্তী দ্বীপ ক্যারিয়া ক্যু-তে এক বিরাট মার্কিনী সেনাদল অবস্থান করেছে।

মার্কিনী সৈন্য যখন গ্রেনাদায় প্রবেশ করে তখন গ্রেনাদার বুকে চলে কঠোর সেন্সরশিপ। এতৎসত্ত্বেও গ্রেনাদার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঐ সময় আর্নালডো হাটচিনসন নামে একজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। ঐ সাংবাদিকের ভাষায় ঃ আক্রমণকারীরা গ্রেনাদায় অবতরণ করেই বাড়ি বাড়ি প্রবেশ করে। তারা নাগরিকদের অর্থকড়ি এবং জিনিসপত্র লুঠ করে। মেক্সিকান ডায়া-র রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে ঃ আক্রমণকারীরা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে। তার খেতের ফসল বিনষ্ট করে। রাস্তায় রাস্তায় মর্কিনী সেনারা টহল দিতে থাকে। গ্রেনাদার রাজধানী এবং অন্যান্য শহরের আকাশে মার্কিনী হেলিকপ্টার উড়তে থাকে। শুরু হয়ে যায় ব্যাপক গ্রেপ্তার। সমস্ত রাস্তা অবরোধ করা হয়। যাতে করে কেউ

দেশেব বাইরে যেতে না পারেন বা গ্রেনাদার অভ্যন্তরে প্রবেশ কবতে না পারেন। মার্কিনী সৈন্য প্রবেশ করার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কুখ্যাত প্রাক্তন আর্মি ডিরেক্টর গেরি জেল থেকে ছাড়া পান। মরিস বিশপের শাসনকালে বহু অপরাধের অভিযোগে গেরি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বারবাডোসের পুলিস কমিশনার মারউইন হোল্ডার এবং গেরিকে নিয়ে অভ্যন্তরীণ যুক্ত কম্যান্ড গঠিত হয়—যে কম্যান্ডের কাজ হলো মার্কিনী হানাদারদের গ্রেনাদার দেশপ্রেমিকদের চিনিয়ে দেওয়া। মার্কিনী সেনাবাহিনী ভ্রাম্যমাণ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে। এই বেতাব কেন্দ্র থেকে প্রতিনিয়ত ঘোষণা হতে থাকে যে, মার্কিনীরা কিউবানদের চেয়ে প্রিয়তর। দেশের একমাত্র বেতার কেন্দ্রকে মার্কিনী সেনাবাহিনীর প্রচারযন্ত্রে পরিণত করা হয়। ঐ বেতার কেন্দ্র মারফত এবং ব্যাপক প্রচার পুস্তিকার সাহায্যে পূর্বতন শাসকদের 'কমিউনিস্ট এজেন্ট' বলে অভিহিত করে নানাভাবে তাঁদের চরিত্র হননের চেষ্টা করা হয়। গ্রেনাদায় মার্কিনী সৈন্য অবতরণের পর এক সপ্তাহের ঘটনাবলী বিবৃত করে বি বি সি-র একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেন ঃ গত এক সপ্তাহ ধরে মার্কিনী সেনারা যেভাবে গ্রেনাদার পূর্বতন সরকারের বিপ্লবীদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েছে তা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে বৃহত্তম তল্লাশি। বহু সংখ্যক বন্দীশিবির স্থাপন করা হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই সমস্ত বন্দীশিবিরে এক হাজার নর-নারীকে আটক করা হয়। এরই পাশাপাশি এক হাজার দাগী আসামীকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রেনাদার বুকে মার্কিনী সেনাদের নারকীয় তাণ্ডব সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল রামসে ক্লার্ক মন্তব্য করেছেন ঃ গ্রেনাদার বুকে এখন যা ঘটছে তা মানবসভ্যতার পক্ষে খুবই কলঙ্কজনক।

ঐ বছর ৯ই নভেম্বর গঠিত হয় গ্রেনাদায় একটি মার্কিনী পুতুল সরকার। এই সরকারের প্রধান হলেন প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল পল স্কুন। এই স্কুন সরকার গঠিত হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হোয়াইট হাউস থেকে ঘোষণা করা হয় যে, এই সরকারই হলো গ্রেনাদার প্রকৃত সরকার। এই পল স্কুনের কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই ছিল না। ফলে যা দাঁড়ায় তা হলো তিনি পূর্বতন মরিস বিশপ সরকারের সমস্ত কাগজপত্র ওয়াশিংটনে প্রেরণা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক গোয়েন্দারা এই সমস্ত ফাইলপত্র পরীক্ষা করে দেখেন।

গ্রেনাদার পুতুল সরকার সম্পর্কে ওয়াশিংটন পোস্ট একটি চমৎকার মন্তব্য করে। ওয়াশিংটন পোস্টের মন্তব্যে বলা হয় ঃ স্কুন মন্ত্রিসভার উপর আর একটি মন্ত্রিসভা রয়েছে। স্কুন সরকারকে যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁরা হলেন ঃ গ্রেনাদায় মার্কিনী মিশনের প্রধান চার্লস গিলেসপি, সামরিক কম্যান্ডার মেজর জেনারেল জ্যাক ফ্যারিস। পুতুল সরকার এঁদের উপদেষ্টা পর্ষদ বলে অভিহিত করে। এর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে, গ্রেনাদার ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট-র নেতা ফ্রান্সিস আলেক্সিকে ঐ দেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু 'বিশ্বস্ততার' অভাবে সে প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু স্কুন-ই কি পুরোপুরিভাবে বিশ্বস্ততা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন? প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই স্কুন ঘোষণা করেন যে, এক বছরের মধ্যে গ্রেনাদায় নির্বাচন করা হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটন থেকে তার প্রতিবাদ করা হয় এবং বলা হয় যে, গ্রেনাদায় নির্বাচন করতে দু'বছরের মত সময় লাগবে।

কিন্তু গ্রেনাদার বুকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আসলে কী করতে চায়? স্কুন-ব্রাথওয়েট সরকারকে সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে চায়।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন সামরিক কম্যান্ডার জোসেফ মেটকাফ বলেছেন : গ্রেনাদায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের বাস্তবতাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্রিটিশ গার্ডিয়ানও লিখেছে : গ্রেনাদায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রশ্নটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অফিসারেরা খতিয়ে দেখছেন। ন্যাটোর সুপ্রীম কম্যান্ডার ওয়েসলি এল ম্যাকডোলান্ড-এর মতে গ্রেনাদায় যদি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা যায় তবে আটলান্টিক সাগর থেকে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত সামরিক নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করা সম্ভবপর হবে।

প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দু'মাসের মধ্যে গ্রেনাদা থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ করা হবে। কিন্তু জ্যাক ফ্যারিস অতি সম্প্রতিও বলেছেন : 'যতদিন প্রয়োজন হয় ততদিনই মার্কিন সৈন্য গ্রেনাদায় থাকবে।' এই সমস্ত ঘটনা থেকে এটাই সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে যে, গ্রেনাদা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের কোন সদিচ্ছা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেই।

এল সালভাডোর

এল সালভাডোরের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে সেখানকার সামরিক বাহিনীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যে কত প্রকট হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ মেলে কর্ণেল ওচোয়া'র নেতৃত্বে ছয় দিনের বিদ্রোহে। কর্ণেল ওচোয়া কাবানাস নর্দান প্রভিন্স-র সামরিক কমান্ডার ছিলেন। তিনি তার পরিচালনাধীন ১১শ' সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ করেন। তাঁর প্রধান দাবি ছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী জোসেগুইলেরেমো গার্সিয়ার পদত্যাগ। গোসে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ওচোয়াকে উরুগুয়েতে মিলিটারী অ্যাটাচির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। জোসে মনে করেন এটা তাঁর রাজনৈতিক নির্বাসন ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গার্সিয়া ঘোষণা করেন যে, "এই অভ্যুত্থানের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিছু ব্যক্তির হাত রয়েছে" ওচোয়া তাঁর সর্বময় কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য রাজধানীতে ছুটে যান। এরপর প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট মাগানা ঘোষণা করেন যে, বিদ্রোহের অবসান ঘটেছে। ওচোয়া তাঁর সামরিক পদের দায়িত্বভার ত্যাগ করছেন কিন্তু মিলিটারী অ্যাটাচি হিসাবে তাঁকে উরুগুয়েতে যেতে হবে না।

পশ্চিমী সংবাদপত্র সমূহের অভিমত ছিল : ওচোয়া ছিলেন বামপন্থী গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একজন শক্তিশালী কমান্ডার। তাঁর এই বিদ্রোহের পিছনে গণপরিষদের স্পীকার উগ্র দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনালিস্ট রিপাবলিক অ্যালায়েন্সের নেতা রোবার্টো দ্য অ্যাবুসনের মদত ছিল। বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ফ্রন্টের নেতা রুবেন জামোরার বক্তব্য হলো : "এই বিদ্রোহ মডারেট দক্ষিণপন্থী এবং উগ্র দক্ষিণপন্থীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি"।

এল সালভাডোরের দেশপ্রেমিক নেতারা সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। এই আলাপ আলোচনা চালানোর প্রশ্নে এল সালভাডোরের শাসক দলের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সরকারের পক্ষ থেকে বারে বারে এই আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

সরকারের কোন কোন নেতা দেশপ্রেমিকদের সাথে গোপন যোগাযোগ করতে পারেন এই আশঙ্কায় উগ্র দক্ষিণপন্থীরা এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই ধরনের

অভ্যুত্থানের আশঙ্কা অবশ্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী গার্সিয়া অনেক পূর্ব থেকেই করছিলেন। ঘটনার মাস দু'য়েক আগেই তিনি সেনাবাহিনী থেকে কিছু লোককে সরিয়ে দেন। ওচোযাকেও এই উদ্দেশ্যেই উরুগুরুতে পাঠানোর চেষ্টা হয়।

এল সালভাডোর দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের রেডিও "ভেনসিরেমো" ঘোষণা করে ঃ ওচোয়াব বিদ্রোহ সরকারী গোষ্ঠীর বিশেষ করে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেকার চরম অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই এল সালভাডোরের এই বিদ্রোহের প্রতি নজর রেখে চলছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া হয়নি। যেদিন ওচোয়া বিদ্রোহ করেন সেদিনই এল সালভাডোরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সালভাডোরের প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি সাংবাদিকদের কাছে কোন মন্তব্য করেন না। ইউ পি আই-এর বিশ্লেষণ হলো ঃ ওচোয়ার এই বিদ্রোহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভালো চোখে দেখে নি। কেননা যদিও এই বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল পুরোপুরি উগ্র দক্ষিণপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা তথাপি এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সেখানকার সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে ফেটে পড়ে। এল সালভাডোরের বর্তমান "সংকটময়" মুহূর্তে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এল সালভাডোর সরকার উভয়ের স্বার্থের পক্ষেই ক্ষতিকর।

পানামা

পূর্ব ইউরোপে যখন কয়েকটি দেশে অস্থিরতা, সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন অভ্যন্তরীণ সমস্যায় বিব্রত, ঠিক সেই সময়টিকে বেছে নিয়ে ১৯৮৯ সালের ২০ শে ডিসেম্বর ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে অন্যের বাড়িতে ডাকাতি করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কেউ কখনও শুনেছেন যে, জবরদস্তি একটা দেশে সামরিক হামলা চালিয়ে সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে ধরে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে ফাটকে পুরে বিচার করা যায়? তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশকে যদি এইভাবে ধরে নিয়ে অন্য কোন দেশ তাঁকে কারাগারে রেখে বিচার করত তাহ'লে প্রতিক্রিয়াটা কী হতো? অনেকেই বলবেন, সেটা সম্ভবত নয়, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অমিত পরাক্রম আর বিত্তশালী দেশ। এসব করতে গেলে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে। পানামা কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও স্বাধীন দেশ। জেনারেল ম্যানুয়েল আন্তোনিও নোরিয়েগা মার্কিন সরকারের চোখে যেমন লোকই হোন না, তিনি ছিলেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান। সবই সম্ভব হ'ল কারণ ক্ষুদ্র পানামার সাধ্য ছিল না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করে।

মার্কিন সরকার নিজেও জানত তাদের এই কাজ আন্তর্জাতিক রীতি, নীতি, আইন সব কিছুরই বিরোধী। তারা জানত তাদের এই কাজ সভ্যতা, শালীনতা বিরোধী। তাই, বিশ্বসমাজের সামনে একটা অজুহাত খাড়া করার জন্য জেনারেল নোরিয়েগা একজন মাদক দ্রব্যের বে-আইনি ব্যবসায়ী এই'প্রচারের ঢল নামিয়ে দিল। প্রচণ্ড প্রভাবশালী বুর্জোয়া প্রচার যন্ত্রের মহিমায় ড্রাগ ব্যবসায়ী নোরিয়েগার বিরুদ্ধে একটা নৈতিকতার ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে নিজেদের চরম নীতিবিগর্হিত বোম্বেটে কীর্তি চাপা দেবার চেষ্টা করল।

কেবল জেনারেল নোরিয়েগা নয়, মার্কিন বাহিনীর যথেচ্ছাচারের শিকার পানামার রাজধানী পানামা সিটিতে অবস্থিত নিকারাগুয়ার দূতাবাস এবং দু'জন নিকারাগুয়ান

কূটনীতিকের বাসস্থান। নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রদূতের আপত্তি অগ্রাহ্য করে, তাঁকে অস্ত্র দেখিয়ে বাসভবনের গেটে দাঁড় করিয়ে মার্কিনী বোম্বেটে বাহিনী নির্বিবাদে বাড়িতে ঢুকে তল্লাশির নামে তাণ্ডবনৃত্য চালায়। নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রদূত তাঁর কূটনৈতিক পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও সেসব উপেক্ষা করেই সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে দূতাবাস তছনছ করা হয়।

লাতিন ও মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশ মার্কিন আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছে। অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস্ (ও এ এস) এক প্রস্তাবে মার্কিন আগ্রাসনের নিন্দা করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে দু'টি প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। পানামায় মার্কিন আক্রমণ এবং নিকারাগুয়ার দূতাবাসে বে-আইনী প্রবেশ ও তল্লাশি দু'টোরই নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে অধিকাংশ দেশ। কিন্তু হলে কি হবে। আন্তর্জাতিক মস্তান মার্কিন সরকার তাঁর বিশেষ অধিকার খাটিয়ে সব প্রতিবাদকে 'নিয়মের' রোলার চালিয়ে পিষে দিয়েছে।

মজার কথা হ'ল, এত হাম্বিতাম্বি, নির্লজ্জ হামলা ইত্যাদি চালিয়ে যাঁকে মার্কিন মুলুকে নিয়ে যাওয়া হ'ল সেই ম্যানুয়েল নোরিয়েগা পরবর্তীকালে মার্কিন সরকারের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ান। না যাচ্ছে গেলা, না যাচ্ছে তোলা। একসময় কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র প্রধান ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ। সেই সময় এই ম্যানুয়েল আন্তোনিও নোরিয়েগা ছিলেন সি আই এ-র বিশ্বস্ত অনুচর। তখনও নোরিয়েগা যতদিন তাঁদের "বিশ্বস্ত" ছিলেন ততদিন সব কিছুই উপেক্ষা করা গেছে। গোল বাধলো যখন নোরিয়েগা পানামা খালের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ মার্কিন জবরদস্তি মেনে নিতে আপত্তি তুলতে থাকেন।

পানামা যোজক বা পানামা খাল প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন স্বার্থের ক্ষেত্রে এই খালের অবস্থানগত গুরুত্ব অসাধারণ। ১৯০২ সালে তৎকালীন মার্কিন কংগ্রেস এই খাল খননের সিদ্ধান্ত নিয়ে মার্কিন মালিকানায় সেটি খনন ও পরিচালনের জন্য তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেয়। পানামা তখন অপর একটি মধ্য আমেরিকান রাষ্ট্র কলম্বিয়ার অধীন। ১৯০৩ সালে পানামা স্বাধীনতা আদায় করে। ঐ সালেই এক অসম চুক্তির বলে মার্কিন সরকার পানামা খাল খনন ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করে। ১৯১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট খালটি জলযান যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

পানামার মানুষ কোনদিনই পানামা খালের উপর জবরদস্তি মার্কিন মালিকানা ও প্রশাসন মেনে নিয়ে পারেন নি। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে পানামা সরকারের সঙ্গে মার্কিন সরকারের একটি নতুন চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৯৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে পানামা খালের মালিকানা পানামাকে হস্তান্তর করার কথা। একই চুক্তি অনুসারে পানামা থেকে মার্কিন সেনাও সরিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু চুক্তির কালি শুকোবার আগেই মার্কিন কংগ্রেস একতরফা একটি সংশোধনের দ্বারা মার্কিন অধিকার প্রসারিত করে। চুক্তিটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করার হয় যার অর্থ দাঁড়ায় পানামা খাল চিরকাল মার্কিন সম্পত্তি হয়েই থাকবে। জেনারেল ম্যানুয়েল আন্তোনিও নোরিয়েগা পানামার জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে ধারাবাহিকভাবে মার্কিন জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর এই অবস্থানটাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিরঃপীড়ার কারণ। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৮৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিন সরকার তিনবার পানামার অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা চালায়। প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ

হয়। শেষ পর্যন্ত ভিতর থেকে অভ্যুত্থানেব কৌশল ছেড়ে সরাসরি পানামাতে সামরিক অভিযান চালায় মার্কিন সরকার। এই আগ্রাসনের ফলে মধ্য আমেরিকায় শান্তি স্থাপন প্রয়াসও গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

"গণতন্ত্রের" ধ্বজাধারী মার্কিন সবকার পানামায় এই আগ্রাসনের দ্বারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকেই পুনরায় উদ্‌ঘাটিত করে। অনেকেরই হয়ত মনে আছে ১৯৮৩ সালে এই ভাবেই প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান চালিয়ে আর একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গ্রেনাদাতে মার্কিন তাঁবেদার সরকার বসানো হয়েছে। নিকারাগুয়া, এল সালভাডোর এবং লাতিন ও মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে মার্কিন হস্তক্ষেপ সুবিদিত।

নিকারাগুয়া

১৯৮৮ সালে নিকারাগুয়ার জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হয়েছে। ছয় বছর পূর্বে নিকারাগুয়া সরকার এক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এই জরুরী অবস্থা জারি করতে বাধ্য হয়েছিল। ছয় বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৮২ সালে নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট দানিয়েল ওরতেগা যখন দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তখন নিকারাগুয়ার পরিস্থিতি চিল অগ্নিগর্ভ। রাজধানী মানাগুয়া আক্রান্ত—রাস্তায় রাস্তায় চলছিল রক্তাক্ত সংঘর্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে। মার্কিন মদতপুষ্ট প্রতিবিপ্লবী কন্ট্রারা দেশের সরকারকে উৎখাত করার রক্তাক্ত অভিযানে মত্ত হয়।

নিকারাগুয়ার জনগণ এই দীর্ঘ ছয় বছর ধরে প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সংগ্রাম চালিয়ে যান। নিকারাগুয়ার জনগণ অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে চালিয়ে যান। নিকারাগুয়ার জনগণ অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে, প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে ক্লান্ত। সেখানকার মানুষ শান্তি চাইছিলেন। নিকারাগুয়ার জনগণের এই ইচ্ছার প্রতি মর্যাদা দিয়েই নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট দানিয়েল ওরতেগা বলেন ঃ যুদ্ধ বাধানো সহজ। কিন্তু শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন বহু মানুষের সদিচ্ছা নিকারাগুয়া সরকার দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য সব রকমের প্রয়াস চালিয়ে যাবে। ওরতেগা এই ঘোষণা করেন কোস্টারিকা সম্মেলনের প্রাক্‌মুহূর্তে। কোস্টারিকার সানজোসে শহরের উপকণ্ঠে মধ্য আমেরিকার দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয় ১৯৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি। এই শীর্ষ সম্মেলনে নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, এই সালভাদোর, হন্ডুরাস ও গুয়াতেমেলার রাষ্ট্রপতিগণ যোগদান করেন। মধ্য আমেরিকার দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের এই শীর্ষ সম্মেলন কিন্তু কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। এর প্রস্তুতি চলছে বহুদিন ধরে—এই ধরনের শীর্ষ সম্মেলনের ভিত্তি স্থাপিত হয় প্রায় বছর খানেক আগে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিকারাগুয়ার বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে হন্ডুরাস এবং গুয়াতেমালা সরকারকে সর্বতো ভাবে ব্যবহার করে। কিন্তু এর ফলশ্রুতি হিসাবে নিকারাগুয়ায় প্রতিবিপ্লবীদের হাত শক্তিশালী হলেও, নিকারাগুয়ার সরকার বিব্রত হলেও হন্ডুরাস এবং গুয়াতেমালায়ও কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। অনাহারের তাড়নায় হন্ডুরাস থেকে হাজার হাজার নরনারী সীমান্ত পেরিয়ে উদ্বাস্তু হিসাবে নিকারাগুয়ার আশ্রয় নেয়। অর্থনৈতিক অবরোধে অবরুদ্ধ নিকারাগুয়াকে বাঁচাতে এবং ঐ দেশে স্বনির্ভর অর্থনীতি

গড়ে তুলতে পেরু এবং কোস্টারিকার মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রক্রিয়া এবং নিজ নিজ দেশের ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতিতে এল সালভাদোর, হন্ডুরাস এবং গুয়াতেমালার রাষ্ট্রনায়কেরা নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করেন নিকারাগুয়ার সঙ্গে বৈরিতা কাটিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার রাজনৈতিক তাৎপর্য।

এই প্রেক্ষাপটেই কোস্টারিকা সম্মেলন এবং সম্মেলনে ওরতেগার পারস্পরিক সহযোগিতার প্রস্তাবটি বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। ১৯৮৯ সালের ১৬ এবং ১৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই শীর্ষ বৈঠকে দীর্ঘ ২৯ ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে প্রেসিডেন্ট ওরতেগা ঘোষণা করেন, নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সান্দিনিস্তা সরকার কেবল যে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করবে তাই নয়—কন্ট্রারা যদি অস্ত্র সম্বরণ করেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৮১ সালের পর থেকে দণ্ডিত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে। কেবল নিকারাগুয়া নয়—এল সালভাডার, হন্ডুরাস ও গুয়াতেমালাতেও বর্তমানে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। ঐ শীর্ষ বৈঠকে এটাও স্থির হয় যে, সমস্ত দেশ থেকেই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হবে। কোস্টারিকা বৈঠকের রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম। কেননা মধ্য আমেরিকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই নীতির ফলে ১৯৮৫-'৮৬ সালে মধ্য আমেরিকার এই অঞ্চল সবচেয়ে উত্তেজিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

মধ্য আমেরিকার জনগণ সরকারগুলি নিজেদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই এলাকার শান্তি এবং সুস্থিতির জন্য তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মধ্য আমেরিকার দেশসমূহের এই পারস্পরিক ঐক্য ও সমঝোতাই পারে এই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে।

নিকারাগুয়ার নির্বাচন

১৯৯০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি নিকারাগুয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিবাচনী ফলাফল ছিল, নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রার্থী ও তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি দানিয়েল ওরতেগা পরাজিত হন। জয়ী হন মার্কিন মদতপুষ্ট ১৪ দলীয় জোট ইউনাইটেড অপোজিশন ইউনিয়নের নেত্রী ও 'লা প্রেসনা' সংবাদপত্রের মালিক সম্পাদিকা ভিওলেতা চামোরো। চামোরো ভোট পান ৫৫ শতাংশ আর ওরতেগা ভোট পান ৪২ শতাংশ। নিকারাগুয়ার প্রগতিশীল শক্তির পক্ষে এটা বড় ধরনের পরাজয় ছিল।

নিকারাগুয়া সান্দিনিস্তা মুক্তিফ্রন্ট দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রণী বাহিনী। এই ফ্রন্ট নিকারাগুয়ার স্বৈরশাসক সোমোজা'র বিরুদ্ধে দীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালনা করে। এই সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই ১৯৭৯ সালে সোমোজা স্বৈরশাসনের পতন ঘটে। নিকারাগুয়ায় শুরু হয় নতুন অধ্যায়। প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পর থেকেই সেই সরকারকে উৎখাত করার জন্য মার্কিন প্রশাসন মরিয়া প্রয়াস চালাতে থাকে। হন্ডুরাস ও কোস্টারিকা সীমান্ত থেকে প্রতিবিপ্লবী কন্ট্রাদের অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত করে পেন্টাগন। এদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ফলে ৫৯০ হাজার নর-নারী নিহত হন। নিকারাগুয়ার অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

কন্ট্রাদের আক্রমণের পাশাপাশি পূর্বতন রেগন প্রশাসন নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ পরিচালনা করে। নিকারাগুয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে। নিকারাগুয়ার বন্দরগুলিতে মাইন বসানো হয়। যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অবরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের ফলে ৩৫ লক্ষ মানুষের দেশ নিকারাগুয়া অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় করতে হয় প্রতিরক্ষা খাতে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায় এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান নেমে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিকারাগুয়াকে পদানত করতে পারে না, বা কন্ট্রা দেশের সান্দিনিস্তা সরকারের পতন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। এর মূলে ছিল নিকারাগুয়া সান্দিনিস্তা জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের গৌরবজনক এবং বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। নিকারাগুয়ায় রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করতে কোস্টারিকার প্রেসিডেন্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই উদ্যেগের ফলশ্রুতিতে মধ্য আমেরিকার পাঁচটি দেশের রাষ্ট্রপতিদের উপস্থিতিতে কোস্টা ডাল সোল ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ীই ১৯৯০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি নিকারাগুয়ায় সাধারণ নির্বাচনের দিন স্থির হয়।

নিকারাগুয়ার নির্বাচন কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। স্বাভাবিক পরিবেশে সেখানে নির্বাচন হয়ও নি। এখনও হন্ডুরাসে পনেরো হাজারের বেশি সশস্ত্র কন্ট্রা অবস্থান করছে। পূর্বতন রেগন প্রশাসনের মতো পরবর্তী বুশ প্রশাসনও নির্বাচনের পূর্বে ভিওলেতা চামোরো, দক্ষিণ-পন্থী জোট এবং 'লা প্রেসনা' সংবাদপত্রের জন্য ঢালাও অর্থ সরবরাহ করে। নির্বাচনের দিন ঘোষিত হবার অব্যবহিত পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস্ নিকারাগুয়ার নির্বাচনে বিরোধীদের সাহায্য করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। এটা ছিল এক নজিরবিহীন ঘটনা। মার্কিন কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী জোটের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করে। বলা হয়, গণতন্ত্রের জন্য সেখানে অর্থের প্রয়োজন। তাছাড়া সি আই-এর মাধ্যমে গোপনে সেখানে ঢালাও অর্থ পাঠানো হয়। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে 'নিউজ উইকে' প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ, নির্বাচনের পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিকারাগুয়ার পঞ্চাশ লক্ষ ডলার খরচ করে। নিকারাগুয়ায় দক্ষিণপন্থী জোটের সপক্ষে 'ভিয়া সিভিকা' নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সেই প্রতিষ্ঠান মার্কিন অর্থ গ্রহণ করে। এরই পাশাপাশি তৎকালীন বুশ প্রশাসন কন্ট্রাদের জন্য ৬ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করে। ফলে, নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে কন্ট্রাদের সামরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। পূর্বতন কন্ট্রা নেতারা এবং প্রতিবিপ্লবীরা সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তাঁরা দক্ষিণপন্থী জোটের সপক্ষে নির্বাচনে প্রচার চালান।

চোদ্দ দলের দক্ষিণপন্থী জোট দীর্ঘদিন ধরে নিকারাগুয়ায় অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করে চলেছিল। নির্বাচনে এই জোট সেই সঙ্কটকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগায়। আবার দেশের কয়েকটি বামপন্থী দল এই দক্ষিণপন্থী জোটে ভিড়ে যায়। ভোটারদের একটা অংশ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হন। এই ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সান্দিনিস্তা যে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়েছে, সেই ভোট প্রকৃতঅর্থেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভোট, রাজনৈতিক সচেতন ভোট।

নিকারাগুয়ায় দক্ষিণপন্থী জোট নির্বাচন জয়ী হবার পর সংগ্রামের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। সেই সংগ্রাম হলো অর্জিত সাফল্য ও অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। ১৯৭৯ সালে

সান্দিনিস্তা সরকার গঠিত হবার পর আমূল ভূমিসংস্কার নীতি গৃহীত হয়। এই নীতির ফলে হাজার হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছেন। ১৯৭৮ সালে দেশের চাষযোগ্য জমির ৪২ শতাংশ মাত্র দু'হাজার পরিবারের হাতে ছিল। ওরতেগা সরকারের আমলে ব্যাপক ভূমি সংস্কারের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বৃহৎ ভূস্বামীরা চাষযোগ্য জমির মাত্র ৯ শতাংশের মালিক। ভূমি সংস্কারের ফলে এক লক্ষ বিশ হাজার পরিবার উপকৃত হয়েছেন। ঐ সরকার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালায়। সান্দিনিস্তা সরকারের দশ বছরে দশ লক্ষ নর-নারী লিখতে ও পড়তে শেখেন। এই সংখ্যা হলো নিকারাগুয়ার জনসংখ্যার ত্রিশ শতাংশ।

নিকারাগুয়ার পরিবর্তিত নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের সামনে এই সমস্ত অর্জিত অধিকারগুলি রক্ষার প্রশ্নই বড় প্রশ্ন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৯৯৬ সালের ২১শে অক্টোবর নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ভোটপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মূল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন 'সানদিনিস্তা ফ্রন্টের' প্রার্থী ও পূর্বতন রাষ্ট্রপ্রধান, দানিয়েল ওরতেগা এবং সমাজাপন্থী দক্ষিণ মার্গীদের 'লিবারেল অ্যালেয়েন্স'-র আরনল্‌দো আলেমান। কিন্তু একে ভোট না বলে প্রহসন বলাই ভাল। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষককূল যতই নির্বাচনী পদ্ধতির প্রশংসা করুন, একথা আজ আর চেপে রাখা যাচ্ছে না যে, ভোটে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পেশিশক্তির ব্যবহার। যে সব অঞ্চলে সানদিনিস্তাদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে সেইসব জায়গার সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রে অসম্ভব ধীর গতিতে ভোট গণনা হয়েছে। দানিয়েল ওরতেগা ঘোষণা করেছিলেন যে, এই তথাকথিত নির্বাচনী পদ্ধতি এবং ফলাফল তিনি মেনে নেবেন না। 'নিচুতলা থেকে সংগ্রাম শুরু'রও তিনি ডাক দিয়েছিলেন। এদিকে সানদিনিস্তা দল নাকি দু-টুকরো হয়ে গেছে বলে বৃহৎ-পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদ সংস্থাগুলি যে 'খবর' এতদিন ছড়িয়ে এসেছে, পরে বোঝা গেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেমন মিথ্যা, সান্দিনিস্তা দলের 'সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে সরে আসার' কল্পকাহিনী। আসলে, সানদিনিস্তা দল থেকে বিতাড়িত অল্প কিছু সংখ্যক নেতা 'নতুন' বা 'নববিধান' সানদিনিস্তা বলে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। এঁরাই সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে কথাবার্তা বলেন। এঁদের নেতা সেরজিও হারনানদেন্‌ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে এ পর্যন্ত ০.১% ভোটও পাননি। দানিয়েল ওরতেগা ও টমাস্‌ বোর্‌হে নতুন করে নির্বাচনের দাবি তুলেছেন।

চিলি

চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি চিলির জনগণের প্রতি একটি আবেদন প্রচার করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই আবেদনটি প্রচার করা হয়। আবেদনে বলা হয়, গণ-অভ্যুত্থানই চিলির জনগণের মুক্তি আনতে পারে। পার্টির সাধারণ সম্পাদক লুইস করভালান এই আবেদন ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিবাদ নিজেই এই বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।"

আবেদনে বলা হয়েছে : চিলির জনগণ বেশি বেশি করে ভয় মুক্ত হচ্ছেন। তাঁরা সংগ্রামেব নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার এটা উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁরা যে সমস্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন সেগুলি কিছুতেই আদায় হবে না, যদি না তাঁরা মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই আবেদনে সাড়া দিয়েই এল তেনিয়েতের খনি শ্রমিকরা ধর্মঘট কবে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যখন আলোচনার টেবিলে বসেন তখন তাঁদের বক্তব্যে রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্মঘটে ছাত্ররা বিশেষভাবে সাহায্য করেন। রাস্তায় রাস্তায় পুলিসের সাথে শ্রমিক ও ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। এল তেনিয়েতের এই শ্রমিক-ধর্মঘট ছিল বিনোচেত শাসনে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট। এরপর পোর্ট এবং কয়লাখনি শ্রমিকেরা ধর্মঘটে অবতীর্ণ হন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই সমস্ত শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে বিপুলসংখ্যক মানুষ এগিয়ে এসেছেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের স্ত্রী-কন্যারাও স্ট্রাইক কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন, তাঁরা মিছিলে যোগদান করেন। একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। সান আনটোনিও ছিলেন ষোল বছরের এক শ্রমিক কন্যা। পোর্ট শ্রমিকেরা যখন সভা করছিলেন তখন তিনি সেখানে গিয়ে বলেন, এই ধর্মঘটে সাহায্য করার অধিকার আমার রয়েছে। আমার বাবাকে পিনোচেত সরকার গুলি করে হত্যা করেছে। সংগ্রামের ময়দানে আমি বাবার স্থান গ্রহণ করতে চাই।

আর একটি ঘটনা হলো : একদিন ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যখন খেলা চলছিল তখন দশ মিনিটের জন্য সেখানে ব্ল্যাক আউট হয়। যখন আলো জ্বলে তখন দেখা যায়, কয়েক হাজার প্রচারপত্র স্টেডিয়ামের এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। ঐ প্রচারপত্রে অ্যান্টোনিও মাইডানার মুক্তি দাবি করা হয়।

চিলির জনগণের কাছে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল যে, পিনোচেত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একই সঙ্গে পরিচালনার প্রয়োজন। কেননা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য ও সমর্থনেই পিনোচেত সরকার টিকে থাকে।

স্বৈরতন্ত্র কোণঠাসা

চিলিতে ১৯৮৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত মার্কিন তাঁবেদার সামরিক স্বৈরশাহীর বিরুদ্ধে চিলির বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম একটি সফল আঘাত হানতে সক্ষম হয়। তবে, প্রস্তাবিত এই নির্বাচন সামরিক শাহীর শাসনেই অনুষ্ঠিত হয়।

চিলির স্বৈরশাসক রাষ্ট্রপতি আগুস্তো পিনোচেত আরও আট বছর ক্ষমতায় থাকার অভিলাষ প্রকাশ করে যে গণভোট অনুষ্ঠিত করেন তাতে পিনোচেত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। প্রদত্ত ভোটে প্রায় ৫৫ শতাংশ পিনোচেতের অভিলাষকে "না" জানিয়ে দেবার পর চিলির রাজধানী শান্তিয়াগো সহ সর্বত্র জনসাধারণ রাস্তায় রাস্তায় আনন্দ উৎসব করেন এবং অবিলম্বে পিনোচেত ও তাঁর সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন। কিন্তু পিনোচেত এই দাবি অগ্রাহ্য করেন। পিনোচেতের অজুহাত ছিল দেশের সংবিধান অনুসারে ১৯৯০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় থাকবেন। ঐ সংবিধান অনুসারেই ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের

মধ্যে নতুন নির্বাচন করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত ঐ সংবিধানটি ১৯৮০ সালে সামরিক স্বৈরশাহী সন্ত্রাসের বিভীষিকা সৃষ্টি করে জবরদস্তি এক গণভোটে পাশ করায়। ঐ সংবিধানের প্রতি চিলির গণতান্ত্রিক মানুষের কোনো সমর্থন নেই। ঐ সংবিধান অনুসারে পিনোচেত রাষ্ট্রপতি না থাকলেও আজীবন সেনেট সদস্য এবং সাময়িক বাহিনীর প্রধানের পদে সদস্য থেকে যাবেন। এ ছাড়াও "জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ" নামে সামরিক কর্তৃত্বাধীন একটি সংস্থা শাসন বিভাগ এবং আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতেই থাকবে। সঙ্গত কারণেই ঐ সংবিধান বাতিল অথবা যথাযথ সংশোধনের দাবি তুলেছে চিলির বাম ও গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলি।

স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৭০ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র ষড়যন্ত্রে চিলির সামরিক বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল ও মার্কিন তাঁবেদার অংশ চিলির তৎকালীন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা সালভাডোর আলেন্দের সরকারকে উৎখাত করে সালভাডোর আলেন্দে এবং তাঁর প্রাসাদরক্ষীরা সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিযে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু ঘটে শত শত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক কর্মী ও নেতার। ক্ষমতা জবরদখলকারী পিনোচেতের সামরিক জুন্টা চিলির বুকে চালায় নৃশংস হত্যাভিযান ও বর্বর সন্ত্রাস। চিলির হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ চিরদিনের জন্য নিখোঁজ হযেছেন। হাজার হাজার মানুষ দেশ ছাড়া। নারকীয় এই হত্যা ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও চিলির বীর শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত, গণতান্ত্রিক মানুষ সংগ্রামের পতাকা উর্দ্ধে উড্ডীন রেখেছেন। শত অত্যাচারেও সামরিক স্বৈরশাহী গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে সক্ষম হয়নি।

চিলির গণভোটের প্রাক্কালে জল্লাদ পিনোচেতের সমর্থকরা আশা করেছিলেন গণভোট পিনোচেত জিতবেন এবং আরও নয় বছর অর্থাৎ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পিনোচেত বহাল থাকবেন। তাঁদের এই দুরাশার ভিত্তি ছিল এই দাবি যে বিগত কয়েক বছরে চিলির অর্থনীতির বিকাশের হার ৫ থেকে ৬ শতাংশ রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে, বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে, বেকারী কমেছে ইত্যাদি। কিন্তু মার্কিন পর্যবেক্ষকদের মত অনুসারেই সামরিক স্বৈরশাসনে চিলির মুষ্টিমেয় একটি অংশ ফুলে ফেঁপে উঠলেও লক্ষ লক্ষ গরিব। মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার কোন সুরাহাই হয়নি। তাছাড়া, অর্থনীতির যতটুকু অগ্রগতি ঘটে তার পিছনে ছিল বেতন ও মজুরি সঙ্কোচনের পদক্ষেপ। বস্তুত ১৯৮১ সালের পর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতনের কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। অথচ ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। পাশাপাশি চলে রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার মতলবে অত্যাচার নিপীড়ন আর অবাধে হত্যালীলা। এই ভয়ঙ্কর অবস্থাতে সাধারণ মানুষ সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং প্রথম সুযোগেই তাঁরা পিনোচেতের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রায় ঘোষণা করেছেন।

লক্ষণীয়, যে মার্কিন প্রশাসন পিনোচেত ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের সাহায্যে চিলিতে গণতন্ত্র হত্যা করেছিল, তারাই পরে চিলিতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার কথা বলে। এর কারণ, দীর্ঘদিন শাসনক্ষমতায় থাকার সুবাদে স্বৈরশাসকরা যেমন মার্কিন প্রভুদের প্রয়োজনে নিজেদের অপরিহার্য মনে করতে শুরু করে, অন্যদিকে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী বিক্ষোভ অনিবার্যভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিক্ষোভে রূপান্তরিত হতে থাকে। একটা নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকার বসিয়ে দু'টি ফ্যাসাদ থেকেই অব্যাহতি পেতে মার্কিন প্রশাসন আগ্রহী। নির্বাচন যদি প্রহসন হয় তাতেও আপত্তি নেই।

কিউবা

১৯৮৩ সালের নভেম্বরের গোড়াব দিকেব দিনগুলি কিউবাব জনগণেব কাছে ছিল শৌর্যময়তায় মণ্ডিত। হাভানার জোস মার্টি বিমান বন্দরে বিমানগুলি নেমে আসছিল সাতশ'র মত নির্মাণকর্মী ও সমবায় কর্মচারীদের বয়ে নিয়ে। এঁরা গ্রেনাডাব পয়েন্ট স্যালাইনসে বাণিজ্য বিমান বন্দর তৈরির কাজে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মার্কিন আগ্রাসনকাবীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নির্মাণকেন্দ্র রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিমানযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন আহত কর্মীরা আব ছিলেন পতাকায় আচ্ছাদিত শবধারে ২৪ জন নিহত কর্মী। এঁরা সকলেই ছিলেন রাজমিস্ত্রী, রংমিস্ত্রী, ক্রেণচালক, যান্ত্রিক, স্থপতি প্রমুখ শ্রমিক কর্মচারী। এঁদের মধ্যে জনকয়েক সামরিক কর্মী ছিলেন; এঁদের নিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা গ্রেনাডায় হাজার হাজার কিউবার সৈন্যের উপস্থিতির মিথ্যার বেসাতি ছড়িয়েছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীদের নীতিই হল এমন ধারণার সৃষ্টি করা যে হাজার হাজার সৈন্য সাজিয়ে কিউবা "তৃতীয় বিশ্ব" দখল করতে উদ্যত। এঙ্গোলা-ইথিওপিয়া আন্তর্জাতিক বাহিনীতে কিউবার সৈনিকদের উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকা বিজয়ে কিউবা-সাবেক সোভিয়েত চক্রান্তের মিথ্যা প্রচার করে চলে। এঙ্গোলার জনগণের সাধারণতন্ত্র বারংবার একথা বলে যে, এঙ্গোলা ও কিউবা উভয়েই যেহেতু স্বাধীন দেশ সেহেতু তাদের যেমন খুশি তেমন চুক্তি বা সমঝোতায় আসতে বাধা না থাকলেও, এঙ্গোলার অঞ্চলবিশেষর উপর দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের সেনাবাহিনীর লাগাতার দখলদারি এবং নতুন করে তাদের আগ্রাসনের হুমকির মোকাবিলার উদ্দেশ্যেই সে-দেশে কিউবান সৈন্যের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হয়।

এটা সুবিদিত যে, এঙ্গোলার উপর বর্ণবিদ্বেষী ফৌজের আক্রমণের দরুনই সে-দেশে কিউবার সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণ ছিল। স্পষ্টতঃই এঙ্গোলা-ভূমি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা বাহিনীর অপসারণ, এঙ্গোলার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং ভাবী আক্রমণের আশঙ্কা বিদূরিত হওয়ার ভিত্তিতেই কিউবার আন্তর্জাতিক বাহিনী সে-দেশ থেকে প্রত্যাহৃত হয়।

অন্যান্য উন্নতিকামী দেশগুলির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে কেবল কতিপয় দেশকে সামরিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্যেই কিন্তু কিউবা আফ্রিকার প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি জ্ঞাপন করে।

পর্তুগীজ উপনিবেশবাদ থেকে এঙ্গোলা যেসব ভয়ঙ্কর বস্তুর উত্তরাধিকার লাভ করেছে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিধিব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা সেগুলির অন্যতম। দ্বিপাক্ষিক স্বাস্থ্য-কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ডাক্তার, নার্স, কারিগর ও সহায়ক কর্মী পাঠিয়ে এঙ্গোলার চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নয়নে কিউবার প্রধান ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর এঙ্গোলা সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে।

স্বাধীনতা লাভের বছর, ১৯৭৫ সালের শেষ-ভাগে, কিউবার স্বাস্থ্য-কর্মীদের একটি ছোট দল উত্তরাঞ্চলের প্রদেশ কাবিন্দায় উপস্থিত হন এবং ১৯৮২ সালের পরিসংখ্যানে প্রকাশ, আন্তর্জাতিক সেবাকার্যে নিয়োজিত কিউবার চিকিৎসা-কর্মীদের এক-তৃতীয়াংশই এঙ্গোলায় কর্মরত থেকে যান।

১৯৮০ সালে কিউবার চিকিৎসকরা এঙ্গোলার দশ লক্ষ বিশ হাজার ছিয়ানব্বই জন

রোগীর শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং ১৯৮১ সালের কেবল প্রথমার্ধেই ঐ-সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় এগার লক্ষ দু'হাজার চারশ' আশি জনে। ঐ সংখ্যার মধ্যে আরও যে হাজার হাজার ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার, টীকা দান, শিশু ভূমিষ্ঠ-করানো, রোগজীবাণু পরীক্ষা ও রঞ্জন রশ্মি গ্রহণ প্রভৃতি ধরা হয়নি। নিদানিক ব্যবস্থাদির চিকিৎসক ছাড়াও ঔষধ প্রদান, পরিসংখ্যা ও সংক্রামক রোগ তত্ত্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপদেষ্টা এবং মাধ্যমিক স্তরের প্রযুক্তিকর্মী ও পরিসেবিকাদের শিক্ষণ-শিক্ষকও রয়েছেন।

কিউবার চিকিৎসা-কর্মীরা তাঁদের নির্দিষ্ট কাজের মধ্যেই নিজেদের নিবদ্ধ রাখেন নি; বস্তুতঃ তাঁরা এঙ্গোলার জনস্বাস্থ্য মন্ত্রক বা তার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহ রচিত কর্মসূচী রূপায়ণে সহায়তা করেন। স্থানীয় পদস্থ আধিকারিকরা বলেন যে, শিশু পক্ষাঘাত, কুষ্ঠ ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ অভিযানে এবং সংক্রামক রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের কাজে কিউবার অংশ গ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এঙ্গোলার তরুণ-তরুণীদের কিউবায় গিয়ে চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, প্রকৃতিনিদানতাত্ত্বিক, দন্তনির্মাণ কারিগর প্রভৃতি রূপে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কিউবা সরকারের বৃত্তিপ্রদানের উপর বারংবার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিউবার এইসব সহযোগিতা ছাড়াও কিউবার স্থপতিবাহিনী এঙ্গোলায় ব্যাপক গৃহনির্মাণ কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেন।

কিউবার আকাশসীমা লঙ্ঘন

১৯৯৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি দুটি মার্কিনী 'সেসনা' এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমান কিউবার আকাশসীমা লঙ্ঘন করে। এর আগেও এ'ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এই ছোট বিমানগুলি বিগত কয়েক বছর ধরেই কিউবার বড় শহরগুলির ওপর দিয়ে নিচু উচ্চতায় উড়ে গিয়ে প্রচারপত্র, পুস্তিকা, সিগারেটের প্যাকেট এমনকি নেশার ওষুধের প্যাকেট পর্যন্ত ওপর থেকে ফেলেছে। প্রচার পত্র-পত্রিকায় আহ্বান জানানো হয়েছে : কাস্ত্রোকে হত্যা করে কিউবাকে 'গণতন্ত্রী' দেশে পরিণত করার কাজ শুরু করা হোক অবিলম্বে। যতবারই এধরনের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালানো হয়েছে, ততবারই কিউবার সরকার মার্কিনী প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে বলেছে। ১৯৯৬ সালের ১৫ই জানুয়ারি আবার দুটি 'সেসনা' বিমান রাজধানী হাভানার ওপর দিয়ে উড়ে যায় — এবং যথারীতি প্ররোচনামূলক প্রচারপত্র ছড়ায়। জানা যায় যে, ১৯৬১ সালের ব্যর্থ 'বে অব পিগস' আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত কিছু মার্কিনী আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য 'ব্রাদার্স টু দ্য রেসকিউ' নামে একটি কিউবা-বিরোধী সংস্থার মাধ্যমে এই ধরনের কানুন-বিরোধী উদ্যোগের মূল সংগঠক। এঁদের অর্থ যোগায় সি আই এ এবং এফ বি আই।

অবশেষে, কিউবা বাধ্য হয় আকাশ সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে। ২৪শে ফেব্রুয়ারি 'ব্রাদার্স' সংস্থার দুটি 'সেসনা' বিমান ২৪তম অক্ষরেখা পেরিয়ে কিউবার আকাশসীমায় অনধিকার প্রবেশ করলে, বারাকোয়া বিমানঘাঁটি থেকে বিমানগুলিকে ফিরে যেতে বারবার অনুরোধ করা হয়। তাতে কর্ণপাত না করে 'সেসনা' বিমান দুটি নিচু উচ্চতায় রাজধানী হাভানার দিকে এগোতে থাকে। তখন বিমানঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রতিরক্ষা

প্রধান রাউল কাস্ত্রোর অনুমতি চান অনুপ্রবেশকারী মার্কিনী বিমানগুলি রুখে দেবাব জন্য। রাউল কাস্ত্রো জানান : "প্রথমে কিউবার জঙ্গী বিমানগুলিকে 'সেসনা' দুটির কাছাকাছি নিয়ে এসে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হোক; তারপর শূন্যে রকেট ছুঁড়ে ওদের বোঝানো হোক যে, ফিরে না গেলে, কিউবার জঙ্গী বিমান বাধ্য হবে সরাসরি হামলা করতে।" সেইমতো দুটি 'মিগ-২৯' জেট-বিমান উড়ে যায়, এবং 'ভি এইচ এফ' রেডিও'র মাধ্যমে 'সেসনা'র পাইলটদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। উত্তরে তাঁদের শুনতে হয় অকথ্য গালিগালাজ। তারপর সাবধান করতে ছয়টি রকেট ছোঁড়া হয় 'সেসনা' দুটির ওপর দিয়ে। তাতেও কাজ হয় না। বরং মার্কিনী পাইলটরা ঠাট্টা করে বলে যে, কিউবার বিমানবাহিনীর লোকজন শুধু ভীরুই নয়, তারা চোখেও কম দেখে। এরপরই দুটি 'হিট-সিকিং' ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে 'সেসনা' দুটিকে জমিতে পেড়ে ফেলা হয়। বিমানের চারজন আরোহীই নিহত হয়।

শুরু হয়ে যায় কিউবা-বিরোধী মার্কিনী উদ্যোগ। তড়িঘড়ি নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকা হয়। যাতে কিউবার বিদেশমন্ত্রী রোবেরতো রোবাইনা সময়মতো ওই সভার হাজির না থাকতে পারেন, তার জন্য তাঁর 'ভিসা' দিতে দেরি করানো হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ১৬ ঘণ্টা ধরে উত্তপ্ত বিতর্কে চীন ও রাশিয়ার প্রতিনিধিগণ কিউবার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। যা হোক গায়ের জোরে মার্কিনী প্রতিনিধি ও তার তাঁবেদারগণ কিউবার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করায়। শুধু তাই নয় ফ্লোরিডায় বসবাসকারী বিতাড়িত কিউবান গোষ্ঠীর লোকজনের ভোট আদায়ের দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টন, নির্বাসিত কিউবানদের 'সি আই এ' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতা হোর্জে মাসকানোসকে জানান যে, হোয়াইট হাউস, যেমন বার্টন বিলকে দ্রুত কার্যকরী রূপ দেবে। অর্থনৈতিক অবরোধ আরও জোরদার করা হবে। ফ্লোরিডায় অবস্থিত 'রেডিও মার্তি' ও 'টিভি মার্তির' ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হবে। যে সমস্ত দেশ বর্তমানে কিউবার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক/বহুপাক্ষিক বাণিজ্যে নিযুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে 'ক্ষতিপূরণের' মামলা চালানো হবে মার্কিনী আদালতে।

কিউবা যথারীতি নিষ্কম্পচিত্ত। ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন : "৩৫ বছর ধরে যারা আমাদের ভয় দেখিয়ে আসছে, তারা জেনে রাখুন, তাদের আমরা ভয় করি না, ঘৃণা করি। যখন পারমাণবিক ভীতির সামনে কিউবার মানুষ নির্ভয়ে দাঁড়াতে শিখেছে, তখন অর্থনৈতিক অবরোধে তাদের টলানো যাবে না।"

হাইতি

ক্যারিবিয় সাগরে, কিউবার ঠিক পূর্ব দিকের দ্বীপটির দুটি ভাগে দুটি ছোট ছোট দেশ আছে। পূর্বাংশের রাষ্ট্রের নাম ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্র; আর পশ্চিমে রয়েছে হাইতি। ১৯৯১ সালের অক্টোবর হাইতিতে সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জাঁ-বার্ত্রঁ আরিসতিদে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। হাইতিতে অনুষ্ঠিত প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, আরিসতিদে, প্রাক্তন স্বৈরাচারি শাসক "বেবি ডক্‌" দ্যুভলিয়েরের প্রতিভূকে বিপুল ভোটে পরাস্ত করে দেশের নেতৃত্বের ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাউল সেডরাস চকিত আক্রমণ চালিয়ে রাষ্ট্রপতিকে বন্দী করেন, এবং ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। প্রথমে মনে হয়েছিলঃ আরিসতিদেকে অবধারিত ভাবে মেরে ফেলা হবে। অর্গানাইজেশন অব্ আমেরিকান স্টেটস্

(ও এ এস) নামে মার্কিন বশংবদ যে সংগঠন আছে আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে, তাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বিদ্রোহীগণ রাষ্ট্রপতিকে আশ্চর্যজনকভাবে শুধু প্রাণেই যে মারল না, তা নয়, ওঁকে হাইতি ছেড়ে বিমান যোগে চলে যাবারও অনুমতি দিল। সংবাদ যতটুকু পাওয়া যায়, ওই অভ্যুত্থানে ইতোমধ্যেই তিনশ'র বেশি ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

আরিসতিদে যখন প্রথম ক্ষমতায় এলেন বিপুল ভোটাধিক্যে, তখন মার্কিন প্রশাসন তাকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়েছিল। পরে দেখা গেল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুধু নতুন রাষ্ট্রপতির সুসম্পর্কই গড়ে ওঠেনি, তিনি সুযোগ পেলেই কিউবার কড়া সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি। সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক সেডরাস তো স্পষ্টই বলে বেড়াচ্ছে যে, আরিসতিদে দেখা দিয়েছিলেন মার্কিন তাঁবেদার এবং অত্যাচারি শাসক হিসাবেই। পালাবার আগে আরিসতিদের অন্যতম শেষ কাজ নাকি ছিল ঃ পূর্বতন প্রশাসনের নেতা, কারাগারে বন্দী, রজার লাফঁতাঁত কে গুপ্ত হত্যার নির্দেশ দেওয়া। এ'ছাড়া আরিসতিদে ফরাসি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পঞ্চাশ জন কম্যাণ্ডোর একটি ব্যক্তিগত ঝটিকা বাহিনী গড়ে তুলে ছিলেন যাদের সাহায্যে তিনি নানা কীর্তি-কুকীর্তি করিয়ে বেড়াতেন। আর একথা তো' জানাই যে আরিসতিদে হাইতির সংসদে একদল সশস্ত্র গুণ্ডাকে ডেকে এনে তাদের দিয়ে সাংসদদের ভীতি প্রদর্শন করিয়েছিলেন যাতে তাঁরা আরিসতিদের মন-পছন্দ প্রধানমন্ত্রী রেনে প্রেভালের বিরুদ্ধে আনা ভর্ৎসনা প্রস্তাব তুলে নেন।

এদিকে, খ্যাতির বিড়ম্বনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট পড়েছেন মহা অসুবিধায়। ইরাকের বিরুদ্ধে হিংস্র যুদ্ধে সাফল্য আর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের তাৎক্ষণিক অস্বস্তির সুযোগে তিনি তাঁর নয়া "বিশ্ব ব্যবস্থার" ফর্মান জারি করেছিলেন সোচ্চারে। এখন অসুবিধার বিষয়টি এই যে, তিনি মার্কিন প্রশাসনকে কিছুতেই আর হাইতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে এগোনোর নির্দেশ দিতে পারেন নি। কারণ স্পষ্ট। ও এ এস থেকে বহুবার, বিভিন্ন মঞ্চে মার্কিন প্রশাসনকে বোঝানো হয়েছে যে, আঞ্চলিক দেশগুলির অন্তরীণ ক্ষেত্রে সরাসরি মার্কিনী হস্তক্ষেপ, উপকারের চাইতেও অপকার বেশি করবে কারণ তা'হলে কিউবার বিরুদ্ধে সোচ্চারে ধিক্কার জানানোর কিঞ্চিৎ অসুবিধা দেখা দিতে পারে। হাজার হোক, কাস্ত্রো তো আগাগোড়াই বলে আসছেন যে, আগ্রাসন ছাড়া মার্কিন প্রশাসনের অন্য কোন পথ পছন্দ নয় লাতিন আমেরিকার "সমস্যা সমাধানে"। আর, পেন্টাগনের মুরুব্বিরা বোধহয় ইতোমধ্যেই বুশ কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হাইতির মত রাজনৈতিক ভাবে অস্থির দ্বীপে সম্মান নিয়ে একবার অনুপ্রবেশ করলে, ছেড়ে আসা মুশকিল। শেষবার যখন ১৯৯৫ সালে মার্কিন সেনা দল বেয়নেট উঁচিয়ে হাইতি-তে "হস্তক্ষেপ" করতে গিয়েছিল তখন তারা পরবর্তী উনিশ বছর বেরিয়ে আসার পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি। মার্কিন প্রশাসন ভেবেছিলেন ঃ দেশের দোরগোড়ায় এ'রকম একটা সামরিক অভ্যুত্থান নীরবে মেনে নেবেন নাকি হস্তক্ষেপের ঝুঁকি নিয়েই ফেলবেন।

হাইতির বিপন্ন সার্বভৌমত্ব

লাতিন আমেরিকার ৬০ লক্ষ মানুষের ছোট্ট দেশ হাইতির সার্বভৌমিত্ব আজ বিপন্ন। গণতন্ত্র রক্ষার নামে মার্কিন সেনাবাহিনী আজ হাইতির বুকে সর্বময় কর্তার ভূমিকা পালন করে চলেছে। সেখানকার সামরিক বাহিনী পরিচালিত প্রেসিডেন্ট লেফটেনেন্ট জেনারেল রাউল কেদ্রাস

পদত্যাগ করেছেন এবং দেশত্যাগ করেছেন। নির্বাচিত অথচ নির্বাসিত প্রেসিডেন্ট জীন বার্ট্রান্ড অ্যারিসাতাইড মার্কিনী সেনা পরিবৃত হয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং প্রেসিডেন্টেব দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী ১৯৯০ সালে হাইতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অ্যারিসতাইড দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি হাইতির প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভাব গ্রহণ করেন। কিন্তু দশ মাসও দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করতে পারেন না। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে হাইতিতে সামরিক অভ্যুত্থান হয়। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট অ্যারিসতাইড ক্ষমতাচ্যুত হন। তিনি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে যান। ১৯৯১ সালেরই ৮ই অক্টোবর জোসেফ নেরেতি হাইতির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। হাইতির সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন, সেখানকার মানুষের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করার কোন ক্ষমতা ও দক্ষতা নেই এই অজুহাতে আমেরিকা হাইতিতে সৈন্য প্রেরণ করে। এর পূর্বে অবশ্যই যথারীতি আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন আদায় করে। দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হাইতির অভ্যন্তরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, চার্চ, এবং আদালত, দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগও গ্রহণ করে। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ও এ এস-এর উদ্যোগে প্রেসিডেন্ট অ্যারিসতাইড এবং সিনেট ও জাতীয় পরিষদের মধ্যে একটি বৈঠক হয়। ঐ বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অ্যারিসতাইড দেশে ফিরে আসবেন। রেনে থিওডারের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হবে। অ্যারিসতাইডও সেই সরকারে যোগদান করবেন। এই চুক্তি মত দেশের রাজনৈতিক সংকটের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে এগুতে থাকে। কিন্তু এই চুক্তি নিয়ে হাইতির সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। সুপ্রিম কোর্ট চুক্তির শর্তগুলি খারিজ করে দেয়। ফলে দেশের অভ্যন্তরে যে অচলাবস্থা চলছিল সেই অচলাবস্থার তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অচলাবস্থার নিরসনের লক্ষ্য নিয়ে হাইতির সামরিক বাহিনীর প্রধান লেফটেনান্ট জেনারেল রাউল কেদ্রাস দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে হাইতির প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। হাইতির সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়।

কেদ্রাস হাইতির প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে হাইতির উপর মার্কিনী চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাইতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে। দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বৃদ্ধি পায়। গুপ্তহত্যা, চোরাচালান ইত্যাদি বেড়ে যায়। হাইতির মাফিয়া গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক মাফিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই মাফিয়া জোটকে আমেরিকা পুরোপুরি মদত দেয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হাইতির বিরুদ্ধে কেবল যে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা হয় তাই নয়, হাইতি আক্রমণ করারও সকল ব্যবস্থা আমেরিকা গ্রহণ করে। সেখানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে এই সৈন্য সংগ্রহ করা যায়। হাইতির রাজনৈতিক নিরাপত্তা, জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই পটভূমিকাতেই কেদ্রাস পদত্যাগ করেন, নতুন সরকার গঠনের পথ পরিষ্কার করে দেবার লক্ষ্য নিয়ে। অ্যারিসতাইড ১৫ই অক্টোবর দেশে ফিরে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দেশের শাসনভার গ্রহণ করলেও সেখানে কি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবার কোন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে!

বিশ্বের অন্যতম দাসরাষ্ট্র হাইতির পাঁচশ বছরের ইতিহাসটাই পরাধীনতার ইতিহাস, দাসত্বের ইতিহাস। প্রথমে স্পেন, তারপর ফ্রান্স এবং সর্বশেষ আমেরিকা বার বার চেষ্টা করেছে সফলও হয়েছে। কিন্তু হাইতির নিপীড়িত জনগণ বার বার বিদ্রোহ করেছেন। এই হাইতির বুকেই সংগঠিত হয়েছে ১৭৯১ সালের ইতিহাস খ্যাত দাস বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে চল্লিশ হাজার দাস শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দাস বিদ্রোহ সারা বিশ্বের দাস শ্রমিকদের মধ্যে নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। চার বছর ধরে সেখানে একটানা বিদ্রোহ চলে, ১৭৯৫ সালে হাইতিতে দাস প্রথার অবসান ঘটে। আবার এই দাস বিদ্রোহই সে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন—যে স্বাধীনতা অর্জিত হয় ১৯১৫ সালে। ১৯১৫ সালে হাইতি স্বাধীনতা অর্জন করলেও আজ পর্যন্ত সে দেশ একদিনের জন্যও স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করে নি। ১৯১৫ সালেই হাইতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে চলে যায়, ১৯৩৪ সাল অবধি সে আমেরিকার অধীনে থাকে। এরপর আবার ১৯৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাইতিতে সেনা প্রেরণ করে এবং প্রথমে পাপা ডক ডুভেলিয়ার এবং পরে বেবি ডক ডুভেলিয়ার পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা করার জন্য সি আই এ হাইতির অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে। ডুভেলিয়ার সরকার হাইতির সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী সরকার হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করে। আমেরিকার মদতপুষ্ট ডুভেলিয়ার সরকার জনগণ থেকে ছিল পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। এমন কি সেনাবাহিনীও এই সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে এবং ১৯৮৬ সালে সেনাবিদ্রোহ হয়। ডুভেলিয়ার সরকারের পতন ঘটে। বেবি ডক ডুভেলিয়ার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। সেনাপ্রধান জেনারেল হেনরি নামফি'র নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে লেসলি ম্যানিগেট প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু ৬ মাসের মধ্যে আবার সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নামফি ক্ষমতা দখল করে। তিনিও তিন মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে লেফটেনান্ট জেনারেল গ্রসপার আভ্রিল এই ১৯৮৮ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষমতা দখল করেন। একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি হিসেবে হাইতির বুকে চরম রাজনৈতিক সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। জনগণের মধ্যে দেখা যায় অসন্তোষ। গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়। হাজার হাজার মানুষ কারারুদ্ধ হন। গণবিক্ষোভের মুখে আভ্রিল পদত্যাগ করেন। ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে এরথা পাসাল ট্রুলোট হাইতির অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে গণভোট এবং নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জিয়ান বার্টান্ড অ্যারিসতাইড প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

লাতিন আমেরিকা : মার্কিন প্রভাব ক্ষীয়মাণ

কিছুদিন আগে আমেরিকায় তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেছে। একটি হলো মধ্য আমেরিকার পাঁচ রাষ্ট্রপতির শীর্ষ বৈঠক। দ্বিতীয়টি হলো কনটাডোরা ও লিমা রাষ্ট্র গোষ্ঠীর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক। তৃতীয়টি হলো কারাকাস শহরে ১৩টি দক্ষিণ আমেরিকান রাষ্ট্রের

পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক। ওই বৈঠকগুলির ফলাফলগুলি সম্পর্কে এককথায় বলা যায়, ওই অঞ্চলটিতে ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ মার্কিন প্রভাব এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে শক্তিশালী ঐক্য ও সহযোগিতাই বৈঠকেব সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকা চিবদিনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়ে আসছে। আর মধ্য আমেরিকা হলো মার্কিন প্রশাসনের দক্ষিণ আমেরিকা সংক্রান্ত নীতির কেন্দ্রবিন্দু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আমেরিকাকে পূর্ব-পশ্চিম সংঘাতের পক্ষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বলে গণ্য করে এবং এই অঞ্চল থেকে সাবেক সোভিয়েত এবং কিউবার প্রভাব ঠেকাতে ও নিশ্চিহ্ন করতে প্রবল চেষ্টা করেছে। একদিকে গ্রেনাডায় আগ্রাসী পদক্ষেপ নিয়ে ও নিকারাগুয়ায় 'স্বল্প তীব্রতার যুদ্ধ' চালিয়ে এবং অন্যদিকে মধ্য আমেরিকার দেশগুলিতে 'গণতন্ত্রীকরণ'-এ উৎসাহ দিয়ে ও তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে ওই নীতিটা রূপায়ণের চেষ্টা করেছে। নিকারাগুয়া বাদে মধ্য আমেরিকার অন্যান্য সমস্ত দেশে মার্কিন সাহায্য প্রতি বছর বেড়েই চলে। ফলে এই অঞ্চলের কয়েকটি দেশ শান্তির প্রক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করছে। এর ফলে কনটাডোরা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যস্থতা কবার চেষ্টা বিফল হয়।

সম্প্রতি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এই অঞ্চলের সমস্যাগুলির রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দূরে সরিযে রাখতে শুরু করে। মধ্য আমেরিকার পাঁচ রাষ্ট্রপতির শীর্ষ বৈঠকে এটা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ওই শীর্ষ বৈঠকের অল্প কয়েকদিন আগে মার্কিন প্রশাসন ওই অঞ্চলের জন্য একটি ছয়দফা শান্তি প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু মধ্য আমেরিকার নেতৃবৃন্দের তাগিদে কোস্টারিকার রাষ্ট্রপতি অসকার আরিয়াস ফার্ণান্ডেজ যে শান্তি প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন সেটি তাঁদের আলোচনার ভিত্তিরূপে গৃহীত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটি শান্তিচুক্তিতে সই করতে সফলও হ'ন। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেকায়দায় পড়ে যায়।

কারাকাসে দক্ষিণ আমেরিকার ১৩টি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠক হয়। ওই বৈঠকের আলোচনায় বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির এবং যত শীঘ্র সম্ভব মধ্য আমেরিকায শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্প পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বৈঠকের শেষে মধ্য আমেরিকা শান্তি চুক্তির রূপায়ণের তদারকির জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয়। এই সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপটি দেখিয়ে দেয় কিভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষিণ আমেরিকার আকাঙ্ক্ষা এবং তা লাভ করার শক্তি ক্রমশঃ বাড়ে।

এই সমগ্র অঞ্চলটাতে মার্কিন প্রভাব ক্রমশঃ কমছে। মালভিনাস যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবটার প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কয়েকটি রাষ্ট্র তো এমন প্রস্তাবও করেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির একটি সংগঠক স্থাপন করা হোক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু মেরামতীর কাজ করার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ আমেরিকার সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা উন্নতি ঘটলেও, মধ্য আমেরিকা এবং ঋণের সমস্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। দক্ষিণ আমেরিকা রাজনৈতিক সমাধানের মারফত মধ্য আমেরিকার গোলযোগগুলির দ্রুত অবসান চায়। তারা বিদেশী হস্তক্ষেপের প্রবল বিরোধী এবং তাদের দাবি হলো, মধ্য আমেরিকার দেশগুলির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ ও হুমকী বন্ধ করতে

অনিচ্ছুক। ঋণের প্রশ্নে, এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পাওনাদার এবং রপ্তানি দ্রব্যের সবচেয়ে বড় বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব সম্পর্কে শীতল ও কঠোর মনোভাব নিয়েছে। ওই প্রস্তাবগুলির মধ্যে আছে, আলাপ আলোচনার প্রস্তাব, ঋণের জন্য ঋণগ্রস্ত এবং ঋণদাতা দেশ উভয়ের দায়িত্ব বহন, ঋণের বোঝা লাঘব করা এবং বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি বর্জন করার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকার করায় তা দক্ষিণ আমেরিকায় অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। নিজেদের সকলের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি এখন ঐক্য, সহযোগিতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে একই অবস্থান গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তিশালী করেছে। মধ্য আমেরিকার সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্দেশ্যে তারা কনটাডোরা ও লিমা রাষ্ট্রগোষ্ঠী গঠন করেছে। ঋণ সম্পর্কের পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে গঠন করেছে কারটাজেনা গোষ্ঠী।

ব্রেজিলে এক সাম্প্রতিক বৈঠকে কনটাডোরা ও লিমাগোষ্ঠীর পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা তাদের কাজকর্মগুলি ধারাবদ্ধ করার জন্য আট সদস্য রাষ্ট্রের এক শীর্ষ বৈঠক ডাকে। এতদিন আমেরিকার সমস্ত শীর্ষ বৈঠক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত হবার যে রীতিটা প্রচলিত ছিল, পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের দরুন তা লঙ্ঘিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ আমেরিকার সম্পর্কের উপর এর প্রভাব হয় অপরিসীম।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ আমেরিকার সম্পর্কে শীগগিরই কোনো নাটকীয় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। কারণ সমস্যাগুলি দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে, মধ্য আমেরিকার দ্বন্দ্বগুলিও বেশ জটিল, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির বাধা বিঘ্ন বিরাট এবং এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব সবিশেষ ভাবেই রয়েছে। তবে, যেটা সুনিশ্চিত, তা হলো, দক্ষিণ আমেরিকা শক্তিশালী হচ্ছে, আরো ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

লাতিন আমেরিকা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে

লাতিন আমেরিকার দেশগুলি অতি দ্রুততার সঙ্গে একতার পথে এগুচ্ছে। আঞ্চলিক ঐক্য গঠনের প্রক্রিয়া সেখানে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৯০ সালের ৯ই মে কারাকাসে লাতিন আমেরিকার মন্ত্রী পর্যায়ের অর্থনৈতিক কমিশনের ২৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে ১৯৯০ সালের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রণকৌশল এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নে আঞ্চলিক স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে হবে। এরপর ১৯৯০-র ২২ থেকে ২৪ শে মে আন্দিন চুক্তিভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপতি পর্যায়ের তিনদিনের শীর্ষ বৈঠক প্রাচীন শহর মাচু পিকচুতে অনুষ্ঠিত হয়। শীর্ষ বৈঠক থেকে একতার প্রক্রিয়া কীভাবে এগুচ্ছে তা খতিয়ে দেখার জন্য রাষ্ট্রপতি পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৯০ সালের ২৫শে মে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং চিলি অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জুন মাস থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। তিন দেশের যুক্ত বিবৃতিতে লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিকে এই বাণিজ্য অঞ্চলে যোগদানের আবেদন জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকা যাতে নিজের স্থান বেছে নিতে পারে সেজন্যই এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আর এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় ও সঙ্গতি রেখে। লাতিন আমেরিকার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। লাতিন আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটার পর সেখানকার অধিকাংশ দেশের উপর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লাতিন আমেরিকায় পশ্চিম ইউরোপের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। পাশাপাশি বৃদ্ধি পেতে থাকে আমেরিকার প্রভাব। ১৯৬০-র দশক থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়। ঐ বছরই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও মেক্সিকো'র বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৮০-র দশকের শুরুতেই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটে এবং বিশেষ করে মধ্য আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী মধ্য আমেরিকার পাঁচটি দেশ ও কন্টাডোরা গ্রুপের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করে। পাশাপাশি রাজনৈতিক আলোচনার কার্যক্রমও স্থির হয়। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি কার্যকর হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে লাতিন আমেরিকায় সম্পর্ক পূর্ণাঙ্গভাবে সরকারী পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। কেবলমাত্র ১৯৮৭ সালের জুন মাসে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির প্রতি পশ্চিম ইউরোপ তার নীতির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে। ঘোষণা করে যে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী এজন্য লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে। এ বছরের এপ্রিল মাসে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মধ্য আমেরিকার পাঁচটি দেশের তিন বছরের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী স্থির করে যে, এই পাঁচটি দেশে অর্থনৈতিক সাহায্য ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে বৃদ্ধি করা হবে।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক একতা প্রতিষ্ঠা করার বাস্তব সম্ভাবনাও বিদ্যমান। গত ত্রিশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে লাতিন আমেরিকার দেশগুলি এই সত্যে উপনীত হয়েছে যে, লাতিন আমেরিকার বুকে স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকল্প কোন রাস্তা নেই। আর এই স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে লাতিন আমেরিকায় আঞ্চলিক সাধারণ বাজার গড়ে তোলা।

দ্য লাতিন আমেরিকান ইনটিগ্রেশন অ্যাসোসিয়েশন, দ্য আন্দিয়ান গ্রুপ এবং দ্য সেন্ট্রাল আমেরিকান কমন মার্কেট যৌথভাবে অর্থনৈতিক একতার কর্মসূচী রূপায়ণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। লাতিন আমেরিকার গ্রুপ-৮ ভুক্ত দেশগুলি লাতিন আমেরিকার মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এই গ্রুপ-৮ একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক

একতা আরো সংহত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিক তেমনি লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গেও সহযোগিতার সম্পর্ক উন্নত করার কর্মসূচী নিয়েছে। একই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে দ্য লাতিন আমেরিকান অর্থনৈতিক কমিশন। এই কমিশন একদিকে যেমন লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক একতা সৃষ্টি, অন্যদিকে ক্যারিবিয়ান দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সংহতি ও অর্থনৈতিক জোট গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছে।

আফ্রিকা

নামিবিয়ার স্বাধীনতা অর্জনেব সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আফ্রিকা পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়। বর্তমানে স্বাধীন দেশের সংখ্যা ৫২টি। এই শতাব্দীর শুরুতে ৫২টি দেশের মধ্যে ৫০টি দেশই ছিল পরাধীন। ব্যাতিক্রম - ইথিওপিযা এবং লাইবেরিয়া। এই দুটি দেশ স্বাধীন থাকলেও সেই স্বাধীনতা ছিল নামমাত্র।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমী দুনিয়ার উপনিবেশবাদীরা আফ্রিকায় প্রবেশ করে। উপনিবেশবাদীরা সেখানে প্রবেশ করার সময় থেকেই আফ্রিকার জনগণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তীব্রতা লাভ করলেও এই সংগ্রামের কার্যকর সাফল্য শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — এই অন্তর্বর্তী সময়ে কেবলমাত্র মিশর স্বাধীনতা অর্জন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিকাশিত হয় এবং ১৯৫০ ও ১৯৬০-র দশকে বিজয়ের শীর্ষে উন্নীত হয়। স্বাধীনতা অর্জন করে লিবিয়া - ১৯৫১ সালে। ১৯৫৬ সালের পর একের পর এক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে আফ্রিকার ৩৯টি দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। একমাত্র ১৯৬০ সালেই ১৭টি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম কিন্তু একই ধরনের পথ ধরে চলে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন পথে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে। আলজেরিয়া, কেনিয়া, অ্যাঙ্গোলা এবং মোজাম্বিক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। ঘানা এবং কিনিয়ার স্বাধীনতা অর্জিত হয় গণ-ভোটের মধ্য দিয়ে। অন্যান্য দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে গণ-সংগ্রামের মাধ্যমে। অধিকাংশ দেশেই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করে। মরোক্কো, লেসোথো এবং সোয়াজিল্যান্ডে স্বাধীনতার পর সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। লিবিয়া এবং মুরুন্ডিতে প্রথমে রাজতন্ত্র, পরে দলহীন রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা হয়। বাকি অধিকাংশ দেশে প্রবর্তিত হয় বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ দেশ ব্যক্তি উদ্যোগ ও বাজারভিত্তিক অর্থনীতি চালু করেছে।

দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল ভাঙছে। আজ সমগ্র আফ্রিকা স্বাধীন।

কিন্তু সেখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শগত উপনিবেশবাদের প্রভাব খুবই প্রকট। সেজন্য আফ্রিকার উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় নি। সংগ্রাম নতুন রূপ নিয়েছে।

পশ্চিমী দুনিয়ার দেশসমূহ আফ্রিকার মূল আর্থনীতি ধ্বংস করে ঐ সমস্ত দেশকে রূপান্তরিত করেছে কাঁচামাল উৎপাদনের দেশে নতুবা এক শিল্পভিত্তিক দেশে। প্রধান প্রধান শিল্প, খনি, বাগিচার মালিকানা বিদেশীদের হাতে। উৎপাদিত পণ্যের বড় অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ফলে আফ্রিকা অধিকাংশ দেশেই খাদ্যশস্যের স্বল্পতা রয়েছে। অথচ একসময় আফ্রিকা ছিল বিশ্বের খাদ্যশস্য ভাণ্ডার। শিল্প এবং যানবাহন ব্যবস্থার হাল খুবই খারাপ। বৈদেশিক বাণিজ্য সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। স্বাধীনতাব পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি।

সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো বিভিন্ন দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে। সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভাষা বা জাতিগত প্রশ্নের উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। এর ফলে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভূখণ্ড নিয়ে বিরোধ, সীমানা যুদ্ধ, জাতিগত সংঘাত হামেশাই লেগে আছে। এর ফলে ঐ সমস্ত দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট খুবই প্রকট। সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকাব জাতীয় সংহতিকেও ক্ষুণ্ণ করেছে। অধিকাংশ দেশের নর-নারী পশ্চিমী দেশসমূহের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। নিরক্ষরতার হার বেশি থাকায় সমস্ত দেশ নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারে নি।

সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক ব্যাপার হলো, আফ্রিকার কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ এখনও পরাধীন। এই সমস্ত পরাধীন দ্বীপ হলো - নামিবিয়া উপসাগরের ওয়ালভিসা, মরোক্কোর সেন্টা এবং মেলিল্লা এবং বমোরোসের মেয়োতে। এগুলি পরাধীন থাকায় বহু দেশ নিজ নিজ ভূখণ্ডের অখণ্ডতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

আজ আফ্রিকার দেশগুলির সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, স্বনির্ভরতা সমস্যা। সেখানকার দেশে দেশে আজ স্বনির্ভরতার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। আর এই সংগ্রামে একটি বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে জিম্বাবোয়ে। জিম্বাবোয়ে ইতিমধ্যেই খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। রেকর্ড খাদ্যশস্য উৎপাদনের কৃতিত্বস্বরূপ জিম্বাবোয়ের রাষ্ট্রপতি রবার্ট মুগাবেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্মানিত করেছে। আফ্রিকার নবগঠিত সরকারগুলিকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিদিন। কয়েকটি দেশের সরকার বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত খনি, শিল্প, বাগিচার মালিকানা বাজেয়াপ্ত করে সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে। আফ্রিকার বুকে থেকে উপনিবেশবাদের প্রভাব দূঢ় করতে ঐ মহাদেশের বিভিন্ন দেশ মিলে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করেছে। এই জোটের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো, সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি। আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে সীমান্ত বিরোধ সৃষ্টি হয় তার নিষ্পত্তি ঘটায়। আজ এই সংস্থার উপর যে নতুন দায়িত্ব বর্তেছে, তা হলো আফ্রিকাকে উপনিবেশবাদের প্রভাব মুক্ত করা।

দক্ষিণ ইয়েমেন

বিগত কয়েক বছরে ইয়েমেনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে বহু অগ্রগতি ঘটেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পদ্ধতি বিশেষ করে অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের প্রশ্নে পার্টির অভ্যন্তরে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রচণ্ড মতবিরোধ চলছিল। দেশের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল। সম্প্রতি সেখানে পরিস্থিতির এত দ্রুত অবনতি ঘটে যে, ইয়েমেনের পথে পথে রক্তাক্ত লড়াই শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কয়েকটি পূর্ব ইউরোপের দেশের কূটনীতিবিদেরা ইয়েমেন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। দক্ষিণ ইয়েমেনের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বিশেষ করে সিরিয়া, লিবিয়া এবং উত্তর ইয়েমেন দক্ষিণ ইয়েমেনের দুঃখজনক ঘটনাবলীতে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সেখানকার সমস্যাবলীর শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আবেদন জানিয়েছে।

দক্ষিণ ইয়েমেনের জনগণ ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করে বিজয়ী হন। স্বাধীনতা অর্জনের পর সেখানকার জনগণ দেশের বহু জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। সেই ইয়েমেন এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

১৮৩৯ সালে ইয়েমেন ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়। অবশ্য সেখানে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে ১৯৫৪ সালে। এই দীর্ঘ সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেখানকার সুলতানদের সাহায্যে ইয়েমেনে শাসন পরিচালনা করত। ১৯৫৪ সালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সরাসরিভাবে ইয়েমেনের শাসনভার গ্রহন করে। তখন থেকেই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনের বুকে কঠোর কঠিন সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার ইয়েমেন এবং তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি রাষ্ট্রের মিলনে একটি ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দেয়। তখন সুলতানেরা প্রমাদ গোনেন এবং ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ইয়েমেনকে মুক্ত করার জন্য ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব সাউথ ইয়েমেন নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃত্বে ইয়েমেনের ৮টি ফ্রন্টে গেরিলাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালে ইয়েমেন স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ইয়েমেন উত্তর এবং দক্ষিণ এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। লিবারেশন ফ্রন্ট দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৫ সালে তিনটি গণতান্ত্রিক দলকে নিয়ে জাতীয় লিবারেশন ফ্রন্ট গঠিত হয়। দক্ষিণ ইয়েমেনের সোস্যালিস্ট পার্টি এই ফ্রন্টের নেতৃত্বে আসীন হয়। ১৯৮০ সালে ইয়েমেনের সোস্যালিস্ট পার্টি একটি বিশেষ কংগ্রেস করে। এই কংগ্রেস থেকে পাঁচজনের পলিটব্যুরো এবং ৪৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে আলি নাসের আহম্মদ দক্ষিণ ইয়েমেনের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই দলের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক প্রশ্নে মতাদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়। সেই বিরোধের ফলশ্রুতি ইয়েমেনের এই দুঃখজনক ঘটনা।

লিবিয়া

লিবিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা গভীর চক্রান্ত শুরু করে। সোস্যালিস্ট পিপলস লিবিয়ান আরব জামাহিরিয়ার অভ্যান্তরীণ পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং

ইজরায়েলের প্রচারযন্ত্রগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে লিবিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে থাকে। ন্যাটো সদাস্যভুক্ত পশ্চিম ইউরোপে কয়েকটি দেশ এই অপপ্রচারে নিজেদের যুক্ত করে। ১৯৮৬ সালে ভিয়েনা এবং রোমে বিস্ফোরণের ফলে যে বিমান দুর্ঘটনায় বহু নর-নারী নিহত হন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সেই ঘটনার জন্য লিবিয়াকে দায়ী করে। এই অজুহাতে তারা লিবিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রচার শুরু করে। লিবিয়া এই সমস্ত দুঃখজনক ঘটনার দায়-দায়িত্ব বার বার অস্বীকার করে। কিন্তু পশ্চিমী প্রচার যন্ত্রগুলি লিবিয়ার কথায় কর্ণপাত না করে লিবিয়ার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচার অভিযান চালিয়ে যেতেই থাকে। বার বার তারা সত্যকে অস্বীকার করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ এরই মধ্যে হোয়াইট হাউসে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাবে লিবিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে কি ধরনের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে নির্দেশিকা রয়েছে। তিনি বলেন যে, লিবিয়া সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল। সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে হলে লিবিয়াকে শায়েস্তা করতে হবে। এর পরই মার্কিন রণতরী ষষ্ঠ নৌবহর লিবিয়া দরিয়ায় উপনীত হয়। একই সময়ে তেল অভিভ থেকে লিবিয়ার বিরুদ্ধে হুমকি ছাড়া হয়। প্রাক্-নববর্ষ ভাষণে ইসরায়েল বলে যে, লিবিয়াকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে গোষণা করা হোক এবং লিবিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অবরোধ গড়ে তোলা হোক। উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক অফিসারেরাও একই দাবি করেন।

পরবর্তীকালে একই ধারায় প্রচার অভিযান চলে। লিবিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিনী প্রচারের তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় ঃ (১) লিবিয়া সরকাবকে বিশ্ব জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা; (২) লিবিয়ার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা; (৩) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তথা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমারিক ঘাঁটি স্থাপনের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে, লিবিয় বিরোধী প্রচারে পশ্চিম ইউরোপের ন্যাটোভুক্ত দেশগুলিকে সমবেত করে। এই সমস্ত দেশের কাছে আবদন জানিয়েছে, লিবিয়াতে রপ্তানি বন্ধ করতে, লিবিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে। এর পূর্বে ব্রিটেন লিবিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ওয়াশিংটনের চাপেই ব্রিটেন এই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু ত্রিপোলীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের পথে অগ্রসর হতে পারে নি। পশ্চিম জার্মানি, ইতালী এবং অন্যান্য কয়েকটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের উপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুরূপ চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সমস্ত দেশ লিবিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে অস্বীকার করে।

সি আই এ লিবিয়া সম্পর্কে একটি অতি গোপনীয় নোট তৈরি করে। ওয়াশিংটন পোস্টের বিশিষ্ট সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড সেই নোট ফাঁস করে দিয়ে লেখেন মার্কিন প্রশাসন লিবিয়ার বিরুদ্ধে একটি গোপন আক্রমণ হানার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সেই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান গদ্দাফিকে অপসারিত করা। এই পরিকল্পনার ব্লু প্রিন্টে বলা হয় লিবিয়ার অভ্যন্তরে লিবিয়ার জামাহিরিয়াদের মধ্যে এমন অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে সেখানে আঞ্চলিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং লিবিয়ার বর্তমান নেতৃত্বকে অপসারিত করা সহজসাধ্য হয়।

লিবিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ষড়যন্ত্র অবশ্য নতুন কোন ঘটনা নয়। ১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ার শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৮১ সালে মিশর ও অন্যান্য কয়েকটি আরব দেশের সহায়তার গদ্দাফি সরকারকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ বছরই লিবিয়া উপকূলে ষষ্ঠ নৌবহর অবতরণ করে। ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুদ্ধ বিমান অবৈধভাবে লিবিয়ার আকাশে মহড়া দেয়। ১৯৮৬ সালে জানুয়ারি মাসে লিবিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪০টি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে। ত্রিপোলীর অভ্যন্তরে যাতে আঘাত হানা যায় সে জন্য ষষ্ঠ নৌবহর লিবিয়া দরিয়ায় মোতায়েন রাখা হয়।

৩৫ লক্ষ নরনারীর দেশ লিবিয়ার বুকে অশান্তি সৃষ্টির মার্কিনী অপপ্রয়াসে আসল উদ্দেশ্য কি ছিল?

প্রথমত, যে কোন মূল্যে আরব অঞ্চলের পরিস্থিতি ঘোরালো করে তোলা, সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাবলী শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। যখন লেবানন সমস্যা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য নানা পর্যায়ে আলাপ আলোচনা চলেছে ঠিক তখনই লিবিয়াকে অশান্ত করে তোলার পিছনে যে গভীর দুরভিসন্ধি রয়েছে তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় নি।

দ্বিতীয়ত, আরব দুনিয়ায় যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে তা দুর্বল করা। তা ছাড়া ওয়াশিংটনের অপছন্দ ত্রিপোলী সরকারকে দুর্বল করা। সম্প্রতি গদ্দাফি মার্কিন সাংবাদিকদের অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূমধ্যসাগর এলাকার ৪০টি যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করে বিপজ্জনক পথ গ্রহণ করেছে। এই ঘটনা লিবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়।

নামিবিয়া

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বতন বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার নামিবিয়ার জেলখানাগুলিতে বন্দী দেশপ্রেমিকদের উপর নৃশংসতম অত্যাচার চালায়। বন্দীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেওয়া হয় বন্দীদের উপর। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন দক্ষিণ অফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ৬ জন সদস্যের একটি গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরি করে।

রিপোর্টে বলা হয়, নামিবিয়ার ওপর অত্যাচারের নীতি হিসাবেই শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অত্যাচার চালিয়ে যায়। রাজনৈতিক বন্দী ও ধৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়, এমনকি বিষাক্ত সাপের ছোবলও দেওয়া হয়।

তখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকাতেও কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ও শিশুদের অবস্থাও খারাপ ছিল। মহিলা ও শিশুদের জোর করে উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠানো হয়।

রিপোর্টে উল্লেখ করার হয়, জলসংকট সত্ত্বেও বন্ধ্যা জমিকে উর্বর করার জন্য কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা সংগ্রাম করে যান। অভাব ছিল খাদ্য, শিক্ষা চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার।

কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় পিতাদের অনুপস্থিতিতে শিশুরা ভোগে অপুষ্টি ও নানারকম রোগে।

স্বাধীনতা অর্জন

১৯৯০ সালের ২১শে মার্চ নামিবিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। ঔপনিবেশিকতার শেষ শৃঙ্খলটি ছিঁড়ে যায়। স্বাধীনতার জন্য, বর্ণ-বিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেন নামিবিয়ার জনগণ। ২১শে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সেদিন আফ্রিকার এই কালো মানুষের দেশে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়ক। স্বাধীন নামিবিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করনে স্যাম নুজোমা। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব জেভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার। এই স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়ক। নামিবিয়ার স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সমস্ত শীর্ষস্থানীয় নেতাদের উপস্থিতি এই নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছে ।

আফ্রিকার এই ছোট দেশ নামিবিয়া একশ' বছরের বেশি সময় পরাধীন ছিল। উনবিংশ শতাব্দী ইউরোপীয় শক্তিসমূহের উপনিবেশবাদের বিকাশের যুগ। সেই সময় ইউরোপীয় শক্তিসমূহ আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা বা নামিবিয়া জার্মানির ভাগে পড়ে। ১৮৮৪ সালে জার্মানি নামিবিয়া দখল করে। হেরেরো এবং নামা এই দুই জাতিগোষ্ঠী নিয়ে নামিবিয়া। জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষক। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মানি হেরেরো এবং নামাদের জমি দখল নেবার অভিযান শুরু করে। ১৯০৭ সালে জেনারেল ভন ত্রোথা নামিবিয়ার এই দুই জাতিগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দেয়। ৬৫ হাজার হেরেরো নিহত হন। মাত্র ১৫ হাজার হেরেরো কোনোক্রমে বেঁচে যান। তাঁদের জমি এবং বিষয়-সম্পত্তি বাতিল করা হয়। এঁরা পরিণত হন ভূমিদাসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জেনারেল লুইস বোতা এবং জান স্মাট-এর নেতৃত্বে মিত্রশক্তির নামে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯১৪ সালে জার্মানিকে পরাজিত করে নামিবিয়ার দখল নেয়। বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি পূর্বতন জার্মান উপনিবেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে এবং স্থির হয় যে, নামিবিয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে লীগ অব নেশনস্। গ্রেট ব্রিটেনের দাবি ছিল নামিবিয়াকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশাসনিক কর্তৃত্বে আনা হোক। দক্ষিণ আফ্রিকা তখন ব্রিটেনের উপনিবেশ। ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল, নামিবিয়ার উপর পরোক্ষে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হোক। পরবর্তীকালে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের দাবিই বাস্তবায়িত হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা নামিবিয়ার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি বিশ্বের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশ স্বাধীনতা অর্জন করে। কোথাও শান্তিপূর্ণ উপায়ে, আবার কোথাও সশস্ত্র উপায়ে। নামিবিয়ার দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক জনগণ স্বাধীনতার দাবিতে দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ধরেন। আর সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য গঠিত হয় *দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা গণসংস্থা বা সোয়াপো। সোয়াপোও প্রথমিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ* আন্দোলন পরিচালনা করে। কিন্তু নামিবিয়ার শাসকগোষ্ঠী সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্যর্থ

করতে প্রচণ্ড দমন-পীড়ন অত্যাচাবের পথ গ্রহণ করে। কযেক হাজার দেশপ্রেমিককে কারাবুদ্ধ করা হয়। বহু ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই পটভূমিকায় সোযাপো দেশের স্বাধীনতা জন্য সশস্ত্র সংগ্রামেব কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের ২৬শে আগষ্ট গঠিত হয় নামিবিয়ার পিপল্‌স লিবারেশন আর্মি। পাশাপাশি সোয়াপো ব্যাপক ঐক্যফ্রন্টও গঠন করে। একদিকে শান্তিপূর্ণ আলোচনা অন্যদিকে সশস্ত্র অভিযান নামিবিয়ার শাসকদেব ভীত-সন্ত্রস্ত কবে তোলে। নামিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রথমে একটি কমিশন এবং পরে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে। দক্ষিণ আফ্রিকাও নামিবিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়িয়ে তোলে। নামিবিয়ার গণমুক্তি ফৌজের ঘাঁটিগুলি চুরমার করে দেবার জন্য অ্যাঙ্গোলার অভ্যন্তবে বার বার বোমাবর্ষণ করতে থাকে। আর নামিবিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বোমাবর্ষণ তো প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নামিবিয়ার গণমুক্তি বাহিনী ইতিমধ্যে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মুক্ত কবে ফেলে। এই পরিস্থিতি দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন বর্ণবিদ্বেষী সরকারকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করে। আর রাষ্ট্রসঙ্ঘ দক্ষিণ আফ্রিকার দখলদারি বাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করে। দক্ষিণ অফ্রিকা চেষ্টা কবেছিল সেখানে একটি তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। ১৯৭৮ সালে নির্বাচনী প্রহসন হলো। সোয়াপো এই নির্বাচন বযকট করল। দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থন পুষ্ট ডেমোক্রাটিক টার্নহল অ্যালয়েন্স-এর নেতৃত্বে দশটি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলকে নিয়ে গঠিত জোট তথাকথিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই জোটকে পুরেপুরিভাবে সমর্থন জানাল এবং সাহায্য করল। এগারো বছব ধরে নামিবিয়ায় ডি টি এ সরকার শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ অবশ্য এই সরকারকে কোনোদিন মেনে নেয় নি।

অবশেষে ১৯৮৮-র ১৩ই ডিসেম্বর কঙ্গোর রাজধানী ব্রাজভিলে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক চুক্তি। সেই চুক্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে নামিবিয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সেই প্রস্তাব ব্যর্থ করার জন্য নানাধরনের ফন্দী আঁটতে থাকে। ১৯৮৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদ পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ করে। নির্বাচনের দিন স্থির হয় ৭ থেকে ১১ই নভেম্বর ১৯৮৯।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নামিবিয়ার স্বাধীনতার প্রক্রিয়া শুরু হয় গত ১লা এপ্রিল ১৯৮৯ থেকে। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিরাপত্তা পরিষদের নামিবিয়ার স্বাধীনতার প্রসঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ৪৩৫নং প্রস্তাব ১১ বছর বাদে বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। কিন্তু নামিবিয়া নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকার তথা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা কথা স্মরণে রাখলে নামিবিয়াতে সত্যি সত্যি স্বাধীনভাবে নির্বাচিত সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। ১৯৮৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকেই উত্তর নামিবিয়াতে ওভাম্বেল্যান্ডে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে আড়াই শতাধিক মানুষকে হত্যা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভাড়াটে নিরাপত্তা বাহিনী। সোয়াপো নেতা স্যাম নুজোমা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান প্রতিনিধি মার্তি আতিসারির নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করেন। যাই হোক, নুজোমা সশস্ত্র সোয়াপো গেরিলাদের দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলার শিবিরে চলে যেতে বলায় তখনকার মত রক্তপাত

বন্ধ হয়। স্বাধীনতার বৃহত্তর লক্ষ্যের কথা মনে রেখেই নুজোমা তাঁর গেরিলাদের সরিয়ে নিতে রাজি হন।

আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে নামিবিয়া (একদা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা নামে পরিচিত ছিল)। ১৮৯০ সালে এই অঞ্চল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে। তার কিছু আগে থেকেই নামিবিয়ার মানুষ ক্রমে ক্রমে তাঁদের স্বাধীনতা হারাতে শুরু করে। পাশেই একটু নিচে পূর্বদিকে বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র তখন ব্রিটিশের শাসনাধীন। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা জার্মানির হাতে ছেড়ে দিয়ে তখন কার মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ব্রিটিশ সৈন্য গিয়ে জার্মানদের হাত থেকে নামিবিয়া কেড়ে নেয়। আর সেখানে ফিরে যেতে পারে নি জার্মান সাম্রাজ্যবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্বকে যুদ্ধ মুক্ত করার ঘোষিত উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অব্ নেশনস। প্রধানত ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থরক্ষক জাতিসঙ্গ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও তুর্কী শাসনাধীন উপনিবেশগুলি কেড়ে নিয়ে সেগুলি বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবার একটা বকলম ব্যবস্থা করে যার নাম ম্যান্ডেট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে একদা জার্মান উপনিবেশ নামিবিয়াতে অধিবাসীদের "শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে স্বাধীনতার উপোযোগী করে গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের হাতে নামিবিয়ার শাসনভার তুলে দেওয়া হয়। প্রায় ৬০ বছর বাদে সেই দক্ষিণ আফ্রিকার দখল থেকে নামিবিয়ার স্বাধীন হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জাতিসঙ্ঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে পারে নি কেন সেই ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে জাতিসঙ্গের অবশেষটুকুও পুড়ে ছাই হবার পর যুদ্ধ শেষে গঠিত হয় বর্তমান রাষ্টরসঙ্ঘ বা ইউনাইটেড নেশন্স। জাতিসঙ্ঘের ম্যান্ডেট ব্যবস্থার নাম পাল্টে করা হয় ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল বা অছি পরিষদ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বার বার প্রস্তাব নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে নামিবিয়া ছেড়ে যেতে বলতে থাকে। ১৯৬৬ সালের আক্টোবর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ এক প্রস্তাব নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নামিবিয়ার উপর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনের অবসান ঘোষণা করে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সেই প্রস্তাব আগ্রাহ্য করে। এর আগে থেকেই আন্তর্জাতিক আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন ছিল। সেই সুযোগই গ্রহণ করে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার। তার পিছনে মদত থাকে গোটা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের। ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা নামটি বাতিল করে 'নামিবিয়া' নামটি অনুমোদন করে। ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক আদালত নামিবিয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকা শাসনকে বে-আইনি ঘোষণা করে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সেই রায়কেও অগ্রাহ্য করে।

এসব চলতে চলতেই ১৯৫৭-৫৮ সালে নামিবিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে গঠিত হয় সাউথ-ওয়েষ্ট আফ্রিকা পিপল্স অর্গানাইজেশন বা সোয়াপো। সোয়াপো নেতারা অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পারেন যে সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না, দখলদার বর্ণবিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে শেষ করতে হলে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া উপায় নেই। ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম আঘাত হানতে শুরু করার পর অক্টোবর মাসেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ উপরিউক্ত প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হয়।

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সোযাপোকেই নামিবিয়ার একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দেয় (১লা এপ্রিল, ১৯৮৯ সাল থেকে অবশ্য এই স্বীকৃতি আর কার্যকব থাকে নি)। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সোয়াপোর কর্মী ও নেতাদের উপব চালায় বর্বর হামলা ও নির্যাতন। কিন্তু সোয়াপোকে শেষ করা যায় নি।

১৯৭৬ সালের জানুয়াবি মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ এক প্রস্তাব নিয়ে বলে, ঐবছর আগষ্ট মাসের মধ্যে নামিবিয়াতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তদারকিতে সাধারণ নির্বাচন করতে হবে, নচেৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদ অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গৃহস্থকে সজাগ করার পর চোরকে চুরি করার কাজেও সাহায্য করে সাম্রাজ্যবাদী শিবির। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার নামিবিয়াকে 'ক্রমান্বয়ে' স্বাধীনতা দেবার নাম করে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত "ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা হস্তান্তরের" একটা বিকল্প পরিকল্পনা পেশ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেই প্রস্তাব বাতিল করে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তার মতলবে অটল থাকে। ১৯৭৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদ ৪৩৫ নং প্রস্তাব গ্রহণ করে। পাশাপাশি ঐ বছরই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার নামিবিয়াতে একটা সাজানো নির্বাচন করে একটা ক্রীড়নক সরকার বানিয়ে দেয়। এক বছর বাদে নিজের বসানো সেই সরকাকেই বদল করে নতুন সরকার বসায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

নামিবিয়া প্রসঙ্গে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা দু'মুখো ভূমিকা আগাগোড়াই স্পষ্ট। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, সাম্রাজবাদী দেশগুলির প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির চাপের মুখে সাম্রাজ্যবাদীরা নাম কা ওয়াস্তে দক্ষিণ আফ্রিকার নিন্দা করলেও কার্যক্ষেত্রে, অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিটি প্রস্তাবের তীব্রতর বিরোধিতা করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক রক্ষা করেই চলেছে। নামিবিয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার দখলদারি বেআইনি ঘোষিত হবার পরও ৪৩৫ নং প্রস্তাব কার্যকর করার কোন ব্যবস্থাই নিতে দেওয়া হয় নি।

কিন্তু জিম্বাবোয়ে, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীন হবার পর আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আফ্রিকান ঐক্য সংস্থাও ক্রমাগত নামিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য চাপ দিতে থাকে। গোটা বিশ্বজুড়েই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম আগের চেয়ে জোরদার হতে থাকে। নামিবিয়াতে সোয়াপো গেরিলারা উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করতে থাকে। গোটা বিশ্বজুড়েই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম আগের চেয়ে জোরদার হতে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে জেনিভাতে ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে নামিবিয়া নিয়ে বিশেষ সম্মেলন বসে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সেই সম্মেলনে তাঁবেদার সরকারের উপস্থিতি দাবি করে সম্মেলন বানচাল করে দেয়।

এরপরই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার নতুন একটি শর্ত তোলে। তারা দাবি করে, অ্যাঙ্গোলা থেকে কিউবার সেনা ফিরিয়ে নিলে তবেই নামিবিয়ার স্বাধীনতার কথা ভাবা যেতে পারে। অ্যাঙ্গোলা এবং সোয়াপো সঙ্গত কারণেই এই শর্ত অগ্রাহ্য করে।

এই পরিস্থিতি চলতে চলতেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে নেতৃত্ব ও নীতির পরিবর্তন ঘটে। তৎকালীন নতুন নেতা মিখাইল গরবাচ্যভ তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগানের সঙ্গে পর পর কয়েকটি শীর্ষ বৈঠকে বসেন। বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আঞ্চলিক বিরোধগুলি মীমাংসার প্রশ্নও আলোচিত হয়। আঞ্চলিক বিরোধ মীমাংসার প্রশ্নে

নতুন সোভিয়েত নীতি ঘোষিত হয়। এই নীতি অনুসারে আঞ্চলিক বিরোধগুলির সামরিক সমাধানের বদলে রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামিবিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যমত্যে আসে। মার্কিন উদ্যোগে অ্যাঙ্গোলা, কিউবা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারগুলি কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের প্রাক্কালে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। সেই চুক্তি অনুসারে কিউবা অ্যাঙ্গোলা থেকে সেনা ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। একই চুক্তি আনুসারে ১৯৮৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে নামিবিয়াতে নিরাপত্তা পরিষদের ৪৩৫ নং প্রস্তাব কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা

যদি বলা হয় যে, প্রশাসন পরিচালনার নেলসন রোহিহ্‌লালা ম্যান্ডেলার কৃতিত্ব কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাফল্যের ধ্বজা বহন করেছে, তাহলে আমাদের উত্তর হবে ঃ গণতন্ত্রের প্রসার। বোঝাপড়া, পুনর্গঠন, এবং বিকাশের বাস্তবসম্মত একটি পরিকল্পনা রূপায়নের মধ্য দিয়েই ম্যান্ডেলা এই সাফল্যকে নিয়ে গেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। কারারুদ্ধ অবস্থায় যিনি ছিলেন মুক্তিকামী বিশ্ববাসীর আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল, তিনি যেভাবে দৃঢ় হাতে প্রশাসনকে পরিচালনা করেছেন রাজনৈতিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে, তাতে যতটা তার মানবিক হৃদয়বার্তা না ফুটে উঠেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্ত হয়েছে তার রাজনৈতিক প্রাঞ্জলতা। অদম্য সাহস দেখিয়ে সাবেক বর্ণবাদী এই দেশের মানুষকে তিনি যত্নের সঙ্গে বুঝিয়েছেন কেন প্রশাসনিক বৈধতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে সবরকম প্রতিহিংসামূলক আচরণকে পরিত্যাগ করতে হবে। ম্যান্ডেলার সরকার তাই বিশ্বাসযোগ্যতায় মহীয়ান, স্বচ্ছতায় ব্যতিক্রমী, এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে অবিচল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে খেটে-খাওয়া মানুষের সর্বাংশ থেকে। প্রথম দিকে সামান্য ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকলেও, পরবর্তীতে প্রশাসন, মূল-স্রোতের রাজনৈতিক দলসমূহ, এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে একটা চমৎকার সমন্বয় গড়ে তুলেছে ম্যান্ডেলা — এবং এই কারণেই দেশের (মূলত শ্বেতকায়দের নিয়ন্ত্রণাধীন) বেসরকারী ক্ষেত্রের সঙ্গে কাজ চালানোর সম্পর্ক স্থাপনে ম্যান্ডেলার বড় কোন অসুবিধা হয়নি। সরকারী, বেসরকারী এবং যৌথ উদ্যোগের জোয়ারে দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতি বাৎসরিক ৩.৫% হারে বাড়ছে। স্বদেশী-বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্লেখ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে সংস্কারের মাধ্যমে জোরদার করা হচ্ছে, এবং আধা-শহর ও গ্রামাঞ্চলে শ্রম-নিবিড় ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। একই সঙ্গে অগ্রাধিকারের আওতায় আনা হচ্ছে রপ্তানিমুখী শিল্পক্ষেত্রগুলিকে। একথা ঠিক যে, রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করতে ইনকাথা জুলু পার্টি এবং বর্ণবাদে বিশ্বাসী শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি সক্রিয়। শহরাঞ্চলে অপরাধপ্রবণতা কমছে না। তবুও মূল কথা হচ্ছে দূরপাল্লার লক্ষ্যের দিকে ম্যান্ডেলার দক্ষিণ আফ্রিকা, সাদা-কালো-বাদামী মানুষের দক্ষিণ আফ্রিকা, এম এ সি পি-কোসাটুর দক্ষিণ আফ্রিকা আলোর নিশানায়, অভ্রান্ত দিশায় এগিয়ে চলেছে। দুনিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের শুভেচ্ছা ওই পথে তাদের পাথেয় যোগাবে।

কেনিয়াতে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন প্রকৃতিপ্রেমী শ্বেতাঙ্গ পুঁজিপতি

রিচার্ড লাকি। লাকি-র 'সাফিনা' দল গঠিত হয়নি মূলত রাষ্ট্রপ্রধান ড্যানিয়েল আরাপ-মোই-কে ক্ষমতাচ্যুত করাতে। উগ্র ঔপনিবেশিকতাবোধ পরিপূর্ণ রিচার্ড লাকির অন্যতম মদতদাতা মার্কিনী কু-ক্লুক্স্ ক্ল্যান এবং অন্যান্য মাফিয়া গোষ্ঠী। বিশেষ করে কেনিয়ার মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে লাকি-র গোঁড়া খৃস্টান বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ইসলাম-বিরোধিতার সুর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তবে লাকির উগ্রপন্থী বক্তব্যের বিপক্ষেই রায় দিয়েছেন কেনিয়ার অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ। লাকির ভাই ফিলিপ্ লীকির নেতৃত্বে কেনিয়ার অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপতি আরাপ-মোইকে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে জানিয়েছেন যে, তাঁরা 'সাফিনা'-র সক্রিয় বিরোধিতাই করবেন। এরা বলেন, আরাপ-মোই-এর কেনিয়া আফ্রিকান্ ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টিকেই আগামী নির্বাচনে সমর্থন জাগাবেন কারণ বর্তমান সরকারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশরক্ষার সাফল্যের ফসল হিসাবেই দেশে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেছে।

পূর্ব আফ্রিকার অন্যত্র, রোয়ান্ডা ও বুরুন্ডি-তে হুটু বনাম টুট্সি উপজাতির দাঙ্গা অব্যাহত। সোমালিয়াতে মহম্মদ ফারাজ আইদিদ ও আলি মাহ্দি মুহাম্মদের মধ্যেকার যুদ্ধ চলে। পার্শ্ববর্তী জাইর-এ উদ্বাস্তু শিবিরে মড়ক বেড়েই চলে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নির্বিকার। সুতরাং যথাপূর্বং আপাতত জয়ী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দেশপ্রেমিক শক্তির অগ্রগতি

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করার লক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশপ্রেমিক শক্তি বিগত কয়েক দশক ধরে নতুন নতুন বিজয় অর্জন করে চলে। দক্ষিন আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার সব দিক থেকে ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্রে তেল সরবরাহ নিষিদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিরপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব আসে তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই প্রস্তাব যদি কার্যকর করা যেত তবে প্রিটোরিয়া সরকারের যে কোন মুহূর্তে নাভিশ্বাস উঠত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন ভেটো প্রয়োগ করে দক্ষিণ আফ্রিকার তেল সরবরাহের প্রস্তাব কার্যকর হতে দেয় নি। বলা চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন মুখে বর্ণবিদ্বেষবাদের প্রচণ্ড নিন্দা করেও যেভাবে বর্ণবিদ্বেষী সরকারের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসে তা নজিরবিহীন ঘটনা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বুকে গণ-অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়; সেই গণ-অসন্তোষ কেন্দ্র করে যেভাবে সেখানে আন্দোলন-সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয় তাতে সেখানকার দেশপ্রেমিক জনগণ এই প্রত্যায়েই উদ্বুদ্ধ হন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সমর্থন সত্ত্বেও, দেশে জরুরী অবস্থাকে আরো কঠোর করা সত্ত্বেও বর্ণবিদ্বেষী প্রিটোরিয়া সরকারের দিন ঘনিয়ে আসছে। এক বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী বিরোধী আন্দোলন কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের মধ্যে সীমিত নেই। এই আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে শ্বেতাঙ্গ জনগণের মধ্যেও। প্রিটোরিয়ার বর্ণ-বিদ্বেষী সরকারের শত্রু তালিকার আজ দেশের বিভিন্ন গীর্জার নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ থেকে দেশপ্রেমিক শ্বেতাঙ্গ জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা প্রিটোরিয়া সরকারের পক্ষে আর একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। এজন্যই প্রিটোরিয়া সরকার দেশের ১৭টি বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করে। বিভিন্ন সংগঠনের ১৮ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এর পূর্বে এই ধরনের আক্রমণ কেবলমাত্র

আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই চালিত হত। কিন্তু এখন দেশের বিরোধী দলের এই নির্মম আঘাত নেমে এসেছে। এই পরিস্থিতিকে আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস যে ভাষায় বিবৃত করেছে তা হলো ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষী সরকারের সব ধরনের দানবীয় পদক্ষেপ আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, দুবছর পূর্বে প্রিটোরিয়া সরকার জনগণকে জরুরী অবস্থার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। আজ সেই শৃঙ্খল ভাঙতে শুরু করেছে। কোন দমন-পীড়নই আজ জনগণকে ক্ষান্ত করতে পারছে না। ভয়-ভীতির শৃঙ্খল ছিঁড়ে জনগণ আজ কদম কদম এগিয়ে চলেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বড় বড় রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা কার্যক্ষেত্রে হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যে সমস্ত সংগঠনকে প্রিটোরিয়া সরকার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে তার মধ্যে একটি ছিল ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট। নিষিদ্ধ অবস্থাতেও এই সংগঠনের সদস্য দাঁড়িয়েছিল ৩০ লক্ষে। প্রথমে এঁরা আত্মগোপন অবস্থাতে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে এরা প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যায়। অপর একটি সংগঠন ছিল কংগ্রেস অব সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নস।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া সরকারের আক্রমণ এখন আর কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ বা আন্দোলনরত শ্রমিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ নেই। শত শত কৃষ্ণাঙ্গ জনগণকে কারারুদ্ধ করে রাখা; তাঁদের নেতাদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা তো এই সরকারের সাধারণ নিয়মের মধ্যেই পড়ত! প্রিটোরিয়া সরকারের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ যে কোন ধরনের উন্মাদনা ছাড়িয়ে যায়। প্রিটোরিয়া সরকারের গুপ্তচর বাহিনী ওসাকাটিতে দেশের জাতীয় ব্যাঙ্কের উপর বোমা বর্ষণ করে। এই ব্যাঙ্কটি একেবারে মাটিতে মিশে যায়। ব্যাঙ্ক কর্মরত ১৮ জনই নিহত হন। অনুরূপ বোমা নিক্ষিপ্ত হয় অনিপা'য় অবস্থিত লুথারিয়ান চার্চের একটি ছাপাখানায়। ছাপাখানাটি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রিটোরিয়া সরকার রোমান ক্যাথলিক চার্চের ছাপাখানার উপরও বোমা বর্ষণ করে।

দক্ষিন আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রামের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় কূটনীতিবিদ্ দের সেখানকার দেশপ্রেমিক জনগণের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হওয়া। বিদেশী কূটনীতিবিদ্দের এরূপ দেশপ্রেমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ঘটনা খুবই নজিরবিহীন। তাঁদের মধ্যে অনেক পাদ্রি ছিলেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রিটোরিয়া সরকার দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামকে সংখ্যালঘু কমিউনিস্টদের সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করার যে অপপ্রয়াস চালিয়েছিল তা বাস্তবে সত্য নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী সংগ্রামের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বর্ণবিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল সেখানকার শ্রমিক শ্রেণী। ১৯৮৭ সাল থেকে দেশপ্রেমিক সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব বেশি বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 'দি আফ্রিকান কমিউনিস্ট' পত্রিকার আন্দোলনের মূল্যায়ন করে যে নোট প্রকাশিত হয় তাতে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয় ঃ আমাদের দেশের মুক্তি আন্দোলন যথার্থভাবে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের সমন্বয় ঘটিয়েছে। একটি আন্দোলন অপর আন্দোলনের পরিপূরক। এই মুহূর্তের শ্রেণী সংগ্রামের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করা।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেসও দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে

সহমত পোষণ করেন। জাতীয় কংগ্রেসেব ইশ্‌তেহারেও বলা হয় ঃ দেশে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ রক্ষা না করতে পারলে স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থহীন হয়ে পড়বে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিবর্তনের সংকেত

দক্ষিণ আফ্রিকার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐ দেশের বহুদিনের জটিল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ সংকেত দেয়।

১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার কট্টর বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্রপতি পি ডব্লু বোথা পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এফ ডব্লু ডে ক্লার্ক। তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন ঃ এক নতুন দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিষ্ঠা করা হবে যেখানে বর্ণবিদ্বেষী নির্যাতন থাকবে না। কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ডে ক্লার্ক এই ঘোষণা করলেন? ১৯৪৮ সাল থেকে ঐ দেশে ন্যাশনাল পার্টি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আর প্রথম থেকেই এই সরকার বর্ণবিদ্বেষী নীতির ভিত্তিতে দেশ শাসন করে চলেছে। ন্যাশনাল পার্টির বর্ণবিদ্বেষী নীতি কেবল যে দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে বা তাঁদের মৌলিক মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেছে তাই নয় — এই নীতি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারকেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব প্রায় সমস্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী নীতির নিন্দা করে। প্রথম দিকে পশ্চিমী দুনিয়ার কোন কোন দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার সপক্ষে থাকলেও পরবর্তীকালে তারাও একের পর এক বর্ণ বিদ্বেষবদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি অনেক আগে থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ১৯৮৫ সালের পর পশ্চিম ইউরোপের একাধিক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৮৫ সালের পর তিনশ'র বেশি বিদেশী কর্পোরেশন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। একের পর এক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন বিনিয়োগ ও ঋণ-এর দরজা রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনও হ্রাস পায়। ১৯৮৯ সালে দেখা যায় বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৮৮ কোটি ডলারে। বেকারির হার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চাপের মুখে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি ডে ক্লার্ক দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংস্কারের ঘোষণা করেন। ডে ক্লার্কের রাজনৈতিক সংস্কারের প্রাথমিক স্তরে পাঁচটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়। সেগুলি হলো ঃ (১) রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কারারুদ্ধ আটজন বিশিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ রাজনৈতিক নেতাকে মুক্তির নির্দেশ দেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ওয়াল্টার সিসুলু। ২৭ বছর কারারুদ্ধ থাকার পর ১৯৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বিনা শর্তে মুক্তি পান। ম্যান্ডেলা কে মুক্তি দেবার পূর্বে সরকার ৩৭৪ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেয়। আর ম্যান্ডেলার মুক্তি লাভের পর ৪৮ জন রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পান। (২) ১৯৯০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার দেশের ৩০ টি রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। যে সমস্ত

রাজনৈতিক দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, পান আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেস অব আজানিয়া এবং সাউথ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টি। এই দুটি পদক্ষেপেব মধ্যে দিয়ে সরকারের সঙ্গে এ এন সি-র আলোচনার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। (৩) বেশ কয়েক বছর ধরে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে জরুরী অবস্থা চলছিল। ১৯৯০ সালের ৭ই জুন একমাত্র নাটলা প্রদেশ বাদে অন্য সমস্ত এলাকা থেকে সেই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হয়েছে। (৪) দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এই সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি বর্ণবিদ্বেষী আইনের অবসান ঘটায়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কতকগুলি সরকারি স্থানে আইন করে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। ৩৭ বছর ধরে আইনটি বলবৎ ছিল। ১৯৯০ সালের ১৯শে জুন দক্ষিণ আফ্রিকার সংসদ আইনটির অবলুপ্তি ঘটায়। ১৯৯০ সালের শুরুতেই সরকার প্রেস সেন্সরশিপ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেয় এবং সামরিকখাতে ১৫ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করেন। (৫) ১৯৯০ সালের ২রা থেকে ৪ঠা মে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ডে ক্লার্কের ঘরোয়া বৈঠক হয়। এই বৈঠকের পর আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে পাঁচ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই পাঁচ দফা কর্মসূচী ছিল ঃ

(১) সমস্ত বর্ণের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে হবে। এই সরকার একদিকে যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা শাসন করবে, তেমনি নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরী করবে।

(২) নতুন সংবিধানের মূল ঘোষণা হবে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা একটি ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক এবং অ-বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্র।

(৩) সকল নাগরিকের প্রকৃত এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং সর্বস্তরের সংস্থায় 'এক নাগরিক, এক ভোট' — এই নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

(৪) বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষ মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে এবং আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের গ্যারান্টি দিতে হবে।

(৫) বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে যে সমস্ত আইন আছে যেমন গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট, পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ইত্যাদি পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। অর্থনীতির প্রশ্নে এ এন সি-র প্রস্তাব হলো, দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু করতে হবে।

আলাপ আলোচনা এবং বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি আজকের দিনে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের একটা প্রধান অঙ্গ। এই বৈশিষ্ট্য নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই এই প্রক্রিয়া এই দেশে সহজসাধ্য ছিল না। তেমনি সহজসাধ্য ছিল না বর্ণবিদ্বেষী নীতির পরিপূর্ণ অবসান। অবশ্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি বাস্তব অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যার শান্তি পূর্ণ সমাধানের পথকে সুগম করছে। সেটি হল, আমেরিকা ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই আজ দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে আগ্রহী ছিলেন।

কিন্তু সেখানকার সরকার ও এ এন সি-র মধ্যেকার মত পার্থক্যটি সহজ ও সাধারণ মত পার্থক্য নয়। এই মত পার্থক্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপৃত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কথাই ধরা যাক। দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন সরকার মূলধনের উপর যে কোন ধরনের ব্যক্তি মালিকানার বিরোধী। কিন্তু এ এন সি উন্নয়নের ধনতান্ত্রিক পথের

পক্ষপাতী হয়েও যে বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় সেটি হল মিশ্র অর্থনীতি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ এন সি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোরতর বিরোধী। আবার এ এন সি যখন 'এক নাগরিক, এক ভোট' নীতিতে বিশ্বাসী তখন ডে ক্লার্কের দাবি হলো গোষ্ঠী ভিত্তিক ভোটাধিকার প্রবর্তন। এই প্রশ্নে এ এন সি-র মনোভাব অনমনীয় নয়। নেলসন ম্যান্ডেলা পরিষ্কার বলেছেন, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের অর্থ কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ শাসন কায়েম করা নয়—দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনে কৃষ্ণাঙ্গ, অ-কৃষ্ণাঙ্গ সকলের সমান মর্যাদা থাকবে।

ডে ক্লার্ক সরকার প্রকৃতপক্ষে কী চায়?

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা ভের্সটার বন্দী শিবির থেকে সে দেশের সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রপতি ফ্রেডারিক উইলিয়াম ডে ক্লার্কের কাছে একখানি সুদীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছিলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল চিঠিখানিকে খুবই গুরুত্ব দেন।

তৎকালিন রাষ্ট্রপতি পি ডবলিউ বোথা তাঁর দল ন্যাশনাল পার্টির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ান। কয়েকমাস বাদে, বোথা এই বিদায় আপতদৃষ্টে অসুস্থতাজনিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের এক অংশের মতে পি ডবলিউ বোথা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কানাগলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারের অকৃত্রিম সমর্থক ও মদতদাতা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিও বোথা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছিল। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দলের চেয়ারম্যান হবার পর ফ্রেডরিক দ্য ক্লার্ক দক্ষিণ আফ্রিকায় নানা রকম সংস্কারের কথা বলতে থাকেন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা ডে ক্লার্ককে একজন সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল নেতা হিসেবে প্রচার দিতে থাকে। এরপর, সেপ্টেম্বর মাসে ডেক্লার্ক রাষ্ট্রপতি হন। অক্টোবর মাসে ডে ক্লার্ক দু'টি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেন। কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরও জোরদার করার দাবি উঠবে অনুমান করে ডে ক্লার্ক ২৬ বছর যাবত কারারুদ্ধ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এ এন সি) সাধারণ সম্পাদক ওয়ালটার সিসুলু এবং আরও সাত জন নেতৃস্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ বন্দীকে মুক্তি দেন। একই সঙ্গে ডে ক্লার্ক কৃষ্ণাঙ্গ সংগ্রামী-ধর্মযাজক ডেসমন্ড টুটু এবং আরও দু'জন কৃষ্ণাঙ্গ নেতার সঙ্গে এক বৈঠকে বলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যাগুলি সমাধানের প্রস্তাব রাখেন।

ডে ক্লার্কের এই দু'টি পদক্ষেপকে অবলম্বন করে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবেরোধ জোরদার করার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। কিন্তু এই প্রথম, কমনওয়েলথ সম্মেলনে বাকি দেশগুলি এককাট্টা হয়ে মার্গারেট থ্যাচারকে অবরোধ জোরদার করার প্রস্তাবে সম্মত হতে বাধ্য করতে সক্ষম হন।

কমনওয়েলথ সম্মেলন চলাকালেই বিশপ ডেসমন্ড টুটু এক বিবৃতিতে ডে ক্লার্কের পদক্ষেপকে চোখে ধুলো দেবার এবং প্রতিকূল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ফন্দি হিসেবে আখ্যা দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডে ক্লার্কের সঙ্গে বৈঠকে বিশপ টুটু আলোচনা শুরু করার

কয়েকটি শর্ত দিয়েছিলেন। সেই শর্তগুলি হ'ল, অবিলম্বে বিনা শর্তে নেলসন ম্যান্ডেলা এবং অন্যান্য সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। বিনা বিচারে আটক সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। ১৯৮৬ সাল থেকে জারি থাকা জরুরী অবস্থা তুলে নিতে হবে। এ এন সি-সহ নিষিদ্ধ দল ও সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকার ছোটখাটো কিছু সংস্কার প্রবর্তন করলেও, আলোচনা শুরু করার কিছু পালটা শর্ত দিয়েছে। এই সব শর্তের মধ্যে আছে, এ এন সি-কে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহার করতে হবে, দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না ইত্যাদি। কিন্তু সব থেকে অদ্ভুত এবং হাস্যকর শর্ত হলো শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের বর্তমান প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখে কৃষ্ণাঙ্গদের হাতে ক্ষমতার কিছু অংশীদারী দেওয়া হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভের্সটার বন্দী খামার থেকে পাঠানো ২৭ বছর যাবত বন্দী নেলসন ম্যান্ডেলার চিঠিখানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিতে ম্যান্ডেলা জোরের সঙ্গেই বলেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যাগুলির সমাধান হওয়া কাম্য। কিন্তু এই আলোচনার পথে প্রতিবন্ধকগুলি অপসারিত না হলে যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না। ম্যান্ডেলার মতে, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে সব থেকে বড় বাধা সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্য বজায় রাখার জেদ। ম্যান্ডেলা তাঁর বহুবার বলা কথাই আবার বলেছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাদা, কালো সকল মানুষের সমান অধিকারের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ঐ চিঠিতে ম্যান্ডেলা ডে ক্লার্ক সরকারের প্রস্তাবিত অন্যান্য শর্তগুলিকেও অবাস্তব ও মানার অযোগ্য বলে দৃঢ়ভাবে অগ্রাহ্য করেছিলেন। এ এন সি-র অস্ত্র ত্যাগের শর্ত সম্পর্কে ম্যান্ডেলার বক্তব্য, যে সরকার দীর্ঘদিন ধরে কৃষ্ণাঙ্গদের দমন করতে আগেই হিংসার আশ্রয় নিয়েছে তাদের অধিকার নেই অস্ত্রত্যাগের দাবি জানাবার। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার শর্ত সম্পর্কে ম্যান্ডেলা বলেন, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোন মানুষ অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সারা জীবনের সাথীকে বর্জন করে জনসাধারণের কাছে নিজেদের আস্থাভাজন হিসেবে জাহির করবে? এই বিশ্বাসভঙ্গের পরে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত দলকে কে বিশ্বাস করবে? তবে, তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এ এন সি-র মৈত্রী কেবলমাত্র বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী লড়াইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কোন কোন মহল মনে করেন, চাপান উতোর থাকা সত্ত্বেও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা সমাধানের কথাটা উভয়পক্ষ থেকেই তোলা হয়। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ জোরদার হওয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ এবং মুক্তি সংগ্রামের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতিতে সার্বিক সঙ্কট ঘনীভূত হওয়া প্রভৃতি কারণেই সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসকরা আলোচনার কথা বলতে বাধ্য হন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ক্রিস হানি'র শহীদের মৃত্যু বরণ

১৯৯৪ সালের ১০ ই এপ্রিল দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড ক্রিস হানি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। জোহানেসবার্গের শহরতলী বোক্সবুর্গে আততায়ীরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। দেশে সাংবিধানিক সংস্কারের দাবিতে ডে ক্লার্ক সরকারের সঙ্গে আফ্রিকান

জাতীয় কংগ্রেসের যে আলোচনা চলছিল তা স্থগিত রাখা হয়ছ। আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে কৃষ্ণাঙ্গদের গণবিক্ষোভ দমন করতে সেখানকার ডে ক্লার্ক সরকার প্রচণ্ড দমন-পীড়নের পথ গ্রহণ করে। ডে ক্লার্ক সরকার বিক্ষোভ দমন করতে বেপরোয়াভাবে গুলি চালায়।

কমরেড হানি দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর পিতাও দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির সমস্য এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালে তখনকার নিষিদ্ধ আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এই বাহিনীর নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার তদানিন্তন শ্বেতাঙ্গ সরকার কমরেড হানিকে দেশ থেকে বিতাড়ণ করেন। দেশ থেকে বিতাড়িত হবার পর ১৯৬৭ সালে তিনি জিম্বাবোয়ের মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে আফ্রিকার প্রতিটি দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম একসূত্রে গ্রথিত। দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং বোৎসোয়ানার কারাগারে দু'বছর বন্দীজীবন যাপন করেন। নির্বাসিত জীবনের অবসানান্তে দেশে ফেরার পর তিনি আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেসের সশস্ত্র বাহিনীর রাজনৈতিক কমিশনার পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৩-৮৭ সাল পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৯১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস থেকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বেশী সময় ধরে এই পার্টিকে আত্মগোপনে কাজ করতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬০ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং ১৯৯০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে মতাদর্শগত প্রশ্নে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়। সেই বিতর্কের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র' না 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'। কমরেড হানি অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পক্ষে মত পোষণ করেন এবং পার্টি কংগ্রেস থেকে 'সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক দলিলটি গৃহীত হয়।

কমরেড হানির নিহত হবার ঘটনা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। গত কয়েক বছরের বেশি সময় ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সেখানকার তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ সরকার এবং আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা চল। কোডেসা শান্তি আলোচনা নামে এটি খ্যাত। সাংবিধানিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করাই এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু বর্তমান শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আধিপত্য ত্যাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আদৌ রাজি নয়। সেজন্য তারা সাংবিধানিক সংশোধনী আলোচনার প্রতি পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। বর্ণ-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে একটি চরম দক্ষিণপন্থী বাহিনীর গঠন করেছে। এই নয়া ফ্যাসিবাদী উগ্র দক্ষিণপন্থী সংগঠনের নাম হচ্ছে আফ্রিকানের উয়েসরস্ট্যানশ বিউঙ্গ (এ ডবলিউ বি)। এই শক্তি গত কয়েকবছর ধরে আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত সংগঠনের বহু নেতার নামই খতম তালিকায় রয়েছে। বর্ণ-বিদ্বেষী ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য এই দক্ষিণপন্থী শক্তি দেশে একের পর এক ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার কোনদিনই এই সমস্ত উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তিকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা

করেনি। ১৯৯১ সালেই এ ডব্লিউ বি ঘোষণা করে যে যদি পরিস্থিতি এমনতরই হয় যাতে আফ্রিকানরা বিপন্ন বোধ করছেন তবে তাঁরা সেনাবাহিনীভুক্ত সদস্যসহ তাঁদের সকল সদস্যকে সশস্ত্র প্রতিরোধে নামার জন্য আহ্বান জানানো হবে। এখানে উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী সেনাবাহিনীর শতকরা ৯০ জনই এই উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তির সমর্থক। হানির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এ ডব্লিউ বি'র একজন নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি আবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ডে ক্লার্কের বিশিষ্ট সহযোগী। তাই কমরেড হানির হত্যাকাণ্ডের দায় কোন অবস্থাতেই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষী সরকার অস্বীকার করতে পারে না।

আর এই হত্যাকাণ্ডের ফলশ্রুতিও সুদূর প্রসারী। সেখানকার সংবিধান সংশোধনী আলোচনা স্থগিত হয়ে গেছে। এর অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব ঘটানো। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজনৈতিক জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকায়

দীর্ঘ ৩৭ বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্য কাজকর্ম শুরু করেছে। ঘোষণা করেছে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের নতুন কর্মসূচী। জোহানেসবার্গের সোয়েটো ফুটবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক বিশাল সমাবেশ থেকে এই কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সমাবেশের পূর্বে এক সপ্তাহ ধরে কমিউনিস্ট পার্টি দেশব্যাপী প্রচার চালায়। সমাবেশে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জো স্লোভো ছাড়াও এ এন সি-র সহ-সভাপতি নেলসন ম্যান্ডেলা ভাষণ দেন।

স্লোভো তাঁর ভাষণে বলেছেন ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি দেশে শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্রোহের পরিকল্পনা এঁটেছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রচার চালানো হচ্ছে তা সর্বৈব মিথ্যা। রাষ্ট্রপতি ডে ক্লার্কের উপদেষ্টারা পার্টির বিরুদ্ধে বিষাক্ত আক্রমণ চালাচ্ছে। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তারা কমিউনিজম বিরোধিতাতেই বেশি আগ্রহী। নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁর ভাষণে অভিযোগ করেন, আলোচনার পরিবেশ বানচাল করতেই কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য বিকৃত করা হচ্ছে। এ এন সি কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন জানায়। কমিউনিস্ট বিরোধী জিগির তুলে স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে অস্বীকার করা যায় না।

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবাহী ঘটনা। আরো গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশের প্রাক্কালে সমগ্র দেশে এক রাজনৈতিক জাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস বহন করছে বহু সংগ্রামের অধ্যায়, ঐতিহ্য। আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট লিগের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট লিগ ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার লেবার পার্টি থেকে বেরিয়ে যায়। মাত্র ১৭৫০ জন সদস্য নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার

কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৫২ সালের সংসদ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে সেখানকার শাসক বর্ণবিদ্বেষী সরকার প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল। এজন্য ১৯৫০ সালেই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কমিউনিস্ট দমন আইন তৈরি করে। এই আইন বলে ১৯৫২ সালে সরকার সংসদে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্যদের বহিষ্কার ও গ্রেপ্তার করে।

১৯৫৩ সালে জোহানেসবার্গে এক গোপন সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অপ্রকাশ্য রাজনৈতিক দল হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও কমিউনিস্ট পার্টির অপ্রকাশ্য অবস্থানের কথা ১৯৬০ সালের পূর্বে প্রকাশ পায় নি। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে থেকে কাজ করতে থাকেন। এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে রয়েছে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, দ্য কংগ্রেস অব ডেমোক্রাটস, দ্য সাউথ আফ্রিকান কালার্ড পিপলস অর্গানাইজেশন এবং দ্য সাউথ আফ্রিকান ইন্ডিয়ান কংগ্রেস। ১৯৫৫ সালে দ্য সাউথ আফ্রিকান কালার্ড পিপলস অর্গানাইজেশন এবং দ্য সাউথ আফ্রিকান ইন্ডিয়ান কংগ্রেস মিলে গঠিত হয় কংগ্রেস অব দ্য পিপাল। কমিউনিস্টদের একটা বড় অংশ তখন থেকে এই কংগ্রেস অব দ্য পিপলের সঙ্গে মিশে যায়। পরবর্তীকালে কংগ্রেস অব দ্য পিপলের পক্ষ থেকে একটি স্বাধীনতার সনদ প্রচারিত হয়। সেই সনদে দাবি জানানো হয় যে, কয়লাখনি, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য প্রধান শিল্পসংস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। এই সনদ তৈরিতে কমিউনিস্টরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যে কংগ্রেস থেকে এই সনদ ঘোষিত হয় সেই কংগ্রেসে যোগদানকারী সকল সদস্যকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। দেখা যায় কংগ্রেসে যোগদানকারী ১৫৬ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জন কমিউনিস্ট। আবার এঁদের মধ্যে রয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক মোঁসে কোতানি এবং কারমান। দু'বছরের বেশি সময় ধরে এঁদের বিচার চলে। বিচারের পর সকলেই বেকসুর মুক্তি পান। এই ঘটনার পর ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার আইন তৈরি করে, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়াটাও দেশদ্রোহিতার অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

১৯৬৪ সালে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা আহ্‌মদ ধাত্রাদা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবার পর সরকারের পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান জোরদার করা হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হয়। এক বছরে আত্মগোপনারী কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন কেন্দ্রীয় সদস্য সহ ২২ জনের কারাদণ্ড হয়। এরপর কমিউনিস্ট কেবল রাজনৈতিক দল নয়, বিভিন্ন গণ সংগঠনের সদস্য হিসাবেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কর্মসূচী প্রচার করে। সেই কর্মসূচীতে বলা হয় ঃ দক্ষিণ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

নিষেধাজ্ঞা মুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলো রাষ্ট্রসংঘ। ১৯৯১ সালের ৮ই অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘের ১৮৪ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ সভার বৈঠকে এই মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়। তার আগে অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা ও এ এন সি-র সভাপতি নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৯১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর বর্ণবাদ সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ কমিটিতে ভাষণ দিতে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানান এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার। তবে তেল সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটি রাষ্ট্রসংঘ এখনও কার্যকর করে নি। বলা হয়েছে অন্তবর্তী পরিষদ কাজ শুরু করলে তা কার্যকরী হবে। ফলে ১৯৬১ সালে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণের সূত্রপাত রাষ্ট্রসংঘ করেছিলো, তার অবসান ঘটলই বলা যায়।

এ ঘটনা একই সঙ্গে ইঙ্গিত করলো যে এই ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেছে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত প্রাকৃতিক ও মানসিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই দেশটি। এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা তার বর্ণবিদ্বেষ জমানার ঘৃণ্য অতীতকে পরিত্যাগ করে এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম প্রতিষ্ঠার দিকে। ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ যখন বর্ধিত আস্ফালনে মত্ত, তখন গণআন্দোলনের এই সফল পরিণতি, সন্দেহ নেই, খুবই আশাব্যঞ্জক ঘটনা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই পালাবদল শুধু যে আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তা নয়, বিশ্বরাজনীতিতেও এর প্রতিক্রিয়া পড়বে সুদূর প্রসারী।

তবে এ প্রসঙ্গে এটা মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে মানেই, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী জমানার পুরোপুরি অবসান ঘটেছে বা জনগণের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পূর্ণতা পেয়েছে প্রত্যাশার সবকটি শর্ত মেনে — এটা ঠিক নয়। ম্যান্ডেলা পরিষ্কার ভাবেই বলে দেন যে আত্মসন্তুষ্টির এখনও কোনো অবকাশ নেই। গণ আন্দোলনের দাবি মেনে দক্ষিণ আফ্রিকার ডে ক্লার্ক সরকার ইতিবাচক পথে এগোচ্ছেন মাত্র। কারণ এ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প যে নেই তা বোঝার মতো বুদ্ধি তিনি দেখিয়েছেন। বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ জমানা কোনো আকস্মিক বৈরাগ্যবশে পরিবর্তনকামী হয়ে ওঠে নি।

ফলে দেখা যাচ্ছে বর্ণবিদ্বেষমুক্ত গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকা গড়ার পথে যথেষ্ট বাধা ছিল। শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই কট্টর দক্ষিণ পন্থী শক্তিগুলি জনগণের স্বার্থবিরোধিতার সামনে অনড়। তাদের পরাস্ত করতে হলে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দৃঢ়তার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সে কারণেই এ এন সি, কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সহযোগী শক্তিগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলেছে।

তাদের সাফল্যের তালিকায় সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল নির্বাচনের দাবি মানতে সরকারকে বাধ্য করা। মাস কয়েক আগেই ঠিক হয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় 'এক ব্যক্তি এক ভোট'-নীতির ভিত্তিতে বর্ণবিদ্বেষমুক্ত প্রথম নির্বাচন হবে ১৯৯৫ সালের ২৫, ২৭ ও ২৮ শে এপ্রিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন। হাতে সময় ছিল মাস ছ'য়েক। সেদিকে সামনে রেখে প্রস্তুতিও শুরু করে বিভিন্ন দল। সেই সঙ্গে আরো ঠিক হয়েছে যে, নির্বাচন শেষে নতুন সরকার দায়িত্বভার না নেওয়া পর্যন্ত দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে একটি অন্তবর্তী পরিষদ। যাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা থাকবে। বহু টালবাহানার পর এই অন্তবর্তী পরিষদ গঠনের দাবি ডে ক্লার্ক সরকার মেনে নেয়। সেই সঙ্গে ১৯৯৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান সংসদে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। যে প্রস্তাবে অবশেষে স্বীকৃতি পেয়েছে কৃষ্ণাঙ্গদের দেশ-শাসনের অধিকার। শ্বেতাঙ্গ সংসদে যেহেতু

রাষ্ট্রপতি ডে ক্লার্কের দল ন্যাশনাল পার্টিই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেহেতু প্রস্তাবটি গৃহীত হতে অসুবিধা হয় নি। কিন্তু ফলাফল থেকে দেশের তদানীন্তন পরিস্থিতি অনেকটাই আঁচ করা যায়। যেমন প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট পড়ে ১০৭টি। কিন্তু ৩৬টি ভোট পড়ে বিরুদ্ধে। কট্টর দক্ষিণপন্থী দলগুলি এর তীব্র বিরোধিতা করে।

কট্টরপন্থী শ্বেতাঙ্গরা এবং ইনকাথার মতো দক্ষিণ পন্থী কৃষ্ণাঙ্গ সংগঠনগুলিই আজ দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিবাচক পালাবদলের পথে প্রধান অন্তরায়। এ এন সি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, কর্মী সমর্থকদের ওপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ চলছে। সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে থাকাকালীন কমরেড ক্রিস হানির হত্যাকাণ্ডের ঘটনাই দেখিয়ে দিয়েছে কট্টরপন্থীরা কতটা বেপরোয়া হতে পারে। ইনকাথা-র প্ররোচনায় কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে দাঙ্গার ঘটনাও প্রমাণ করেছে বর্ধিত সতর্কতার আশু প্রয়োজনীয়তা। কট্টর দক্ষিণপন্থী ও নয়া নাৎসীবাদীদের কার্যকলাপে প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদতও বারে বারে বেরিয়ে আসছে। কমরেড ক্রিস হানিকে হত্যার পর গত ১৮ই জুলাই এ এন সি'র উপ-সভাপতি প্রবীণ নেতা ওয়াল্টার সিসুলুকে পর্যন্ত হত্যার চেষ্টা হয়।

এ সব সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিবাচক উত্তরণের পর্বে নির্ধারক ভূমিকায় রয়েছে এ এন সি, কমিউনিস্ট পার্টি সহ বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী সংগ্রামে পরীক্ষিত সংগঠনগুলি।

দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এবং বাইরে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি চাইবে বর্ণবিদ্বেষমুক্ত গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকায় এ এন সি বা কমিউনিস্ট পার্টি যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় লড়াইটা আজ শুধু দেশ পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের গাত্রবর্ণ বদলের নয়। এ এক বিকল্প রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচীর লড়াই। সে কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সে দেশের শাসকশ্রেণী অনমনীয়তা অনেক বেশি। একই মনোভাব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিরও। দক্ষিণ আফ্রিকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই সব প্রতিকূলতা জয় করেই যে এগিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, শেষ কথা বলে জনগণই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিষেধাজ্ঞা মুক্তির সুফলটি দক্ষিণ আফ্রিকার এই ব্যাপক জনগণের মধ্যে পৌছে দেবার লক্ষ্যেই এখন আগামী দিনের লড়াই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাচন

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলে দক্ষিণ আফ্রিকা। নতুন বর্ণভেদমুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে। ১৯৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি নেলসন ম্যান্ডেলার কারাগার মুক্তি এবং এ এন সি-কমিউনিস্ট পার্টিসহ বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী সংগঠনগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মাধ্যমে সাফল্যের এক নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের অগ্নিপরীক্ষার দীর্ঘপথ এখনও শেষ হয়নি। হাজার হাজার মানুষের রক্তপতনে পিচ্ছিল আজানিয়ার মাটিতে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন সহজ হবে, এ কথা কেউ ভাবেনও নি। বরং জানাই ছিল, মরিয়া বর্ণবিদ্বেষীরা মরণকামড় দেবার লেশমাত্র সুযোগও ছাড়তে নারাজ।

পশ্চিমী-মার্কিন মহল রাষ্ট্রপতি ডে-ক্লার্ক সরকারের পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত প্রচার দিয়ে বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থার একটা 'মানবিক মুখ' বার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘটনাবলীই প্রমাণ করছে, বর্ণবিদ্বেষের কোনো 'সংস্কার' হয় না। তার মূলোচ্ছেদই সর্বোত্তম এবং একমাত্র পন্থা।

ডে ক্লার্ক এবং তাঁর সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তনকে বিলম্বিত করতে কোন চেষ্টাই বাকি রাখেন নি।

কিন্তু, দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবিদ্বেষমুক্ত হবে কিনা তা নির্ভর করছে এ এন সি, কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সহযোগীদের সঙ্গে ডে ক্লার্ক সরকার কতটা সহযোগিতা করছে তার ওপর। তাতেই প্রমাণ হবে, বর্ণবিদ্বেষ ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রত্যাহারে রাষ্ট্রপতি কতটা আন্তরিক।

তবে এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য একটি সাফল্য আসে। অবশেষে ১৯৯৩ সালের ২৬শে জুন ২৬ দলীয় সমঝোতা বৈঠকে ঠিক হয় যে, ১৯৯৪ সালের ২৫, ২৭, ও ২৮শে এপ্রিল ভোট হবে। এটাই ছিলা, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণভেদমুক্ত প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন। জানা যায় মাত্র ৬টি দল এই নির্বাচনের বিরোধিতা করে। এর মধ্যে যেমন শ্বেতাঙ্গ রাজনৈতিক দল আছে, তেমনি আছে কৃষ্ণাঙ্গ সংগঠন। যদিও এই বিরোধিতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ আটকে থাকে নি। কিন্তু কারা নির্বাচনের বিরোধিতা করেছে, কেন, কী কারণ দেখিয়ে করেছে এবং সরকার এদের ক্ষেত্রে কী মনোভাব নেয় সেটাই লক্ষণীয় ছিল।

এটা ঠিকই যে, রাষ্ট্রপতি ডে ক্লার্ক এবং ন্যাশনাল পার্টির সরকার দেওয়ালের লিখন পড়ার ক্ষেত্রে পূর্বসুরীদের চেয়ে বহুগুণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ডে ক্লার্ক সরকার মেনে নেয় যে, বর্ণবিদ্বেষের ভিত্তিতে কোনো শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়।

কিছু কিছু পশ্চিমী প্রশ্রয় সত্ত্বেও, বর্ণবিদ্বেষের কারণেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য থেকে নিদারুণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকশ্রেণী। পাশাপাশি দেশের মধ্যে প্রবল গণ-আন্দোলন অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। শ্বেতাঙ্গ সাধারণ জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থার মোহ থেকে মুক্ত হতে শুরু করেন। সেইসঙ্গে, বলাবাহুল্য, এ এন সি, কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সহযোগীদের অসামান্য রাজনৈতিক সংগ্রাম। ফলে, ডে ক্লার্ক সরকারের কাছে বিকল্প কিছু ছিল না।

কিন্তু কেন এই টালবাহানা, কূটকৌশল? কারণ, এ এন সি, কমিউনিস্ট পার্টির হাতে দেশের শাসনভার চলে যাবার অর্থ এই নয় যে, এতে শুধুমাত্র, গাত্রবর্ণজনিত বৈষম্যের অবসান হবে। কারণ, এ এন সি'র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভূমিসংস্কার প্রভৃতি নীতি সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর — যাদের প্রতিনিধিত্ব করে ন্যাশনাল পার্টি-স্বাভাবিক আপত্তি রয়েছে।

তাই নিষেধাজ্ঞা উঠলেও এ এন সি'র 'প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গ কিছু সংগঠনকে রাজনৈতিক বৈধতা দিতে চেষ্টার কসুর করছে না ডে ক্লার্ক সরকার। লক্ষণীয়, এ এন সি'র কট্টর বিরোধীদের মধ্যে যেমন শ্বেতাঙ্গ নিও নাৎসি সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে, তেমনই রয়েছে শ্বেতাঙ্গ সরকার পোষিত, গাত্রবর্ণে কৃষ্ণাঙ্গ মুঙ্গুসোথি বুথুলেজির নেতৃত্বাধীন ইনকাথা পার্টি। দু'পক্ষই সশস্ত্র হামলা চালাচ্ছে এ এন সি-কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। গত ১০ই এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ক্রিস হানির নৃশংস হত্যাকাণ্ডই দেখিয়ে দিয়েছে, কট্টরপন্থীরা কতটা মরিয়া হতে পারে। কট্টরপন্থীরা এত মরিয়া যে সাঁজোয়া বাহিনী চেপে বহু দলীয় বৈঠকের অধিবেশন কক্ষে তারা ঢুকে পড়ছে।

এ এন সি'কে নিষিদ্ধ করতে শ্বেতাঙ্গ সরকার যত তৎপর ছিল, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ খুনে বাহিনীর বিরুদ্ধে তা কি দেখা যাচ্ছে? এমন কি কড়া পুলিসী ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে না। বরং অভিযোগ, পুলিস বাহিনী নাকি বহু জায়গায় ইনকাথার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হত্যাভিযানে

নামছে। ফলে, খুন খারাপি, রক্তাক্ত সংঘর্ষ এখন দক্ষিণ আফ্রিকায নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত।

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক বর্ণবিদ্বেষহীন দক্ষিণ আফ্রিকা গঠনের পথে এখনও অনেক বাধা। অনেক জটিলতা। তাকে অতিক্রম কবার লড়াইও তাই সহজ হবে না। নির্বাচন হলেই যে সব সমাধান, একথা যুক্তিবাদী কেউই মনে করেন না। তবে, দক্ষিণ আফ্রিকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনগণ শেষপর্যন্ত জিতবেনই। সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় অনেকটা পথ তাঁরা ইতিমধ্যেই পার হয়ে এসেছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের লাগামটাও তাই তাদেরই হাতে।

এক ঘৃণ্য আফ্রিকার সূচনা

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অবাধ নির্বাচনেব সময় 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস' বা এ এন সি'র প্রবীণ নেতা ওয়ালটার সিসুলু বলেছিলেন ঃ "আমরা যে নির্বাচনে জিতবো, এ সন্দেহ আমাদের অতিবড় শত্রুও করে না। কিন্তু আমি কেবল ভাবছি জেতার পরে কি বিপুল প্রত্যাশার সঙ্গে কালো কালো মানুষগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে ঃ দেশের অর্ধেকের মতো মানুষ দরিদ্র, নিরন্ন; অর্ধেকের ওপর বেকার কর্মহীন-কর্মচ্যুত; সত্তর লক্ষ মানুষ গৃহহীন; আরো দশ লক্ষ গৃহছাড়া, ৯০ লক্ষ নিরক্ষর; আর অগুনিত মানুষ ধৈর্যের শেষ বাঁধনে কোনোরকমে একটা আলগা ফাঁস দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, একটু আশার আলোর অস্পষ্ট ঝিলিক দেখবার লোভে।"

জোহানেসবার্গের অদূরে এক জবরদখল কলোনীর একটা নোংরা স্যাঁতসেতে ঘরে বসে ম্যান্ডেলা বলছিলেন ঃ "দেখ বাপু, ম্যাজিক-ট্যাজিক আশা করবে না আমার কাছে — আমাদের অনেক ত্রুটি-দুর্বিলতা রয়েছে, ভুলচুকও যে করছি না, হলফ্ করে বলতে পারছি না — তবে হ্যাঁ, তোমরা একজোটে সঙ্গে থাকো, সুদিন আসবেই।" কথা শুনে হাসছিলো, স্কোয়াটারস্ ক্যাম্পের ধুলোমাখা, রুক্ষচুল মানুষগুলো — কিন্তু হাসির মধ্যে কি একটু অসহায়ত্বের হাল্কা ছোয়া দেখা দিচ্ছিল? ম্যান্ডেলা এ বিষয়ে কিছু বলেননি বটে, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, ওঁর দিন খুব সুখে-শান্তিতে কাটছে না। এরই মধ্যে, দেশের অভিজ্ঞ অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ করে বসেন। কবে? না ঠিক যেদিন ম্যান্ডেলা আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন লুসাকায়, ঠিক তার আগের দিন! আবার দেখুন ঃ ম্যান্ডেলা যখন বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য রাতদিন খাটছেন, বাঁ-চোখের 'টিয়ার-ডাফ্ট' এ অস্ত্রোপচারের পরও, তখনই হ্যাঁ ঠিক তখনই, 'জাতীয় ঐক্যে'র সরকারের শরিক ন্যাশনাল পার্টির এক মাঝারী মাপের নেতা বলে বসলেন ঃ "'তথাকথিত' অপরাধী' পুলিসদের সকলকেই মাফ্ করে দিয়ে গেছে পূর্বতন শ্বেতাঙ্গ সরকার—বিচার টিচার করা আর চলবে না।" বিচার হবে না? তাহলে স্টিভ্ বিকো কিসের জন্যে প্রাণ দিলেন? কিসের জন্যে হাজার হাজার 'বিকো' অত্যাচারের ক্ষত শরীরের সর্বাংশে নিয়ে অজানা কবরখানায় শায়িত! বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী দাল্লাহ্ ওমর এ'ব্যাপারে সামান্যতম প্রতিবাদ করতেই ডে ক্লার্ক গর্জন জুড়ে দিলেন ঃ "আমাকে অপমান করা হয়েছে —সরকারে আমরা থাকব কি থাকব না ভাবতে হবে। এবার শক্ত হলেন ম্যান্ডেলা। পনেব মিনিটের ছোট্ট মিটিং — তারপর দেখা গেল ডে ক্লার্ক মাথা নিচু করে টিভি ক্যামেরার সামনে বিড়বিড় করে বলছেন ঃ "মিটে গেছেঃ স-অ-ব, ইয়ে,

মিটেই গেছে বলতে পারি।" "এতেই কি শেষ? না। কিছু উগ্রপন্থী যুবক হঠাৎই "সমান কাজের জন্য সমান বেতন" স্লোগান তুলে "পুলিস আর সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্য এক বেতন হার" দাবি করে, বেশ কয়েকটা থানা দখল করলেন। ম্যান্ডেলা তখন দিল্লিতে। পরিস্থিতি সামলালেন সিরিল রামাফোমা-জো নেতশিত্নেজহে— কার্ল নাইহাউসের মতো অভিজ্ঞ, পোড়-খাওয়া রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। তাও তো গুলি চললো। কালো মানুষের গুলিতে মরলো কালো মানুষ। তবে ম্যান্ডেলা অবিচল, লক্ষ্যে স্থির তাঁর শাণিত দৃষ্টি। আর তাই প্রিয় সহযোদ্ধা জো স্লোগের জীবনাবসান হয়েছে, একথা নিজেই ঘোষণা করলেন সরকারীভাবে। টেলিভিশনের পর্দায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল ম্যান্ডেলার চোখে জল। কিন্তু কাজ তো থেমে থাকেনি। পরদিনই আঁকে দেখা গেছে ভারতে এসে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে খসড়া দলিলে চোখ বোলাচ্ছেন। পোর্ট এলিজাবেথ থেকে ট্রানস্ভাল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাই শোনা যায় গান ঃ "আমরা তোমায় অফুরন্ত সময় দিতে রাজি, প্রিয় নেতা ম্যান্ডেলা!"

পার্শবর্তী নামিবিয়াতেও গান শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে নাচ। 'স্যাম' ন্যুজোমার নেতৃত্বে 'সোয়াপো' দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে সাম্প্রতিক নির্বাচনে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও জিত ন্যুজোমারই - একি কম আনন্দের কথা - বিশেষত, নামিবিয়ার মানুষদের কাছে! আনন্দধারা বইছে মোজাম্বিকেও। সেখানে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 'ফ্রেলিমো' দল ওঁদের নেতা, বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান হোয়াকিম্ চিগ্মানোর গোষ্ঠিকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছে। অ্যাঙ্গোলাতে কিন্তু একধরনের অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। নির্বাচনে বামপন্থী নেতা, হোজে এদুয়ার্দো দস্ সানতোস্ ও তাঁর দল এম এল এ, মার্কিন মদতপুষ্ট, জোনাস সাভিম্বি এবং তাঁর 'উনিতা' গোষ্ঠীকে হারিয়ে দিলেও সেই হার না মেনে, সাভিম্বি যথারীতি গেরিলা যুদ্ধের পুরনো কায়দায় ফিরে গেছেন। এদিকে, ২০ বছর ধরে চলা এই গৃহযুদ্ধের দাপটে অ্যাঙ্গোলার অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে শরণার্থীদের সারি। আর, মার্কিনী অঙ্গুলি-হেলনে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষাবাহিনী অ্যাঙ্গোলা ছেড়ে দ্রুত অপসৃত হয়েছে যাতে দস্ সানতোস্ চাপের মুখে থাকেন। পূর্ব আফ্রিকার রক্তাক্ত সংঘর্ষ আবার শুরু হয়েছে সোমালিয়ায়। নামমাত্র যে ক'জন বাংলাদেশী সেনা রয়েছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিবাহিনীর অবশিষ্টাংশ হিসাবে, তাঁরা চলে গেলেই গোটা দেশটা আবার ডুবে যাবে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের অন্ধকারে। মার্কিন প্রশাসন এই সুযোগে কিছু বাড়তি অস্ত্র বেচার সুযোগ পাবে সন্দেহ নেই। দক্ষিণে রোয়ান্ডায় টুট্সি-পরিচালিত নতুন সরকার ক্ষমতা দখল করলেও গরিষ্ঠ হুটুরা এখনো দলে দলে দেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী জাইব, উগান্ডা ও তানজানিয়ায় গড়ে-ওঠা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে এক টুক্‌রো রুটি বা এক মগ পানীয় জলের জন্য রোজ দাঙ্গা হচ্ছে—মরছে শত শত মানুষ। কে যে এই নিরন্ন মানুষগুলোর হাতে আধুনিকতম মার্কিন মেশিন—পিস্তল আর রিভলবার তুলে দিচ্ছে, সেটাই রহস্য! মানুষের দুঃখ বেচে কিছু লোক তো টাকা এখনো লোটে তৃতীয় দুনিয়ায় — তাই খুব একটা বিস্ময়ের ব্যাপার বোধহয় নয় ঘটনাটা! এদিকে সোমালিয়া এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে — যেমনটা হয়েছিল ১৯৯২ সালে, আর যাতে প্রাণ গিয়েছিল ৩৫ লক্ষ মানুষের। কিন্তু বুত্রোস ঘালির তো অনেক কাজ — কে মাথা ঘামায় কটা কালো মানুষ মরল কি বাঁচল, আর মরলেই বা কেন মরলো — এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে। হ্যাঁ দুর্ভিক্ষ বোধহয় আসন্ন আরো এক আফ্রিকীয় দেশে। লাইবেরিয়ায়। যেখানে নিহত একনায়ক স্যামুয়েল ডো'র 'দক্ষিণহস্ত' বলে

পরিচিত, 'জেনারেল' চার্লস জুলু আক্রমণ শাণাচ্ছেন ক্ষমতার আসীন 'কর্ণেল' চার্লস টেলরের দখলদারীর বিরুদ্ধে। এই দুই স্বঘোষিত নেতা সশস্ত্র সংঘর্ষে ইতোমধ্যেই দু'লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আর কৃষিজীবী লাইবেরিয়ার মানুষদের দুই-তৃতীয়াংশই চাষবাস ছেড়ে বাস্তুহারা। আকাল আসন্ন, কোনো সন্দেহ নেই।

এদিকে মিশব, সুদান, মরক্কো, আলজেরিয়ার ঐশ্লামীয় মৌলবাদীরা মাথা চাড়া দিচ্ছে, সরকারের দৃঢ়চিত্ত জনমুখী নীতির অভাবের সুযোগের পুরো ফায়দা উঠিয়ে। আলজেবিয়াতে মৌলবাদী 'ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট' ও সরকারের মধ্যে সংঘর্ষে ইতোমধ্যেই ১২,০০০ মানুষ মারা গেছেন। আপাতত, মৌলবাদীরা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছে বিদেশীদের। এয়ার-ফ্রান্স এর এক বিমান ছিনতাই করতে গিয়ে আর এক মৌলবাদী গোষ্ঠী, 'ইসলামিক জিহাদের' চারজন ফরাসী পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছেন। মিশরে মৌলবাদীদের হাতে এতাবৎ নিহত হয়েছেন পাঁচ হাজার মানুষ। প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে ৭০০ উগ্রপন্থীদের। তাতেও কিন্তু মৌলবাদীদের জনপ্রিয়তা কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মোবারক-সরকারের সার্বিক ব্যর্থতা মিশরবাসীর মনে যে বিপুল হতাশার সৃষ্টি করেছে, মৌলবাদের জন্ম সেই হতাশার ক্রোড়েই। একইভাবে সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে যে উগ্র খ্রীষ্টান মৌলবাদ মাথা তুলছে, তার উৎস খুঁজতে হবে সুদানের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ এবং স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের কুশাসনের মধ্যে। মরক্কোতেও একই পরিস্থিতি কাজ করছে। উগ্রপন্থী গোঁড়াবাদীদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে বিশেষ করে বামপন্থী এবং বুদ্ধিজীবীরা। অশীতিপর বৃদ্ধ, সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার জয়ী নাগুইব মাহফুজ-এর ওপর তাঁর কায়রোর বাসস্থানে সশস্ত্র আক্রমণ এরই প্রতিফলন।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক উন্নয়নের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হবার পর থেকে এই অধিকারের পূর্ণ ও বিশ্বজনীন বাস্তবায়নের কমিশন সর্বদাই খুব মাথা ঘামিয়েছেন। ১৯৯০ সালের সম্মেলনে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা নিয়ে আলোচ্যসূচীতে পৃথক আলোচনারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নয়নের অধিকারের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারের ক্ষেত্রে কমিশন খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে এবং এই অধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য খুবই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক সমাজ সর্বদাই এ ব্যাপারটির স্বীকৃতি দিয়েছে ও তার সংপ্রশংস উল্লেখ করেছে।

এই অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে এর তত্ত্বগত দিকটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বর্তমানে এরকম একটা মতবাদ প্রচলিত আছে যে, উন্নয়নের অধিকার আসলে ব্যক্তিগত অধিকার। উন্নয়নের অধিকার একদিকে যেমন রাষ্ট্র বা জাতির অধিকার অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত অধিকারও বটে। এটি একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রগত। এটা একদিকে যেমন সমষ্টিগত, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত মানবিক অধিকার। এই অধিকারকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করাটা দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে সুসমঞ্জস্য নয়। বিশ্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী বিচার করলে ব্যক্তিগত উন্নয়নকে কোনভাবেই রাষ্ট্র বা জাতিগত উন্নয়নের ধারা থেকে পৃথক করা যায় না। এ ব্যাপারে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা একই রকমের। অর্থাৎ একটা দেশ যখন পরপদাবনত এবং স্বাভাবিকভাবেই তার সমস্ত জাতীয় অধিকারের আদৌ কোন অস্তিত্বই নেই সেখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে উন্নয়নের অধিকারের প্রশ্নই ওঠে না। রাষ্ট্রীয় বা জাতিগত পর্যায়ে উন্নয়ন সম্ভব হলে তবেই ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব। সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নয়ন বা বিকাশ সামগ্রিকভাবে দেশ বা জাতির বিকাশের ধারাকে সহজতর করে দেয়। কাজে কাজেই, রাষ্ট্র বা জাতির বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিকাশের প্রশ্নটি এক এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ও একে অপরের পরিপূরক। এই দুয়ের মধ্যে কোন ধরনের সংঘাত বা এদের পৃথক করার কোন খামখেয়ালি প্রচেষ্টা উন্নয়নের অধিকারকে সঠিকভাবে উপলব্ধি এবং তাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

উন্নয়নের অধিকারকে আদায় করতে হলে আন্তর্জাতিক সমাজে জাতীয় বিকাশের পথে

যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাকে অপসারিত করা অত্যাবশ্যক। একথা অস্বীকাব করার কোন উপায় নেই যে, আজকের দুনিয়াতেও নানাধরনের উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য, বিদেশী আগ্রাসন, দখলদারি রয়েছে এবং মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে নানা কৌশলে অবদমিত করা হচ্ছে। এ সমস্ত কিছুই উন্নয়নের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকস্বরূপ এবং মতপার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সমতা, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা, সহযোগিতা বজায় রেখে পারস্পরিক সম্মান ও সাধারণক্ষেত্রে খুঁজে বের করার মানসিকতার উপর ভিত্তি করে নতুন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার স্বার্থে এই প্রতিবন্ধককে হঠানোর জন্য আন্তর্জাতিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করা উচিত। একমাত্র এই ধরনের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই বিশ্বকে উন্নত করা এবং উন্নয়নের অধিকারকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

উন্নয়নের অধিকারকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থাও একান্ত জরুরী। আজকের পৃথিবীতে অনৈতিক ও অসম অর্থনৈতিক পরিবেশের ফলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ফারাকটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ধারাটি চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭২ সালে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা ছিল ২৫, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৪১। বিশ্ববাজারে, উৎপাদনের প্রাথমিক উপকরণ এবং তৈরী মালের বিনিময়মূল্যের ফারাকটা ক্রমবর্ধমান গতিতে বেড়ে চলেছে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ তাদের অর্থনীতিতে বেশি বেশি করে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরিণামে মাথাপিছু আয় হ্রাস পেয়েছে এবং উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য নানা ইতিবাচক প্রচেষ্টা চালিয়েও এখন পর্যন্ত যে প্রাথমিক ফলাফল জানা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা তাদের অস্বস্তিকর অবস্থানের ক্ষেত্রে মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ সবই হচ্ছে অযৌক্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী ফল। বর্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটাতে হলে বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে অবিচার ও অসাম্যকে দূর করে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নতুন রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে চালু বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটাতে হবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির বিকাশের পথে বাধাসমূহকে চূড়ান্তভাবে অপসারিত করতে হবে।

উন্নয়নের অধিকার আদায়ের ব্যাপারটি একটি কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। মানবিক অধিকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির একার প্রচেষ্টা দ্বারা এই কাজ সম্পূর্ণ করা খুবই কঠিন। এরজন্য সরকার, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন শাখা ও অন্যান্য সকলের প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এটা সবাই জানেন যে, বিশ্ব অর্থনীতি একটা অখণ্ড সত্তা এবং উন্নয়ন প্রয়াসে সব দেশই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্য ও দুর্গতিকে দীর্ঘস্থায়ী করে তাদের উন্নয়নহীনতার অন্ধকারে রেখে সংখ্যালঘিষ্ঠের উন্নতিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রগতি একই সঙ্গে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কল্যাণে অবদান যোগাবে। উন্নয়নের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের লক্ষ্যে যথাশীঘ্র সম্ভব পৌঁছবার জন্য এবং উন্নয়নের অধিকারকে কার্যকরী করার জন্য সমগ্র আন্তর্জাতিক সমাজকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজে নামতে হবে। এ ব্যাপারে বিশ্বসমাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মানবজাতির

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশে এবং ঘোষণাপত্রের মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবদান রাখতে প্রস্তুতি রাখা প্রয়োজন।

রেকইয়াভিক শীর্ষ সম্মেলন

১৯৮৬ সালে সাবেক সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গরবাচ্যভ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান-র মধ্যে আইসল্যান্ডে যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বিশ্ব রাজনীতি। রেকইয়াভিক আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ বাস্তবায়িত করা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করতো, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা যে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, সেই সম্ভাবনা দূর করতে হলে সাবেক সোভিয়েত-মার্কিন যৌথ প্রচেষ্টা অনিবার্য ছিল।

আলোচনার শুরুতেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সামগ্রিকভাবে আলোচনার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখে। পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস নয়, স্বল্পকালের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র কীভাবে বর্জন করা যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রস্তাবগুলি পেশ করা হয়।

প্রথম প্রস্তাবটি ছিল 'স্ট্রাটেজিক অফেনসিভ ওয়েপনস্' সংক্রান্ত। এই প্রস্তাবে বলা হয়, পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে এই অস্ত্রের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার মাঝারি-পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্রের প্রশ্নে ব্যাপক ছাড় দেয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারী ক্ষেপনাস্ত্রের ব্যাপারে মার্কিনী আপত্তি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্মত হয়। সোভিয়েত প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের অস্ত্রের সার্বিক বর্জন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল মাঝারি-পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র সম্পর্কে। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ইউরোপে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্টের মাঝারি-পাল্লার সমস্ত মজুত ক্ষেপনাস্ত্র বাতিল করতে হবে, তবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব প্রযোজ্য হবে না। এ ক্ষেত্রেও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগিয়ে তোলার জন্য তার ঘোষিত নীতি থেকে সরে এসেছিল।

তৃতীয় যে প্রশ্নটি সাবেক সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সামগ্রিক আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল তা হলো, পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ সংক্রান্ত চুক্তি এবং ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরোধ সংক্রান্ত (এ বি এম) চুক্তি। উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভবিষ্যতে কোনো দেশের পক্ষেই সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ না থাকে। তাই প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৯৭২ সালের এ বি এম চুক্তি কঠোরভাবে মানতে হবে। অন্ততঃ ১০ বছর এই চুক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে আসা চলবে না। এই সময়-সীমার মধ্যেই 'স্ট্রাটেজিক' অস্ত্র বর্জন করতে সচেষ্ট হতে হবে।

প্রথমদিকে প্রেসিডেন্ট রেগানের প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক মনে হয়নি। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে যে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা চলছিল সেখানে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট রেগানও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রদত্ত বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট রেগান এমন ইঙ্গিতও দেন যে সোভিয়েত

ইউনিয়নের স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ-এ (এস ডি আই) যোগদান করা উচিত এবং বর্তমান এ বি এম চুক্তির পরিবর্তে অন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করা দরকার। প্রেসিডেন্ট রেগানের এই প্রস্তাবে সোভিয়েত প্রস্তাবগুলিকে কার্যতঃ প্রত্যাখ্যান করা হয়। সাবেব সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মত প্রকাশ করে যে, প্রেসিডেন্ট রেগানের এস ডি আই পরিকল্পনা অবস্থার আরও অবনতি ঘটাবে।

আলোচনা যাতে ভেঙে না যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গরবাচ্যভ প্রেসিডেন্ট রেগানকে বলেন যে, তিন ধরনের আক্রমণাত্মক স্ট্রাটেজিক অস্ত্র সম্পর্কে তাঁরা একমত, যেমন ঃ ভূমিতে অবস্থানরত ক্ষেপনাস্ত্র, স্ট্রাটেজিক সাবমেরিণ ও বোম্বার। এই ধরনের সমরাস্ত্রের প্রত্যেকটির সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ কমাবার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অনেক বিতর্কের পর অবশ্য এই সম্পর্কে একটি পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব হয়। মাঝারি-পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র সম্পর্কেও তা হয়। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারেও অনেকটা অগ্রসর হওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এ বি এম এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে কোন কিছু করাই সম্ভব হয়নি।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণের মূল লক্ষ্য ছিল যাতে ভবিষ্যতে আরও ভয়ঙ্কর শক্তিধর পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব না হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রেগানের মতে কোন উন্মাদ তো এই সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ করে যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারে। তাহলে নিরাপত্তা কোথায় থাকবে? সুতরাং আত্মরক্ষার স্বার্থে যে 'এস ডি আই' পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার কাজ অব্যাহত থাকবে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করতো যে যদি সমস্ত ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র বর্জন করা যায় তাহলে সেই অস্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রশ্ন ওঠে না। আসলে 'স্টার-ওয়ার' সংক্রান্ত মার্কিনী পরিকল্পনার পেছনে ছিল জঙ্গী সমর ও শিল্পনীতির অশুভ আঁতাত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এ বি এম চুক্তির পরিবর্তন দাবি, বহির্মহাকাশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার ইত্যাদি সব কিছুই জঙ্গী মার্কিনী মানসিকতার পরিচায়ক। একই সঙ্গে পারমানবিক অস্ত্র হ্রাস আবার তাদের সামরিক উৎকর্ষতার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাওয়া, এই দুটি পরস্পর-বিরোধী নীতি। তাই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সামগ্রিক বিচারের জন্য যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছিল তাতে পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস ও বর্জনের সঙ্গে এ বি এম চুক্তিকে কঠোরভাবে মানা এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণ চুক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল। তাই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পষ্টভাবে প্রেসিডেন্ট রেগানকে জানিয়ে দেয় যে, এ বি এম চুক্তি না মানলে এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণ চুক্তি না হলে স্ট্রাটেজিক অস্ত্রের হ্রাস ও বর্জন সম্পর্কে যে বোঝাপড়া হয়েছে তা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

কিন্তু বিশ্বের জনগণের দিকে তাকিয়ে, শান্তির স্বার্থে এই সম্মেলনের ধনাত্মক দিকগুলির উপর একটি ছোট্ট খসড়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফে আলোচনার শেষ পর্যায়ে আবার পেশ করা হয়। বলা হয় ঃ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী দশ বছর তৎকালীন এ বি এম চুক্তির ধারাগুলি কঠোরভাবে মেনে চলবে এবং বহির্মহাকাশে কোনরকম পারমাণবিক পরীক্ষার মাধ্যমে এ বি এম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষতা অর্জনে বিরত থাকবে। তবে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ কাজ করা যেতে পারে। আগামী পাঁচ বছরে 'স্ট্রাটেজিক অফেনসিভ্' অস্ত্র শতকরা ৫০ ভাগ এবং তার পরের

পাঁচ বছরে বাকি ৫০ ভাগ কমিয়ে ফেলা হবে। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পর এই খসড়াতেও প্রেসিডেন্ট রেগানের সম্মতি পাওয়া যায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনভাবেই তার এস ডি আই গবেষণার কাজ কমিয়ে দিতে রাজি ছিল না। তারা বহির্মহাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলে শীর্ষ সম্মেলন থেকে ধনাত্মক কিছু নীতি বা কর্মসূচী বেরিয়ে আসেনি।

হারারে শীর্ষ সম্মেলন

১৯৮৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে জিম্বাবোয়ের রাজধানী হারারেতে জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে এই জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে এই জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের পূর্বে বিশ্বজোড়া আলাপ-আলোচনা চলে।

হারারে সম্মেলন ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অষ্টম সম্মেলন। এর পূর্বে যে সাতটি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই সমস্ত সম্মেলন অভিহিত হত জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের বৈঠক বলে। কিন্তু বিগত ছয় বছর ধরে এই সম্মেলন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সম্মেলন বলে অভিহিত হয়ে আসছে। এই নাম পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের বিশ্ব রাজনীতিতে ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এখানে কোন্ পটভূমিকায় এবং কীভাবে জোটনিরপেক্ষ মঞ্চের আবির্ভাব ঘটে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫৫ সালের ১৮ থেকে ২৪শে এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বানদুঙ শহরে এশিয়া এবং আফ্রিকার ২৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা একটি বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে সদ্য-স্বাধীন দেশসমূহের ভূমিকা ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা হয়। যে সমস্ত বিশিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধান এই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ভারতের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, চীনের চৌ এন লাই, ভিয়েতনামের ফাম ভাঙ দঙ, মিশরের গামাল অব্দেল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার আহ্‌মেদ সুকার্ণো। যে সময় ১৯টি আফ্রো-এশীয় দেশের রাষ্ট্রনায়কদের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়টা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ বলে চিহ্নিত। বান্দুং বৈঠকের রাষ্ট্রনেতারা বিশ্বে উত্তেজনার অবসানকল্পে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে কিভাবে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে দূরে রাখা যায় সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং দশ-দফা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই দশ দফা প্রস্তাবের মূল কথা ছিল প্রতিটি রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা, সমান সম্মান এবং অধিকার। এই বান্দুং অধিবেশন থেকেই সদ্য-স্বাধীন দেশসমূহের জন্য একটি পৃথক আন্তর্জাতিক মঞ্চ গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বান্দুং বৈঠকেই জোটনিরপেক্ষ মঞ্চের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এখান থেকেই ঠিক হয়, সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের রাষ্ট্রনাযকেরা একটি সম্মেলনে মিলিত হবেন এবং সেই সম্মেলন থেকে জোটনিরপেক্ষ মঞ্চ গড়ে তুলবেন।

বান্দুং শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালের ১ থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেডে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম সম্মেলনের নাম ছিল জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের আন্দোলনের সম্মেলন।

মোট ২৫টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে। প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তির সপক্ষে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ ঘোষণাপত্রে সাবেক সোভিয়েত প্রধান নিকিতা ক্রুশ্চভ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান জন এফ কেনেডিকে অবিলম্বে শান্তি আলোচনায় বসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এর পর কায়রো (১৯৬৪), লুসাকা (১৯৭০), আলজিয়ার্স (১৯৭৩), কলম্বো (১৯৭৬), হাভানা (১৯৭৯) এবং নয়াদিল্লি (১৯৮৩)তে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু হয়েছিল মাত্র ২৫টি দেশের উপস্থিতিতে সেই আন্দোলন গত ২৫ বছরে বিস্তারলাভ করেছে; বহু প্রতিকূল অবস্থান অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করেছে। সেই সাফল্যেরই প্রতিফলন ঘটল হারারেতে অনুষ্ঠিত অষ্টম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে। যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল মাত্র ২৫টি দেশের উদ্যোগে, হারারেতে অনুষ্ঠিত অষ্টম সম্মেলনে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ১০১টি।

বেলগ্রেড থেকে হারারে, ১৯৬১ থেকে ১৯৮৬—এই সময়ের মধ্যে বিশ্ব পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই ২৫ বছরে ৭১টি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। একদিকে সদ্য-স্বাধীন দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি, এই সমস্ত দেশের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মৈত্রী সাম্রাজ্যবাদীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পারমাণবিক যুদ্ধ উন্মাদনায় মরিয়া হয়ে উঠে।

হারারেতে অনুষ্ঠিত অষ্টম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে আলোচনায় যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় তা হলো, বর্ণবিদ্বেষবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের ভূমিকা। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের ওয়ার্কিং গ্রুপের যে সভা হয় সেই সভায় সকলেই এ বিষয়ে একমত হন যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আর কালবিলম্ব না করে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন। ওয়ার্কিং গ্রুপের নেতারা এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হন যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য, সহযোগিতা এবং মদত ব্যতিরেকে বর্ণবিদ্বেষী সরকার দেশের দেশপ্রেমিক জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করতে পারে না।

হারারে সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার মধ্যে রয়েছে ঃ (১) বর্ণবিদ্বেষবাদীদের কবল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে মুক্ত করার জন্য সর্বতো প্রয়াস চালানো। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্তবর্তী দেশগুলিকে এবং সেই সঙ্গে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও সোয়াপোকে বৈষয়িক সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যে "আগ্রাসন, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তহবিল" নামে একটি বিশেষ তহবিল খোলার সিদ্ধান্ত হয়। ভারতকে সভাপতি করে ন'টি দেশকে নিয়ে একটি তহবিল কমিটিও গঠিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধে এবং নামিবিয়ার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে উন্নত দেশগুলিকে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান এবং পশ্চিম জার্মানিকে রাজি করাবার জন্য আটটি দেশকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতেও ভারত অন্যতম সদস্য।

সম্মেলন থেকে নামিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন দাবি করা হয়।

(২) হারারে সম্মেলনে বিশ্বশান্তি এবং নিরস্ত্রীকরণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মেলন থেকে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা সার্বিক নিষিদ্ধকরণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে। সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে ক্রমবর্ধমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান এবং ১৯৮৭ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সময়ভিত্তিক কর্মসূচী হাজির করার অনুরোধ জানানো হয়।

নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রবার্ট মুগাবের ভাষণ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুগাবে বলেছিলেন, আজকের বিশ্বে প্রতি মিনিটে অস্ত্রের খাতে ব্যয় হয় দু'শো কোটি ডলার। মাত্র এক বছরে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তা দিয়ে এই শতকের মতো বিশ্বকে ক্ষুধার হাত থেকে মুক্ত করা যায়। অতএব নিরস্ত্রীকরণই হচ্ছে আমাদের সময়কার মূল কর্তব্য। এখন দরকার সার্বিক পরমাণু পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন একতরফাভাবে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও উচিত অবিলম্বে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করা।

(৩) জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে তৃতীয় যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয় সেটি হল, তৃতীয় দুনিয়ার দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয় সাধন। সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের বৈদেশিক ঋণের সংকটের প্রশ্নে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল কাস্ত্রো এই ঋণকে তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনৈতিক এইডস বলে অভিহিত করেন। অনেকে আবার এই ঋণকে এক ধরনের অর্থনৈতিক বর্ণবিদ্বেষবাদ বলে চিহ্নিত করেন। সম্মেলন থেকে জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য ২৫টি দেশকে নিয়ে মন্ত্রীপর্যায়ের একটি কমিটি গঠিত হয়।

শান্তির জন্য সংগ্রাম

১৯৮৭ সালে শান্তির জন্য সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বৈঠকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেওয়া হয় ঃ (১) সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত পৃথিবীর (২) রেইকিয়াভিক শীর্ষ বৈঠকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছে, (৩) বিশ্বশান্তির সপক্ষে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত যুক্ত ঘোষণায় সই করে। এই সমস্ত ঘোষণার মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ রোধে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তরিক প্রয়াস নিহিত ছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ শান্তির জন্য আরো বেশি বেশি করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করে। শান্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য, আক্রমণ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে দিল্লি ঘোষণা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের সহযোগিতার মনোভাবই ব্যক্ত করে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে উঠছে। ১৯৮৬ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে যাঁরা পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধে মত দেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ শতাংশ, ১৯৮৭ সালের মে-জুনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬

শতাংশ এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮০ শতাংশে। এই একটি চিত্র থেকেই বোঝা যায় যে, পারমাণবিক যুদ্ধের প্রশ্নে রেগান প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ থেকে কত বিচ্ছিন্ন হয়ে পবে।

পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্ব সম্পর্কে সাবেক সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যে প্রস্তাব দিয়েছিল তার মূল কথা ছিল ঃ সমস্ত রকমের পারমাণবিক এবং অন্যান্য অস্ত্র ধ্বংস করতে হবে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে শান্তির সপক্ষে সমস্ত বিশ্বের চেহারা পাল্টে যাবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র মুক্ত পৃথিবীর প্রস্তাবে কোন সাড়া না দিয়ে তারকা যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির মোকাবিলা সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করে দিয়ে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম অধিবেশনে আহ্বান জানানো হয় ঃ "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ সামরিক সমতা ভেঙে সামরিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য উন্মত্ত প্রয়াস চালাচ্ছে। এর ফলে বিশ্ব পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। এজন্য আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে তুলতে হবে। আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে।"

এই সময়ে সাবেক সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্ব-র পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবও দিয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব দেয় যে, ইউরোপ ভূ-খণ্ড থেকে উভয় পক্ষই অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নিক। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। বিগত এক বছর ধরে যে সমস্ত দাবিতে বিশ্ব শান্তি আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তার মধ্যে ইউরোপ থেকে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণ অন্যতম প্রধান দাবি। সাবেব সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রস্তাব বিশ্বের প্রতিটি শান্তিকামী মানুষ স্বাগত জানান। এই প্রস্তাব ইউরোপের জনগণের মনে নতুন আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করে। এর মধ্য দিয়েই ইউরোপের জনগণের মনে স্বস্তি ফিরে আসতে পারে এবং তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত হন। এই প্রস্তাবের পাশাপাশি, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ফেব্রুয়ারি মাসেই এশিয়ায় মাঝারি পাল্লার অস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে এশিয়া এবং পারস্য অঞ্চলের জনগণও নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৮৭-র ফেব্রুয়ারি প্রস্তাব গ্রহণও করতে পারেনি আবার সরাসরি প্রত্যাখ্যানও করতে পারেনি। এদিকে ফরাসী সরকার সাধারণ চিরাচরিত (কনভেনশনাল) অস্ত্র হ্রাসের প্রশ্নে বিরোধিতা করেছে। ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলি বহুপূর্বেই সাধারণ চিরাচরিত অস্ত্র হ্রাসের সপক্ষে মত দেয়। তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারও ফ্রান্সের মতই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি যখন মস্কো সফর করেন তখন আণবিক অস্ত্র হ্রাসের প্রশ্নে খুবই অনীহা প্রকাশ করেন। বাস্তবিকপক্ষে এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্র আণবিক অস্ত্র হ্রাসের সামগ্রিক প্রচেষ্টাকেই বানচাল করে দেবার জন্য খুবই তৎপর হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে ১৯৮৬ সাল আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষ হিসাবে ঘোষিত হয়। এই বছর রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন শাখার উদ্যোগে বহু শান্তি সমাবেশ, শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আণবিক বোমা পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে। সাবেক সোভিয়েত

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা ছিল সম্পূর্ণ একতরফা ঘোষণা। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির সপক্ষে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অকৃত্রিম আন্তরিকতাই প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে কোন সাম্রাজ্যবাদী সরকারই রাষ্ট্রসংঘের আহ্বানে সাড়া দেয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন নতুন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং তারকা যুদ্ধের পরিকল্পনা বিশ্ব জনগণের সামনে তুলে ধরে। এসবের একটিই অর্থ—তা হলো, রাষ্ট্রসংঘের শান্তির আহ্বানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো। ১৯৮৬ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার পর্যায়ক্রমে ধ্বংস করার প্রস্তাব দেয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাব দেয় পারমাণবিক পরীক্ষা স্থগিত রাখার প্রস্তাবের পাশাপাশি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের এই দুটি প্রস্তাবকে সমগ্র বিশ্ব জনমত স্বাগত জানায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এই প্রস্তাবে সাড়া দেয় না, সম্মতি দেয় না। তারা এই অজুহাত সৃষ্টি করে যে, অপরপক্ষ অর্থাৎ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি গোপনে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে তবে এই পরীক্ষা যে হবে না তার গ্যারান্টি কে দেবে? কিন্তু অচিরেই এই যুক্তি অসার প্রমাণিত হয় যখন পাঁচ মহাদেশের ছ'টি দেশ প্রস্তাব দেয় যে, কোথাও কোনভাবে গোপনে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বিজ্ঞানীরাও এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মেনে নেন। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

১৯৮৬ সালে সোস্যালিস্ট আন্তর্জাতিকের ২৭তম কংগ্রেস লিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। পারমাণবিক পরীক্ষা স্থগিত সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘোষণা এই কংগ্রেস স্বাগত জানায়। সঙ্গে সঙ্গে সোস্যালিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা যুদ্ধের পরিকল্পনার নিন্দা করে। এই কংগ্রেসে সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানি, ওয়েস্ট জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি অব চেকোশ্লোভাকিয়া একটি যৌথ প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবে ইউরোপকে রসায়ন অস্ত্র মুক্ত করার দাবি জানানো হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, ব্রিটিশ লেবার পার্টি এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

৯৪টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে বিশ্বশান্তি সংসদ গঠিত। ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়ঃ "বিশ্বে আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে, সমস্ত ধরনের আণবিক পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে। তারকা যুদ্ধের পরিকল্পনা বন্ধ করো।

১৯৮৬ সালের অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষের বাস্তব ঘটনা হল বিশ্বের ১০৫টি কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স এবং সোস্যালিস্ট পার্টিই (এর মধ্যে ৯৮টি কমিউনিস্ট পার্টি) কোন না কোনভাবে শান্তি আন্দোলন সংগঠিত করেছে। সারা বিশ্বে ৪০ কোটি শ্রমজীবী মানুষ এই শান্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এর পূর্বে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ সংগঠিত ভাবে শান্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন নি। আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

আই এন এফ চুক্তি : পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত পৃথিবীর পথে প্রথম ধাপ

১৯৮৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর মানব ইতিহাসে অন্যতম একটি উজ্জ্বলতম দিন হয়ে থাকবে। স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূল ও নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে

ঐদিন ওয়াশিংটনে ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন সাবেক সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গরবাচ্যভ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান। আই এন এফ (ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ অ্যান্ড শর্টার-রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্স বা মাঝারি ও স্বল্প পাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র) চুক্তি নামে ইতিমধ্যে খ্যাত এই চুক্তিটি বিশ্বকে পরমাণু-অস্ত্রমুক্ত করার এবং মানবজাতিকে পারমাণবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার প্রথম সুনির্দিষ্ট ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে এই চুক্তির গুরুত্ব ও তাৎপর্য চুক্তির বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে গেছে।

সাবেক সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিব্যুরো ১৯৮৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের চুক্তিটিকে সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করে। তার আগে গত ১১ ডিসেম্বর বার্লিনে ও ব্রাসেল্‌স-এ চুক্তি রূপায়ণ তদারকির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত কবার জন্য ইউরোপের সাতটি দেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। বার্লিনে সাবেক সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে গণতান্ত্রিক জার্মানি এবং চোকোশ্লোভাকিয়ার। ব্রাসেল্‌স-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে পাঁচটি পশ্চিম ইউরোপীয় (ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডস্‌) দেশের।

সারা বিশ্বের শান্তিকামী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সরকারগুলি এবং জনসাধারণ আই এন এফ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল। মাঝারি ও স্বল্প পাল্লার সাবেক সোভিয়েত ও মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূল ও নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি মোটেই খুশি নয়। তাদের মতে, ওয়াশিংটন চুক্তির ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য এখন অন্যান্য ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা খুবই জরুরী। খোদ মার্কিন মুলুকেও যুদ্ধবাজ শক্তিগুলি রেগান-গরবাচ্যভ আই এন এফ চুক্তির প্রভাব বানচাল করার জন্য তৎপর।

এই চুক্তির দ্বারা কিন্তু অন্যান্য ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রাদি নির্মূল বা নিষিদ্ধ করার নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় নি। মহাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপনের মার্কিন ষড়যন্ত্র এস ডি আই (স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ) বা নক্ষত্র যুদ্ধের কর্মসূচী অব্যাহত থাকছে। অব্যাহত থাকছে, মারাত্মক বিধ্বংসী রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন। তাছাড়া, প্রথাগত অস্ত্র সীমিতকরণের প্রশ্নও রয়ে গেছে। সাবেক সাবেক সোভিয়েত নেতা গরবাচ্যভ তাই চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পর পরই বলেছিলেন, মানবজাতির ইতিহাসে এই চুক্তি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ হলেও আমাদের দু'টি দেশের পরস্পরের পিঠ চাপড়ানোর সময় এখনও আসে নি। সে সময় সাবেক সোভিয়েত সংবাদসংস্থা তাস-এর পর্যবেক্ষক সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন, আগামী দিনগুলি দেখিয়ে দেবে ওয়াশিংটনের শীর্ষ বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ফলগুলি কীভাবে বাস্তাবায়িত হয়। সাবেক সোভিয়েত পার্টি সম্ভাব্য দ্বিতীয় আর একটি চুক্তির উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে। ১৯৭৮-র ডিসেম্বরের ওয়াশিংটন শীর্ষ বৈঠকে উভয় দেশের রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন (স্ট্রাটেজিক) অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার অন্তত ৫০ শতাংশ হ্রাস করার প্রশ্নে নীতিগত ঐকমত্য হয়।

৮ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখের আই এন এফ চুক্তির দু'টি দিক আছে। প্রথম দিক, মাঝারি ও স্বল্প পাল্লার মার্কিন ও সাবেক সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূল ও নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় দিক, নির্মূলীকরণ ও নিষিদ্ধকরণ যাচাই ও তদারকি করার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা।

মাঝারি ও স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বলতে চুক্তিতে ভূমি থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ঐ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের কথাই বলা হয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র দু'ধরনের। একটি হলো নির্দিষ্ট অভিমুখে

নির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালিত (ব্যালিস্টিক)। অপরটি, গতিপথ ও অভিমুখ নিয়ন্ত্রণের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাসম্পন্ন (ক্রুইজ)। স্বল্প এবং মাঝারি পাল্লা মিলিয়ে পাঁচশ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার পাল্লাসম্পন্ন ভূমিভিত্তিক যে সব ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূল ও নিষিদ্ধ হয় তার মধ্যে আসে সাবেক সোভিয়েতের আর এস ডি-১০, আর-১২, আর-১৪ (সবই মাঝারি) এবং ৩টি আর ২২ এবং ২৩ (এগুলির মার্কিন দেওয়া নাম যথাক্রমে এস এস-২০, এস এস-৪, এস এস-৫ এবং এস এস-১২ এস এস-২৩)। অপরদিকে, আসে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র পার্শিং-১১, বি জি এম-১০৯ জি (মাঝারি) এবং পার্শিং-১ এ (স্বল্প)। মাঝারি (৮২৬) এবং স্বল্প (৯২৬) পাল্লার সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র মোট ১৭৫২ এবং মার্কিন ক্ষেপানাস্ত্র (৬৮৯ + ১৭০) মোট ৮৫৯টি নির্মূল করতে হবে। কেবল ক্ষেপনাস্ত্রগুলিই নয়, সেই সঙ্গে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় উৎক্ষেপণ ব্যবস্থাদি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা। চুক্তির ষষ্ঠ ধারা অনুসারে মাঝারি ও স্বল্প পাল্লার কোন ক্ষেপণাস্ত্র আর উৎপাদন বা পরীক্ষা করাও হবে না। আনর্মূলীকরণ প্রক্রিয়া দু'টি পর্যায়ে মোট তিন বছর সময়সীমার মধ্যে শেষ করার কথা ছিল।

নির্মূলীকরণ ও নিষিদ্ধিকরণ তদারকির ও পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে উভয় দেশের বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে উভয় দেশের বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষকরা পরস্পরের দেশে পাকাপাকি অবস্থান ছাড়াও যে-সব স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপিত বা রক্ষিত আছে এবং যেখানে তা তৈরি হয় সে সব স্থানে সরেজমিন (অন দ্য স্পট) তদারকি করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। তদারকির প্রশ্নে যাবতীয় প্রশ্নাদির চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য উভয় দেশের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষ তদারকি কমিশন (স্পেশাল ভেরিফিকেশন কমিশন) গঠন করার কথা বলা হয়।

আই এন এফ চুক্তি রাতারাতি সম্পন্ন হয় নি। এর পিছনে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সাবেক সোভিয়েত তথা সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং বিশ্বের শান্তিকামী তাবৎ মানুষের লাগাতার প্রয়াস। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ ছাড়া বাঁচতে পারে না। অপরদিকে সমাজতন্ত্র পররাজ্য আক্রমণ, গ্রাস বা শোষণ-বিরোধী দর্শন। মহান অক্টোবর বিপ্লবের মহান নেতা লেনিন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই মৌলিক নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের শান্তিকামী পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছিলেন। সেই নীতি আজও অম্লান। মৌলিক সেই নীতিই আজকের আই এন এফ চুক্তির উৎস ও প্রেরণা।

এই পর্যায়ে এই চুক্তির ভিত রচিত হয় ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে (১৯-২১) জেনিভাতে অনুষ্ঠিত রেগান-গরবাচ্যভ প্রথম শীর্ষ বৈঠকে। সেখানেই প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপতি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করা যায় কিন্তু সেই যুদ্ধে বিজয়ী বলে কেউ থাকবে না। পারমাণবিক দৈত্য আক্রমণকারী ও প্রতিরোধকারী উভয়কেই গ্রাস করবে। জেনিভা বৈঠকে অবশ্য নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন ফলশ্রুতি ঘটে নি। ভবিষ্যতে আরও আলোচনার প্রতিশ্রুতি নিয়েই সে বৈঠক শেষ হয়।

১৯৮৬ সালের ১৬ই জানুয়ারি সাবেক সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচ্যভ এই শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বকে পরমাণু-অস্ত্র-মুক্ত করার তিন পর্যায়বিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ঐ প্রস্তাবের প্রথম পর্যায় ছিল, পাঁচ থেকে আট বছরের মধ্যে সাবেক সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সহ পরস্পরকে আঘাত করতে সক্ষম এমন

অস্ত্রগুলিব ৫০ শতাংশ নির্মূল কববে। মহাকাশ যুদ্ধ বা নক্ষত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ হবে। দু'পক্ষই পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রাখবে। বিদেশের মাটিতে মার্কিন অস্ত্র মজুত কবা হবে না। এই প্রস্তাবের পর সাবেক সোভিয়েত তার আন্তরিকতার নিদর্শন হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা একতরফাভাবে বন্ধ বাখে। অন্যদিকে, মার্কিন প্রশাসন প্রস্তাবটিকে প্রচারধর্মী বলে উপহাস করে এবং পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা জারি রাখে।

১৬ই জানুয়ারির (১৯৮৬) প্রস্তাব বিশ্বের তাবৎ শান্তিকামী দেশ ও শান্তিকামী মানুষ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে জিম্বাবোয়ের রাজধানী হাবাবেতে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে সাবেক সোভিয়েত প্রস্তাবকে স্বাগত জানান হয়। মেক্সিকোর ইক্সটাপা শহরে অনুষ্ঠিত ছয় রাষ্ট্র গোষ্ঠীর শীর্ষ বৈঠক প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি দিবসে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ রাজপথে নেমে সোচ্চারে ঐ প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করে।

সাবেক সোভিয়েত সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রস্তাবে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সহ শান্তিকামী দেশগুলির সমর্থন, বিশ্বব্যাপী শান্তিকামী মানুষের সমর্থন প্রভৃতির ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজনমতের দরবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পাশাপাশি জাপান ও পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতিতে মার্কিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেখা দেয় নজিরবিহীন সংকট। মার্কিন বাজেট ঘাটতির পরিমাণ আগেকার সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিণত হয় বিশ্বের সব থেকে বড় ঋণী দেশে।

এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটন শীর্ষ বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয় আই এন এফ চুক্তি। গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ৫০ শতাংশ হ্রাস করার প্রশ্নে নীতিগত ঐক্যমত্যের পবিপ্রেক্ষিতে প্রথমার্ধে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান মস্কোতে যান।

২৭তম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন

এই কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য। "ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস" হিসেবে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা ও নতুন সংবিধান কার্যকর হবার পর তার "ব্রিটিশ" তকমাটি উঠে গিয়েছিল বটে কিন্তু ব্রিটেনের মাতব্বরি বজায় ছিল। এখনও তা দূর হয়েছে বলা চলে না। কিন্তু এই প্রথম কমলওয়েলেথের বাকি সদস্যরা সংস্থাটিকে তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম একটি মঞ্চে পরিণত করার দিকে মনোনিবেশের মানসিকতা দেখাতে পেরেছে। এই গতি অব্যাহত রয়েছে।

এই কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে সব থেকে বেশি গুরুত্ব পায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গ। লক্ষণীয়, এই সম্মেলনে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবরোধ জোরদার করার দাবি উঠবে সেটা অনুমান করেই প্রিটোরিয়া সরকার মার্গারেট থ্যাচারের হাত শক্ত করার কৌশল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম শীর্ষ নেতা এবং নেলসন ম্যান্ডেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী ওয়ালটার সিসুলু সহ ছয়জন বন্দীকে মুক্তি দেয়। সেই সঙ্গে রটিয়ে দেওয়া হয় রিফর্মড্ চার্চের নেতা অ্যালান বোয়েসাক কমনওয়েলথকে অনুরোধ করেছেন তাঁরা যেন দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রপতিকে অন্তত ছয় মাস সময় দেন এবং তারপরই কেবল

শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধ জোরালো করা হয়। মার্গারেট থ্যাচার প্রত্যাশিতভাবেই বন্দীমুক্তির ঘটনাটা ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে তিনি তুলে ধরেন অবরোধ সম্পর্কে তার পুরান তত্ত্বটি, অর্থাৎ, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাধানিষেধ আরোপ করলে তাতে তুলনামূলকভাবে কৃষ্ণাঙ্গদেরই ক্ষতি বেশি হবে। এই একই হুমকি দিয়ে থ্যাচার আগের বারের সম্মেলনে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু এই সম্মেলনে সে কৌশল ব্যর্থ হয়। এই সম্মেলনে সমবেত অন্য সদস্যরা খোলাখুলিই বলেন প্রিটোরিয়ার নতুন সরকারের চমকে তাঁরা ভুলতে রাজি নন। নেলসন ম্যান্ডেলা সহ শত শত বন্দী এখনও কারান্তরালে। এই সম্মেলনের কিছুদিন আগেও দক্ষিণ আফ্রিকায় যে নির্বাচন হয়েছে প্রহসন ছাড়া তা কিছু ছিল না। কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বর্ণবৈষম্যের নীতি ও ব্যবস্থাবলী চিরতরে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগও দেখা যায়নি। পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি বোথা এ ধরনের বহু প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার এসব করে তারপর যথারীতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন। সেই অভিজ্ঞতা যে ভোলা যায় না সে কথাও এই সম্মেলনে ব্যক্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মার্গারেট থ্যাচার প্রস্তাব গ্রহণে বাধা দিতে সাহসী হননি। কমনওয়েলথ-এর বিধি অনুসারে এই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। নিয়ম অনুসারে প্রস্তাবের কেউ বিরোধিতা করলে গৃহীত হয় না। অবশ্য থ্যাচার সরকার মুখরক্ষার জন্য একটি বিবৃতি দিন এবং তার জন্য ভর্ৎসিতও হয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি আরও জোরদার করার যে প্রয়োজন ছিল আগের নিষেধাজ্ঞাগুলির ফলাফলই তার প্রমাণ। আগেকার নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রিটোরিয়া সরকারের মজুত স্বর্ণভাণ্ডার এবং বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় প্রায় অর্ধেক কমে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্য বিক্রির বাজার সংকুচিত হয়। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে ঋণ পাবার সুযোগও প্রভূত পরিমাণে কমে যায়। অস্ত্রশস্ত্র কেনার ব্যাপারেও প্রিটোরিয়াকে মুস্কিলে পড়তে হয়। সব মিলিয়ে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যার অনুভব করতে বাধ্য হয় তৎকালীন বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিন আফ্রিকার সরকার। কমনওয়েলথ সম্মেলনে সেই পথই গৃহীত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবিরোধীরা অ্যালান বোয়েসাকের নামে মিথ্যা রটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন।

এই কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে শিল্পোন্নত দেশগুলির তীব্র সমালোচনা করা হয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে দূরে রাখার মতলবে যে-সব বাণিজ্যিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়েছিল তার তীব্র নিন্দা করা হয়। বৈদেশিক ঋণের বোঝায় জর্জরিত দেশগুলির চরম আর্থিক ও অন্যান্য সংকট নিরসনের জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির দিক থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ দাবি করা হয়েছিল। যে-সব দেশ ঋণ পরিশোধে অক্ষম তাদের বিশেষ সাহায্য দিতে বলা হয়েছিল। ঋণ পরিশোধের জন্য যে সব দেশের নতুন ঋণ এবং এমনকি নিজেদের সামান্য আর্থিক সংগতিও ক্ষয়ে যাচ্ছিল তাদের জন্যও ব্যবস্থা দাবি করা হয়েছিল।

এসব দাবি অবশ্য নতুন নয়। ইতিপূর্বেও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মঞ্চ থেকে এগুলিকে তোলা হয়েছে বা তোলার চেষ্টা হয়েছে। কমনওয়েলথ মঞ্চটিকেও এই দাবি পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবহারের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।

রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের প্রশ্নে প্যারিসে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

প্যারিসে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে একটি মন্ত্রী পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। ১৫১টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সম্মেলনের শেষে সর্বসম্মত একটি বিবৃতিতে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার না করার অঙ্গীকাব ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে মজুত রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস এবং রাসায়নিক অস্ত্রে উৎপাদন, মজুতকরণ ও রপ্তানি নিষিদ্ধকরণের জন যত শীঘ্র সম্ভব একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার অঙ্গীকারও ঘোষিত হয়।

প্যারিসের এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল ফ্রান্স। ১৯২৫ সালে স্বাক্ষরিত রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত জেনিভা চুক্তির তদারক হিসেবেই ফ্রান্স এই সম্মেলন আহ্বান করে। সম্মেলন আহ্বানের আপাতঃ কারণ হিসেবে ইরাক-ইরান যুদ্ধে কুর্দ উপজাতির মানুষের ওপর ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের ভয়াবহ পরিণতিকেই তুলে ধরা হয়। লক্ষণীয়, সম্মেলনের প্রাক্কালে মার্কিন প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমগুলি ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের বীভৎস পরিণতির সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করতে থাকে। পাশাপাশি মার্কিন প্রশাসন লিবিয়ার বিরুদ্ধে একটি রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির কারখানা নির্মাণের অভিযোগ তোলে এবং একতরফাভাবে লিবিয়ার উপর আক্রমণ চালিয়ে অভিযুক্ত ঐ কারখানাটি ধ্বংসের হুমকি দেয়। বিষয়টিকে নাটকীয়তা দেবার জন্য বিশ্বাসের অযোগ্য অজুহাত দেখিয়ে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের একটি বিমানবাহী জাহাজ থেকে দুটি বিমান উড়ে গিয়ে লিবিয়ার দুটি জঙ্গী বিমান ধ্বংস করে। এই সব ঘটনার ফলে প্যারিস সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুনিয়াব্যাপী আগ্রহের সঞ্চার হয়।

মার্কিন মতলব

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার প্রয়োজন ব্যক্ত করেন। এ থেকে মনে হতে পারে যে মার্কিন প্রশাসন সত্যিসত্যিই রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্যকে উদঘাটিত করে।

১৯৬৯ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপর রাসায়নিক নতুন অস্ত্র তৈরি না করার একটা অলিখিত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সালে 'ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে মার্কিন সরকার নতুন রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর ক্ষমতা নিয়ে নেয়। যথারীতি সোভিয়েত জুজু দেখিয়ে কার্যটি হাসিল করা হয়। বলা হয়, সাবেক সোভিয়েত রাসায়নিক অস্ত্র আধুনিকীকরণ করছে, তাই মার্কিন সরকারও পিছিয়ে থাকতে চায় না। 'এম ৬৮৭' এবং 'বিগ আই' নামে দুটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাসায়নিক মারণাস্ত্র তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। নতুন অস্ত্রগুলিকে "বাইনারি" বলা হয়। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, যাদের এককভাবে ধ্বংসের ক্ষমতা নেই, কিন্তু দুটিকে যুক্ত করলে মারাত্মক বিধ্বংসী ক্রিয়া করে—তাই দিয়ে অস্ত্র তৈরি হয়।

একটি হিসেবে দেখা যায়, ১৯৮৬ সালের শেষ নাগাদ মার্কিন প্রশাসনের হাতে কমপক্ষে

১০ হাজার নতুন নার্ভগ্যাস অস্ত্র তৈরির যোগ্যতা ও আর্থিক সামর্থ্য ছিল। এটা বর্তমানে পশ্চিম জার্মানিতে মজুত করে রাখা মার্কিন বাইনারি অস্ত্রের সমান পরিমাণ।

ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ন্যাটো জোটের অনেক সদস্য রাষ্ট্রের অস্ত্রভাণ্ডারেই প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক অস্ত্র জমা আছে।

সাবেক সোভিয়েত নীতি ও পদক্ষেপ

১৯৮৭ সালেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন রাসায়নিক অস্ত্রের প্রশ্নে যে যুক্তিসঙ্গত ও সাহসিক নীতি ঘোষণা করে এবং সেই নীতি রূপায়ণে একতরফা সাহসী উদ্যোগ নেয় তার প্রভাব কাটাবার জন্যই মার্কিন প্রশাসনের চিন্তিত ছিল।

১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে সাবেক সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচ্যভ প্রাহাতে ঘোষণা করেন যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করে দিয়েছে। গরবাচ্যভ দৃঢ়তার সঙ্গে একথাও বলেন যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলিতে বা সাবেক সোভিয়েত সীমানার বাইরে কোথাও কোনো রাসায়নিক অস্ত্র মজুত করেনি। এই প্রসঙ্গে সরেজমিন তদন্তের জন্য ব্রিটিশ প্রস্তাবকেও তিনি স্বাগত জানান। ঐ বক্তৃতায় গরবাচ্যভ আরও জানান, সাবেক সোভিয়েত রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করার উপযোগী একটি চলমান কারখানাও তৈরি করেছে।

১৯৮৭ সালের আগস্ট মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে তৎকালীন সাবেক সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী এডুয়ার্ড শেভার্দনাদজে ঘোষণা করেন রাসায়নিক নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে সাবেক সোভিয়েতের সামরিক কেন্দ্র শিখানি-তে সরেজমিন পর্যবেক্ষণের আমন্ত্রণ জানানো হবে। দেড় মাস বাদে অক্টোবরের গোড়ার দিকে ৫১টি দেশের ১৩০ জন প্রতিনিধি এবং ৫৬ জন সাংবাদিক শিখানি-তে হাজির হন। সাবেক সোভিয়েত সরকার উপস্থিত সকলকে সাবেক সোভিয়েতের যাবতীয় রাসায়নিক অস্ত্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানায় এবং দেখায়। রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করার চলমান ব্যবস্থাটিও দেখানো হয়।

সাম্রাজ্যবাদীদের অস্বস্তি

সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অকল্পনীয় এদৃশ পদক্ষেপ মার্কিন সরকার এবং তার সাঙাৎ দেশগুলিকে চরম অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়। প্রত্যাশিতভাবেই এমন একটা সাম্রাজ্যবাদী প্রচার সুকৌশলে চালু করা হয় যে সোভিয়েত তার আসল অস্ত্রগুলি চেপে গিয়েছে। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি সেই প্রচারকে মেনে নেওয়া যায় তবু সাবেক সোভিয়েত যতখানি এগিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন ও তার মিত্রদের ভূমিকার স্বরূপ বিশ্বজনমতের দরবারে ধরা পড়ে যায়। মার্কিন প্রশাসন তার মজুত রাসায়নিক অস্ত্র নির্মূল করা দূরে থাক, নতুন ও অনেক বেশি ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক রাসায়নিক অস্ত্র তৈরিতে মন ও সামর্থ্য নিয়োজিত করে। স্বাভাবিকভাবেই তার অপপ্রয়াস থেকে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য মার্কিন প্রসাশনকে নানাবিধ হীন কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

প্যারি সম্মেলন

প্যারিসে সাবেক সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী এডুয়ার্ড শেভার্দনাদজে রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন, মজুত ও রপ্তানি নিষিদ্ধ করার জন্য অবিলম্বে বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহ্বান জানান। শেভার্দনাদজে বলেন, রাসায়নিক অস্ত্রের সার্বিক নিষিদ্ধকরণ এখন কেবল একটা মানসিকতার পরিবর্তনের অপেক্ষা করছে। রাসায়নিক নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে সাবেক সোভিয়েতের একতরফা পদক্ষেপের উল্লেখ করে শেভার্দনাদজে বলেন, সাবেক সোভিয়েত সরকার এ ব্যাপারে যে কোনো রকম কঠোর তদন্ত ব্যবস্থাকে মেনে নিতে প্রস্তুত। এই প্রশ্নে রাষ্ট্রসঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপরও তিনি জোর দেন।

ইতিমধ্যে লিবিয়ার বিমান ধ্বংস করার অপকর্মের ফলে আন্তর্জাতিকভাবে মার্কিন সরকার ধিকৃত হয়। মার্কিন প্রশাসনের অজুহাত একমাত্র তাঁবেদার থ্যাচার সরকার ছাড়া কেউ মেনে নেয়নি। মার্কিন সরকার লিবিয়ার অভিযুক্ত নির্মীয়মাণ রাসায়নিক কারখানা ধ্বংস করার ঘোষিত সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্যারিস সম্মেলন যে উদ্দেশ্যেই ডাকা হোক, সেখানে মার্কিন সরকার সাবেক সোভিয়েতের এবং তৃতীয় বিশ্বের বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অবিলম্বে আর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার সাবেক সোভিয়েত প্রস্তাব বানচাল করার নানা অপপ্রয়াস চলতে থাকে। মজুত রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করার সোভিয়েত প্রস্তাবকে 'কৌশল' আখ্যা দিয়ে প্রশ্নটিকে চাপা দেবার চেষ্টা হয়। শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকার সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিশ্রুতি না দিলেও গোল গোল ভাষায় মজুত রাসায়নিক অস্ত্র নির্মূল করার কিছু শর্তাধীন আশ্বাস দিতে বাধ্য হয়। প্যারিস সম্মেলনে সাবেক সোভিয়েত ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি রাসায়নিক অস্ত্র সার্বিক নিষিদ্ধকরণের সময়সীমা বেঁধে দিতে চেয়েছিল। তা সম্ভব হয়নি।

রাসয়নিক নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব

রাসায়নিক অস্ত্রকে পারমাণবিক অস্ত্রের থেকে কম বিপজ্জনক বলা যায় না। পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ প্রভূত ব্যয় ও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাপেক্ষ। এই কারণে অনেক দেশ পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে সক্ষম হলেও সামর্থ্যের অভাবে সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। তুলনায় রাসায়নিক অস্ত্র স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদনযোগ্য এবং এর ধ্বংস ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হল দালানকোঠা বা ঘরবাড়ি ছেড়ে মানুষকেই মারাত্মকভাবে আঘাত করে। রাসায়নিক অস্ত্র অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষেও উৎপাদন ও মজুত করা সম্ভব। এই কারণে এই অস্ত্রকে 'গরিবের অ্যাটম বোম' বলা হয়ে থাকে। বস্তুত পক্ষে সোভিয়েত, আমেরিকা বাদেও আনুমানিক আরও ১৫-১৬ টি দেশে এই অস্ত্র উৎপাদন ও মজুত হয় বলে জানা গেছে। ইচ্ছে করলে আরও দেশ এই পথ নিতে পারে। মজার ব্যাপার, অনেক দেশই রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদনের প্রযুক্তি, মাল-মশলা, এমনকি কারখানা পর্যন্ত পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে। মৃত্যু নিয়ে ব্যবসা ধনতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম লাভজনক কারবার। মৃত্যুর কারবারীদের নিরস্ত্রীকরণের আত্মঘাতী পথে সহজে আনা যাবে না।

মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলন নিয়ে চীনের দৃষ্টিভঙ্গি

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবিক অধিকার কমিশন ও অন্যান্য কতকগুলি সংগঠন কিভাবে মানবিক অধিকাব এবং মৌলিক স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে আরো উন্নত, আরো প্রসারিত করা যায় তা' নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। ১৯৯৩ সালে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত যে বিশ্ব-সম্মেলন হতে যাচ্ছে চীনের প্রতিনিধিদল তাকে স্বাগত জানায়। এই সম্মেলনের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য চীন অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমানতালে কাজ করতে খুবই আগ্রহী এবং প্রয়োজন হ'লে সম্মেলন তহবিলে কিছু অর্থও সে দিতে রাজী হয়। চীনের ১৯৯৩ সালের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে মতামত ও প্রস্তাব আমি এখানে তুলে ধরতে চাই।

মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল নির্দেশিকা বা গাইড লাইনটি রয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার বা ঘোষণাপত্রে। এতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবিক গুণসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করতে চাওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জাতি, ধর্ম, ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা, তাকে উৎসাহদান এবং তার প্রসার ও উন্নতির কথাও বলা হয়েছে। তথাপি আমার মতে, দীর্ঘকাল ধরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংগঠনের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ইস্যুগুলি পরস্পরবিরোধী মতাদর্শ ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির প্রবল সংঘাতজাত ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহাওয়ার তলায় চাপা পড়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিমুখী আচরণ, উন্নাসিকতা এবং শুধু লাভ-লোকসান বিচার করে চলার মানসিকতা জয়ী হয়েছে। কতকগুলি দেশ এই মানবিক অধিকারের বিষয়টিকে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো, ছোট ও দুর্বল দেশগুলির উপর রাজনৈতিক চাপসৃষ্টি এবং আপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। চীনের ক্ষেত্রে, এই ধরনের মানসিকতার ফলে মানবিক অধিকার প্রসঙ্গে সহযোগিতার ধারণাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিষাক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মানবিক অধিকারকে প্রসারিত করার কাজটি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই জাতিপুঞ্জের কাঠামোর মধ্যে যে কতকগুলি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তা' দূর করতে হবে, ঘটাতে হবে তার সম্পূর্ণ অবসান।

১৯৯৩ সালের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে এই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথমে কতকগুলি পরিবর্তন করার কথা বলে চীন। মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ঐক্যের প্রসার ঘটানো এবং সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়ার পরিবেশ গড়ে তোলাই হবে চীনের এই সম্মেলনের প্রধান কাজ। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন এবং বহু বিচিত্র ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমিযুক্ত দেশসমূহের মানবিক অধিকার সম্পর্কে ও নিজস্ব মতামত রয়েছে এই সম্মেলনে তাকে প্রকাশের পথ করে দিতে হবে। বিরোধের বিষয়গুলিকে দূরে ঠেলে দিয়ে একটা সাধারণ ক্ষেত্র খুঁজে বের করা এবং পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন, উন্নততর পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে তোলা, সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করা ও পারস্পরিক উৎসাহদানের পরিবেশে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত বলে চীন মতামত ব্যক্ত করে।

মানবিক অধিকারের বিষয়টিকে ব্যবহার করে নিজের মতাদর্শ ও মূল্যবোধকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা অথবা মানবিক অধিকারের আড়ালে অন্য দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অভ্যাস সম্মেলনকে, নিঃসন্দেহে, ফেলে আসা বছরগুলিব মতই ঠাণ্ডালড়াই ও সংঘাতের পরিবেশে নিক্ষেপ করবে। চীনের দৃঢ় অভিমত হ'ল যে, এসব অভ্যাসকে গোড়া থেকেই বর্জন করা উচিত। একমাত্র এইভাবেই চীনের মতে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনের সঠিক গাইড-লাইন বা নির্দেশিকা তৈরির যে সুযোগ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার বা ঘোষণাপত্রে বিধৃত মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্বের কথা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারা যাবে।

মানবিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হবার পর থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবিক অধিকার সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি সূত্র প্রণয়ন করেছেন এবং তা গ্রহণও করেছেন। এর ফলে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্রটির তত্ত্ব বা ধারণাটি আরো সমৃদ্ধ এবং প্রসারিত হয়েছে। আজকের দিনে মানবিক অধিকার বলতে শুধুমাত্র কতকগুলি নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারকে বোঝায় না; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের অধিকারও আজ মানবিক অধিকারে আঙিনাভুক্ত। কাজেই চীন মনে করে যে ১৯৯৩ সালের সম্মেলনে মানবিক অধিকার সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাজের পর্যালোচনার সময়ে যেন এই বিষয়টি খেয়াল রাখা হয় এবং তা যেন জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্রে মানবিক অধিকারের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে মানবিক অধিকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিষয়ে যে সমস্ত নীতি গড়ে উঠেছে সেগুলিকে অলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বলে চীন দাবী করে এ বিষয়ে আমি বিশেষ করে ১৯৬৮ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে যে ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল তার উল্লেখ করতে চাই। তেহরান ঘোষণাপত্রে মানবিক অধিকার বিষয়ে এমন অনেক নতুন বিষয় সংযুক্ত হয়েছিল যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম ঘোষণাপত্রে ছিল না। তেহেরান সম্মেলনে শুধু প্রস্তাবই গৃহীত হয়নি, কতকগুলি লক্ষ্যও নির্দিষ্ট হয় এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতিপুঞ্জকে ঐ সময় থেকে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণেরও অনুরোধ জানানো হয়।

তেহেরান সম্মেলনের পথ ধরে ১৯৯৩ সালে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন আবার বসছে। আশা করা যায় যে, এই সম্মেলনে বিগত তেহেরান সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কতটা অগ্রগতি বা ব্যর্থতা ঘটেছে সে সম্পর্কে পর্যালচনাকে আরত সময়োপযোগী করে তোলা দরকার।

১৯৭৭ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় এই জাতীয় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ঐ প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, মানবিক অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সময় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে জাতি ও বর্ণগত বৈষম্য, ঔপনিবেশিকতা, বিদেশী আগ্রাসন, দখলদারি, প্রভুত্ব ইত্যাদিজনিত কারণে মানবিক অধিকারের ব্যাপক উল্লঙ্ঘন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং নিজস্ব সম্পদ ও প্রাকৃতিক উৎসের উপর পূর্ণ অধিকারকে স্বীকৃতি জানাতে অস্বীকার করার বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই

প্রস্তাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকাব ভোগের প্রতি সমান দৃষ্টি দেবার কথা পুনর্বার উচ্চারিত হয়। এতে আরো জোর দিয়ে বলা হয় যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ছাড়া পূর্ণাঙ্গ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়। মানবিক অধিকারের রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্থায়ী অগ্রগতি নির্ভর করছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের দৃঢ় এবং কার্যকরী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি গ্রহণের উপর।

১৯৭৭ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক সমাজের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করছে এবং মানবিক অধিকারকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে তাদের ঐকমত্যকে তুলে ধরেছে। ঐ প্রস্তাব গৃহীত হবার পর থেকে জাতিপুঞ্জ তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। অবশ্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ৩২ তম সাধারণ সভার সময় থেকে আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনেকটাই পালটে গেছে। তবুও, ঐ প্রস্তাবে মানবিক অধিকারের যে ব্যাপক উল্লঙ্ঘনের কথা বলা হয়েছিল সে পরিস্থিতি আজও বিরাজমান। উত্তর ও দক্ষিণের বিকাশের স্তরের বিরাট ফারাক এবং বর্তমানের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ধারা বহুসংখ্যক উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে মানবিক অধিকারকে ভোগ করার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কাজেই, চীনের অভিমত ছিল এই যে, ১৯৯৩ সালের আসন্ন সম্মেলনকে এইসব সমস্যার প্রতি গভীরভাবে নজর দিতে হবে এবং ১৯৭৭ সালে সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবের আরো ব্যাপক রূপায়ণের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট পন্থা খুঁজে বের করতে হবে এবং এইভাবেই বর্তমান সময়ের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর আশু সমাধানে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

এক নজরে
বিশ্বের দেশগুলি

আফগানিস্তান ১৯শে নভেম্বর ১৯৪৬
রাজধানী — কাবুল; জনসংখ্যা ২০.৫ মিলিয়ন; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্ব তালিকাব স্থান০.২২৯/১৬৯ (১৯৯৩) মুদ্রা — আফগানি (AFA); পরিসীমা — উত্তবে তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও কাজাকিস্তান। পূর্বে চীন। পূর্ব দক্ষিনে পাকিস্তান। পশ্চিমে ইরান। মোট ভূখণ্ড — ২৫১,৭৭৩ বর্গমাইল (৬৫২,০৯০ বর্গ কি. মি.) মোট জনসংখ্যার ২১% শহরবাসী। জাতি — পাস্তুন ৬২%, তাজাক ২০%, উজবেক ৯%। জাতীয় ভাষা— পাস্তু ও দারি। খনিজ সম্পদ — তেল, গ্যাস, কয়লা, লোহা, সোনা, রূপা, অভ্র, গন্ধক, এবং তামা। কৃষি — গম, বার্লি, মেইজা, চাল। প্রানী সম্পদ — গরু, ঘোড়া, উট, ভেড়া, ছাগল, দুমকা। শিল্প — স্থানীয় ফল ও কৃষিজের প্রক্রিয়া করণ, সিমেন্ট, কয়লা, বস্ত্র, কার্পেট, চামড়া এবং চিনি শিল্প। ১৯৯০ সালের জনসংখ্যার ২৫% সাক্ষর।

আলবেনিয়া ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৫
রাজধানী — তিরানা। জনসংখ্যা ৩.৪২ মিলিয়ন (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্ব তালিকার স্থান — ০.৬৩৩/১০৪(১৯৯৩)। মাথাপিছু আয় (বাৎসরিক) ডলারে ৩৬০। মুদ্রা— লেক (Lek)। জাতীয় ভাষা — আলবানীয়, গ্রীক। ৭ বছর থেকে ১৫ বছর বয়সী সমস্ত নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা। পরিসীমা — উত্তরে যুগোস্লভিয়া, পূর্বে ম্যাক্‌ডোনিয়া, দক্ষিনে গ্রীস, পশ্চিমে আড্রিয়াটিক। মোট ভূখণ্ডের পরিমান — ১১,০০০ বর্গমাইল (২৮,৭৪৮ বর্গ কি.মি.)। জাতি — আলবেনিয়াম, গ্রীক, ম্যাকাডোনিয়ান। মোট জনসংখ্যার ৪০% শহর বাস করেন। খনিজ সম্পদ — তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ক্রোমিয়াম, তামা, অভ্র, লিগনাইট, লোহা, নিকেল। কৃষি — মোট জমির ২৫% কৃষি কাজে লাগে। মেজ, সুগার বিট, আলু, যব, তৈলবীজ, তামাক, ফল। প্রানীসম্পদ — গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, ঘোড়া, মুরগি। গ্রামাঞ্চল — ১,০৪৬ বর্গ হেক্টর। শিল্প — ইস্পাত, রাসায়ন, তামা, লিগনাইট, তামাক, ফল ও সব্জি প্রক্রিয়াকরণ।

আলজেরিয়া ৮ই অক্টোবর ১৯৬২
রাজধানী — আলজিয়ার্স। জনসংখ্যা — ২৮.৫৮ মিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্ব তালিকায় স্থান — ০.৭৪৬/৬৯ (১৯৯৩)। মাথা পিছু আয় (ডলারে, বাৎসরিক) ৬৯০ (১৯৯৪)। মুদ্রা — দিনার (DZD) জাতীয় ভাষা — আরবি/বেরবের (স্থানীয় ভাষা)। সাক্ষরতা — ৬০.৬% (১৯৯২) পরিসীমা — পশ্চিমে মরক্কো এবং পশ্চিম সাহারা। দক্ষিন-পশ্চিমে মৌরিটেনিয়া ও মালি। দক্ষিন-পূর্বে নাইজের। পূর্বে লাইবেরিয়া ও তিউনিসিয়া। উত্তরে মেডিটেরিয়ান সি। মোট ভূখণ্ডের.পরিমান — ৯,১৯,৫৯৫ বর্গমাইল (২,৩৪১,৭৪১ বর্গ কি.মি.)। খনিজ সম্পদ — তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, লোহা, সিসা, ফসফেট, জিঙ্ক, রূপা, তামা, অ্যান্টিমনি। কৃষি — গম, যব, ভূট্টা, আলু, কমলালেবু, অলিভ। শিল্প — মৎস্য, লোহা, ইস্পাত, ইস্পাতের পাইপ, তামাক প্রভৃতি।

আনদোরা ২৮ জুলাই ১৯৯৩
রাজধানী — আনিদোরর লা ভেল্লা। জনসংখ্যা — ৬২,৫০০ (১৯৯৪)। ভূখণ্ডের পরিমাপ ১৮১ বর্গ মাইল (৪৬৮ বর্গ কি.মি.)। বসবাস — জনসংখ্যার মোট ৬২.৫% শহরে বাস

করেন। সরকারী ভাষা — কাতালানীয়। মুদ্রা — দিনার। ফ্রান্স ও স্পেনের মুদ্রারও চল আছে। কৃষি — ১,০০০ হেক্টর কৃষি জমি। ১০,০০০ হেক্টর বনাঞ্চল। তামাক ও আলু প্রধান উৎপাদন। শিল্প — পর্যটন, সাধারন ব্যবসা ও হালকা শিল্প, তামাক শিল্প। শিক্ষা — ৬ বছরের প্রাথমিক ও ৪ বছরের মাধ্যমিক অবৈতনিক।

অ্যাঙ্গোলা ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৬

রাজধানী — লুয়াণ্ডা। জনসংখ্যা — ১১.৫ মিলিয়ন (১৯৯৫)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্ব তালিকায় স্থান — ০.২৮৩/১৬৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় (ডলারে) ৬২০ (১৯৮৯)। মুদ্রা — কোয়াঞ্জা (AOK)। সরকারী ভাষা — পর্তুগীজ। পরিসীমা — উত্তরে কঙ্গো, উত্তর পূর্বে জাইরে, পূর্বে জাম্বিয়া, দক্ষিনে নামিবিয়া, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। মোট ভূখণ্ডের পরিমান — ৪৮১,৩৫৪ বর্গ মাইল (১,২৪৬,৭০০ বর্গ কি.মি.) মোট জনসংখ্যার ৫০% শহরে বাস করেন। খনিজ সম্পদ — হিরে, গ্রানাইড, খনিজ তেল, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ এবং তামা। কৃষিসম্পদ — আখ, কফি, কলা, মিষ্টি আলু। প্রাণীসম্পদ — গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর। বনাঞ্চল — ৫২.৯৫ হেক্টর। শিল্প — খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তৈল শোধনাগার, ভুট্টা ও গম জাত খাবার প্রস্তুতি, সাবান, কাঁচ, প্লাস্টিক, জিঙ্ক প্রভৃতি।

অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডা ১১ নভেম্বর ১৯৮১

রাজধানী — সেন্ট জনস। জনসংখ্যা — ৬৩,৯০০(১৯৯৫)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৮৮৬ (১৯৯৩) মাথাপিছু জাতীয় বাৎসরিক আয় (ডলারে) ৬,৯৭০ (১৯৯৩)। সরকারী ভাষা — ইংরাজী, অ্যান্টিগুয়ার প্রচলিত ভাষা। পরিসীমা — ১৭১ বর্গমাইল(৪৪২ বর্গ কি.মি.)। মুদ্রা — ইস্টার্ন ক্যারাবিয়ান ডলার (XCD)। কৃষি — ১৯৭০ সালে চিনি শিল্প ধ্বংস হওয়ার পরে তুলো এবং ফলের চাষে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাণী সম্পদ — গরু, শূকর, ভেড়া, ছাগল। শিল্প — ১৯৮২ সালে একটি তেল শোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া চামড়া, রেফ্রিজারেটার, টালি শিল্প আছে।

আর্জেন্টিনা ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — বুয়েনস এয়ার্স। জনসংখ্যা — ৩৪.৭৭ মিলিয়ন (১৯৯৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৮৮৫ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় (ডলারে) ৮,০৬০। মুদ্রা — পেস। সরকারী ভাষা — স্পেনীয়। পরিসীমা — উত্তরে বলিভিয়া, উত্তর-পূর্বে প্যারাগুয়ে, পূর্বে ব্রাজিল, উরুগুয়ে এবং আতলান্তিক মহাসাগর, পশ্চিমে চিলি। মোট ভূখণ্ডের পরিমান — ২,৭৮০,৪০০ বর্গ কি.মি.। মোট জনসংখ্যার ৮৬% শহরবাসী। সাক্ষরতার ৯৫.৫% (১৯৯২)। খনিজ সম্পদ — গম, সুগারকেন, তামাক, তেল, তেলবীজ, অলিভ, ধান। প্রাণীসম্পদ — গরু; ভেড়া, শূকর, ঘোড়া। শিল্প — কাগজ, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, সালফিউরিক অ্যাসিড, সিমেন্ট, সিন্থেটিক রবার, চিনি, ভোজ্য তেল ইত্যাদি।

আরমেনিয়া ২মে ১৯৯২

রাজধানী — য়েরেভান। জনসংখ্যা — ৩.৭ মিলিয়ন (১৯৯৪) মাথা পিছু বার্ষিক আয় (ডলারে) ৬৭০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৫৮০ (১৯৯৩), আরমেনিয়ান

৯৫ ৩% , অজাব বাইজানিস ২ ৬%, কুর্দ ১.৭%, বাশিয়ান ১.৬%। আয়তন — ১১,৪৯০ বর্গ মাইল। পরিসীমা — উত্তরে জর্জিয়া, পূর্বে আজারবাইজান, দক্ষিণ-পশ্চিমে তুর্কী, এবং ইরান। মুদ্রা — ড্রাম (Dram) (AMD)। খনিজ সম্পদ — তামা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, মার্বেল, গ্রানাইড। কৃষিসম্পদ — তুলা, অলিভ, গম, রবার, আলু, ফল, বেরিস (Berris), প্রাণী সম্পদ — গরু, ছাগল, শুকর। শিল্প — বয়ন, রবার, গৃহনির্মানের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কাগজ। সাক্ষরতা — ৪২%। সরকারী ভাষা — আরমেনীয়

অস্ট্রেলিয়া ১ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — ক্যানবেরা। জনসংখ্যা — ১৮.৩ মিলিয়ন (১৯৯৬)। মাথাপিছু জাতীয় আয় বাৎসরিক (ডলারে) ১৭,৯৮০(১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্ব তালিকায় স্থান — ০.৯২৯/১১ (১৯৯৩)। আয়তন — ৭,৬৮২,৩০০ বর্গ কিমি.। ৮৫.৩% শহরবাসী। পরিসীমা — দক্ষিনে কেপ ইয়র্ক, উত্তরে তাসমেনিয়া, পূর্বে কেপ বাইরন। মুদ্রা — আস্ট্রেলিয়ান ডলার। খনিজ সম্পদ — কয়লা, বক্সাইট, তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, তেল, ইউরেনিয়াম, সোনা। কৃষিক্ষেত্র ১৬.৯ মিলিয়ন হেক্টর। কৃষিজ সম্পদ — যব, গম, সুগার কেন, তামাক, চাল, আঙ্গুর। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, শুকর, মাছ চাষ ও সমুদ্রে থেকে মাছ ধরা। বনাঞ্চল — ১০৫.২৬ মিলিয়ন হেক্টর। শিল্প — লোহা, সিমেন্ট, খাদ্য প্রক্রিয়াকরন, উল, তামাক, মোটর যান, সালফিউরিক অ্যাসিড। সাক্ষরতার হার — ৯১.৯%। সরকারী ভাষা — ইংরাজী।

অস্ট্রিয়া ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

রাজধানী — ভিয়েনা (VIENA) জনসংখ্যা — ৮.০৫ মিলিয়ন (১৯৯৫)। মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলারে) ২৮,৯১(১৯৯৫)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৯২৮/১৩ (১৯৯৩)। পরিসীমা—উত্তরে জার্মানী এবং চেক রিপাব্লিক, পূর্বে স্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরি, দক্ষিনে স্লোভেনিয়া ও ইতালি। পশ্চিমে সুইজারল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া। আয়তন ৩২,৩৭৮ বর্গ মাইল (৮৩,৮৫৮ বর্গ কি.মি.) জনসংখ্যার ৬৫% শহরবাসী। সরকারী ভাষা — জার্মান। মুদ্রা — সিলিং(Schilling)(ATS)। খনিজ সম্পদ — লিগনাইট, তেল, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, গ্রানাইট। কৃষিসম্পদ — গম, চাল, যব। প্রাণী সম্পদ — গরু, শুকর, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, পোলট্রি। শিল্প — লোহা, সেলুলয়েড, তেল শোধানগার, কাগজ, উল। জাতি— রোমান ক্যাথলিক ৭৮%, প্রটেস্টান ৫%, মুসলিম ২%।

আজেরবাইজান ৯ মে ১৯৯২

রাজধানী — বাকু (BAKU)। জনসংখ্যা —৭.৫ মিলিয়ন (১৯৯৪)। মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয়(ডলারে) ৫০০(১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৬৬৫/৯৬ (১৯৯৪)। পরিসীমা —পশ্চিমে আরমেনিয়া, উত্তরে জর্জিয়া এবং রাশিয়া, পূর্বে ক্যাসপিয়ান সাগর, দক্ষিনে ইরান। আয়তন — ৩৩,৯৩১ বর্গ মাইল (৮৬,৬০০ বর্গ কি.মি.)। জাতি সমূহ—৮২.৭% আজারবাইজানি, ৫.৬% আরমেনিয়ান। সরকারী ভাষা — আজেরী(Azeri) মুদ্রা — মানাট (MANAT) AZM। খনিজসম্পদ — কয়লা, লোহা,

খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, দস্তা, জিঙ্ক। কৃষিজসম্পদ — ভূট্টা, গম, চাল, তূলো, তামাক, সিল্ক। প্রাণীসম্পদ — গরু, শূকর, ভেড়া, ছাগল। শিল্প — লোহা ও ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, সিমেন্ট, ফল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সিন্থেটিক রবার, বয়ন, মৎস্য শিকার ইত্যাদি। সাক্ষর — ১.৪ মিলিয়ন শিশু প্রতিবছর প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষা পায়।

বাহামাস ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

রাজধানী — নাসসৌ (NASSAU)। জনসংখ্যা — ২৭৫,৭০০ (১৯৯৫)। মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় (ডলারে) ১১,৭৯০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৮৯৫ (১৯৯৩) পরিসীমা — মাত্র ২২টি দেশ নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্রের আয়তন ৫,৩৮২ বর্গ মাইল (১৩,১৩১ বর্গ কি.মি.) ফ্লোরিডার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ৭০০ দ্বীপ এখনও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের হাতে। মুদ্রা — বাহামিয়ান ডলার। বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১,৩০৬ মেগাওয়াট। সাগরের পাড় থেকে কিছু অ্যারাগোনাইট (ARAGONITE) নিষ্কাশন করা হয়। কৃষি — সুগারকেন, সব্জি ও ফল উৎপাদন । প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর। মৎস্য শিকারই একমাত্র জীবিকা। শিল্প — প্রধানতঃ প্রসাধনে ব্যবহার্য ক্যমিকেলের দু'টি কারখানা আছে। শিক্ষা — ৫ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক। সাক্ষরতা — ৯৮%।

বাহারিন ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

রাজধানী — মানামা। জনসংখ্যা — ৫৮৬,১০৯ (১৯৯৫)। বার্ষিক মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলারে) ৭,৫০০ (১৯৯৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৮৬৬/৩৯ (১৯৯৩) পরিসীমা — আরবের খাড়িতে ৩৬টি নিচু দ্বীপ নিয়ে গঠিত বাহারিন। আয়তন — ৭০৬.৬ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যার ৮৩% শহরে থাকেন। সরকারী ভাষা — আরবি। মুদ্রা — বাহারিনি দিনার (BHD)। বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১,১০০ মেগাওয়াট। খনিজ সম্পদ — তেলই এখানকার প্রধান খনিজ সম্পদ। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ১.৯ মিলিয়ন টন তেল পাওয়া গেছে। অনুমান আরো ১৫৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল পাওয়া যাবে। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন হয়েছে ৭.১ মিলিয়ন ঘনফুট। অনুমান আরো ৭,৬৭০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস পাওয়া যাবে। কৃষি — উৎপাদন হয় সামান্য। মূলত ফল ও সব্জির চাষ হয়। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, উট, ছাগল। মৎস্য শিকারের পরিমান ৯,৮৮৬ টন (১৯৯০)। শিল্প — অ্যালুমিনিয়াম, পেট্রকেমিক্যাল, জাহাজ নির্মাণ এবং ইলেকট্রনিকস। সাক্ষরতার হার — ৮৩.৫% (১৯৯২)।

বাংলাদেশ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

রাজধানী — ঢাকা। জনসংখ্যা — ১১৮.৭ মিলিয়ন (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় (ডলারে) ২৩০ (১৯৯৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৩৬৫/১৪৫ (১৯৯৩) পরিসীমা — বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে ভারত, পূর্বে ভারত ও মায়ানমার ও দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর। আয়তন — ৫৭,২৯৫ বর্গমাইল (১৪৮,৩৯৩ বর্গ কি.মি.)। সরকারী ভাষা — বাংলা। মুদ্রা — টাকা (BDT)। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা — ২০৬৮ মেগাওয়াট। প্রাকৃতিক গ্যাস — অনুমান ১০,৪৩৮,৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আছে ১৭টি ক্ষেত্রে।

কি.মি.)। সরকারী ভাষা — ডাচ (ফ্লেমিশ), ফরাসী, জার্মান। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক (বেলজিয়াম) (BBF) FRANCE। বিদ্যুৎ উৎপাদন — ১৯৯৫ সালে ৭০৬৩১ মিলিয়ন কিলোওয়াট। প্রাকৃতিক গ্যাস — ১৯৯৫ সালে ৪৩২,৪৮০ মিলিয়ন ঘনমিটার। খনিজ সম্পদ — কয়লা, আকরিক লোহা। কৃষি সম্পদ — গম, যব, চাল, বিট (সুগার), তামাক। প্রাণী সম্পদ — ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর। মৎস্য — ১৯৯৫ সালে ২০,৫১৯ টন মাছ ধরা পড়ে। শিল্প — চিনি, মদ। সাক্ষরতা ৯৮%।

বেলিজ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮১

রাজধানী — বেলমোপান (BELMOPAN)। জনসংখ্যা — ২০৯,৫০০ (১৯৯৪)। মাথাপিছু বার্ষিক জাতিয় আয় (ডলারে) ২,৫৫০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৭৫৪/৬৭ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তরে মেক্সিকো, পশ্চিম ও দক্ষিণে গুয়াতেমালা, পূর্বে ক্যারাবিয়ান সাগর। আয়তন — ২২৯৬০ বর্গ কিলোমিটার। সরকারী ভাষা — ইংরাজী, স্পেনীয়, স্থানীয় ক্রেয়ন উপভাষা। মুদ্রা — বেলিজ ডলার (BZD)। বিদ্যুৎ উৎপাদন — ১৯৮৮ সালে ১০.৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট। শিল্প — কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল শিল্প, মূলত কাঠ শিল্প, বয়ন শিল্প, চিনি উৎপাদন। কৃষি — সুগারকেন, গাজর, কলা, ধান। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, শূকর। বনাঞ্চল — ১ মিলিয়ন হেক্টর। মেহগিনি, সান্তামেরিয়া, হাডউড, পাম্প। সাক্ষরতা — ৯৩%।

বেনিন ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — PORTO-NOVO পোর্তো-নোভো। জনসংখ্যা — ৫.৪৬ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বার্ষিক মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলারে) — ৩৭০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৩২৭ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পূর্বে নাইজেরিয়া, উত্তরে নাইজের, বুরকিনা, ফাসো, পশ্চিমে টোগো, দক্ষিণে গুয়েনিয়খাড়ি। আয়তন — ১১২,৬২২। মুদ্রা — ফ্রাংকস (FRANCES)। বিদ্যুৎ — ১৯৯৩ সালে ২৩৬.১ মিলিয়ন কিলোওয়াট উৎপাদন হয়। কৃষি সম্পদ — বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলা, চাল, গম, বাদাম, তুলা, সুগারকেন। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর। বনাঞ্চল — ৩.৫২ মিলিয়ন হেক্টর। প্রচুর পরিমাণে কাঠ পাওয়া যায়। মৎস্য — ১৯৯১ সালে ৪১,০০০ টন মাছ ধরা হয়। শিল্প — পাম তেল উৎপাদন, সিমেন্ট, সুগার, বয়ন, ছাপা কাগজ, রসায়ন, কাঠ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। সাক্ষরতা — ৭৫%। সরকারী ভাষা — ফরাসী। স্থানীয় — য়োরুবা, ফন, সোমবা।

ভুটান ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

রাজধানী — থিম্পু। জনসংখ্যা — ০.৬ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বার্ষিক মাথাপিছু জাতিয় আয় (ডলারে) — ৪০০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৩০৭/১৫৯ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পূর্ব হিমালয়ে অবস্থিত ভুটানের উত্তরে চীন, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ভারত। আয়তন — ১৮,০০০ বর্গমাইল (৪৬,৫০০ বর্গ কিলোমিটার)। সরকারী ভাষা — জোঙখা, গুরুঙ, অসমীয়া। মুদ্রা — নেগুলট্রান (NGULTRUN)। বিদ্যুৎ — ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৪২ মিলিয়ন ওয়াট। খনিজ সম্পদ — চুনাপাথর, মার্বেল, ডলোমাইট,

১৯৯৩-৯৪ পর্যন্ত উৎপাদন হয়েছে ৬,৩৩৪ মিলিয়ন ঘনফুট। খনি সম্পদ — লিগনাইট, লাইমস্টোন, চায়না ক্লে। কৃষি সম্পদ — ধান, পাট, গম, সুগারকেন, তামাক, চা, তুলা। প্রাণী সম্পদ — গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ। বনাঞ্চল — ৪.৭২ মিলিয়ন একর। শিল্প — পাটজাত শিল্প, বয়ন, চা, কাগজ, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার, ভারি ও হালকা শিল্প, তামাক। সাক্ষরতা — ৩২.৪% (১৯৯৩)।

বারবাডোস ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

রাজধানী — ব্রিজ টাউন (BRIDGE TOWN)। জনসংখ্যা — ২৬৪,৩০০ (১৯৯৪)। জাতীয় আয় মাথা পিছু বার্ষিক (ডলারে) ৬,৫৩০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৯০৬ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উইন্ডওয়ারড দ্বীপের পূর্বে বারবাডোস। আয়তন — ১৬৬ বর্গ মাইল (৪৩০ বর্গ কি.মি.)। সরকারী ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — বারবাডোস ডলার (BBD)। বিদ্যুৎ — ৫৭১ মিলিয়ন কিলোওয়াট বার্ষিক উৎপাদন। খনিজ সম্পদ — তেল, ১৯৯৪ সালে উৎপাদন ৪৫৩,৪২৭ ব্যারেল। অনুমান ৩.২ মিলিয়ন ব্যারেল মজুত আছে। ১৯৯৪ সালে প্রাকৃতিক গ্যাস ২৮.৯ মিলিয়ন ঘনমিটার উৎপাদন হয়েছে। অনুমান আরো ২০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস মজুত আছে। কৃষি — সুগারকেন, তুলা, পিঁয়াজ, টমাটো। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, ছাগল, শুকর, মৎস্য চাষ, শিকার ইত্যাদি। ১৯৯৪ সালে ৪,৩৩৮ টন মাছ ধরা হয়। শিল্প — তৈল শোধনাগার, প্রাকিতিক গ্যাস, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পোষাক, প্লাস্টিক। সাক্ষরতা — ১৯ শতাংশ।

বেলারুশ ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ বাইলোরুশিয়া (BYELORUSSIA) UN-কে জানায় তাদের নাম পরিবর্তন করে বেলারুশ (BELARUS) করা হোক)

রাজধানী — মিনস্ক (MINSK)। জনসংখ্যা — ১০.৪ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বার্ষিক জাতীয় আয় মাথাপিছু (ডলারে) ২,১৬০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৭৮৭/৬১ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পশ্চিমে পোল্যান্ড, উত্তরে লাতভিয়া, পূর্বে রাশিয়া, দক্ষিণে ইউক্রেন। আয়তন — ৮০,১৩৪ বর্গ মাইল (২০৭,৬০০ বর্গ কিলোমিটার)। ১৯৮৯ জনগণনা অনুযায়ী ৭৭.৯% বেলারুশিয়ান, ১৩.২% রাশিয়ান, ৪.১২% পোলিশ, ২.১% ইউক্রেনীয়। জনসংখ্যার মোট ৬৮.২% শহরবাসী। সরকারী ভাষা — বেলারুশ, রুশ। মুদ্রা — রুবল। বিদ্যুৎ উৎপাদন — ৩৩,৪০০ কিলোওয়াট (১৯৯৩)। খনিজ সম্পদ — ২ মেট্রিক টন (১৯৯৩)। কৃষিজ সম্পদ — রবার, সুগারকেন, আলু, সব্জি। প্রাণীসম্পদ — গরু, শুকর, ভেড়া, ছাগল।

বেলজিয়াম ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — ব্রাশেল। জনসংখ্যা — ১০.১৪ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বার্ষিক মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলারে) ২২.৯২০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমান এবং বিশ্বে স্থান — ০.৯২৯/১২ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তরে নেদারল্যান্ড, উত্তর পশ্চিমে উত্তরসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্বে জার্মানী ও লুক্সেমবার্গ। আয়তন — ১১,৭৭৪ বর্গমাইল (৩০,৫২৮ বর্গ

স্লেট, গ্রাফাইট, তামা, কয়লা, লোহা। কৃষি সম্পদ — ধান, গম, ভুট্টা, যব, কমলালেবু, আপেল, তাঁত শিল্প, কাঠ। প্রাণী সম্পদ — গরু, শুকর, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া। বনাঞ্চল — ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বনাঞ্চল ছিল ২.৯ মিলিয়ন হেক্টর। শিল্প — চুনাপাথর, কাঠশিল্প, ফল প্রক্রিয়াকরণ। সাক্ষরতা — ৪৬%।

বলিভিয়া ১৪ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — (SUCRE) সুকরে। জনসংখ্যা — ৮.০৭ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বার্ষিক জাতীয় মাথাপিছু আয় (ডলারে) — ৭৭০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৫৮৪/১১১ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তর-পূর্বে ব্রাজিল, দক্ষিণে প্যারাগুয়ে এবং আর্জেন্টিনা, পশ্চিমে চিলি এবং পেরু। আয়তন — ৪২৪,১৬৫ বর্গমাইল (১,০৯৮,৫৮১ বর্গ কিলোমিটার)। সরকারী ভাষা — স্পেনীয়। মুদ্রা — বলিভিয়ান। বিদ্যুৎ — ১৯৮৬ সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান ছিল ২০৮০ মিলিয়ন কিলোওয়াট। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস — ১৯৯৬ সালে প্রতি দিন ৩০,১৮৮ ব্যারেল তেল উৎপাদন হয়। এবং ১৯৯৩ সালে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন হয় ১০৯,০০০ মিলিয়ন ঘনমিটার। খনিজ সম্পদ — জিঙ্ক, দস্তা, অ্যালুমিনিয়ম, সোনা, রূপা। কৃষি সম্পদ — সুগারকেন, ধান, কফি, গম, আলু। প্রাণী সম্পদ — শূকর, গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল। শিল্প — খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তামাক, বয়ন। সাক্ষরতা — ৬৩%।

বসনিয়া এবং হেরজেগোভিনা ২২ মে ১৯৯২

রাজধানী — SARAJEVO সারাজেভো। জনসংখ্যা — ৪.৩৭ মিলিয়ন (১৯৯১)। পরিসীমা — উত্তর এবং পশ্চিমে ক্রোয়েশিয়া, দক্ষিণ-পূর্বে যুগোস্লাভিয়া। আয়তন — ৫১,১২৯ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যার ৩৪.২% শহরবাসী। সরকারী ভাষা — সার্বো-ক্রোয়েসিয়ান (Serbo-Croat)। মুদ্রা — দিনার। বিদ্যুৎ উৎপাদন — ১৯৯০ সালে ১৪,৬৩২ মেট্রিক কিলোওয়াট। কৃষি সম্পদ — ভুট্টা, মকাই, গম, প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, শুকর। বনাঞ্চল থেকে কিছু কাঠ সংগ্রহ হয়। শিল্প — কয়লা, লিগনাইট, ইস্পাত, সিমেন্ট, তুলা। সাক্ষরতা — ৮৯%।

বোতস্ওয়ানা ১৭ অক্টোবর ১৯৬৬

রাজধানী — (GABORNE) গাবোরোনে। জনসংখ্যা — ১.৪ মিলিয়ন (১৯৯৪)। জাতীয় বার্ষিক মাথাপিছু আয় (ডলারে) — ২.৮০০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৭৪১/৭১ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পশ্চিমে ও উত্তরে নামিবিয়া, উত্তর-পূর্বে জাম্বিয়া এবং জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ-পশ্চিমে দক্ষিণ আফ্রিকা। আয়তন — ৫,৮১,৭৩০ বর্গ কিলোমিটার। শহরবাসী জনসংখ্যার হার — ৪৫.৭%। সরকারী ভাষা — ইংরেজী। মুদ্রা — পুলা BWP (PULA)। বিদ্যুৎ উৎপাদন — ১৯৯৪-৯৫ সালে ৯১৬.৬ কিলো ওয়াট। খনিজ সম্পদ — কয়লা, লোহা, সোডা, অ্যাস, হিরা, তামা। কৃষি সম্পদ — মোট ভূখণ্ডের ৭০-৮০% মরুভূমি। কিছু তুলা, সেজ, সজি। প্রাণী সম্পদ — গরু, শুকর, ভেড়া, ছাগল, গম। শিল্প — পশু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। সুতাকল, ফলজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ। সাক্ষরতা — ৬৭.৩%।

ব্রাজিল ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — ব্রাসিলিয়া, ব্রাসেলিয়া (BRASILIA)। জনসংখ্যা — ১৫৫.৮ মিলিয়ন (১৯৯৫) জাতীয় বার্ষিক মাথা পিছু আয় (ডলার) — ৩,৩৭০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৭৯৬/৫৮ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পূর্বে আতলান্টিক মহাসাগর, পূর্ব এবং দক্ষিণে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ। আয়তন — ৮৫১১৯৬৫ বর্গ কিলোমিটার। কেবল চিলি এবং ইকেয়েডার। সরকারী ভাষা — পোর্তুগীজ। মুদ্রা — (REAL) রিয়াল (BRC) । ৭৫.৬% শহরবাসী। বিদ্যুৎ — ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৬০.৬৭৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ তেল — মোট ১৩টি তৈল উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে ১৯৯৫ সালে প্রতি দিন ৭৪৫০০০ ব্যারেল। প্রাকৃতিক গ্যাস — ১৯৯৫ সালে মোট উৎপাদন ছিল ৮,০৫৩,৮৬৯,০০০ ঘনমিটার। খনিজ সম্পদ — কোয়ার্টজ, কিস্টাল, ক্রোম, অভ্র, বেরিলিয়ান, গ্রাফাইট, জ্যানেসাইট, লোহা, ফসফ্রেট, গোল্ড, রূপা। কৃষি সম্পদ — কলা, BEANS, CASSAVA, CASTOR BEAN, কমলালেবু, আঙ্গুর, নারকেল, কফি, তুলা, সেজ, চাল, গম, ভুট্টা। প্রাণী সম্পদ — গরু, শূকর, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া। মৎস্য — ১৯৮৯ সালে ৭৯৮৬৩৮ টন। শিল্প — ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ, রবার, মোটরজান। সাক্ষরতা — ৮০%।

ব্রুনেই/দারুসালাম ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

রাজধানী — Bandar Seri Begawan বন্দর সেরী বেগাওয়ান। জনসংখ্যা — ২৭৬,৩০০ (১৯৯৩)। বার্ষিক জাতীয় আয় মাথা পিছু (ডলার) ১৪,২৪০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমান ও বিশ্বে স্থান — ০ ৮৭২/৩৬ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণে চীন সাগর। আয়তন — ২,২২৬ বর্গমাইল (৫,৭৬৫ বর্গ কি.মি.)। সরকারী ভাষা — মালয়, ইংরেজি। মুদ্রা — ব্রুনেই উলার বা রিংগিট (BND) RINGGIT। বিদ্যুৎ — ১৯৯৩ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১,৪৪৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ তেল — ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ৭৩৫ কূপ থেকে উৎপাদন হয়েছে ৪.৪৫ মিলিয়ন টন। প্রাকৃতিক গ্যাস — ১৯৯৩ সালের উৎপাদন ছিল ৯,৭৮৯ মিলিয়ন ঘনমিটার। কৃষি — চাল, সব্জি, ফল। বনাঞ্চল — ১৯৯৩ সালে কাঠ উৎপাদন হয় ১,৮২,০০০ বর্গ মিটার। মৎস্য চাষ — ১৯৯৩ সালে সাগর ও অন্য উৎস থেকে ১৭২৭ টন মাছ ধরা হয়েছে। শিল্প — খনিজ তেলই প্রধান শিল্প, অন্যান্য শিল্পের মধ্যে আছে রবার, কাগজ, কাষ্ঠ শিল্প। সাক্ষরতা — ৭৩%।

বুলগেরিয়া ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫

রাজধানী — সোফিয়া। জনসংখ্যা — ৮.৪৩ মিলিয়ন (১৯৯৫)। জাতীয় বার্ষিক আয় মাথাপিছু (ডলারে) ১,১৬০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৭৭৩ (১৯৯৩)। আয়তন — ৪২,৮৫৫ বর্গমাইল (১১০,৯৯৪ বর্গ কিলোমিটার)। পরিসীমা — উত্তরে রোমানিয়া, পূর্বে কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণে তুর্কী এবং গ্রীস, পশ্চিমে যুগোশ্লোভিয়া। মুদ্রা — লেভ (LEV) (BGL)। বিদ্যুৎ — ১৯৯৪ সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৩৮,১৩০ মিলিয়ন কিলোওয়াট। তেল — ১৯৯৪ সালে খনিজ তেলের উৎপাদন ছিল ৩৬,০০০ টন। প্রাকৃতিক গ্যাস — ৭.৫৮ মিলিয়ন ঘন মিটার। খনিজ সম্পদ — ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, লিগনাইট,

কয়লা। কৃষি — গম, সেইজ, যব, সুগারনিট, সূর্যমুখী তেল বিজ, তুলা, তামাক, আঙ্গুর। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, শূকর। মৎস্য — ১৯৯০ সালে ৬৬,৮০০ টন। শিল্প — লোহা, ইস্পাত, সার, সালফিউরিক অ্যাসিড, সিমেন্ট, কাগজ, বয়ন, তামাক। সরকারী ভাষা — বুলগেরীয়/তুর্কী।

বুরকিনা ফাসো ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — OUAGADOUGOU ঔয়াগাদৌগো। জনসংখ্যা — ১০ মিলিয়ন (১৯৯৪)। মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় (ডলারে) — ৩০০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০২২৫/১৭০ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তর-পশ্চিমে মালি, পূর্বে নাইজের, দক্ষিণে বেনিন, টোগ, ঘানা। আয়তন — ২৭৪,১২২ বর্গ কিলোমিটার। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক (CFA)। বিদ্যুৎ — ১৯৯১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ সম্পদ — ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, চুনাপাথর, ফসফেট, হীরে, সোনা। কৃষি সম্পদ — গম, সুগারকেন, ভুট্টা, বাদাম, ধান, তুলা। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, ছাগল, শুকর, ঘোড়া। মৎস্য — বাৎসরিক ৫,৫০০ টন মাছ উৎপাদন হয়। শিল্প — খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বয়ন। সাক্ষরতা ১০% (১৯৯৪) । সরকারী ভাষা — ফরাসী, (স্থানীয়) সুদানীয়, আদিবাসী ভাষাসমূহ।

বুরুন্ডি ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২

রাজধানী — (BUJUMBURA) বুজমবুরা। জনসংখ্যা — ৫.৩ মিলিয়ন (১৯৯৬)। জাতীয় মাথাপিছু বার্ষিক আয় (ডলারে) — ১৫০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.২৮২/১৬৬ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তরে রোটাভা, পূর্বে এবং দক্ষিণে তাঞ্জানিয়া, পশ্চিমে জাইরে। আয়তন — ১০৭৫৯ বর্গমাইল (২৭৮৩৪ বর্গ কি.মি.) ২.৫% শহরবাসী। স্থানীয় ভাষা — KIRUNDI (কিরুন্ডি) সরকারী ভাষা — ফরাসী, রুন্ডি। মুদ্রা — বুরুন্ডি ফ্রাঁ (FRANCE) (BIF)। বিদ্যুৎ — ১৯৯১ সালে উৎপাদন ৯৯.৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ সম্পদ — সোনা, নিকেল, ফসফেট। কৃষি সম্পদ — কফি, কলা, ভুট্টা, বাদাম, তুলা, চা। প্রাণী সম্পদ — গরু, ছাগল, ভেড়া, শুকর। বনাঞ্চল — ৬৬০০০ হেক্টর। সামান্য মৎস্য উৎপাদন। শিল্প — বয়ন, চামড়া, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ।

কাম্বোডিয়া ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

রাজধানী — (PHNOM PENH) নম্ পেন। জনসংখ্যা — ৯.৮৬ মিলিয়ন (১৯৯৬)। জাতীয় মাথাপিছু বার্ষিক আয় (ডলারে) — ২০০ (১৯৯১)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৩২৫/১৫৬ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তরে থাইল্যান্ড, পশ্চিমে থাইল্যান্ড, পূর্বে ভিয়েতনাম, দক্ষিণে থাইল্যান্ডের খাড়ি অঞ্চল। আয়তন — ৬৯,৮৯৮ বর্গমাইল (১৮১,০৩৫ বর্গ কিলোমিটার) । সরকারী ভাষা (KHMER) খামের, ফরাসী। মুদ্রা — রিয়েল (RIEL) (KHR)। বিদ্যুৎ — ১৯৮৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান ছিল ১৪২ মিলিয়ন কিলো ওয়াট। খনিজ সম্পদ — উচ্চমানের আকরিক লোহা, ফসফেট, সোনা। কৃষি সম্পদ — ধান, রবার, ভুট্টা। প্রাণী সম্পদ — গরু, মহিষ, শুকর, ঘোড়া, মুর্গি। বনাঞ্চল — ৩.৮ মিলিয়ন হেক্টর। মৎস্য চাষ হয় বিশাল পরিমানে। শিল্প — রাবার শিল্প, সামুদ্রিক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, পাট।

ক্যামেরুন ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — (YAOUNDE) য়াওনদে। জনসংখ্যা — ১২.২ মিলিয়ন (১৯৯২)। মাথাপিছু জাতীয় আয় বার্ষিক (ডলারে) — ৬৮০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার/বিশ্বে স্থান — ০.৪৮১/১২৭ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পশ্চিমে গুয়েমার খাড়ি অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমে নাইজেরিয়া, পূর্বে চাজ এবং মধ্য আফরিকান রিপাবলিক, দক্ষিণে কঙ্গো, গ্যাবন। আয়তন — ৪৭৫,৪৪২ বর্গ কিলোমিটার। সরকারী ভাষা — ফরাসী এবং ইংরেজী। মুদ্রা — ফ্রাঁ (CFA) (XAF) FRANCE। বিদ্যুৎ — ১৯৮৮ সালে ৭৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। তৈল — ১৯৯২ সালে উৎপাদন ছিল ৭.৪৬ মিলিয়ন টন। খনিজ সম্পদ — চুনাপাথর, টিন, বক্সাইট, ইউরেনিয়াম, নিকেল, সোনা।

ক্যানাডা ৯ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — (OTTAWA) অটোয়া। জনসংখ্যা — ২৯.৯৬ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বার্ষিক জাতীয় মাথাপিছু আয় (ডলারে) — ১৯,৫৭০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৯৫১ (১৯৯৩)। পরিসীমা — দক্ষিণে আমেরিকা, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে (ARCTIC OCEAN) পূর্বে বাফিন বে (BAFFIN BAY)। আয়তন — ৯৯,৭০,৮১০ বর্গ কিলোমিটার। সরকারী ভাষা — ইংরাজী, ফরাসী। মুদ্রা — ক্যানাডিয়ান ডলার (CAD)। বিদ্যুৎ — ১৯৯৫ সালে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১১৩ মিলিয়ন মেগাওয়াট। তেল — ১৯৯৫ সালের হিসাব অনুযায়ী সঞ্চিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ ৬৫৬.১ মিলিয়ন ঘনমিটার। ১,৮১২,০০০ মিলিয়ন ঘনমিটার। খনিজ — কয়লা, লোহা, তামা, সিসা, জিঙ্ক, নিকেল, ইউরেনিয়াম, রূপা, সোনা। কৃষিজ — গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি। খনিজ সম্পদ — গরু, ভেড়া, শূকর। বনাঞ্চল — ৪৫৩.৩ মিলিয়ন হেক্টর। মৎস্য উৎপাদন — (১৯৯৫) ৩১৬৯,৯০০ টন। শিল্প — সিমেন্ট, লোহা, এলয়, স্টিল, অ্যালমিনিয়াম, অভ্র, জিঙ্ক, নিউজপ্রিন্ট।

কেপ-ভারডে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

রাজধানী — (PRAIA) প্রাইয়া। জনসংখ্যা — ০.৪২ মিলিয়ন। মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় (ডলারে) — ৯১০ (১৯৯৪)। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০৫৩৯ (১৯৯০)। পরিসীমা — মোট দশটি দ্বীপ নিয়ে কেপ ভারডের অবস্থান আটলান্টিক মহাসাগরে, পূর্ব আফ্রিকা থেকে ৬২০ কি.মি. দূরে। আয়তন — ১৫৫৭ বর্গমাইল (৪,০৩৩ বর্গ কি.মি.)। সরকারী ভাষা — পোর্তুগীজ। মুদ্রা — এসকিউডো (CVE)। বিদ্যুৎ — ১৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ সম্পদ — খনিজ গ্যাস প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। কৃষি — নারকেল, আখ, কলা, গম, ভুট্টা। প্রাণী সম্পদ — ছাগল, গরু, শুকর। মৎস্য উৎপাদন — ৯০০০ টন বার্ষিক উৎপাদন (১৯৯৫)। শিল্প — গম ও ভুট্টা জাত আটা, ময়দাই প্রধান উৎপাদন। ১৯৯৩ সালে ১৭৪৩ হেক্টলিটার 'বান' উৎপাদন হয়। সাক্ষরতা — ১৯৯৩ সালে বয়স্ক সাক্ষর ছিলেন ৬৬%।

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — (BANGUI) বানগুই। জনসংখ্যা — ৩.০৭ মিলিয়ন (১৯৯৪)। মাথাপিছু জাতীয়

বার্ষিক আয় (ডলারে) — ৩৭০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৩৩৫ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তরে চাদ, পূর্বে সুদান, দক্ষিণে জাইরে, কঙ্গো, পশ্চিমে ক্যামারুন। আয়তন — ২৪০,৩২৪ বর্গমাইল (৬২২,৪৩৬ বর্গ কিলোমিটার)। সরকারী ভাষা — ফরাসী। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক (CFA)। বিদ্যুৎ — ১৯৯৫ সালে মোট উৎপাদনের পরিমান ছিল ১০০,২২০ কিলোওয়াট। খনিজ সম্পদ — হীরা, সোনা। কৃষি সম্পদ — ক্যাসাডা, বাদাম, কলা, জোয়ার, ভুট্টা, তুল, কফি। প্রাণী সম্পদ — গরু, ছাগল, ভেড়া, শুকর। বনাঞ্চল — ৩৫.৮ হেক্টর বনাঞ্চল। মৎস্য — বছরে প্রায় ১৩০০০ টন মাছ ধরা হয়। শিল্প — ছোট শিল্পই বেশি, সুতি বস্ত্র, চামড়া, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। সাক্ষরতা — ৬২% (১৯৯২)।

চাদ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — (N'DJAMENA) জামেনা। জনসংখ্যা — ৬.২৮ মিলিয়ন। বার্ষিক মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলারে) — ১৯০ (১৯৯৪)। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.২৯ (১৯৯৩) আয়তন — ১২,৮৪,৬০০ বর্গ কিলোমিটার। পরিসীমা — পূর্বে ক্যামারুন, নাইজেরিয়া, নাইগ্রে, উত্তরে লিবিয়া, পশ্চিমে সুদান, দক্ষিণে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক। সরকারী ভাষা — ফরাসী, আরবি। মুদ্রা — FRANCE (CFA) ফ্রাঁ। বিদ্যুৎ — ১৯৯৪ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান ৮৪.৭৮ কিলোওয়াট। খনিজ সম্পদ — ইউরেনিয়াম, সোনা, লোহা, বক্সাইট, খনিজ তৈল। কৃষি — জোয়ার, আখ, মিষ্টি আলু, তুলাবিজ, বাদাম, গঁদের আঠা, ভুট্টা, তুলা। প্রাণী সম্পদ — ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, উট। মৎস্য — ১৯৯৩ সালে মৎস্য উৎপাদনের পরিমান ছিল ৩১,০০০ টন। শিল্প — বয়ন, ভোজ্য তেল, চিনি, বিয়ার, তামাক, তৈল শোধনাগার, সাবান।

চিলি ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — সান্তিয়াগো। জনসংখ্যা — ১৪.৬৬ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বার্ষিক মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলারে) — ৩,৫৬০ (১৯৯৪)। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৮৮২ (১৯৯৩)। আয়তন — ৭৫৬,৯০৫ বর্গ কিলোমিটার। সরকারী ভাষা — স্পেনীয়। পরিসীমা — উত্তরে পেরু, পূর্বে বলিভিয়া ও আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। মুদ্রা — পেসো (CLP)। বিদ্যুৎ — ১৯৯৫ সালের উৎপাদন ২৬,৭৪২ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ তেল ও গ্যাস — ১৯৯৫ সালে তেলের উৎপাদন ছিল ৬০৫,১০০ ঘনমিটার। গ্যাস ৩৭৮৩.২ মিলিয়ন ঘনমিটার। খনিজ সম্পদ — তামা, কয়লা, লোহা, চুনাপাথর, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, সোনা, রূপা। কৃষি — গম, যব, ভুট্টা, চাল। প্রাণী সম্পদ — গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, শুকর। বনাঞ্চল — ১.৩ মিলিয়ন হেক্টর। মৎস্য — উৎপাদন ১৯৯২-তে ছিল ৮.০২ মিলিয়ন টন। শিল্প — মৎস্য শিকার, সেলুলয়েড, নিউজপ্রিন্ট, টায়ার, সিমেন্ট, ইস্পাত, তামা। সাক্ষরতা — ১৯৯৩তে ছিল ৯২%।

চীন ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — বেইজিং (পিকিং)। জনসংখ্যা — ১১৯৯ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বার্ষিক মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলারে) — ৫৩০ (১৯৯৪)। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৬০৯

(১৯৯৩)। আয়তন — ৯৫,৯৭,০০০০ বর্গ কিলোমিটার (তাইওয়ান সহ)। পরিসীমা — পূর্বে উত্তর কোরিয়া, হংকং ও ম্যাকাও। পশ্চিমে ভারত, পাকিস্তান, আফিগানিস্তান। উত্তরে রাশিয়া ও ম্যাঙ্গোলিয়া, দক্ষিণে ভিয়েতনাম, লাওস, বার্মা, ভারত, ভুটান ও নেপাল। মুদ্রা — ইয়ান (CNY)। বিদ্যুৎ — ১৯৯৪-এ উৎপাদন ৯২৮১০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট। গ্যাস — ১৯৯৪এ উৎপাদন ১৭৫৫১ মিলিয়ন ঘনমিটার। খনিজ তেল — ১৯৯৫এ প্রতিদিনের উৎপাদন ২৯৯৪০০০। খনিজ সম্পদ — কয়লা, লোহা, টিন, টাংস্টেন, জিঙ্ক ও অ্যালুমনিয়াম। কৃষি — চাল, গম, ভুট্টা, ধান, চা, তুলা ও তৈলবীজ। প্রাণী সম্পদ — গরু, ছাগল, ভেড়া ও শূকর। বনাঞ্চল — ১২৮.৬৩ মিলিয়ন হেক্টর। মৎস্য — ২১.৪৩ মিলিয়ন টন (১৯১৪)। শিল্প — সুতীবস্ত্র, কাগজ, চিনি, প্লাস্টিক ও লৌহ-জাত দ্রব্য। শিক্ষা — ১৯৯৪এ ৯৮.৪% শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষা নেয়। সরকারী ভাষা — মান্দারিম (স্থানীয়) কিয়াং, গান, মিন, ঝপং, সি, হুই।

কলম্বিয়া ৫ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — বোগোটা। জনসংখ্যা — ৩৪.৫ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বার্ষিক মাথাপিছু জাতীয় আয় — ১৬২০ ডলার (১৯৯৪)। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৮৪০। আয়তন — ১,১৪১,৭৪৮ বর্গ কিলোমিটার। পরিসীমা — উত্তরে ক্যারাবিয়ান সাগর, উত্তর-পশ্চিমে পানামা, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইকুয়েডর ও পেরু, দক্ষিণ-পূর্বে ভেনিজুয়েলা এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ব্রাজিল। মুদ্রা — কলম্বিয়ান পেসো [Colombian Peso] (COP)। বিদ্যুৎ — ২৯,৬৫০ মিলিয়ন কিলোওয়াট (1987)। খনিজ তৈল — ১৯৯২-এ ২২.৩৩ মিলিয়ন টন। খনিজ দ্রব্য — সোনা, রূপা, তামা, সিসা, ম্যাঙ্গানীজ ও পাথর। এছাড়া আছে পান্না (যার পরিমান পৃথিবীর মোট উৎপাদনের অর্ধেক)। কৃষিজ — কফি, আলু, ধান ও ভুট্টা। প্রাণী সম্পদ — গরু, শূকর, ভেড়া। মৎস্য — ১৯৮৭-তে মোট উৎপাদন ছিল ৮৩,৫৬৯ টন। সরকারী ভাষা — স্প্যানিশ।

কমোরোস ১২ নভেম্বর ১৯৭৫

রাজধানী — মোরোনি। জনসংখ্যা — ৪৯০,০০০ (১৯৯৫)। বার্ষিক মাথাপিছু আয় (ডলারে) — ৫১০ (১৯৯৪)। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৩৯৯ (১৯৯৩)। আয়তন — ১৮৬২ বর্গ কিলোমিটার। পরিসীমা — আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড ও মাদাগাসকারের মধ্যস্থিত ভারত মহাসাগরের তিনটি দ্বীপ নিয়ে কমোরোস। মুদ্রা — কমোরিয়ান ফ্রাঁ Comorian Frane (KMF)। বিদ্যুৎ — ১৯৯১-এ মোট উৎপাদন ২৩,৯৫৭.০০০ কিলোওয়াট। কৃষি সম্পদ — মূলতঃ ইক্ষু। এছাড়া ভুট্টা, নারকোল ও কলা। মৎস্য — ১৯৯১-এ ৮০০০ টন। প্রাণী সম্পদ — গরু, গাধা, ভেড়া ও ছাগল। ভাষা — মূলতঃ কোমোরিয়ান। এছাড়া সফুয়া ও ফরাসি।

কঙ্গো ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — ব্রাজ্জাভিলা। জনসংখ্যা — ২.৯৪ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বার্ষিক মাথাপিছু আয় (ডলারে) ৬৪০ (১৯৯৪)। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৫১৭। আয়তন —

৩,৪১,৮২১ বর্গ কিলোমিটার। পরিসীমা — উত্তরে ক্যামেরুন, পূর্ব ও দক্ষিণে জাইরো, দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর ও অ্যাঙ্গোলা এবং পশ্চিমে গ্যাবন। মুদ্রা — Franc CFA (BEAC)। বিদ্যুৎ — ১৯৯০-এ মোট উৎপাদন ৫০৩,৯৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ তৈল — ১৯৯২-এ মোট উৎপাদন ৮,৩০৩,০০০ টন। গ্যাসের আনুমানিক পরিমান ৭১০০০ মিলিয়ন ঘনমিটার। খনিজ সম্পদ — দস্তা, সীসা, বিটুমিনাস ছাড়া সোনা ও হীরা। কৃষি সম্পদ — কফি, কোকো, ধান, ভুট্টা, বাদাম ও কলা। প্রাণী সম্পদ — গরু, ছাগল, ভেড়া ও শুকর। মৎস্য — বাৎসরিক শিকার আনুমানিক ১২০০০ টন। সরকারী ভাষা — ফরাসী। সাক্ষরতার হার — ৫৭% (১৯৯০)।

কোস্টারিকা ২ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — সান জোস। জনসংখ্যা — ৩.৩৭ মিলিয়ন। বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় — ২৩৮০ ডলার। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৮৮৪। আয়তন — ৫১,১০০ বর্গ কিলোমিটার। পরিসীমা — উত্তরে নিকারাগুয়া, পূর্বে ক্যারাবিয়ান, দক্ষিণ-পূর্বে পানামা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। মুদ্রা — কোস্টারিকার কোলেন [Costa Rican Colon (CRC)] বিদ্যুৎ — ১৯৯১ এ উৎপাদন ছিল ৩৮৭২ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ — লবণ ও সোনা। কৃষিজ সম্পদ — কফি, ইক্ষু, তামাক, ভুট্টা, ধান ও কলা। বন সম্পদ — ১.৫৬ মিলিয়ন হেক্টর। প্রাণী সম্পদ — গরু ও শুকর। মৎস্য — ১৯৯১ এ উৎপাদন ছিল ১৮০০টন। শিল্প — বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, সার ও সিমেন্ট। সরকারী ভাষা — স্প্যানিশ। শিক্ষার হার — ৯২.৮% (১৯৯২)।

আইভরিকোস্ট ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — আবিদজান [Yamoussaukro, formerly Abidjan] জনসংখ্যা — ১৩.৭২ মিলিয়ন। বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় — ৫১০ ডলার। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৩৫৭। আয়তন — ৩২০,৭৮৩ বর্গ কিলোমিটার। পরিসীমা — পশ্চিমে লাইবেরিয়া, উত্তরে মালি, পূর্বে ঘানা এবং দক্ষিণে গুয়েনা উপমহাসাগর। মুদ্রা — ফ্রাঁ [France CFA] । বিদ্যুৎ — ১৯৯২-এ উৎপাদন ছিল ১৮৪৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ তৈল ও গ্যাস — ১৯৯২ এ তৈল উৎপাদন - ৬৩,০০০ টন। আনুমানিক গ্যাসের পরিমান — ৬,৫১৬,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট। খনিজ সম্পদ — হীরা (১৯৮৭ তে ২০,০০০ ক্যারাট) সোনা (মোট সঞ্চয় আনুমানিক ৪৫০০ কেজি)। কৃষিজ সম্পদ — ইক্ষু, কফি, কোকোয়া, তৈলবীজ, ভুট্টা, ধান। বনজ সম্পদ — ৩ মিলিয়ন হেক্টর। প্রাণী সম্পদ — গরু, ছাগল, ভেড়া ও শুকর। মৎস্য — ১৯৮৮তে মোট উৎপাদন ১০৭৬০০ টন। সরকারী ভাষা — ফরাসী। স্থানীয় — আকন, ক্রু, ভোলতারিক মালিনকে। সাক্ষরতা — ৫৪% (১৯৯৩)।

ক্রোয়াসিয়া ২২ মে ১৯৯২

রাজধানী — জাগ্রেব। জনসংখ্যা — ৪.৮৪ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় — ২৫৩০ ডলার। আয়তন — ৫৬,৫৩৮ বর্গ কিলোমিটার। পরিসীমা — উত্তরে

স্লোভেনিয়া এবং হাঙ্গেরী, পূর্বে যুগোশ্লাভিয়া ও বসানিয়া। মুদ্রা — ক্রুনা (HRK) । বিদ্যুৎ — ১৯৯৫ এ উৎপাদন ছিল ৯,১৪৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজতৈল ও গ্যাস — ১৯৯৫এ খনিজ তৈল উৎপাদন ছিল — ১.৫ মিলিয়ন টন ও গ্যাস — ১৯৬৬ মিলিয়ন ঘনমিটার খনিজদ্রব্য — কয়লা, লিগনাইট, বক্সাইট ও লোহা। কৃষিজদ্রব্য — গম, ভুট্টা, আলু ও দ্রাক্ষা। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া ও শূকর। অরন্য — ২০৭৯৩০১ হেক্টর। মৎস্য — ১৯৯৪এ ১৬৫৬০ টন। সরকারী ভাষা — Serbo-Croat (Croatian) সার্বো-ক্রোয়াসিয়ান।

কিউবা ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — হাভানা। জনসংখ্যা — ১০.৯৮ মিলিয়ন। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৭২৬। আয়তন — ১১০৮৬০ বর্গ কিলোমিটার। মুদ্রা — কিউবার পেসো (CUP)। বিদ্যুৎ — ১৯৯১ এ উৎপাদন ছিল ১৬৩০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজতৈল — ১৯৯২ এ অশোধিত তৈল উৎপাদন ৭৭১,০০০ টন। খনিজদ্রব্য — ইক্ষু, ধান, ভুট্টা, তামাক, কফি, এছাড়া বিভিন্ন ফল যথা কমলালেবু, আনারস, আম, কলা ইত্যাদি। বনসম্পদ — মোট ভূমির ২৫% বা ২.৭ মিলিয়ন হেক্টর। মৎস্য — তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকর দ্রব্য, ১৯৮০ এ মোট শিকার ১৯১,৮৮৯ টন। শিল্পজাত দ্রব্যর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বস্ত্র, জ্বালানী, সিগারেট, সার, রেডিও, টিভি। সাক্ষরতা — (৬-১৪) বৎসরের শিশুর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। প্রাণী সম্পদ — গরু, ছাগল, ঘোড়া ও ভেড়া।

সাইপ্রাস ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — নিকোসিয়া। জনসংখ্যা — ৭২৯,৮০০(১৯৯৫)। মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় — ১১,১২১ ডলার (১৯৯৩) ও বার্ষিক বদ্ধির হার — ০.৯০৯। আয়তন — ৯২৫১ বর্গ কিলোমিটার। পরিসীমা — তুর্কী দক্ষিণ উপকূল থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ হল সাইপ্রাস। সিরিয়া উপকূল থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে। মুদ্রা — সাইপ্রাস পাউন্ড (cyp)। বিদ্যুৎ — ১৯৯৪এ মোট উৎপাদন ২৬৮১ মিলিয়ন কিলোওয়াট। খনিজ সম্পদ — জিপসাম ও বেন্টোনাইট। কৃষিজ সম্পদ — দ্রাক্ষা, আলু, গম ও বার্লি। প্রাণী সম্পদ — গরু, ছাগল, ভেড়া ও শুকর। বন সম্পদ — ১৭৫৮ বর্গ কিলোমিটার। মৎস্য — ১৯৯৪ এ উৎপাদন ৩০৮২ টন। সরকারী ভাষা — গ্রীক ও তুর্কী তবে ইংরাজীও বহুলপ্রচলিত। সাক্ষরতা — বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ৫১/২ থেকে ১১১/২ বৎসরের শিশুর অবৈতনিক।

চেক রিপাব্লিক (প্রজাতন্ত্র) ১৯ জানুয়ারি ১৯৯৩

রাজধানী — প্রাগ। জনসংখ্যা — ১০.৩৩ মিলিয়ন। (১৯৯৬) মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় (ডলারে) — ৩২১০(১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৮৭২ (১৯৯৩)। আয়তন — ৭৮,৮৬৪ বর্গ কিলোমিটার। পরিসীমা — পশ্চিমে জার্মানি, উত্তরে পোল্যান্ড, পূর্বে স্লোভাকিয়া, দক্ষিণে আস্ট্রিয়া। সরকারী ভাষা — চেক, হাঙ্গেরী, রোমান। মুদ্রা — KORUNA (CER)। বিদ্যুৎ — ১৯৯৩ সালে ৫৮৮৮২ মেগাওয়াট উৎপাদন ছিল। খনিজ সম্পদ—

কয়লা, লিগনাইট, সোনা। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, শুকর। বনাঞ্চল — ২,৬২৮,৬২৮ হেক্টর (১৯৯৪)। শিল্প — কয়লা শিল্প, লিগনাইট শিল্প, গ্যাস শিল্প। সাক্ষরতা — প্রথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

রাজধানী — পিয়ঙ ইয়ঙ। জনসংখ্যা —২৩.২৬ মিলিয়ন (১৯৯৫)। মাথাপিছু জাতীয় বার্ষিক আয় (ডলারে) — ৯২৩। বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৭১৪(১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তরে চীন, পূর্বে জাপান সাগর, পশ্চিমে পিতসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ কোরিয়া। আয়তন — ৪৬,৫৪০ বর্গমাইল। মুদ্রা — (WON) উয়ন (KPW)। বিদ্যুৎ উৎপাদন — ১৯৯৩ সালে উৎপাদনের পরিমান ছিল ২১,২০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট। তেল — ১৯৯০ সালে উৎপাদনের পরিমান ছিল ৭০,০০০ ব্যারেল প্রতিদিন। খনিজ সম্পদ — লোহা, তামা, সীসা, কয়লা, ইউরেনিয়াম ম্যাঙ্গানিজ, সোনা, রূপা, শ্লেট। কৃষি সম্পদ — ধান, ভুট্টা, আলু, সোয়াবিন। প্রাণী সম্পদ — গরু, শুকর, ভেড়া, ছাগল। বনাঞ্চল — ৬,৪৬৮,০০০ হেক্টর। মৎস্য — ১৯৯৩ সালে ১.০৯ মিলিয়ন টন। শিল্প — বয়ন, জলবিদ্যুৎ, সুতাবস্ত্র। শিল্প — রেয়ন, সার, কেমিক্যালস্, জাহাজ, মোটরগাড়ি, টি.ভি। সরকারী ভাষা — কোরিয়। সাক্ষরতা — প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিক সাক্ষর।

কঙ্গো ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — ব্রাজাভিল। জনসংখ্যা — ২.৯৪ মিলিয়ন (১৯৯৫)। মাথাপিছু জাতীয় বার্ষিক আয় (ডলারে) — ৬৪০ (১৯৯৫)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৫১৭ (১৯৯৩)। বিশ্বে জনসংখ্যার স্থান — ১২৫ (১৯৯৩) পরিসীমা — উত্তরে ক্যামেরুন ওসেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, পূর্বে, ও দক্ষিণে জাইরে, দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যাঙ্গোলা ও অ্যাটলান্টিক সাগর এবং পশ্চিমে গাবোন। মোট ভূখণ্ড — ৩,৪১,৮২১ বর্গ কি.মি.। শহরবাসী — ৪০%। খনিজ — সোনা, হীরা, লোহা, দস্তা, সীসা। কৃষি — চাল, কলা, কফি, কোকো, মেজ, বাদাম। শিল্প — খাদ্য, বস্ত্র, সিমেন্ট, ধাতব ও রাসায়নিক পদার্থ। জাতীয় সরকারী ভাষা — ফরাসী। অন্যান্য ভাষা — কঙ্গো, মোনোকুতুবা, লিঙ্গালা। মুদ্রা— ফ্রাঙ্ক (CFA)। সাক্ষরতা — ৫৭% (১৯৯০)।

ডেনমার্ক ২৮ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — কোপেনহগেন। জনসংখ্যা — ৫.৩ মিলিয়ন (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় (ডলারে) — ২৮,১১০(১৯৯৪)। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৯২৮ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পশ্চিমে উত্তর মহাসাগর, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তরে নরওয়ে এবং সুইডেন, দক্ষিণে জার্মানী। আয়তন — ১৬,৬৩৩ বর্গমাইল (৪৩,০৭৬ বর্গ কি.মি.)। সরকারী ভাষা — ড্যানিস। মুদ্রা — (DANISH KRONE) ড্যানিস ক্রোনে (DKK)। বিদ্যুৎ — ৩৪,৪৫৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট (১৯৯৫)। তেল — ৯.২ মিলিয়ন টন (১৯৯৫)। কৃষি — গম, যব, ভুট্টা, তামাক, বাজরা, আলু। প্রাণীজ সম্পদ — ঘোড়া, গরু, শুকর। মৎস্য — ২,৯৩৮ মিলিয়ন ক্রোনে। শিল্প — তামাক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরন, বস্ত্র, চামড়া, নিউজপ্রিন্ট, কাঠ, তৈল শোধানগার, রাবার, প্লাস্টিক।

জিবৌতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

রাজধানী — জিবৌতি। জনসংখ্যা — ৫৮৬,০০০(১৯৯৫)। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.২৮৭ (১৯৯৩)। পরিসীমা — দক্ষিণ-পূর্বে সোমালিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইথিওপিয়া, উত্তর-পূর্বে খাড়ি উপতাকা। আয়তন — ২৩,২০০ বর্গ কি.মি. (৮৯৫৮ বর্গ মাইল)। সরকারী ভাষা — ফরাসী, আরবী। অন্যান্য আফর, ইস্সো। মুদ্রা — (FRANC) জিবৌতি ফ্রাঁ (DJF)। বিদ্যুৎ — ১৮৭.৮৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট (১৯৮৯)। কৃষি — টমাটো, সামান্য শাকসব্জি। প্রাণী সম্পদ — গরু, ভেড়া, ছাগল, উট। মৎস্য — ৫০০ টন (১৯৯৫)। সাক্ষরতা — ৮৩ শতাংশ (১৯৯৩)।

ডোমেনিকা ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮

রাজধানী — রোসেউ। জনসংখ্যা — ৭৪,২০০ (১৯৯৪)। মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় (ডলারে) — ২৮৩০ (১৯৯৪)। বার্ষিক জনসংখ্যা বদ্ধির হার — ০.৭৬৪ (১৯৯৩) আয়তন — ৭৪৮.৫ বর্গ কি.মি. (২৮৯.৫ বর্গ কি.মি.)। পরিসীমা — ওয়েস্ট ইন্ডিজের একটি দ্বীপরাষ্ট্র। মুদ্রা — ফ্রা। বিদ্যুৎ — ১৩৫০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট (১৯৯৩)। কৃষি — কলা, টমাটো, নারকেল। প্রাণী সম্পদ — গরু, শূকর, ভেড়া, ছাগল। শিল্প — বস্ত্র, ফল প্রক্রিয়াকরণ। সাক্ষরতা — ৯০% (১৯৯৪)।

ডোমেনিকান রিপাব্লিক ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — সালতো ডোমিঙ্গো। জনসংখ্যা — ৭.৭৭ মিলিয়ন (১৯৯৪)। মাথাপিছু জাতীয় বার্ষিক গড় আয় (ডলারে) ১৩২০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার — ০.৭০১ (১৯৯৩)। সরকারী ভাষা — স্পানিস। অন্যান্য হাইতিয়ান ফ্রেঞ্চ। পরিসীমা — পশ্চিমে হাইতি, পূর্বে এই দ্বীপের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে হিসপ্যানিতলা। আয়তন — ৪৮,৪৪২ বর্গ কি.মি. (১৮৭৭০ বর্গমাইল)। মুদ্রা — পেস (DOP)। বিদ্যুৎ — ৪,৬২৬,১৪৭ মেগাওয়াট। খনিজ সম্পদ — বক্সাইট, ফেরোনিকেল, সোনা, রূপা। কৃষি — আখ, কোকো, কফি, কলা, ধান, তামাক, ভুট্টা। প্রাণী সম্পদ — গরু, শূকর, ভেড়া। মৎস্য — ২১৮১৫ টন (১৯৯১)। বনাঞ্চল — ০.৬১ মিলিয়ন হেক্টর। শিল্প — চিনি, সিমেন্ট, রং, সিগারেট। সাক্ষরতা — ২৫ শতাংশ (১৯৯২)।

ইকোয়েডর ২১ডিসেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — কুইটো। জনসংখ্যা — ১১.৭ মিলিয়ন (১৯৯৬)। মাথাপিছু জাতীয় বার্ষিক আয় (ডলারে) — ১,৩১০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৭৬৪ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তরে কলোম্বিয়া, দক্ষিণ-পূর্বে পেরু, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর। আয়তন — ১০৯,৪৮৩ বর্গমাইল। মুদ্রা — SUCRE (ECS)। সরকারী ভাষা — স্পেনীয়। অন্যান্য — কুয়েচুয়ান, জিভারন। বিদ্যুৎ — ৮,৩২৬ মেগাওয়াট। খনিজতেল — ১,৪১,১৫১,০০০ ব্যারেল (১৯৯৫)। গ্যাস — ৬,২৮৪,৯০০ ব্যারেল (১৯৯৫)। খনিজ সম্পদ — রূপা, সোনা, তামা, জিংক, কয়লা, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ। কৃষি — ধান, কলা, কোক, কফি, গব, আলু, ভুট্টা, আখ। প্রাণীজ সম্পদ — গরু, ভেড়া, শূকর, ছাগল। বনাঞ্চল — ১১.৮ মিলিয়ন

হেক্টর (১৯৮৮)। মৎস্য — ৪৯৮.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয় (১৯৯৩)। শিল্প — সিমেন্ট, চিনি, কয়লা, তামা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। সাক্ষরতা — প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

ইজিপ্ট ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — কায়রো। জনসংখ্যা — ৬০.২৪ মিলিয়ন (১৯৯৬)। জাতীয় মাথাপিছু বার্ষিক আয় (ডলারে) — ৭১০ (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৬১১ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পূর্বে ইজরায়েল, আরবের খড়ি এবং লোহিত সাগর, দক্ষিণে সুদান, পশ্চিমে লিবিয়া। আয়তন — ৯৯৭,৭৩৯ বর্গ কিলোমিটার। সরকারী ভাষা — আরবী। অন্যান্য — ফারসী এবং ইংরাজী। মুদ্রা — ইজিপ্টিয় পাউন্ড (EGP)। বিদ্যুৎ — ৪৮,৬০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট (১৯৯৩-৯৪)। গ্যাস — অনুমানিক ২১,০০০,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসসমূহ আছে (১৯৯৫)। খনিজ — ফসফেট, লোহা, স্টেট, ক্যওলিন। কৃষি — যব, মটর, কলাই, কার্পাস, রসুন, ভুট্টা, পিঁয়াজ, আখ, সুগার বিট, স্ট্রবেরি, গম। প্রাণী সম্পদ — গবাদি পশু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট, শূকর। বনাঞ্চল — ২.২৫ মিলিয়ন বর্গমিটার। মৎস্য — ৩০৭,৫১৬ টন। শিল্প — চিনি শিল্প, তামাক, বস্ত্র, সালফিউরিক অ্যাসিড, কাগজ, সার, ইস্পাত, মোটরযান। সাক্ষরতা — ৫২ শতাংশ (১৯৯৬)।

এল-সালভাডোর ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — সান্ সালভাদোর। জনসংখ্যা — ৫.০৫ মিলিয়ন (১৯৯২)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৫৭৬ ও জনসংখ্যায় বিশ্বে স্থান — ১১৫ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তর-পূর্বে গুয়াতোমালা, উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে হন্ডুরাস ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর। মোট ভূখণ্ড — ২১,০৪১ বর্গ কি.মি.। জাতীয় ভাষা- — স্প্যানিশ। মুদ্রা — কোলোন (SVC)। খনিজ — লবণ, লাইমষ্টোন, জিপসাম। কৃষি — কফি, তুলাবীজ, মেজ, ধান, চাল, আখ। প্রাণীজ সম্পদ — ছাগল, শূকর, গরু। শিল্প — পেট্রোলিয়াম, জ্বালানী তেল, কাগজ। সাক্ষরতার হার — ৭৫% (১৯৯২)।

ইকোয়েটেরিয়াস গিনি ১২ নভেম্বর ১৯৬৮

রাজধানী - মালাবো। জনসংখ্যা — ৪,২০,০০০ (১৯৯২) । জাতীয় বার্ষিক আয় মাথাপিছু — ৪৩০ ডলারে (১৯৯৩)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৪৬১ ও বিশ্বে স্থান — ১৩১ (১৯৯৩) । পরিসীমা — উত্তরে ক্যামেরুন, পূর্বে ও দক্ষিণে গাবোন এবং পশ্চিমে গিনি উপসাগর। মোট ভূখণ্ড — ২৮,০৫১ বর্গ কি.মি.। জাতীয় ভাষা — স্প্যানিশ। সরকারী ভাষা — স্পেনীয়। অন্যান্য - ফার, বুবি। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক (CFA) । জাতিসত্তা - ফ্যাঙ (৮৫%) ও বুবি প্রভৃতি। খনিজ — সোনা। কৃষি — কোকো, কফি, পাম তেল, কলা। শিল্প — খাদ্য পদ্ধতিকরণ (Food Procussing) ও টিম্বার প্রসেসিং। সাক্ষরতার হার — ৫০% (১৯৯০)।

এরিট্রেইয়া ২৮ মে ১৯৯৩

রাজধানী — আসমারা। জনসংখ্যা — ৩.৫৩ মিলিয়ন (১৯৯৪)। জাতীয় বার্ষিক আয় —

৭৭ ডলার (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তর-পূর্বে লোহিতসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে জিবৌতি, দক্ষিণে ইথিওপিয়া এবং পশ্চিমে সুদান। মোট ভূখণ্ড — ৯৩,৬৭৯ বর্গ কি.মি.। শহরবাসী — ২০% । সরকারী ভাষা — আরবী ও তিগ্রিনিয়া। মুদ্রা — ইথিওপিয়ার মুদ্রা । খনিজ — সোনা, রূপা, তামা, দস্তা, নিকেল, সালফার। কৃষি — সোরঘাম। প্রাণীসম্পদ — ছাগল, ও উট। শিল্প — ফুড প্রসেসিং বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, তেল। সাক্ষরতার হার — ২০% (১৯৯৪)

এস্তোনিয়া ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

রাজধানী — তাল্লিন। জনসংখ্যা — ১.৬ মিলিয়ান (১৯৯২)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৭৪৯ ও ৬৮ (১৯৯৩)। বার্ষিক জাতীয় আয় মাথাপিছু — ২৮২০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে ও উত্তরে বাল্টিক সাগর, পূর্বে রাশিয়া ও দক্ষিণে নোতভিয়া। মোট ভূখণ্ড — ৪৫,১০০ কি.মি.। সরকারী ভাষা — এস্তোনীয়। অন্যান্য — রুশ, উক্রেনীয়, বেলারুশী। জাতিসত্তা — এস্তোনীয় ৬১.৫%, রুশ ৩০.৩%, ইউক্রেনীয় ৩.১%, বেলারুশী ১.৮% ও ফিন ১.১% । মুদ্রা — ক্রুন (EKR)। খনিজ — ফসফোরাইট ও সুপার ফসফেট। কৃষি — গম, রাই, যব, আলু। শিল্প — ইস্পাত, টিম্বার, সিমেন্ট, হোসিয়ারী, চর্ম।

ইথিওপিয়া ১৩ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — আদ্দিস আবাবা। জনসংখ্যা — ৫৫ মিলিয়ন (১৯৯৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.২৩৭ ও ১৬৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু জাতীয় বার্ষিক আয় — ১৩০ ডলার পরিসীমা — উত্তর-পূর্বে ইরিগ্রিয়া, পূর্বে জিবৌতি ও সোমালিয়া, দক্ষিণে কেনিয়া এবং পশ্চিমে সুদান। মোট ভূখণ্ড — ১০,৯৮,০০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — আম্হারিক, অন্যান্য — টিগ্রে (সেমেট্রিক), গাল্লা (হেমেটিক)। মুদ্রা — রিব্ (ETB) । খনিজ — সোনা, সিমেন্ট, লবণ। কৃষি — কফি, তেফ্ (Eragrastis abyssinica) যব, গম, মেজ। শিল্প — প্রসেস্ড্ ফুড্ বয়ন এবং পানীয় শিল্প। ১৯৯২ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১.১৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট। সাক্ষরতার হার — ৬২.৫% (১৯৯০)।

ফিজি ১০ অক্টোবর ১৯৭০

রাজধানী — সুভা। জনসংখ্যা — ৮,০৩,৫০০ (১৯৯৬)। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৮৫৩ ও ৪৭ (১৯৯৩)। মাথপিছু বার্ষিক আয় — ২৩২০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ১৫° থেকে ২২° অক্ষাংশ ও ১৭৪° থেকে ১৭৭° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ৭,০৭৮ বর্গ কি.মি.। মুদ্রা — ফিজি ডলার। খনিজ — সোনা, রুপা । কৃষি — আখ, তামাক, চাল, কোকো। শিল্প — চিনি, নারিকেল তেল, সিগারেট, সাবান, বিয়ার। ১৯৯৪ সালে ৪৭৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। সাক্ষরতার হার — ৮৭% (১৯৯২)

ফিনল্যান্ড ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

রাজধানী — হেলসিঙ্কি। জনসংখ্যা — ৫.১২ মিলিয়ান। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে

স্থান — ০.৯৩৫ ও ৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৪,৪৭০ (১৯৯৫)। পরিসীমা — উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরে নরওয়ে, পূর্বে রাশিয়া, দক্ষিণে বাল্টিক সাগর ও পশ্চিমে বথনিয়া উপসাগর ও সুইডেন। মোট ভূখণ্ড — ৩,০৪,৫৯৩ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ফিনিশ, সুইডেন, অন্যান্য — ল্যাপিশ। মুদ্রা — মারক্কা (FIM)। খনিজ — দস্তা, তামা, নিকেল, ক্রোমিয়াম। কৃষি — রাই, যব, গম। শিল্প — বয়ন, খাদ্য পদ্ধতিকরণ, কাষ্ঠ, পেট্রোলিয়াম, ট্রান্সপোর্ট, গ্যাস। ১৯৯৪ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন — ০৬২,১৮০ মিলিয়ান কিলোওয়াট।

ফ্রান্স ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — প্যারিস। জনসংখ্যা — ৫৮ মিলিয়ান (১৯৯৫)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৯৩৫ ও ৭ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৩,৪৭০ ডলার। পরিসীমা — উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর-পূর্বে বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ, পূর্বে জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও ইতালি, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ-পশিমে স্পেন ও আন্দোরা এবং পশ্চিমে অ্যাটলান্টিক সাগর। মোট ভূখণ্ড — ৫,৪৩,৯৬৫ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ফরাসী। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক (FRF) খনিজ — কয়লা, লৌহ আকর, অ্যালুমনিয়াম, পটাশ, লবণ। কৃষি — গম, যব, রাই ওট, আলু, মেজ, চিনি, বীট। শিল্প — কেমিক্যাল শিল্প, বয়ন শিল্প, পাট শিল্প, চুন ও সিমেন্ট, চকোলেট, বিস্কুট, রেডিও, মোটরগাড়ী, টেলিভিশন, টায়ার। ১৯৯৪ সালে ৪,৫৪,৪৭৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে ২.৮ মিলিয়ন টন তেল উত্তোলন করা হয়েছে।

গ্যাবন ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — লিবেরভিল। জনসংখ্যা — ১.০১ মিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.৫৫৭ ও ১২৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩,৩৫০ ডলার (১৯৯৪) পরিসীমা — পশ্চিমে আটল্যান্টিক সাগর, উত্তরে ইকোয়টোরিয়াল গিনি ও ক্যামেরুন, পূর্বে ও দক্ষিণে কঙ্গো। মোট ভূখণ্ড — ২,৬৭,৬৬৭ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ফরাসী। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক (CFA)। খনিজ — ম্যাঙ্গনিজ, ইউরোনিয়াম। কৃষি — আখ, কলা, কোকো, বাদাম, পাম তেল, কফি, ধান। শিল্প — ফুড প্রসেসিং, টিম্বার প্রসেসিং। ১৯৯০ সালে ৯১৮ মিলিয়ান কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে ৩,৪৪,০০০ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়েছে। সাক্ষরতার হার ৬০.৭% (১৯৯০)।

গাম্বিয়া ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

রাজধানী — বাঞ্জুল। জনসংখ্যা — ৯.০৯ মিলিয়ান (১৯৯৫)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বে স্থান — ০.২৯২ ও ১৬২ (১৯৯৩)। বার্ষিক মাথাপিছু আয় — ৩৬০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে আটলান্টিক সাগর এবং পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে সেনেগাল। মোট ভূখণ্ড — ১০,৬৮৯ বর্গ কি.মি., ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — ডালাসি (GMD)। খনিজ — ইল্‌মেনাইট, জারবান, রুটাইল। কৃষি — বাদাম, তুলা। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন — ৫৯.৫ মিলিয়ান কিলোওয়াট। সাক্ষরতার হার — ২৭.২% (১৯৯১)।

জর্জিয়া ৩১ জুলাই ১৯৯২

রাজধানী — বিলিসি। জনসংখ্যা — ৫ ৪৩ মিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ০.৬৪৫ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৫৮০ ডলার (১৯৯৩)। পরিসীমা — পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণে তুরস্ক, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান। মোট ভূখণ্ড — ৬৯,৭০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — জর্জিয়ান। মুদ্রা — লারি (GEL) । খনিজ — কয়লা, সোনা, অ্যাগেট, মার্বেল, আলবাস্টার, লোহা ও অন্যান্য আকরিক, টাংস্টেন, মার্কারি। কৃষি — সব্জী, বেরী, আঙুর, আলু। শিল্প — ধাতুশিল্প, মোটর কারখানা, কাঠশিল্প, বয়নশিল্প, রেশমশিল্প। ১৯৯৩ সালে ৯,৭০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে এবং ০.২ মিলিয়ান টন তৈল নিষ্কাশন করা হয়েছে।

জার্মানি ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

রাজধানী — বার্লিন। জনসংখ্যা — ৮১.৫ মিলিয়ান (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৯২০ (১৯৯৩)। বার্ষিক মাথাপিছু আয় — ২৫,৫৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে ডেনমার্ক, উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগর, পূর্বে পোল্যান্ড, পূর্বে ও দক্ষিণে সুইজারল্যান্ড এবং পশ্চিমে ফ্রান্স, লুক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড। মোট ভূখণ্ড — ৩,৫৬,৯৭৮ বর্গ কি.মি.। ভাষা — জার্মান। মুদ্রা — ডয়েচ্ মার্ক (DEM)। খনিজ — কয়লা, লৌহ আকর, লিগনাইট। কৃষি — গম, রাই, যব, ওট, মেজ আলু, চিনি-বীট। শিল্প — সিমেন্ট, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, সার, প্লাস্টিক, বস্ত্র, ফ্রিজ, গাড়ী, কাগজ। ১৯৯৪ সালে ৪৫,২৯,৩১,০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ও ২.৯৩ মিলিয়ান টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

ঘানা ৮ মে ১৯৫৭

রাজধানী — আক্রা। জনসংখ্যা — ১৬.৪৭ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৪৬৭ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৪৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে আইভরি কোস্ট উত্তরে বুরকিনা ফাসো, পূর্বে তোগো এবং দক্ষিণে গিনি উপসাগর। মোট ভূখণ্ড — ৯২,০৯৯ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — সেদি (GHC)। খনিজ — হীরা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, সোনা। কৃষি — মেজ, ধান, মিলেট, কলা। শিল্প — অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতি। ১৯৯০ সালে ৫,৮০১ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত।

গ্রীস ২৫ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — এথেন্স। জনসংখ্যা — ১০.৪ মিলিয়ন (১৯৪৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৯০৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৭,৭১০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে আলবেনিয়া, ম্যাসেডোনিয়া ও বুলগেরিয়া, পূর্বে তুরস্ক ও ঈজিয়ান সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিমে আইয়েনিয়ান সাগর। মোট ভূখণ্ড — ৯,৩১,৯৫৭ বর্গ কিমি। ভাষা — গ্রীক। মুদ্রা — দ্রাঘমা। খনিজ — লোহা, বক্সাইট, নিকেল, অ্যাস্বেসটস্, ক্রোমাইট, কয়লা। কৃষি — গম, রাই, তামাক, তুলাবীজ, অলিভ তেল। শিল্প — ফ্রুটজুস্, বীয়ার, বস্ত্রশিল্প, চামড়া, জুতো, কাগজ, সবান কেমিক্যাল, কাঁচ। ১৯৯৩ সালে ৯১,৫০,১৫৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ও ১৯৯২ সালে ৫০,০৮,৩৬৮ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়।

গ্রেনেডা ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
রাজধানী — সেন্ট জর্জেস। জনসংখ্যা — ৯৬০০০ (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৭২৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,৩০৪ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উইন্ডওয়াড আইল্যান্ডের সর্বাপেক্ষা দক্ষিণ অবস্থানে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ৩১১ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — ইষ্টার্ণ ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD) । কৃষি — কোকো, কলা, আখ, তুলা, কফি। ১৯৯১ সালে ৫৯.৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত। সাক্ষরতার হার — ৯৫% (১৯৯৫)।

গুয়াতেমালা ২১ নভেম্বর ১৯৪৫
রাজধানী — গুয়াতেমালা সিটি। জনসংখ্যা — ১০.৬২ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৫৮০ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,১৯০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে ও পশ্চিমে মেক্সিকো, দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্বে এল সালভাদর, হন্ডুরাস ও বেলিজ। মোট ভূখণ্ড — ১,০৮,৮৮৯ বর্গ কি.মি.। ভাষা — স্প্যানিশ। অন্যান্য — মায়া ভাষাসমূহ। খনিজ — সোনা, রুপা, নিকেল। কৃষি — কফি, কলা, তুলা, রাবার। শিল্প — চিনি, প্লাস্টিক, ধাতব আসবাবপত্র। ১৯৯৪ সালে ৬৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত ও ১৯৯২ সালে ৩৬.২ মিলিয়ন ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয় । সাক্ষরতা — ৫৫.১% (১৯৯০)।

গুয়েনা-বিসাত/গিনি-বিসাউ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
রাজধানী — বিসাউ। জনসংখ্যা — ১.০৬ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.২৯৭। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে সেনেগাল, পশ্চিমে আটলান্টিক সাগর এবং দক্ষিণে ও পূর্বে গিনি। ভাষা — পর্তুগীজ। অন্যান্য — ক্রিউলো। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক (CFA)। খনিজ — বক্সাইট, ফস্ফেট। কৃষি — বাদাম, আখ, কলা নারিকেল, ধান, পাম তেল, মেজ। ১৯৮৬ সালে ২৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৬৪% (১৯৯০)।

গায়ানা ২০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
রাজধানী — জর্জটাউন। জনসংখ্যা — ৭,৩০,০০০ (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৬৩৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৫৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পূর্বে সুরিনাম, পশ্চিমে ভেনেজুয়েলা, দক্ষিণে ও পশ্চিমে ব্রাজিল। মোট ভূখণ্ড — ২,১৪,৯৬৯ বর্গ কিমি। ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — গায়ানা ডলার (GYD)। খনিজ — সোনা, তামা, লোহা, টাংস্টেন, নিকেল, বক্সাইট। কৃষি — চিনি, চাল, কফি, কোকো, নারিকেল, ভোজ্য তেল, তামাক। শিল্প — অ্যাগ্রো প্রসেসিং (চিনি, ধান, কাঠ, নারিকেল)। ১৯৮৬ সালে ৫০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

হাইতি ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫
রাজধানী — পোর্ট-অ-প্রিন্স। জনসংখ্যা — ৬.৭৬ মিলিয়ন (১৯৯২)। বৃদ্ধির হার — ০.৩৫৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩২০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পূর্বে

ডোমিনিকান রিপাব্লিক, অন্য তিন দিকেই ক্যাবিবিয়ান সাগর। মোট ভূখণ্ড — ২৭,৭৫০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ফরাসী ও ক্রিওল। মুদ্রা — গুর্দে (HTG)। কৃষি — চিনি, কফি, ধান, মেজ, মিলেট, বীন, কোকো, তুলা, কলা। শিল্প — খেলনা, খেলার জিনিষপত্র, বস্ত্র, ইস্পাত, সাবান, জুতা, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট। ১৯৯০-৯১ সালে ৪৯১ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

হন্ডুরাস ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — তেগুসিগালপা। জনসংখ্যা — ৫ ২৯ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৫৭৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৫৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর, দক্ষিণ-পূর্বে নিকারাগুয়া, পশ্চিমে গুয়াতেমালা, দক্ষিণ-পশ্চিমে এল সালভাদর ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর। মোট ভূখণ্ড — ১,১২,০৮৮ বর্গ কি.মি.। ভাষা — স্পানিশ। মুদ্রা — লেম্পিরা (HNL)। খনিজ — সীসা, দস্তা, রূপা, সোনা, টিন, লোহা, তামা কয়লা, অ্যান্টিমনি। কৃষি — কলা, কফি, মেজ। শিল্প — সিমেন্ট, বীয়ার। ১৯৯৪ সালে ২,৩০৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৭২.১% (১৯৯১)।

হাঙ্গেরি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

রাজধানী — বুদাপেস্ত। জনসংখ্যা — ১০.২১ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৮৫৫ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩,৮৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে স্লোভাকিয়া, উত্তর পূর্বে উক্রাইন, পূর্বে রোমানিয়া, দক্ষিণে ক্রোয়েশিয়া ও যুগোস্লাভিয়া এবং পশ্চিমে অষ্ট্রিয়া। মোট ভূখণ্ড — ৯৩,০৩২ বর্গ কি.মি.। ভাষা — হাঙ্গেরিয়ান। মুদ্রা — ফোরিন্ট (HUF)। খনিজ — লিগনাইট, কয়লা, বক্সাইট। কৃষি — গম, যব, মেজ, সূর্যমুখীর বীজ, চিনি-বীট, রাই, ওট, আলু। শিল্প — ইস্পাত, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাষ্টিক, অ্যান্টিবায়োটিক, বাস, টিভি, ফ্রিজ। ১৯৯১ সালে ৬,৪০৩ মিলিয়ন ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫ সালে ১৬,৬৬,৯০০ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

আইসল্যান্ড ১৯শে নভেম্বর ১৯৯৬

রাজধানী — রিকইয়াভিক। জনসংখ্যা — ২,৬৭,৮০৬ (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৯৩৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৬,৩৪০ ডলার (১৯৯৫)। পরিসীমা — উত্তর আটলান্টিকের একটি দ্বীপরাষ্ট্র। মোট ভূখণ্ড — ১,০৩,০০০ বর্গ কি.মি., ভাষা — আইস্‌ল্যান্ডিক্। মুদ্রা — ক্রোনার। কৃষি — আলু। শিল্প — সার, সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়াম। ১৯৯৩ সালে ১০,৪৮,৯৩২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত।

ভারত ৩০শে অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — নিউ দিল্লী। জনসংখ্যা — ৯১৩.২ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৪৩৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩১০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তরে চীন, তিব্বত, নেপাল ও ভুটান, পূর্বে বার্মা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগর। মোট ভূখণ্ড — ৩১,৬৫,৫৯৬ বর্গ কি.মি. । ভাষা — হিন্দি।

অন্যান্য — অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, সংস্কৃত, উর্দু, নেপালী, মনিপুরী, মালায়ালাম, কন্নড়, কাশ্মিরী। মুদ্রা — রুপিয়া (INR), খনিজ — সোনা, রূপা, তামা, লোহা, দস্তা, সীসা, বক্সাইট, ক্রোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ। কৃষি — গম, ধান, পাট, তুলা, মেজ, তৈলবীজ। শিল্প — নিউক্লিয়ার, পেট্রোলিয়াম, মোটরগাড়ী, রেলইঞ্জিন, রাসায়নিক, বস্ত্র, পাট, ওষুধ, মেশিনারী, প্ল্যাস্টিক, কাগজ, সার। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৩,০,০৮৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত ও ৩৫.২ মিলিয়ন টন তৈল নিষ্কাশিত হয়।

ইন্দোনেশিয়া ২৮সেপ্টেম্বর ১৯৫০

রাজধানী — জাকার্তা। জনসংখ্যা — ১৯১.৩৬ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৬৪১ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৮৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ভারত মহাসাগরের ১৭৫০৮ টি দ্বীপের সম্মিলিত রাষ্ট্র। মোট ভূখণ্ড — ১৯,১৯,৮৮৩ বর্গ কি.মি.। ভাষা — বাহাসা ইন্দোনেসিয়া। অন্যান্য - ডাচ। মুদ্রা — রুপিয়া (IDR)। খনিজ — কয়লা, তামা, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, রূপা, সোনা। কৃষি — ধান, মেজ, আলু, আখ, নারিকেল, রবার, কফি, বাদাম, সব্জী, ফল, চা, তামাক। শিল্প — সিমেন্ট, সার, মোটরগাড়ী, কেমিক্যাল। ১৯৯১ সালে ৩৭,৭০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫ সালে ১৪,৭৬,০০০ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা — ৮৪% (১৯৯৬)।

ইরান ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — তেহেরান। জনসংখ্যা — ৬৩.২ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৭৫৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,১৯০ ডলার (১৯৯২)। পরিসীমা — উত্তরে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, কাস্পিয়ান সাগর ও তুর্কমেনিস্তান, পূর্বে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান, দক্ষিণে ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিমে ইরাক ও তুরস্ক। মোট ভূখণ্ড — ১৬,৪৮,০০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ফারসী। মুদ্রা — রিয়াল (IRR)। খনিজ — লোহা, কয়লা, দস্তা, সীসা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট। কৃষি — গম, ধান, যব, চিনি-বীট, তামাক। শিল্প — ভোজ্য তেল, চিনি, ইঁট, গাড়ী, সিমেন্ট, বাস লরি, ট্রাক। ১৯৯৪ সালে ৮২,০১৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫ সালে ৩৬,২৫,০০০ ব্যারেল তেল প্রতিদিন নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা — ৮০.৬% (১৯৯১) পুরুষ ও মহিলা ৬৭.১% (১৯৯১)

ইরাক ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — বাগদাদ। জনসংখ্যা — ১৯.৪১ মিলিয়ন (১৯৯৩)। বৃদ্ধির হার — ০.৫৯৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,১৪০ ডলার (১৯৮৬) পরিসীমা — উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে ইরান, দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে কুয়েত ও সৌদি আরব এবং পশ্চিমে জর্ডন ও সিরিয়া। মোট ভূখণ্ড — ৪,৩৮,৩১৭ বর্গ কি.মি.। ভাষা — আরবী। মুদ্রা — ইরাকী দিনার (IQD)। কৃষি — গম, যব। ১৯৯৫ সালে প্রতিদিন তেল নিষ্কাশিত হয়েছে। সাক্ষরতা — ৬২.৫% (১৯৯২)।

আয়ারল্যান্ড (১৯৯৬) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫
রাজধানী — ডাবলিন। জনসংখ্যা — ৩.৬২ মিলিয়ন। বৃদ্ধির হার — ০.৯১৯ (১৯৯৩) মাথাপপিছু বার্ষিক আয় — ১৩,৬৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — আটলান্টিক সাগরে অবস্থিত আযারল্যান্ডের পূর্বদিকে আইরিশ সাগর দ্বারা গ্রেট ব্রিটেন থেকে পৃথকীকৃত এবং উত্তর-পূর্বে নর্দান-আয়ারল্যান্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভাষা — আইরিশ ও ইংরাজী। মুদ্রা — আইরিশ পাউন্ড (IEP)। খনিজ — দস্তা, সীসা, জিপসাম, রূপা, ডলোমাইট, সোনা। কৃষি — গম, ওট, যব, আলু, চিনি-বীট। শিল্প — মেশিনারি, রাসায়নিক, ফুড প্রসেসিং, বস্ত্র, কাঠ, ডেয়ারী। ১৯৯৫ সালে ৪,১৫৯ মিলিয়ন ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

ইজরায়েল ১১ মে ১৯৪৯
রাজধানী — জেরুজালেম। জনসংখ্যা — ৫.৭১ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৯০৮। মাথাপিছু আয় — ২৪,৪১০ ডলার (১৯৯৪)। মোট ভূখণ্ড — ২১,৯৪৬ বর্গ কি.মি.। ভাষা — হিব্রু ও আরবী। মুদ্রা — শেকেল (ILS)। খনিজ — পটাশ, ব্রোমিন ও অন্যান্য লবণ। কৃষি — গম, বার্লি, মেজ, আলু, টম্যাটো, তুলা। শিল্প — কেমিক্যাল, চর্ম, কাগজ, প্লাষ্টিক, বস্ত্র, টায়ার, কাঁচ। ১৯৯৫ সালে ৩৯,৪২৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

ইটালি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫
রাজধানী — রোম। জনসংখ্যা — ৫৭.২৫ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৯১৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৯,২৭০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে সুইজারল্যান্ড ও অষ্ট্রিয়া, পূর্বে স্লোভানিয়া ও আড্রিয়াটিক সাগর, দক্ষিণ-পূর্বে আইয়োনিয়ান সাগব, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে তিরেনিয়ান সাগর এবং লিগুরিয়ান সাগর এবং পশ্চিমে ফ্রান্স। মোট ভূখণ্ড — ৩১,৩০৮ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইতালিয়ান। মুদ্রা — লিরা (ITL)। খনিজ — সিমেন্ট, দস্তা, সীসা, সালফার, ফেল্ডস্পার, বেটোলাইট। কৃষি — চিনি-বীট, গম, মেজ, যব, টম্যাটো, ওট, অলিভ তেল, বাই তামাক। শিল্প — ইস্পাত, মোটরগাড়ী, সিমেন্ট, রেজিন। ১৯৯৪ সালে ২,৩১,৮০৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫ সালে ৫২,০৭,৯৮০ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

জামাইকা ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
রাজধানী — কিংসটন। জনসংখ্যা — ২.৫ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৭৩৬ (১৯৯৫)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৪২০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — কিউবার ১৫০ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র। মোট ভূখণ্ড — ১১ ৪২৫ বর্গ কি.মি.। মুদ্রা — জামাইকান ডলার (JMD)। খনিজ — বক্সাইট, জিপসাম, মার্বেল। কৃষি — আখ, কলা, নারিকেল। শিল্প — চিনি, গুড়, আটা, সার, কাঁচ, সিমেন্ট, সিগারেট। ১৯৯৫ সালে ২,৪১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

জাপান ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৬

রাজধানী — টোকিও। জনসংখ্যা — ১২৫.৫৭ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০ ৯৩৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩৪,৬৩০ ডলার (১৯৯৪)। মোট ভূখণ্ড — ৩,৭৭,৮১২ বর্গ কিমি। ভাষা — জাপানী। মুদ্রা — ইয়েন (JPY)। খনিজ — কয়লা, লোহা, দস্তা, তামা, সীসা, রূপা, সোনা। কৃষি — ধান, যব, গম, সয়াবীন, আখ, চিনি, বীট। শিল্প — টিভি, রেডিও, ক্যামেরা, ইস্পাত, কেমিক্যাল, কাগজ, বস্ত্র, রেশম, জাহাজ নির্মাণ। ১৯৯৩ সালে ৯,০৬,৭০৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয। ১৯৯৩ সালে ৯,১১,০০০ কিলোলিটার তেল নিষ্কাশিত হয়।

জর্ডন ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

রাজধানী — আম্মান। জনসংখ্যা — ৪.১ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৭৪১ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৪৯০ ডলার (১৯৯৫)। পরিসীমা — উত্তবে সিরিয়া, পূর্বে ইরাক, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণে সৌদি আরব এবং পশ্চিমে ইজরায়েল। মোট ভূখণ্ড — ৯১,৮৬০ বর্গ কিমি। ভাষা — আরবি। মুদ্রা — জর্ডন দিনার (JOD)। খনিজ — ফসফেট, পটাশ। কৃষি — গম, যব, মেজ, তামাক, টম্যাটো, আলু, অলিভ, আঙ্গুর। শিল্প — অ্যালকোহলিক পানীয়, ফসফেট। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, সিমেন্ট, পটাশ, কেমিক্যাল, সার। ১৯৯৪ সালে ৫,০৭৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

কাজাকিস্তান/কাজাখস্তান ২ মে ১৯৯২

রাজধানী — আক্‌মলা। জনসংখ্যা — ১৬.৫ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৭৪৮০ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,১১০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে উজবেকিস্তান ও কির্গিজস্তান, পূর্বে চীন ও পশ্চিমে কাস্পিয়ন সাগর ও রাশিয়া। মোট ভূখণ্ড — ২৭,১৭,৩০০ বর্গ কিমি। ভাষা — কাজাখ। মুদ্রা — তেঙ্গে। খনিজ — কয়লা, বক্সাইট, ক্রোমিয়াম, তামা, সীসা, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, মলিবডেনাম, দস্তা, টাংস্টেন। কৃষি — ধান, গম, চিনি-বীট, আলু, সব্‌জী। শিল্প — ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতুশিল্প, সার, কাগজ, সিমেন্ট, কেমিক্যাল, চর্মশিল্প, টিভি, ট্রাক্টর, ফ্রিজ। ১৯৯৫ সালে ৬৬,৭০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার তেল নিষ্কাশিত।

কেনিয়া ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৩

রাজধানী — নাইরোবি। জনসংখ্যা — ২৬.৪৪ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৪৭৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৬০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে সুদান ও ইথিওপিয়া, পশ্চিমে উগান্ডা, দক্ষিণে তানজানিয়া ও পূর্বে সোমালিয়া ও ভারত মহাসাগর। মোট ভূখণ্ড — ৫,৮২,৬৪৬ বর্গ কিমি। ভাষা — সোয়াহিলি। অন্যান্য — ইংরাজী, কিকুয়ু, লুহিয়া, লুত্ত, কাম্বা, কালেঞ্জিন, গুসিই, মেরু, মিজিকেন্দা। মুদ্রা — কেনিয়া শিলিং (KES)। খনিজ — লবণ, সোডা অ্যাশ, ফ্লুওরস্পার, সোনা, গার্নেট। কৃষি — মেজ, গম, ধান, যব, মিলেট, আখ, কফি, তামাক, চা, সব্‌জী। শিল্প — বস্ত্র, কেমিক্যাল, জুতা, তামাক, ফুড প্রসেসিং। ১৯৯৪ সালে ৮০৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৭০.৫%

কুয়েত ১৪ মে ১৯৬৩
রাজধানী — কুয়েত। জনসংখ্যা — ২.০২ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৮৩৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৯,০৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পূর্বে পারস্য উপসাগর, উত্তরে ও পশ্চিমে ইরাক, এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌদি আরব। মোট ভূখণ্ড — ১৭,৮১৮ বর্গ কিমি। ভাষা — আরবি। অন্যান্য — ইংরাজী। মুদ্রা — কুয়েতী দিনার (KWD)। কৃষি — পেঁয়াজ, তরমুজ, টম্যাটো। শিল্প — তৈলশিল্প, নৌকা তৈরী, মাছ ধরা, ফুড প্রসেসিং, পেট্রোকেমিক্যাল, গ্যাস, কনস্ট্রাক্‌শন। ১৯৯৩ সালে ২০,১৭৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত। ১৯৯৫ সালে ২০,২৯,০০০ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত।

কিরগিজিস্তান ২ মে ১৯৯২
রাজধানী — বিশ্‌কেক্‌। জনসংখ্যা — ৪.৪৬ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৬৬৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৬১০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পূর্বে চীন, পশ্চিমে কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তান, উত্তরে কাজাখস্তান ও দক্ষিণে তাজিকিস্তান। মোট ভূখণ্ড — ১,৯৯,৯০০ বর্গ কিমি। ভাষা — কিরগিজ্‌। অন্যান্য — রাশিয়ান। মুদ্রা — সোম (KGS)। খনিজ — কয়লা। কৃষি — গম, চিনি-বীট, তামার, ভেষজ গাছ, ধান। শিল্প — সিমেন্ট, জুতা, লরি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন। ১৯৯৩ সালে ১১,১০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

লাও পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫
রাজধানী — ভিয়েনতিয়েন। জনসংখ্যা — ৪.৫৮ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৪০০ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩২০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে চীন, পূর্বে ভিয়েতনাম, দক্ষিণে কাম্বোডিয়া এবং পশ্চিমে থাইল্যান্ড ও বার্মা। মোট ভূখণ্ড — ২,৩৬,৮০০ বর্গ কিমি। ভাষা — লাও। অন্যান্য — ফরাসী, ইংরাজী। মুদ্রা — কিপ (LAK)। খনিজ — কয়লা, টিন, জিপ্‌সাম। কৃষি — ধান, তামাক, কফি, আলু, মেজ, তুলাবীজ, আখ, সয়াবীন, চা, আফিম। শিল্প — লোহা, অক্সিজেন, সিগারেট, বীয়ার, পানীয়, প্লাষ্টিক। ১৯৯৬ সালে ২,১৭,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা ৬৭% (১৯৯৬)।

লাটভিয়া ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
রাজধানী — রিগা। জনসংখ্যা — ২.৪৯ মিলিয়ন (১৯৯৬), বৃদ্ধির হার — ০.৮২০ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,২৯০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে এস্তোনিয়া ও বাল্টিক সাগর, পশ্চিমে বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে লিথুয়ানিয়া ও বেলারুশ এবং পূর্বে রাশিয়া। ভাষা — লাতভীয়া। মুদ্রা — লাত্‌স্‌ (LVL)। মোট ভূখণ্ড — ৬৪,৬০০ বর্গ কি.মি.। খনিজ — অ্যাম্বার, জিপসাম। কৃষি — গম, চিনি-বীট, রাই, আলু, সব্‌জী। শিল্প — উল, কাগজ, কাঠ, সার, গাড়ী। ১৯৯৫ সালে ৩,৯৪২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

লেবানন ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫
রাজধানী — বেইরুট। জনসংখ্যা — ২.৮৪ মিলিয়ন (১৯৯২)। বৃদ্ধির হার — ০.৬৬৪ (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তরে ও পূর্বে সিরিয়া, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণে ইজরায়েল। মোট ভূখণ্ড — ১০,৪৫২ বর্গ কি মি। ভাষা — আরবি। অন্যান্য — ইংরাজী, ফরাসী। মুদ্রা — লেবানিজ পাউন্ড (LBP)। কৃষি — গম, চিনি-বীট, অলিভ, কলা, আলু, আপেল, আঙ্গুর। শিল্প — ফুড প্রসেসিং। ১৯৯৫ সালে ৯,৮৫৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

লেসাথো ১৭ অক্টোবর ১৯৬৬
রাজধানী — মাসেরু। জনসংখ্যা — ২.১১ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার ০.৪৬৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৭০০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। মোট ভূখণ্ড — ৩০,৩৫৫ বর্গ কিমি। ভাষা — সেসোথো ও ইংরাজী। মুদ্রা লোতি (LSL)। খনিজ — হীরা। কৃষি — গম, মেজ, বীন, সব্জী। ১৯৮৫ সালে ১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা - ২৬.৪% (১৯৯৫)।

লাইবেরিয়া ২ নভেম্বর ১৯৪৫
রাজধানী — মনরোভিয়া। জনসংখ্যা — ২.৮৩ মিলিয়ন (১৯৯২)। বৃদ্ধির হার — ০.৩১১ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৪৪০ ডলার (১৯৮০)। পরিসীমা — উত্তর-পশ্চিমে সিয়েরা লিওন, উত্তরে গিনি, পূর্বে আইভারি কোষ্ট ও দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিক সাগর। মোট ভূখণ্ড -- ৯৯,০৬৭ বর্গ কিমি। ভাষা — ইংরাজী। অন্যান্য — মান্ডে, পশ্চিমী আটলান্টিক, কোয়া। মুদ্রা — লাইবেরিয়ান ডলার (LRD)। খনিজ — লোহা, সোনা, হীরা। কৃষি — কফি, কোকো, আখ, ধান। ১৯৮৬ সালে ৬৫৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

লাইবিয়ান আরব জামাহিরিয়া ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫
রাজধানী — ত্রিপোলি। জনসংখ্যা — ৫.৫৯ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৭৯২ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৫,৪১০ ডলার (১৯৮৮)। পরিসীমা — উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে মিশর ও সুদান, দক্ষিণে চাদ ও নাইগার এবং পশ্চিমে আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়া। মোট ভূখণ্ড — ১৭,৫৯,৫৪০ বর্গ কি.মি.। ভাষা --- আরবি। মুদ্রা — লিবিয়ান দিনা (LYD)। খনিজ — সিমেন্ট, জিপসাম, লোহা। কৃষি — গম, যব, অলিভ। শিল্প — ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, বস্ত্র, বয়ন, জুতো, চর্ম, ফুড প্রসেসিং। ১৯৮৬ সালে ২,১২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫ সালে ১৪,২৬,০০০ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়।

লিচিয়েন্তান ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
রাজধানী — ভাদুজ্। জনসংখ্যা — ৩০,৯২৩ (১৯৯৫)। পরিসীমা — পূর্বে অষ্ট্রিয়া, পশ্চিমে সুইজারল্যান্ড। মোট ভূখণ্ড — ১৬০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — জার্মান। মুদ্রা — সুইস মুদ্রা।

শিল্প — বস্ত্র, কাঁচ, ইস্পাত, ক্যানড্ ফুড, ঔষধ। ১৯৯৫ সালে ৬৪,৮৫৪,০০০ কিলো ওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

লিথিয়েনিয়া/লিথুয়ানিয়া ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

রাজধানী — ভিলনিউস্। জনসংখ্যা — ৩ ৭১ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৭১৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৩৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে লাতভিয়া, পূর্বে ও দক্ষিণে বেলারুশ এবং পশ্চিমে পোল্যান্ড, রাশিয়া ও বাল্টিক সাগর। মোট ভূখণ্ড — ৬৫,৩০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — লিথুয়ানিয়ান। মুদ্রা — লিতাস্। কৃষি — গম, রাই, চিনি-বীট, সব্জী, আলু। শিল্প — ইস্পাত কেমিকাল, কাগজ, বস্ত্র, সার, রেশম, পশম, ফ্রিজ, টিভি, বাইসাইকেল। ১৯৯৩ সালে ১৪,১৩৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

লুক্সুমবার্গ/লুক্সেমবুর্গ ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — লুক্সেমবুর্গ। জনসংখ্যা — ৪,১২,৮০০ (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৮৯৫ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩৯,৮৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে বেলজিয়াম, দক্ষিণে ফ্রান্স, পূর্বে জার্মানি। মোট ভূখণ্ড — ২,৫৮৬ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ফরাসী, জার্মান ও লেৎজেবুর্গেশ। মুদ্রা — লুক্সেমবুর্গ ফ্রাঙ্ক (LUF)। খনিজ — লোহা। কৃষি — মেজ, ডাল। শিল্প — ইস্পাত। ১৯৯৪ সালে ১,১৬৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

মাদাগাসকার ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — আন্তানানারিভো। জনসংখ্যা — ১৩.৫ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৩৪৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এবং মোজাম্বিক চ্যানেল দ্বারা আফ্রিকা থেকে পৃথকীকৃত। মোট ভূখণ্ড — ৫,৮৭,০৪১ বর্গ কি.মি.। ভাষা — মালাগাসি। অন্যান্য — ফ্রেঞ্চ। মুদ্রা — মাগাসি ফ্রাঙ্ক (MGF)। খনিজ — গ্রাফাইট, ক্রোমাইট, অভ্র। কৃষি — ধান, কলা, আলু, আম, আখ, মেজ, কফি, তামাক, তুলাবীজ। শিল্প — কৃষিজাত দ্রব্য প্রসেসিং। ১৯৯৩ সালে ৪৮৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। দিনে ১২,০০০ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত করা হয়।

মালাউই ১ ডিসেম্বর ১৯৬৪

রাজধানী — লিলংওয়ে। জনসংখ্যা — ১১ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার ০.৩২১ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — আফ্রিকার মালাউই দ্বীপের দক্ষিণ এবং পশ্চিম তীরে অবস্থিত, উত্তরে তানজানিয়া, দক্ষিণে মোজাম্বিক ও পশ্চিমে জাম্বিয়া। মোট ভূখণ্ড — ১,১৮,৪৮৪ বর্গ কি.মি.। ভাষা — চিচেওয়া, ইংরাজী। মুদ্রা — কোয়াচা (MWK)। খনিজ — মার্বেল, কয়লা। কৃষি — মেজ, তামাক, আখ, চা। শিল্প — বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ও খনিজ পদার্থের প্রসেসিং। ১৯৯৫ সালে ৮৫৭.৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা ৪১.২% (১৯৯৩)।

মালয়েশিয়া ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

রাজধানী — কুয়ালালামপুর। জনসংখ্যা — ২১.৩ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৮২৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩,৮৯৯ ডলার (১৯৯৫)। পরিসীমা — মায়ল উপসাগরে দ্বীপগুলির সম্মিলিত রাষ্ট্র। উত্তরে থাইল্যান্ড, দক্ষিণে সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া, পূর্বে বোর্নিও, উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর পূর্বে দক্ষিণ চীন সাগর ও সুলু সাগর। মোট ভূখণ্ড — ৩,২৯,৭৫৮ বর্গ কি.মি.। ভাষা — বাহাসা মালয়েশীয়া। অন্যান্য — চীনা, তামিল ও ইরান। মুদ্রা — মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR)। খনিজ — বক্সাইট, লোহা, তামা, টিন। কৃষি — ধান, তামাক, কোকো, রবার, পাম তেল। শিল্প — বিভিন্ন পন্যসামগ্রী। ১৯৯৫ সালে ৪১,৯৬১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫ সালে ১১.৬৮ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

মালদ্বীপ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

রাজধানী — মালে। জনসংখ্যা — ২,৫৩,২৯৮ (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৬১০ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৯০০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সম্মিলিত দ্বীপপুঞ্জের একটি রাষ্ট্র। শ্রীলঙ্কার ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ২৯৮ বর্গ কিমি। ভাষা — দিভেহি। মুদ্রা — রুফিয়া (MVR)। কৃষি — নারিকেল, মেজ, রাঙালু, পেঁয়াজ, লঙ্কা। শিল্প — মাছ ধরা, পর্যটন, ল্যাকারিং, গহনা শিল্প। ১৯৯৪ সালে ৫১.৪৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

মাল্টা ১ ডিসেম্বর ১৯৬৪

রাজধানী — ভালেত্তা। জনসংখ্যা — ৩,৬০,০০০ (১৯৯২)। বৃদ্ধির হার — ০.৮৬৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৮,৮৮৪ ডলার (১৯৯৫)। পরিসীমা — সিসিলির ৯৩ কি.মি দক্ষিণে এবং টিউনিসিয়ার ২৮৮ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জের সম্মিলিত রাষ্ট্র। মোট ভূখণ্ড — ৩১৬ বর্গ কি.মি.। ভাষা — মাল্টিজ। অন্যান্য — ইংরাজী। মুদ্রা — মাল্টিজ লিরা (MTL)। কৃষি — আলু, টম্যাটো, পীচ, অ্যাপ্রিবাট, তরমুজ, বেরী তাল প্রভৃতি। শিল্প — খাদ্য, বস্ত্র, রাসায়নিক, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকদ্রব্য, জাহাজ নির্মাণ, পর্যটন। ১৯৯৫-৯৬ সালে ১,৬৫৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

মালি ২৮ সেপ্টম্বর ১৯৬০

রাজধানী — বামাকো। জনসংখ্যা — ৯.২ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.২২৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে সেনেগাল, উত্তর-পশ্চিমে মরিটানিয়া উত্তর-পূর্বে আলজিরিয়া, পূর্বে নাইগার এবং দক্ষিণে বুরাকিনা ফাসো, আইভরি কোষ্ট ও গিনি। মোট ভূখণ্ড - ১২,৪৮,৫৭৪ বর্গ কিমি। ভাষা — ফরাসী। অন্যান্য — বাম্বারা। মুদ্রা — ফাঙ্ক (CFA)। খনিজ — লোহা, ইউরেনিয়াম, হীরা, বক্সাইড, তামা, লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ। কৃষি — মিলেট, আখ, বাদাম, ধান, মেজ, তুলাবীজ, রাঙালু। শিল্প — ফুড প্রসেসিং, কটন প্রসেসিং, বস্ত্র শিল্প, সিমেন্ট, ঔষধশিল্প। ১৯৯২ সালে ২৬২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা ৩২% (১৯৯০)।

মার্শাল আইসল্যান্ড ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

রাজধানী — দালাপ-উলিগা-দারিত্। জনসংখ্যা — ৫৮,৫০০ (১৯৯৬)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৬৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — প্রশান্ত মহাসাগরে কিরিবাতির উত্তরে ও মাইক্রোনেসিয়ার পূর্বে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ১৮১ বর্গ কিমি। ভাষা — মার্শালিজ ও ইংরাজী। মুদ্রা — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাই প্রচলিত। খনিজ — উচ্চ মানের ফসফেট। কৃষি — নারিকেল, টম্যাটো।

মরিটেনিয়া ৭ অক্টোবর ১৯৬১

রাজধানী — নুয়াকচোট্। জনসংখ্যা — ২.৩৩ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৩৫৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৪৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে আটলান্টিক সাগর, উত্তর-পশ্চিমে সাহার, উত্তর-পূর্বে আলজেরিয়া, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে মালি এবং দক্ষিণে সেনেগাল। মোট ভূখণ্ড — ১০,৩০,৭০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — আরবী। অন্যান্য — ফরাসী, পুলার, সোনিনকে, ওলোফ। মুদ্রা — উগুইয়া (MRD)। খনিজ — তামা, সোনা, ফসফেট, জিপসাম, লোহা। কৃষি — মিলেট, মেজ, ধান, বাদাম। শিল্প — মাছ থেকে প্রস্তুত দ্রব্য, চীজ, মাখন। ১৯৯০ সালে ১২৯ মিলিয়ন·কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা - ৪০% (১৯৮৮-৮৯)।

মরিশাস ২৪ এপ্রিল ১৯৮৮

রাজধানী — পোর্ট লুইস। সংখ্যা — ১.১৩ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৮২৫ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩,১৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ভারত মহাসাগরে মাদাগাস্কারের ৮০০ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ২০৪০ বর্গ কিমি। ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — মরিশাস রূপী (MUR)। কৃষি - আখ, চা, তামাক, আলু, মেজ, পেঁয়াজ। শিল্প — বস্ত্র, চর্ম, হীরাকাটিং, গহনা, আসবাব। ঘড়ি, চশমা, রাসায়নিক দ্রব্য। ১৯৯৫ সালে ১,০৪৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

মেক্সিকো ৭ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — মেক্সিকো সিটি। জনসংখ্যা — ৯১.১২ মিলিয়ন। বৃদ্ধির হার — ০.৮৪৫ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৪,০১০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা -- উত্তরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে গুয়াতেমালা, বেলিজ ও ক্যারিবিয়ান সাগর এবং উত্তর পূর্বে মেক্সিকো উপসাগর। মোট ভূখণ্ড — ১৯,৬৭,১৮৩ বর্গ কি.মি.। ভাষা — স্প্যানিস। মুদ্রা — মেক্সিকান পেসো (MXP)। খনিজ — সীসা, তামা, দস্তা, রূপা, সোনা, কয়লা, জিপসাম। কৃষি — মেজ, বীন, গম, তুলাবীজ, যব, সয়া, ধান। শিল্প — পেট্রোল, সিমেন্ট, ইস্পাত, মোটরগাড়ী, লরি। ১৯৯৪ সালে ১,৩৭,৫২২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫ সালে একদিনে ২৬,১৭,০০০ ব্যারেল তৈল নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা - ৮৭.৩% (১৯৯০)।

মাইক্রোনেশিয়া ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
রাজধানী — পালিকির। জনসংখ্যা — ১,০৪,৭২৪ (১৯৯৪)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৮৯০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমভাগে ১৩৭° থেকে ১৬৩° পূর্বে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ৭০১ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাই প্রচলিত। কৃষি — কলা, মরিচ।

মোনাকো ২৮ মে ১৯৯৩
রাজধানী — মোনাকো। জনসংখ্যা — ২৯,৯৭২ (১৯৯০)। পরিসীমা — দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং বাকী তিন দিকেই ফ্রান্স। মোট ভূখণ্ড — ১৯৫ হেক্টর। ভাষা — ফরাসী। মুদ্রা — ফরাসী ফ্রাঙ্ক। শিল্প — রাসায়নিক দ্রব্য। প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কাগজ। ১৯৯৫ সালে ১১.৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

মঙ্গোলিয়া ২৭ অক্টোবর ১৯৬১
রাজধানী — উলান বাতোর। জনসংখ্যা — ২৩ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৫৭৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে রাশিয়া এবং পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিমে চীন। মোট ভূখণ্ড — ১৫,৬৬,৫০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — হাল মোঙ্গোল। মুদ্রা — তুগ্রিক (MNT)। খনিজ — তামা, নিকেল, দস্তা, মলিবডেনাম, টিন। কৃষি — গম, যব, আলু, সব্জী। ১৯৯৫ সালে, ২,০৫৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

মরক্কো ১২ নভেম্বর ১৯৫৬
রাজধানী — রাবাত। জনসংখ্যা — ২৬.১ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৫৩৪ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে আলজেরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে পশ্চিম সাহারা, উত্তর-পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগর। মোট ভূখণ্ড — ৪,৫৮,৭৩০ বর্গ কিমি। ভাষা — আরবী। অন্যান — ফরাসী, স্প্যানিজ, বার্বার। মুদ্রা — দিরহাম (MAD)। খনিজ — ফসফেট, সীসা, দস্তা, রূপা, তামা, লোহা। কৃষি — গম, যব, মেজ, আখ, চিনি-বীট। শিল্প — বস্ত্র, চিনি, অলিভ তেল, সিমেন্ট। ১৯৯৪ সালে ৯,২৭৬.৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা — ৪৯% (১৯৯০)।

মোজেম্বিক ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
রাজধানী — মাপুতো। জনসংখ্যা — ১৬ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.২৬১ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পূর্বে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে সোয়াজিল্যান্ড, পশ্চিমে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে, উত্তরে জাম্বিয়া, মালউই ও তানজানিয়া। মোট ভূখণ্ড — ৭,৯৯,৩৮০ বর্গ কিমি। ভাষা — পর্তুগীজ। মুদ্রা — মেটিক্যাল (MZM)। খনিজ — সোনা, কয়লা, লবন, মার্বেল, কৃষি — ধান, কলা, বাদাম, কাজু। শিল্প — বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, রেলওয়ে। ১৯৯২ সালে ৪৯০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৩৩.৫% (১৯৯২)।

মায়ানমার (বার্মা) ১৯ এপ্রিল ১৯৪৮
রাজধানী — রেঙ্গুন। জনসংখ্যা — ৪৪.৭৪ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বার্ষিক মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলারে) ২০০ (১৯৮৬)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বিশ্বস্থান ০.৪৫১/১৩৮ (১৯৯৩)। পরিসীমা — পূর্বে চীন, লাওস এবং থাইল্যান্ড, পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, বাংলাদেশ, ভারত। আয়তন — ২,৬১,২২৮ বর্গ মাইল, (৬৭৬,৫৭৭ বর্গ কি.মি.)। সরকারী ভাষা — বার্থিজ এর ইংরাজি। মুদ্রা — কিয়েট (KYAT) (MMK) । বিদ্যুৎ — ১৯৯৫-৯৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১০০০ মেগাওয়াট। তেল — ১৯৯৫-৯৬ সালে তেল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬.৯ মিলিয়ন ব্যারেল। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৯,৫৪০ মিলিয়ন ঘনফুট। খনিজসম্পদ — জিঙ্ক, অভ্র, নিকেল, সীসা, টিন, রূপা, সোনা, তামা। কৃষি — ধান, ইক্ষু, ভুট্টা, পাট, তুল, গম, রবার, বাদাম। প্রাণী সম্পদ — গরু, মহিষ, শূকর, ভেড়া, ছাগল। বনাঞ্চল — ৪৮০.০৪ মিলিয়ন একর। মৎস্য চাষ — ১৯৯৫-৯৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৭১.৪ মিলিয়ন টন।

নামিবিয়া ২৩শে এপ্রিল ১৯৯০
রাজধানী — উইন্ডহোয়েক। জনসংখ্যা — ১.৫১ মিলিয়ন (১৯৯২)। বৃদ্ধির হার ০.৫৭৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,০৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে অ্যাঙ্গোলা ও জাম্বিয়া, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পূর্বে বটসোয়ানা। মোট ভূখণ্ড ৮,২৬,৭০৪ বর্গ কিমি। ভাষা — ইংরাজী। অন্যান্য — আফ্রিকান, জার্মান। মুদ্রা — নামিবিয়া ডলার (NAD)। খনিজ ইউরেনিয়াম, তামা, সীসা, দস্তা, টিন, রূপা, সোনা, হীরা। কৃষি — গম, মেজ, সব্জী, সূর্যমুখীর বীজ। শিল্প — ক্ষুদ্র শিল্প, বস্ত্র, চর্ম, ইস্পাতের সামগ্রী ১৯৯২ সালে ১,৭১৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৬০% (১৯৯৭)।

নেপাল ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫
রাজধানী — কাঠমাণ্ডু। জনসংখ্যা — ১৯.২৮ মিলিয়ন (১৯৯৩)। বৃদ্ধির হার ০.৩৩২ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২০০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে চীন (তিব্বত), পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিমে ভারত। মোট ভূখণ্ড — ১,৪৭,১৮১ বর্গ কিমি। ভাষা — নেপালী। মুদ্রা — নেপালীজ রুপি (NPR)। খনিজ — লিগনাইট, ট্যালকাম, ম্যাগনেসাইট। কৃষি — ধান, মেজ, গম, আখ, আলু, মিলেট। শিল্প - বস্ত্র, পাট, সিমেন্ট, চিনি, বীয়ার। ১৯৯৪ সালে ১,০৫৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ২৫.৬% (১৯৯১)।

নেদারল্যান্ডস ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৫
রাজধানী — আমষ্টারডাম। জনসংখ্যা — ১৫.৪২ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার ০.৯৩৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২১,৯৭০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে এবং পশ্চিমে উত্তরসাগর, দক্ষিণে বেলজিয়াম এবং পূর্বে জার্মানী। মোট ভূখণ্ড — ৪১,৪৪৭ বর্গ কি.মি.। ভাষা ডাচ্। মুদ্রা — গুল্ডেন। খনিজ — লবন। কৃষি — গম, রাই, যব, ওট, আলু,

চিনি-বীট। শিল্প কাগজ, চর্ম বস্ত্র, কাঠ, রবার, ধাতু, ইলেকট্রিক্যাল মেশিনারী, ট্রান্সপোর্ট ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র। ১৯৯৪ সালে ৭৯,৪৮৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

নিউজিল্যান্ড ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — ওয়েলিংটন। জনসংখ্যা — ৩.৬৬ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৯২৭ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৩,১৯০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — প্রশান্ত মহাসাগরের দিক্ষিণাংশে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ২,৭০,৫৩৪ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী। অন্যান্য — মাওরি। মুদ্রা — নিউজিল্যান্ড ডলার (NZD)। খনিজ — কয়লা, চুনাপাথর, পিউনিস পাথর। কৃষি — হর্টিকালচার ও টিম্বার। শিল্প — বস্ত্র, পশম, কাগজ, কাঠ, ধাতু, রাসায়নিক। ১৯৯৫ সালে ১.৪৫ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

নিকারাগুয়া ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — মানাগুয়া। জনসংখ্যা — ৪.৪ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৫৬৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে হন্ডুরাস, পূর্বে ক্যারিবিয়ান সাগর দক্ষিণে কোস্টারিকা এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। মোট ভূখণ্ড — ১,৩০,৬৭১ বর্গ কি.মি.। ভাষা — স্পানিশ। মুদ্রা — কডোবা (N.I.O)। খনিজ — সোনা, রূপা, চুনাপাথর। কৃষি — ধান, মেজ, বীন, সয়াবীন, কলা গ্রীন কফি, গ্রীন টোব্যাকো, তুলাবীজ। শিল্প — সিমেন্ট, ধাতু, বাম, চর্ম। ১৯৯৩ সালে ১,৬৩৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ১২% (১৯৮৩)।

নাইজের ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — নিয়ামে। জনসংখ্যা — ৯.৪৬ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.২০৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৩০ ডলার (১৯৯৪), পরিসীমা — উত্তরে আলজেরিয়া ও লিবিয়া, পূর্বে চাদ, দক্ষিণে নাইজেরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে বেনিন ও বুরকিনাফাসো এবং পশ্চিমে মালি। মোট ভূখণ্ড — ১২,৬৭,০০০ বর্গ কিমি। ভাষা — ফরাসী। অন্যান্য — হাউসা, জেরমা, ফুলানি। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক CFA (NAF)। খনিজ - ইউরেনিয়াম, ফসফেট, কয়লা, টিন, লবন। কৃষি — চিনি-বীট, রাঙালু, আখ, বাদাম, মেজ, মিলেট। শিল্প — ক্ষুদ্র শিল্প (বস্ত্র, সিমেন্ট, রাসায়নিক অসবাব)। ১৯৯০ সালে ১৪৯.৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৩১.২% (১৯৯২)।

নাইজেরিয়া ৭ অক্টোবর ১৯৬০

রাজধানী — আবুজা। জনসংখ্যা — ৯৭.২২ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৪০০ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে নাইজের, পূর্বে দাচ ও ক্যামেরুন, দক্ষিণে গিনি উপসাগর এবং পশ্চিমে বিলিন। মোট ভূখণ্ড ৯,২৩,৭৭৩ বর্গ কিমি। ভাষা — ইংরাজী, ফরাসী। মুদ্রা — নাইরা (NGN)। খনিজ — চুনাপাথর, মার্বেল, সোনা, দস্তা,

সীসা, ইউরেনিয়াম, টিন। কৃষি — মিলেট, মেজ, কলা বাদাম, তূলাবীজ, ধান কোকো। শিল্প — সার, প্লাইউড, চিনি, মাখন, চীজ। ১৯৯৫ সালে ১৪,৪৮২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ২০,৫৯,০০০ ব্যারেল তেল প্রতিদিন নিষ্কাশিত হয়।

নরওয়ে ২৭ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — অস্‌লো। জনসংখ্যা — ৪.৪ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০. ৯৩৭ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৬,৪৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর, পূর্বে রাশিয়া, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন, দক্ষিণে স্কাগেরাক প্রণালী এবং পশ্চিমে উত্তর সাগর। মোট ভূখণ্ড — ৩,২৩,৮৯৫ বর্গ কিমি। ভাষা — নরওয়েজিয়ান। মুদ্রা — নরওয়েজিয়ান ক্রোন (NOK)। খনিজ — লোহা, টাইটেনিয়াম, তামা, সীসা, দস্তা। কৃষি — যব, ওট, গম, আলু, সব্‌জী। শিল্প — কয়লা, বস্ত্র, ধাতু, কাঠ, তামাক, চর্ম, রাসায়নিক, কাগজ, রবার, মেশিনারি। ১৯৯৫ সালে ১,২৩,১৮৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ও ২৯,০২,০০০ ব্যারেল তেল প্রতিদিন নিষ্কাশিত হয়।

ওমান ৭ অক্টোবর ১৯৭১

রাজধানী — মাসকাট। জনসংখ্যা — ২.১৪ মিলিয়ন (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৭১৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৫,২০০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তর-পূর্বে ওমান উপসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে আরবসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইয়েমেন এবং উত্তর-পশ্চিমে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। মোট ভূখণ্ড — ৩,০৯,৫০০ বর্গ কিমি। ভাষা — আরবি। অন্যান্য — ইংরাজী। মুদ্রা — ওমানি রিয়াল। খনিজ — তামা। কৃষি — সব্‌জী, ফল। শিল্প — ফুড প্রসেসিং কেমিক্যাল। ১৯৯৫ সালে ৬,৫০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ৮,৫২,০০০ ব্যারেল তেল প্রতিদিন নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা — ৪১% (১৯৯৪)।

পাকিস্তান ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

রাজধানী — ইসলামাবাদ। জনসংখ্যা — ১৩০.২ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৪৪২ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৪৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে ইরান, উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, উত্তরে চীন, পূর্বে ভারত এবং দক্ষিণে আরবসাগর। মোট ভূখণ্ড — ৭,৯৬,০৯৫ বর্গ কিমি। ভাষা — উর্দু। অন্যান্য — পাঞ্জাবী, ইংরাজী। মুদ্রা — পাকিস্তান রুপি (PKR)। খনিজ — কয়লা, জিপসাম, সালফার, মার্বেল, অ্যান্টিমনি, ফসফেট, সোপস্টোন। কৃষি — ধান, গম, আখ, মেজ, মিলেট, তূলা। শিল্প — কৃষিজ দ্রব্য প্রসেসিং, বস্ত্র, কেমিক্যাল, সিমেন্ট, ইস্পাত, গাড়ী, ট্রাক্টর। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫৩,৩১২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৩৪% (১৯৯২)।

পালাউ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪

রাজধানী — কোরোর। জনসংখ্যা — ১৮,০০০ (১৯৯৪)। পরিসীমা — প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ১,৬৩২ বর্গ কিমি। ভাষা — পালাউয়ান। অন্যান্য — ইংরাজী। মুদ্রা — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাই প্রচলিত। শিল্প — পর্যটন।

পানামা ১৩ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — পানামা সিটি। জনসংখ্যা — ২.৩৩ মিলিয়ন (১৯৯০), বৃদ্ধির হার — ০.৮৫৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,৬৭০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর, পূর্বে কলম্বিয়া, দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে কোস্টারিকা। মোট ভূখণ্ড — ৭৫,৫১০ বর্গ কিমি। ভাষা — স্প্যানিশ। মুদ্রা — বালবোয়া (PAB)। খনিজ — চুনাপাথর, লবণ। কৃষি — ধান, মেজ, বীন, কফি, চিনি, কলা, ফল, কোকো, নারিকেল। শিল্প — ফুড প্রসেসিং, তেল, কাগজ, কেমিক্যাল। ১৯৯৫ সালে ৫৫১ মেগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা —.৯০% (১৯৯২)।

পাপুয়া নিউগিনি ১০ অক্টোবর ১৯৭৫

রাজধানী — পোর্ট মোরেস্‌বি। জনসংখ্যা — ৩.৮৫ মিলিয়ন (১৯৯২), বৃদ্ধির হার — ০.৫০৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,১৬০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ইকুয়েডর থেকে কেপ বার্গানেয়া এবং লুইসিয়েড দ্বীপপুঞ্জ থেকে পশ্চিম ইরিয়ান বর্ডার পর্যন্ত। মোট ভূখণ্ড — ৪,৬২,৮৪০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী.। অন্যান্য — নিও মেলানেসিয়ান ও হিরি মোতু। মুদ্রা — কিনা (PGK)। খনিজ — তামা, রূপা, সোনা। কৃষি — কফি, নারিকেল, কোকো, রবার। শিল্প — তামাক, ফুড প্রসেসিং, কাঠ, ধাতু। ১৯৯৪ সালে ১,৩৬২.৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ১৯৯২ সালে ২.১২ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

প্যারাগুয়ে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — আসুনসিওন। জনসংখ্যা — ৪.৯ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৭০৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৫৭০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তর-পশ্চিমে বলিভিয়া, উত্তর-পূর্বে এবং পূর্বে ব্রাজিল এবং দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পূর্বে আর্জেন্টিনা। মোট ভূখন্ড — ৪,০৬,৭৫২ বর্গ কি.মি.। ভাষা — স্প্যানিশ। অন্যান্য — গুয়ারানি। মুদ্রা — গুয়ারানি (PYG)। খনিজ — চুনাপাথর, জিপসাম, লবণ, কেওলিন, তামা, লোহা। কৃষি — আখ, মেজ, সয়াবীন, গম, ধান, তামাক। শিল্প — সিমেন্ট, চিনি, তেল, সিগারেট, দেশলাই। ১৯৯৩ সালে ৮,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৯০.৮% (১৯৯২)।

পেরু ৩১ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — লিমা। জনসংখ্যা — ২৩.৮৫ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৬৯৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৮৯০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে ইকুয়াডর ও কলম্বিয়া, পূর্বে ব্রাজিল ও বলিভিয়া, দক্ষিণে চিলি এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। মোট ভূখণ্ড — ১২,৮৫,৬৪০ বর্গ কি মি.। ভাষা — স্প্যানিশ। অন্যান্য — কেচুয়া, আয়মারা। মুদ্রা — নুয়োভা সোল (PES)। খনিজ — লোহা, দস্তা, তামা, সীসা, রূপা, সোনা। কৃষি — গম, ধান, আলু, মেজ, আখ, ধান, কফি। শিল্প — লোহা এবং অন্যান্য ধাতব শিল্প। ১৯৯৪ সালে ১৫,৮৬২.৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৪ সালে ৪৬.৫২ মিলিয়ন ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা — ৮৭.২% (১৯৯৩)

ফিলিপিনস ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫
রাজধানী — ম্যানিলা। জনসংখ্যা — ৬৯.৮ মিলিয়ন (১৯৯৬), বৃদ্ধির হার — ০.৬৬৫ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৯৬০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ২১.২৫ থেকে ৪.২৩ উত্তর অক্ষাংশ, এবং ১১৬ থেকে ১২৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড (আনুমানিক) — ৩,০০,০০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ফিলিপিনো। অন্যান্য — সেবুয়ানো, ইয়োকানো। মুদ্রা — পিসো (PMP)। খনিজ — সোনা, রূপা, তামা, কয়লা, নিকেল। কৃষি — ধান, নারিকেল, বাদাম, কফি, আনারস, তামাক, বাদাম, কলা, আখ, রবার। শিল্প — খাদ্য, তেল ও কেমিক্যাল শোধন। ১৯৯৩ সালে ২৬,৫৯২ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

পোল্যান্ড ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫
রাজধানী — ওয়ারশ। জনসংখ্যা — ৩৮.৬১ মিলিয়ন (১৯৯৬), বৃদ্ধির হার — ০.৮১৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,৪৭০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে বাল্টিক সাগর ও রাশিয়া, পূর্বে লিথুয়ানিয়া, বেলারুশ এবং ইউক্রেন, দক্ষিণে চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া এবং পশ্চিমে জার্মানী। মোট ভূখণ্ড — ৩,১২,৬৮৫ বর্গ কি.মি.। ভাষা — পোলিশ। মুদ্রা — জোতি (PLZ)। খনিজ — কয়লা, তামা, সালফার। কৃষি — গম, যব, রাই, ওট, আলু, চিনি-বীট। শিল্প — ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ, পেট্রোলিয়াম, প্লাষ্টিক, ধাতু, মেশিনারী, গাড়ী, লরি, বাস, কেমিক্যাল। ১৯৯৫ সালে ১,৩৮,৯৯০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ২,৯২,০০০ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

পর্তুগাল ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫
রাজধানী — লিসবন। জনসংখ্যা — ৯.৯ মিলিয়ন (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৮৭৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৯,৩৭০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে ও পূর্বে স্পেন এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে আটল্যান্টিক মহাসাগর। মোট ভূখণ্ড — ৯১,৯০৫ বর্গ কি.মি.। ভাষা — পর্তুগীজ। মুদ্রা — এসকুদো (PTE)। খনিজ — সোনা, ইউরেনিয়াম, কয়লা, টিন, তামা, গ্রানাইট, মার্বেল। কৃষি — গম, মেজ, ওট, যব, রাই, ধান, আলু। শিল্প — ফুড প্রসেসিং, বীয়ার, সফট ড্রিংকস, সিগারেট, বস্ত্র, চর্ম, পেট্রল, কাঁচ, সিমেন্ট, টায়ার। ১৯৯৫ সালে ৭,৫২,৬৭২ টন তেলের সমান মানের বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৮০% (১৯৯০)।

কাতার ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
রাজধানী — দোহা। জনসংখ্যা — ৫,৩৯,০০০ (১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৮৩৯ (১৯৯৩) মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৪,৫৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে পারস্য উপসাগর এবং দক্ষিণে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। মোট ভূখণ্ড — ১১,৪৩৭ বর্গ কি.মি.। ভাষা — আরবি। মুদ্রা — কাতারি রিয়াল (QAR)। কৃষি — ফল, সবজী, তাল। শিল্প — অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, সালফার। ১৯৯৪ সালে ৫,৪২৫.৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫ সালে প্রতিদিন ৪,৭৪,০০০ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়।

কোরিয়া সাধারণতন্ত্র

রাজধানী — সিওল। জনসংখ্যা — ৪৪.৬১ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৮৮৬ (১৯৯০)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৮,৪৮৩ (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে অসামরিক অঞ্চল (যা উত্তর কোরিয়া থেকে এই দেশকে পৃথক করেছে), পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে কোরীয় প্রণালী এবং পশ্চিমে পীতসাগর। মোট ভূখণ্ড — ৯৯,২৬৩ বর্গ কি.মি.। ভাষা — কোরিয়ান। মুদ্রা — উয়োন (KRW)। খনিজ — টাংস্টেন, চুনাপাথর, গ্রাফাইট, সীসা, দস্তা। কৃষি — ধান, যব, গম, আলু, ধান। শিল্প — তামাক, কেমিক্যাল, ইলেকট্রনিক, ইস্পাত, সিমেন্ট, মেশিনারী, মোটরগাড়ী। ১৯৯৪ সালে ১,৮৮,৩৪৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

উত্তর কোরিয়া

রাজধানী — পিয়ং-ইয়ং। জনসংখ্যা — ২৩.২৬ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৭১৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৯২৩ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে চীন, পূর্বে জাপান সাগর, পশ্চিমে পীতসাগর এবং দক্ষিণে দক্ষিণ কোরিয়া (অসামরিক অঞ্চল)। মোট ভূখণ্ড — ১,২২,৭৬২ বর্গ কি.মি.। ভাষা — কোরিয়ান। মুদ্রা — উয়োন (KPW)। খনিজ — লোহা, তামা, সীসা, দস্তা, কয়লা, ইউরেনিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ। কৃষি — ধান, গম, মেজ, আলু, সয়াবীন। শিল্প — সিমেন্ট, বস্ত্র, মোটরগাড়ী, টিভি, জাহাজ। ১৯৯৩ সালে ২১,১০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ১৯৯০ সালে প্রতিদিন ৭০,০০০ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়।

মোলদোভা সাধারণতন্ত্র ২ মে ১৯৯২

রাজধানী — কিশিনেভ। জনসংখ্যা — ৪.৪ মিলিয়ন (১৯৯৬), বৃদ্ধির হার — ৪১.৬৬৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৮৭০ ডলার (১৯৯৬)। পরিসীমা — পূর্ব ও দক্ষিণে ইউক্রেন, পশ্চিমে রোমানিয়া। মোট ভূখণ্ড — ৩৩,৭০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — মলদাভিয়ান। অন্যান্য — রাশিয়ান। মুদ্রা — লেউ (MLD)। খনিজ — ফসফরাইট, লিগনাইট, জিপসাম। কৃষি — চিনি-বীট, আলু, সব্জী, ফল। শিল্প — ফেব্রিক, চর্ম, ট্রাক্টর, টিভি, ফ্রিজ। ১৯৯৩ সালে ১২.২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৫২% (১৯৯৪)।

রোমানিয়া ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

রাজধানী — বুখারেষ্ট। জনসংখ্যা — ২২.৭৩ মিলিয়ন (১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৭৩৭ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১২৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে ইউক্রেন, পূর্বে মলদোভা, ইউক্রেন ও কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণে বুলগেরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে যুগোস্লোভিয়া এবং উত্তর-পশ্চিমে হাঙ্গেরী। মোট ভূখণ্ড — ২,৩৭,৫০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — রোমানিয়ান। মুদ্রা — লেউ (ROL)। খনিজ — লোহা, কয়লা, লিগনাইট। কৃষি — গম, রাই, যব, ওট, মেজ, আলু, সূর্যমুখী-বীজ, চিনি-বীট। শিল্প — ইস্পাত, কেমিক্যাল, কাগজ, সিমেন্ট, চিনি, ভোজ্য

তেল, প্লাস্টিক, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ট্রাক্টর। ১৯৯৪ সালে ৫৫,১৩৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ১৯৯৪ সালে ৬.৭০০ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

রাশিয়া ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫
রাজধানী — মস্কো। জনসংখ্যা — ১৪৭.৫ মিলিয়ন (১৯৯৬), বৃদ্ধির হার — ০.৮০৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,৬৫০ ডলার (১৯৪৪)। পরিসীমা — উত্তরে বারেনৎস, কারা, লাপতেভ, পূর্ব সাইবেরিয়ান সাগর, পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (মালাস্কা) ও জাপান থেকে যথাক্রমে বেরিং প্রণালী ও কাম্‌স্‌কাত্‌শ উপসাগর দ্বারা পৃথকীকৃত। দক্ষিণে উত্তর কোরিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া, কাজাখস্তান ও কাস্পিয়ান সাগর, জর্জিয়া, কৃষ্ণসাগর ও ইউক্রেন; পশ্চিমে বেলারুশ, লাতভিয়া, এস্তোনিয়া, বাল্টিক সাগর ও ফিনল্যান্ড। মোট ভূখণ্ড — ১,৭০,৭৫,০০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — রাশিয়ান। মুদ্রা — রুবল (PUR)। খনিজ — লোহা, কয়লা, সোনা, প্ল্যাটিনাম, সীসা, দস্তা, তামা, টিন। কৃষি — গম, ধান, আলু, সূর্যমুখী-বীজ, সব্‌জী, ফল। শিল্প — ইস্পাত, ধাতু, কেমিক্যাল, কাগজ, প্লাস্টিক, কাঁচ, ঘড়ি, টিভি, মেশিনারী, মোটরগাড়ী, ট্রাক্টর, ফ্রিজ, মদ, সিগারেট। ১৯৯৪ সালে ৮,৭৫,৯০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ৩২৮ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

রোয়ান্ডা ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
রাজধানী — কিগালি। জনসংখ্যা — ৭.৪৬ মিলিয়ন (১৯৯৩)। বৃদ্ধির হার — ০.৩৩২ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২১০ ডলার (১৯৯৩)। পরিসীমা — দক্ষিণে বুরুন্ডি, পশ্চিমে জাইরে, উত্তরে উগান্ডা এবং পূর্বে তানজানিয়া। মোট ভূখণ্ড — ২৬,৩৩৮ বর্গ কি.মি.। ভাষা — কিনিয়ারওয়ান্ডা, ফরাসী, ইংরাজী। অন্যান্য — সোয়াহিলি। মুদ্রা — রোয়াণ্ডা ফ্রাঙ্ক (RWF)। খনিজ — ক্যাসিটেবাইট, উলফ্রাম। কৃষি — চা, কফি, বাদাম, আলু, বীন, মেজ। শিল্প — ব্রুয়ারী, খনিজ। ১৯৮৬ সালে ১১০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

সেন্টকিটস অ্যান্ড নেভিস ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
রাজধানী — বাসেতের। জনসংখ্যা — ৪৩,৩৫০ (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৮৫৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৪,৭৬০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — সেন্টকিটস পূর্ব ক্যারিবিয়ান সাগরে লিউওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত; নেভিস সেন্টকিট্‌সের ৩ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD)। কৃষি — নারিকেল, তুলা, আখ। শিল্প — খাদ্য ও পানীয় প্রসেসিং। ১৯৯০ সালে ৪৬.৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৯৫% (১৯৯৬)।

সেন্ট লুসিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯
রাজধানী — ক্যাষ্ট্রিজ। জনসংখ্যা — ১,৪০,৯০০ (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৭৩৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩,৪৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পূর্ব

ক্যারিবিয়ান সাগরে একটি দ্বীপরাষ্ট্র। মোট ভূখণ্ড — ৬১৭ বর্গ কি.মি.। কৃষি — কফি, কোকো, ব্রেডফ্রুট, আম। শিল্প — সাবান, ইলেকট্রনিক্স।

সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডিন্স ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮০

রাজধানী — কিংসটাউন। জনসংখ্যা — ১,০৯,০০০ (১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৭৩৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,১২০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পূর্ব ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্র। মোট ভূখণ্ড — ৩৮৮ বর্গ কি.মি.। মুদ্রা — পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD)। কৃষি — কোকো, আম, পেয়ারা ও অন্যান্য ফল। শিল্প — বস্ত্র, ইলেকট্রনিক, ইলেকট্রিকাল, পশুখাদ্য, চিনি। ১৯৯১ সালে ৫,৩০,২৪,৭৮৮ কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

স্যান ম্যারিনো ২ মে ১৯৯২

রাজধানী — সান মারিনো। জনসংখ্যা — ২৪,০০৩ (১৯৯৩)। পরিসীমা — মধ্য ইতালীর মধ্যে অবস্থিত একটি স্থল দ্বারা আবদ্ধ রাষ্ট্র। অ্যাড্রিয়াটিক সাগর থেকে ২০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ৬১.১৯ বর্গ কি মি.। ভাষা — ইতালীয়। মুদ্রা — ইতালীয় মুদ্রাই প্রচলিত। তবে নিজেদের মুদ্রাও আছে। কৃষি — গম, যব, মেজ, আঙুর।

সাও তোমে এবং প্রিন্সিপ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

রাজধানী — সাও তোমে। জনসংখ্যা — ১,৩১,০০০ (১৯৯৫)। বৃদ্ধির হার — ০.৪৫৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — গিনি উপসাগরে, গাবোনের পশ্চিম উপকূল থেকে ২০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ১,০০১ বর্গ কি.মি.। ভাষা — পর্তুগীজ। অন্যান্য — লুঙ্গোয়া সাও তোমে, ক্যাঙ, বালু। মুদ্রা — দোবরা (STD)। কৃষি — নারিকেল, কোকো, কলা। শিল্প — ইঁট, সেরামিক, বস্ত্র, সাবান। ১৯৯২ সালে ৪.৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

সৌদি আরব ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — রিয়াধ। জনসংখ্যা — ১৬.৯ মিলিয়ন (১৯৯২), বৃদ্ধির হার — ০.৭৭১ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৭,২৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, উত্তরে জর্ডন, ইরাক ও কুয়েত এবং দক্ষিণে ইয়েমেন ও ওমান। মোট ভূখণ্ড — ২.২ মিলিয়ন বর্গ কিমি। ভাষা — আরবি। মুদ্রা — রিয়াল (SAR)। খনিজ — লোহা, তামা, রুপা, টিন, নিকেল, দস্তা, সীসা। কৃষি — যব, গম, সবজী, ফল। শিল্প — ধাতু, পেট্রোকেমিক্যাল। ১৯৯০-৯১ সালে ৬৩,৬৩২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ১৯৯৫ সালে ৮০,৮৩,০০০ ব্যারেল তেল প্রতি দিন নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা — ৬৪.১% (১৯৯২)।

সেনেগাল ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — ডাকার। জনসংখ্যা — ৭.৯৭ মিলিয়ন (১৯৯৩)। বৃদ্ধির হার — ০.৩৩১

(১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৬১০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে মরিটানিয়া, পূর্বে মালি, দক্ষিণে গিনি ও গিনি-বিসাউ ও পশ্চিমে আটল্যান্টি মহাসাগর। মোট ভূখণ্ড — ১,৯৭,১৬১ বর্গ কিমি। ভাষা — ফরাসী। অন্যান্য — ওলোফ্। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক CFA (XOF)। খনিজ — সোনা, ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ফসফেট। কৃষি — বাদাম, তুলা, মেজ, ধান, মিলেট। শিল্প — সিমেন্ট, সার, চিনি, পাম-তেল, মাখন। ১৯৮৯ সালে ৮৬৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৩৮.৩% (১৯৯০)।

সেশেল্‌স্ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

রাজধানী — ভিক্টোরিয়া। জনসংখ্যা — ৭৩,৮৫০ (১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৭৯২ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৬,২১০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ভারত মহাসাগরে মাদাগাস্কারের উত্তরে ১১৫টি দ্বীপের সম্মিলিত রাষ্ট্র। মোট ভূখণ্ড — ৪৫৫ বর্গ কিমি। ভাষা — ক্রিওল, ইংরাজী, ফরাসী। মুদ্রা — সেশেলস্ রুপি (SCR)। কৃষি — চা, আখ, কলা, রাঙালু, সব্জী। শিল্প — ব্রুয়ারী, ঠাণ্ডা পানীয়, পর্যটন। ১৯৯৪ সালে ১২৫.২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৮৫% (১৯৯১)।

সিরা লিয়েন/সিয়েরা লিওন ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬১

রাজধানী — ফ্রিটাউন। জনসংখ্যা — ৪.৪৬ মিলিয়ন (১৯৯৩), বৃদ্ধির হার — ০.২১৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তর-পশ্চিমে, উত্তর এবং উত্তর-পূর্বে গিনি, দক্ষিণ-পূর্বে লাইবেরিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর। মোট ভূখণ্ড — ৭৩,৩২৬ বর্গ কিমি। ভাষা — ইংরাজী, ক্রিওল। মুদ্রা — লিওন (SLL)। খনিজ — সোনা, হীরা, বক্সাইট। কৃষি — ধান, পাম-তেল, কফি, কোকো। শিল্প — কাঠ, আসবাব। ১৯৯০ সালে ২২৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ২৩.৭% (১৯৯২)।

সিঙ্গাপুর ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

রাজধানী — সিঙ্গাপুর সিটি। জনসংখ্যা — ২.৯৯ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৮৮১ (১৯৯৩) মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৩,৩৬০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — মালয় উপসাগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ৬৫টি দ্বীপের সম্মিলিত রাষ্ট্র। মোট ভূখণ্ড — ৬৪৭.৫ বর্গ কি.মি.। ভাষা — মালয়, চীনা (মান্দারিন), তামিল, ইংরাজী। মুদ্রা — সিঙ্গাপুর ডলার (SGD)। শিল্প — পেট্রোলিয়াম, মেশিনারী, ধাতব, কাগজ, কেমিক্যাল। ১৯৯৫ সালে ২২,০৫৭.৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৯১.৮% (১৯৯৫)।

স্লোভাকিয়া ১৯ জানুয়ারি ১৯৯৩

রাজধানী — ব্রাতিস্লাভা। জনসংখ্যা — ৫.৩৭ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৮৬৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,২৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তর-পশ্চিমে চেক প্রজাতন্ত্র, উত্তরে পোল্যান্ড, পূর্বে ইউক্রেন, দক্ষিণে হাঙ্গেরী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অষ্ট্রিয়া।

মোট ভূখণ্ড — ৪৯,০৩৯ বর্গ কি.মি.। ভাষা — স্লোভাক। মুদ্রা — স্লোভাক ক্রাউন (SKK)। খনিজ — কয়লা, লিগ্‌নাইট, লোহা। শিল্প — ইস্পাত, লোহা, দস্তা, প্লাস্টিক, টিভি-গ্রাহক যন্ত্র। ১৯৯৩ সালে ২৪,৪২৯ মেগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

স্লোভেনিয়া ২১ মে ১৯৯২

রাজধানী — ল্যুবলিয়ানা। জনসংখ্যা — ১.৯৮ মিলিয়ন (১৯৯৫)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৭,১৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে অস্ট্রিয়া, উত্তর-পূর্বে হাঙ্গেরী, দক্ষিণ-পূর্বে ক্রোয়েশিয়া এবং পশ্চিমে ইতালী। মোট ভূখণ্ড — ২০,২৫৩ বর্গ কি.মি.। ভাষা — স্লোভেন। মুদ্রা — তোলার (SLT)। খনিজ — কয়লা, লিগনাইট। কৃষি — গম, মেজ, চিনি-বীট, আলু, বাঁধাকপি। শিল্প — ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ মেশিনারী, পশম, গাড়ী, লরি, টিভি। ১৯৯২ সালে ১২,০২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

সোলোমন আইসল্যান্ড ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

রাজধানী — হোনিয়ারা। জনসংখ্যা — ৩,৪৯,৫০০ (১৯৯৩), বৃদ্ধির হার — ০.৫৬৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৮০০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ৫° থেকে ১২° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১৫৫°৩০′ থেকে ১৬৯°৪৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ১০,৯৫৪ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী। অন্যান্য — মালয়েশিয়ান, পাপুয়ান ও পলিনেশিয়ান ভাষাগুলিও ব্যবহৃত হয়। মুদ্রা — সলোমন আইল্যান্ড ডলার (SBD)। খনিজ — বক্সাইট, ফসফেট, সোনা, রূপা। কৃষি — নারিকেল, রাঙালু, কলা। শিল্প — তামাক, ঠাণ্ডা পানীয়, ফুড ও ফিশ প্রসেসিং। ১৯৮৭ সালে ২,৪২,০৫,১১৭ কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

সোমালিয়া ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — মোগাডিসু। জনসংখ্যা — ৯.২ মিলিয়ন (১৯৯২), বৃদ্ধির হার — ০.২২১ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৭০ ডলার (১৯৮৯)। পরিসীমা — উত্তরে এডেন উপসাগর, পূর্বে ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে কেনিয়া, ইথিওপিয়া ও জিবৌতি। মোট ভূখণ্ড — ৬,৩৭,৬৫৭ বর্গ কি.মি.। ভাষা — সোমালি। অন্যান্য — আরবি, ইংরাজী, ইতালিয়ান। মুদ্রা — সোমালি শিলিং (SDS)। খনিজ — সোনা, রূপা, তামা, দস্তা, সীসা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ। কৃষি — আখ, কলা, মেজ, তুলাবীজ। শিল্প — চিনি পরিশোধন, ফুড প্রসেসিং, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, বস্ত্র। ১৯৭৮ সালে ১৩৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — প্রিটোরিয়া। জনসংখ্যা — ৪৯.৫৪ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৬৪৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩০১০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে নামিবিয়া, বটসোয়ানা এবং জিম্বাবোয়ে, উত্তর-পূর্বে মোজাম্বিক ও সোয়াজিল্যান্ড, পূর্বে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে দক্ষিণ আটল্যান্টিক। মোট ভূখণ্ড — ১২,২৪,৬৯১ বর্গ

কিমি। ভাষা — আফ্রিকান ও ইংরাজী। মুদ্রা — র‍্যান্ড (ZAR)। খনিজ — কয়লা, সোনা, রূপা, তামা, নিকেল, লোহা, প্ল্যাটিনাম। কৃষি — গম, আখ, মেজ, বাদাম, সূর্যমুখী-বীজ, কমলালেবু, আলু, সবজী, আপেল, আঙ্গুর। শিল্প — তামাক, মেশিনারী, ছাপা, পেট্রোলিয়াম, ধাতু, কাগজ। ১৯৯৫ সালে ১,৮৮,১৩৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ও ৩,৪৮,৩৬২ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

স্পেন ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

রাজধানী — মাদ্রিদ। জনসংখ্যা — ৪০.৪৬ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৯৩৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৩,২৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে বিস্কে উপসাগর, ফ্রান্স ও আন্ডোরা, পূর্ব ও দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং জিব্রাল্টার প্রণালী, দক্ষিণ-পশ্চিমে আটল্যান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে পর্তুগাল ও আটল্যান্টিক। মোট ভূখণ্ড — ৪,৯২,৫৯২ বর্গ কিমি। ভাষা — স্প্যানিশ। অন্যান্য — কার্তালান, গ্যালিসিয়ান, বাস্কে। মুদ্রা — পেসেতা (ESP)। খনিজ — কয়লা, লোহা, ইউরেনিয়াম, লিগনাইট। কৃষি — গম, যব, রাই, ওট, মেজ, আলু, চিনি-বীট, সূর্যমুখী-বীজ। শিল্প — ইস্পাত, কেমিক্যাল, বস্ত্র, কাগজ, টিভি, ফ্রিজ, গাড়ী। ১৯৯৫ সালে ১,৬৮,৬৮৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ৬,৫২,০০০ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

শ্রীলঙ্কা ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

রাজধানী — কলম্বো। জনসংখ্যা — ১৭.৯ মিলিয়ন (১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৬৯৮ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৬৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ভারত মহাসাগরে একটি দ্বীপরাষ্ট্র, যা ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে পক প্রণালী দ্বারা পৃথকীকৃত। মোট ভূখণ্ড — ৬৫,৬১০.৮৬ বর্গ কি.মি.। ভাষা — সিংহলী ও তামিল। অন্যান্য — ইংরাজী। মুদ্রা — শ্রীলঙ্কান রুপি (LKB)। খনিজ — বিভিন্ন মূল্যবান পাথর, গ্রাফাইট, ইলমেনাইট, লবণ। কৃষি — ধান, চা, নারিকেল, রবার। শিল্প — তামাক, বস্ত্র, চর্ম, ফুড প্রসেসিং, রবার, প্লাষ্টিক, কেমিক্যাল, পেট্রোলিয়াম। ১৯৯৪ সালে ৪,৩৬৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৮৮% (১৯৯১)।

সুদান ২২ নভেম্বর ১৯৫৬

রাজধানী — খার্তুম। জনসংখ্যা — ২৮.৯ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৩৫৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৪০০ ডলার (১৯৯০)। পরিসীমা — উত্তরে ইজিপ্ট, উত্তর-পূর্বে লোহিত সাগর, পূর্বে ইরিত্রিয়া এবং ইথিওপিয়া, দক্ষিণে কেনিয়া, উগান্ডা ও জাইরে, পশ্চিমে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও চাদ এবং উত্তর-পশ্চিমে লিবিয়া। মোট ভূখণ্ড — ২৫,০৫,৮১৩ বর্গ কি.মি.। ভাষা — আরবি। মুদ্রা — সুদানীজ পাউন্ড (SDP)। খনিজ — গ্রাফাইট, সালফার, জিপসাম, দস্তা, তামা, অভ্র, কয়লা, চুনাপাথর, সীসা। কৃষি — আখ, বাদাম, গম, তুলাবীজ, মিলেট, ফল। শিল্প — চিনি, সিমেন্ট। ১৯৮৬ সালে ১,২১০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ও ১৯৮৫ সালে ১,০১৯ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

সুরীনাম ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৫
রাজধানী — পারামারিবো। জনসংখ্যা — ৪,০৭,০০০ (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৭৩৭ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৮৭০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে আটল্যান্টিক মহাসাগর, পূর্বে ফ্রেঞ্চ গায়ানা, পশ্চিমে গায়ানা এবং দক্ষিণে ব্রাজিল। মোট ভূখণ্ড — ১,৬৩,৮২০ বর্গ কিমি। ভাষা — ডাচ্। অন্যান্য — হিন্দি, সুরিনামি, চাইনিজ, জাভানীজ, ইংরাজী। মুদ্রা — সুরিনাম গিল্ডার (SRG)। খনিজ — বক্সাইট। কৃষি — ধান, কমলালেবু, আঙুর, কলা, সব্জী, নারিকেল। শিল্প — অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, পাম-তেল, বীয়ার, জুতা, সিগারেট। ১৯৯৪ সালে ১,৩৩২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ও ১৯৯২ সালে ০.২ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

সোয়াজিল্যান্ড ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
বাজধানী — ম্‌বাবানে। জনসংখ্যা — ৮,৫০,৬২৮ (১৯৯৩), বৃদ্ধির হার — ০.৫৮৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,১৬০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পূর্বে মোজাম্বিক। মোট ভূখণ্ড — ১৭,৪০০ বর্গ কিমি। ভাষা — সোয়াজি ও ইংরাজী। মুদ্রা — লিলাঙ্গেনি (SZL)। খনিজ — কয়লা, অ্যাসবেস্‌টস্, হীরা। কৃষি — আখ, মেজ, আনারস, তামাক, তুলাবীজ, টম্যাটো। শিল্প — কৃষিজ পণ্য, পাঠ, জুতা, বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং। ১৯৯৩ সালে ৩৬৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

সুইডেন ১৯ নভেম্বর ১৯৪৬
রাজধানী — স্টকহোম্। জনসংখ্যা — ৮.৮৪ মিলিয়ন (১৯৯৬), বৃদ্ধির হার — ০.৯৩৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৩,৬৩০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে নরওয়ে, পূর্বে ফিনল্যান্ড এবং বসনিয়া উপসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে বাল্টিক সাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কাটেগাউ। মোট ভূখণ্ড — ৪,৪৯,৯৬৪ বর্গ কি.মি.। ভাষা — সুইডিশ। মুদ্রা — ক্রোনা (SEK)। খনিজ — লোহা, তামা, সীসা, দস্তা, ইউরেনিয়াম। কৃষি — গম, রাই, যব, ওট, আলু, চিনি-বীট, তৈলবীজ। শিল্প — কেমিক্যাল, কাগজ, ফুড প্রডাক্টস্, কয়লা, রবার, ধাতব, বস্ত্র। ১৯৯৫ সালে ১,৪৩,৩১৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

সিরিয়াম আরব রিপাবলিক ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫
রাজধানী — দামাস্কাস। জনসংখ্যা — ১৪.৬২ মিলিয়ন (১৯৯৬), বৃদ্ধির হার — ০.৬৯০ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,১১০ ডলার (১৯৯১)। পরিসীমা — পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও লেবানন, দক্ষিণে ইজরায়েল ও জর্ডন, পূর্বে ইরাক এবং উত্তরে তুরস্ক। মোট ভূখণ্ড — ১,৮৫,১৮০ বর্গ কিমি। ভাষা — আরবি। অন্যান্য — কুর্দিশ, আর্মেনিয়ান। মুদ্রা — সিরিয়ান পাউন্ড (SYP)। খনিজ — ফসফেট, জিপসাম, সীসা, তামা, নিকেল, অ্যান্টিমনি। কৃষি — গম, যব, মেজ, তুলাবীজ, মিলেট, চিনি-বীট, আলু, টম্যাটো, অলিভ, আঙুর। শিল্প — বস্ত্র, সুতা, পশম, ইস্পাত, ভোজ্য তেল, ফ্রিজ, কার্পেট। ১৯৯৫ সালে ১৫,৫৪৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ও ৩৪.২৮ ঘনফুট তেল নিষ্কাশিত হয়।

টোঙ্গা

রাজধানী — নুকু আলোফা। জনসংখ্যা — ১,০৩,০০০ (১৯৯১)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৬৪০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা ১৫° থেকে ২৩° ৩০ দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১৭৩° থেকে ১৭৭° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ৭৪৮ বর্গ কিমি। মুদ্রা — পাআঙ্গা (TOP)। কৃষি — ফল, নারিকেল, সব্জী। ১৯৮৬ সালে ৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

তিউনিসিয়া ১২ নভেম্বর ১৯৫৬

রাজধানী — তিউনিস। জনসংখ্যা — ৮.৮ মিলিয়ন (১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৭২৭ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৮০০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তর ও পূর্বে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আলজেরিয়া এবং দক্ষিণে লিবিয়া। মোট ভূখন্ড — ১,৬৪,১৫০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — আরবি, অন্যান্য — ফারসী। মুদ্রা — তিউনিসিয়ান দিনার (TND)। খনিজ — লোহা, সীসা, দস্তা। কৃষি — গম, যব, অলিভ, আলু, লবঙ্গ, টমেটো, মরিচ, তরমুজ, আপেল, অ্যাপ্রিকর্ট, চিনি-বীট, আঙুর, তামাক। শিল্প — কেমিক্যাল, সিমেন্ট, মোটর গাড়ী, লরি, রেডিয় ও টিভি। ১৯৯১ সালের ৫.৩৫ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা — ৬৫% (১৯৯৩)।

তুর্কী ১৪ অক্টোবর ১৯৫৬

রাজধানী — আঙ্কারা। জনসংখ্যা — ৬২.৫৩ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৭১১ (১৯৯৩) মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৪৫০ ডলার (১৯৯৪) পরিসীমা — পশ্চিমে ঈজিয়ান সাগর এবং গ্রীস, উত্তরে বুলগেরিয়া ও কৃষ্ণসাগর, পূর্বে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও ইরান এবং দক্ষিণে ইরাক, সিরিয়া এবং ভূমধ্যসাগর। মোট ভূখন্ড ৭,৭৯,৪৫২ বর্গ কি.মি.। ভাষা — তুর্কী। অন্যান্য — কুর্দিশ। মুদ্রা — তুর্কী, লিরা, (TRL)। খনিজ — কয়লা, লোহা, তামা, বক্সাইট, ক্রোমাইট, লিগনাইট, বোরন, লবণ। কৃশি — গম, গব, মেজ, রাই, তামাক, ওট, ধান। শিল্প — ইস্পাত, লোহা, পশম, বস্ত্র, কেমিক্যাল, চিনি, গাড়ী। ১৯৯৫ সালে ৮১,৮৫৮.৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ও ১৯৯৪ সালে ৩.৬৯ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা — ৮২.৫% (১৯৯৪)

তাজাকিস্তান ২মে ১৯৯২

রাজধানী — দুশানবে। জনসংখ্যা — ৫.৯ মিলিয়ন(১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৬১৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে এবং পশ্চিমে উজবেকিস্তান ও কিগিজস্তান, পূর্বে চীন এবং দক্ষিণে আফগানিস্তান। মোট ভূখন্ড — ১,৪০,০০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — তাজিক (TJR)। মুদ্রা — তাজিক রুবল্ । খনিজ — কয়লা, সীসা, দস্তা, ইউরেনিয়াম। কৃষি — আখ, পাট, ধান, মিলেট। শিল্প — সার, সিমেন্ট, ফ্রিজ, চর্ম। ১৯৯৩ সালে ১৭,৭০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ৪০,০০০ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

থাইল্যান্ড ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬

রাজধানী — ব্যাঙ্কক। জনসংখ্যা — ৫৮.৩৪ মিলিয়ন (১৯৯৩), বৃদ্ধির হার — ০.৮৩২ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২২৯০ ডলার(১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে বার্মা, উত্তরে ও পূর্বে লাওস এবং দক্ষিণ পূর্বে কাম্বোডিয়া। মোট ভূখন্ড — ৫,১৩, ১১৫ বর্গ কি.মি.। ভাষা — থাই। অন্যান্য — লাও, চীন, মালয়ী, খামের। মুদ্রা — বাইট্ । খনিজ — টিন, উলফ্রার্ম, কয়লা, অ্যান্টিমনি, তামা, সোনা, লোহা, সীসা, রুপা, দস্তা। কৃষি — ধান, মেজ, আখ, পাট, তামাক, ট্যাপিওকা, সয়াবীন, নারিকেল, বাদাম। শিল্প — ইস্পাত, পাটজাত দ্রব্য, ডিটারজেন্ট, চিনি, কাগজ। ১৯৮৮ সালে ৩২,৪৬৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৩ সালে ৮,৫৪৪ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়।

টোগো ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

রাজধানী — লোমে। জনসংখ্যা — ৩.৬ মিলিয়ন(১৯৯১), বৃদ্ধির হার — ৩৮৫ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩২০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে ঘানা, উত্তরে বুরকিনা ফাসো, পূর্বে বেনিন এবং দক্ষিণে গিনি উপসাগর। মোট ভূখণ্ড — ৫৬,৭৮৫ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ফরাসী। অন্যান্য — এওয়ে, কররে। মুদ্রা — ফ্রাঙ্ক (CFA)। খনিজ — লোহা, চুনাপাথর, ফসফেট, মার্বেল। কৃষি — কফি, কোকো, মেজ, বাদাম, তূলা। শিল্প — সিমেন্ট, বস্ত্র, ফুড প্রসেসিং। ১৯৮৮ সালে ৩৩৯.৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৪৩% (১৯৯০)

তুর্কমেনিস্তান ২ মে ১৯৯২

রাজধানী — আশাগাবাত। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,২৭০ ডলার (১৯৯২)। পরিসীমা — উত্তরে কাজাখস্তান, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ইরান এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর। মোট ভূখণ্ড — ৪,৪৮,১০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — তুর্কমেন। মুদ্রা — মানা (TMM)। খনিজ — কয়লা, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, লবন। কৃষি —মেজ, তুলা, রেশম, ফল। শিল্প — সিমেন্ট, সার, চর্ম। ১৯৯৫ সালে ১১,২০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৩ সালে ৫ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

উগান্ডা ২৫ অক্টোবর ১৯৬২

রাজধানী — কাম্পালা। জনসংখ্যা — ১৬.৬৭ মিলিয়ন (১৯৯১)। বৃদ্ধির হার — ০.৩২৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২০০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে সুদান, পূর্বে কেনিয়া, দক্ষিণে তানজানিয়া ও রোয়ান্ডা এবং পশ্চিমে জাইরে। মোট ভূখণ্ড — ২,৪১,০৩৮ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী। অন্যান্য — কিশোয়াহিলি, বান্টু, নিলোটিক ভাষাসমূহ। মুদ্রা — উগান্ডা শিলিং (UGS)। কৃষি — মিলেট, মেজ, চিনি-বীট, কফি, তূলা, তামাক, চা, কলা। শিল্প — সাবান, চিনি, বীয়ার। ১৯৯৪ সালে ১,০১৬.৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

ইউক্রেন ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫
রাজধানী — কিয়েভ। জনসংখ্যা — ৫২.১৪ মিলিয়ন (১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৭১৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,৫৭০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পূর্বে রাশিয়া, উত্তরে বেলারুশ, পশ্চিমে পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া এবং মলদোভা ও দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর ও আজোভ সাগর। মোট ভূখণ্ড — ৬,০৩,৭০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইউক্রেনিয়ান। কৃষি — গম, বীট, সূর্যমুখী-বীজ, তুলা, তামাক, সয়া, রবার , আলু, সব্‌জী, ফল। শিল্প — ধাতু, সার, কাগজ, সিমেন্ট, মোটরগাড়ী, ট্রাক্টর, চর্ম, চিনি। ১৯৯৩ সালে ২,২৭,০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ৪.২ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

সংযুক্ত আরব আমীরশাহী ৯ ডিসেম্বর
রাজধানী — আবুধাবি। জনসংখ্যা — ২.৪ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৮৬৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২২,৪৭০ ডলার (১৯৯৩)। পরিসীমা — উত্তরে পারস্য উপসাগর, উত্তর-পূর্বে ওমান, পূর্বে ওমান উপসাগর এবং ওমান, দক্ষিণ ও পশ্চিমে সৌদি আরব এবং উত্তর-পশ্চিমে কাতার। মোট ভূখণ্ড — ৮৩,৬৫৭ বর্গ কি.মি.। ভাষা — আরবি। অন্যান্য — ইংরাজী। মুদ্রা — দিরহাম (AED)। কৃষি — ফল, সব্‌জী, ফুল। শিল্প — অ্যালুমিনিয়াম, সার, সিমেন্ট, কেমিক্যাল, ইস্পাত, প্লাষ্টিক, বস্ত্র, মেশিনারী। ১৯৯৪ সালে ২৩,৪০২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং প্রতিদিন ২.১৬ মিলিয়ন ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়।

গ্রেট ব্রিটেন যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য উত্তর আয়ারল্যান্ড সমূহ
রাজধানী — লন্ডন। জনসংখ্যা — ৫৮.৭৮ মিলিয়ন (১৯৯৬), বৃদ্ধির হার — ০.৯২৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৮,৪১০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ইংল্যান্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড নিয়ে গঠিত। মোট ভূখণ্ড — ২,২৮,৩৫৬ বর্গ কি.মি. (গ্রেট ব্রিটেন)। ভাষা — ইংরাজী। অন্যান্য — ওয়েলশ্, স্কটিশ, আইরিশ। মুদ্রা — পাউন্ড, স্টার্লিং (GBP)। খনিজ — কয়লা, চুনাপাথর, চক্, চীনামাটি। কৃষি — গম, যব, ওট, আলু, চিনি-বীট। শিল্প — পশম, সিমেন্ট, তুলা, গাড়ী, ইঞ্জিনিয়ারিং, বস্ত্র, কাঠ, কেমিক্যাল। ১৯৯৫ সালে ৩,১৪,৭৮১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ১০০ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

সংযুক্ত তানজানিয়া রিপাবলিক ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬১
রাজধানী — দোদোমা। জনসংখ্যা — ২৯.৭ মিলিয়ন (১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৩৬৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৯০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তর-পূর্বে কেনিয়া, উত্তরে লেক ভিক্টোরিয়া ও উগান্ডা, উত্তর-পশ্চিমে রোয়ান্ডা ও বুরুন্ডি, পশ্চিমে টাঙ্গানিকা লেক, দক্ষিণ-পশ্চিমে জাম্বিয়া ও মালাউই এবং দক্ষিণে মোজাম্বিক। মোট ভূখণ্ড — ৯,৪৫,০৩৭ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী ও সোয়াহিলি। মুদ্রা — তানজানিয়ান শিলিং (TZS)। খনিজ — হীরা, সোনা, কয়লা, মূল্যবান পাথর। কৃষি —

গম, মেজ, মিলেট, কফি, তামাক, বাদাম, লবঙ্গ, কাজুবাদাম। শিল্প — বস্ত্র, পেট্রোলিয়াম, কেমিক্যাল, তামাক, কাগজ, ফুড প্রসেসিং। ১৯৯১ সালে ১,৫৮১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — ওয়াশিংটন ডি. সি.। জনসংখ্যা — ২৬৫.৬২ মিলিয়ন (১৯৯৬), বৃদ্ধির হার — ০.৯৪০ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৫,৮৬০ ডলার (১৯৯৪)। মোট ভূখণ্ড — ৩৫,৩৬,২৭৮ বর্গ মাইল। ভাষা — ইংরাজী। অন্যান্য — স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, চীনা। মুদ্রা — ডলার (USD)। খনিজ — কয়লা, তামা, সোনা, লোহা, সীসা, নিকেল, রূপা, দস্তা, মলিবডেনাম, ম্যাগনেসিয়াম। সালফেট, চুনাপাথর, ডলোমাইট, লবন। কৃষি — গম, আলু, সয়াবীন, তামাক, ধান, তূলা, ফল। শিল্প — ইস্পাত, গাড়ী, জাহাজ, টিভি, ইলেকট্রনিক, কাগজ, কেমিক্যাল, প্লাষ্টিক, বস্ত্র, চর্ম, সিগারেট। ১৯৯৫ সালে ২৯,৯৪,৫২৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৪ সালে প্রতিদিন ৮৬,৪৫,০০০ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়।

উরুগুয়ে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — মন্টেভিডিও। জনসংখ্যা — ৩.২ মিলিয়ন (১৯৯৬)। পরিসীমা — উত্তর-পূর্বে ব্রাজিল, দক্ষিণ-পূর্বে আটলান্টিক, দক্ষিণে রিও দে প্লাটা এবং পশ্চিমে আর্জেন্টিনা। মোট ভূখণ্ড — ১,৭৬,২১৫ বর্গ কি.মি.। ভাষা — স্প্যানিশ। মুদ্রা — উরুগুয়ান পেসো (UYP)। কৃষি — ধান, মেজ, যব, ওট, গম, চিনি-বীট, আখ, আলু। শিল্প — প্যাকেজিং, তেল পরিশোধন, চর্ম, সিমেন্ট, বস্ত্র কেমিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিনি, মটরগাড়ী, লরি, পেট্রোলিয়াম। ১৯৯৫ সালে ৬,১৬৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৯৫.৪% (১৯৯২)।

উজবেকিস্তান ২ মে ১৯৯২

রাজধানী — তাশখন্দ। জনসংখ্যা — ২২.২ মিলিয়ন (১৯৯৪), বৃদ্ধির হার — ০.৬৭৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৯৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে কাজাখস্তান, পূর্বে কিরগিজিস্তান ও তাজিকিস্তান, দক্ষিণে আফগানিস্তান ও পশ্চিমে তুর্কমেনিস্তান। মোট ভূখণ্ড — ৪,৪৭,৪০০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — উজবেক। মুদ্রা — সোম (UKS)। খনিজ — সোনা, কয়লা। কৃষি — ধান, রেশম, তূলা, ফল। শিল্প — ধাতু, সিমেন্ট, সার, কাগজ, চর্ম, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন। ১৯৯৩ সালে ৪৯,১০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ৪ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

ভানুয়াতু ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮১

রাজধানী — ভিলা। জনসংখ্যা — ১,৬০,০০০ (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৫৬২ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১,১৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ৮০ টি দ্বীপের সমাহার ফিজির ৫০০ মাইল পশ্চিমে এবং নিউ ক্যালেডোনিয়ার ২৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে

অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ১২,১৯০ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী ও ফরাসী। মুদ্রা — ভাতু (VUV)। কৃষি — কোপ্রা, কোকো, কফি। শিল্প — ফুড প্রসেসিং, ঠাণ্ডা পানীয়। ১৯৮৬ সালের ২০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

ভেনেজুয়েলা ১৫ নভেম্বর ১৯৪৫

রাজধানী — ক্যারাকাস। জনসংখ্যা ২০.৪১ মিলিয়ন (১৯৯৩), বৃদ্ধির হার — ০.৮৫৯ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২,৭৬০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর, পূর্বে গায়ানা, দক্ষিণে ব্রাজিল, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমে কলম্বিয়া। ভাষা — স্প্যানিশ। মুদ্রা — বলিভার (VEB)। খনিজ — বক্সাইট, অ্যালুমিনা, লোহা, কয়লা, সোনা। কৃষি — কফি, কোকো, আখ, মেজ, গম, ধান, তামাক, তূলা, বীন। শিল্প — ইস্পাত, সার, সিমেন্ট, কাগজ, গাড়ী। ১৯৮৬ সালে ৫০,২৪০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫ সালে ২৬,৫৭,০০০ ব্যারেল তেল প্রতিদিন নিষ্কাশিত হয়।

ভিয়েৎনাম ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

রাজধানী — হ্যানয়। জনসংখ্যা — ৭৪ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৫২৩ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ১৯০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে কাম্বোডিয়া ও লাওস, উত্তরে চীন, পূর্বে ও দক্ষিণে দক্ষিণ চীন সাগর। মোট ভূখণ্ড — ৩,২৯,৫৬৬ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ভিয়েতনামিজ। মুদ্রা — দং (VND)। খনিজ — কয়ল, অ্যানথ্রাসাইট, লিগনাইট, লোহা, সোনা, বক্সাইট, টিটানিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ। কৃষি — ধান, কফি, চা, রবার, নারিকেল, আখ, তুলা। শিল্প — ইস্পাত, সিমেন্ট, সার, কাঁচ, কেমিক্যাল, চিনি, মটর গাড়ী, সিগারেট, মেশিনারী। ১৯৯০ সালে ৬,৩০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৯২ সালে ৫.৪০ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়। সাক্ষরতা — ৮৮% (১৯৯২)

ইয়েমেন ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

রাজধানী — সানা'আ। জনসংখ্যা — ১৫.৮ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৩৬৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ২৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে সৌদি আরব, পূর্বে ওমান, দক্ষিণে এডেন উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। মোট ভূখণ্ড — ৫,৫৫,০০০ বর্গ কি.মি.। মুদ্রা — রিয়াল (YER)। খনিজ — জিপসাম, লবন। কৃষি — গম, যব, মিলেট, মেজ, আলু, ডাল, টম্যাটো, তূলাবীজ, পেঁয়াজ, তরমুজ, কফি, কলা, আঙুর। শিল্প — সিমেন্ট, পেট্রোলিয়াম, ভোজ্য তেল। গ্যাস, অ্যাসকাণ্ট। ১৯৯২ সালে ১,৯৫৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ৯.৯৬ মিলিয়ন টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

যুগোস্লাভিয়া ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

রাজধানী — বেলগ্রেড। জনসংখ্যা — ১০.৫৪ মিলিয়ন (১৯৯৫)। পরিসীমা — উত্তরে হাঙ্গেরী, উত্তর-পূর্বে রোমানিয়া, পূর্বে বুলগেরিয়া, দক্ষিণে ম্যাসোডোনিয়া ও আলবেনিয়া এবং

পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, বসনিয়া-হারজেগোভেনিয়া ও ক্রেয়েশিয়া। মোট ভূখণ্ড — ১,০২,১৭৩ বর্গ কি.মি। ভাষা — সার্বিয়ান। অন্যান্য — হাঙ্গেরিয়ান, আলবেনিয়ান। মুদ্রা — দিনার (YUD)। খনিজ — কয়লা, তামা। কৃষি — গম, মেজ, সয়াবীন, চিনি-বীট, আলু, আঙ্গর। শিল্প — ইস্পাত, গাড়ী, ফ্রিজ, টিভি, সিমেন্ট, সার, কেমিক্যাল, প্লাষ্টিক। ১৯৯৫ সালে ৩৭,১৭৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ১০,৬৬,০০০ টন তেল নিষ্কাশিত হয়।

জাম্বিয়া ১ ডিসেম্বর ১৯৬৪

রাজধানী — লুসাকা। জনসংখ্যা — ৮.৯৪ মিলিয়ন (১৯৯৩), বৃদ্ধির হার — ০.৪১১ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩৫০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে জাইরে, উত্তর-পূর্বে তানজানিয়া, পূর্বে মালাউই, দক্ষিণ-পশ্চিমে মোজাম্বিক এবং দক্ষিণে নামিবিয়া। মোট ভূখণ্ড — ৭,৫২,৬১৪ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরেজী। মুদ্রা — কোয়াচা (ZMK)। খনিজ — তামা, দস্তা, সীসা, রুপা, সোনা, মূল্যবান পাথর। কৃষি — মেজ, আখ, বাদাম, তুলাবীজ, তামাক। ১৯৯৩ সালে ৭,৯২৩.২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

জিম্বাবোয়ে ২৪ আগষ্ট ১৯৮০

রাজধানী — হারারে। জনসংখ্যা — ১১.৫ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৫৩৪ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৪৯০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — উত্তরে জাম্বিয়া, পূর্বে মোজাম্বিক, দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিমে বটসোয়ানা ও নামিবিয়া। মোট ভূখণ্ড — ৩,৯০,৭৫৯ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — জিম্বাবোয়ে ডলার (ZWD)। খনিজ — সোনা, নিকেল, কয়লা। কৃষি — গম, মেজ, যব, আখ, কফি, বাদাম, সয়াবীন, তুলাবীজ, চা, ফল, সব্‌জী। শিল্প — ফুড প্রসেসিং, বস্ত্র, আসবাব, কাঠ। ১৯৯৩ সালে ৭,১৮৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাক্ষরতা — ৬৯% (১৯৯২)।

ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

রাজধানী — পোর্ট অফ্ স্পেন। জনসংখ্যা — ১.২৭ মিলিয়ন (১৯৯৬)। বৃদ্ধির হার — ০.৮৭২ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩,৭৮০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ক্যারিবিয়ান সাগরে ভেনেজুয়েলার উত্তর-পূর্ব উপকূল থেকে ১২ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। টোবাগো আরও ৩০.৭ কিমি দূরে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ৫,১২৮ বর্গ কি.মি.। ভাষা — ইংরাজী। মুদ্রা — ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ডলার (TTD)। কৃষি — চিনি। শিল্প — ইস্পাত, সিমেন্ট, বিয়ার, স্পিরিট, সিগারেট, চিনি, সার। ১৯৯৫ সালে ৪,২২৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ৪,৭৫,৩০,৭০৯ ব্যারেল তেল নিষ্কাশিত হয়।

সুইজারল্যান্ড

রাজধানী — বার্ণে। জনসংখ্যা — ৭.০২ মিলিয়ন (১৯৯৫), বৃদ্ধির হার — ০.৯২৬ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৩৭,১৮০ (১৯৯৪)। পরিসীমা — পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে ফ্রান্স, উত্তরে জার্মানি, পূর্বে অষ্ট্রিয়া এবং দক্ষিণে ইতালি। মোট ভূখণ্ড — জার্মন,

ফরাসী ও ইতালিয়ান। মুদ্রা — সুইস ফ্রাঙ্ক (CHF)। খনিজ — লবন। কৃষি — গম, চিনি-বীট, আলু, যব, মেজ, তামাক, ফল। শিল্প — চীজ, মাখন, চিনি, ঘড়ি, চর্ম, বস্ত্র। ১৯৯০ সালে ৫৪,০৭৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

পশ্চিম সামোয়া

রাজধানী — আপিয়া। জনসংখ্যা — ১,৬৩,০০০ (১৯৯৪)। বৃদ্ধির হার — ০.৭০০ (১৯৯৩)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় — ৯৭০ ডলার (১৯৯৪)। পরিসীমা — ১৩° থেকে ১৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১৭১° থেকে ১৭৩° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। মোট ভূখণ্ড — ২,৮৩০.৮ বর্গ কি.মি.। ভাষা — সামোয়ান ও ইংরাজী। মুদ্রা — টালা (WST)। কৃষি — নারিকেল, কোপ্রা, কলা, পেঁপে, আম, আনারস, কোকো। ১৯৯৫ সালে ৬৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

** প্রতিটি দেশের নামের পাশের তারিখটি হল সেই দেশের রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্তির দিন।

বিশ্বের দেশগুলির মানচিত্র এবং পতাকা

আফগানিস্তান
আলবেনিয়া
আলজেরিয়া
আরমেনিয়া
আনদোরা
আঙ্গোলা
অ্যান্টিগুয়া
আর্জেন্টিনা
অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রিয়া
আজেরবাইজান
বাহারিন
বাংলাদেশ
বারবাডোস
বেলারুশ
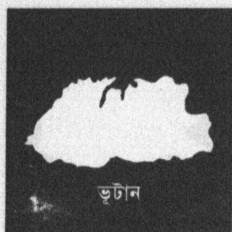
বেলজিয়াম
বেলিজ
বেনিন
বাহামাস
ভুটান
বলিভিয়া
বসনিয়া
বোতস্ওয়ানা
ব্রাজিল
ব্রুনেই
বুলগেরিয়া
বুরকিনা ফাসো
বুরুন্দি
কম্বোডিয়া
ক্যামেরুন
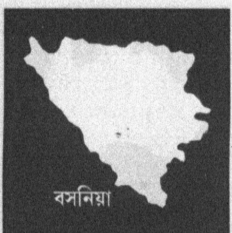
কানাডা
চাদ
চিলি
চীন
কলম্বিয়া
কমোরোস
কঙ্গো
কোস্টারিকা
ক্রোয়েশিয়া
কিউবা
সাইপ্রাস
চেক রিপাব্লিক (প্রজাতন্ত্র)
ডেনমার্ক

জিবৈতি
ডোমিনিকা
ডোমেনিকান রিপাব্লিক
ইজিপ্ট
ইকোয়েডার
এল-সালভাডোর
ইকোয়েটেরিয়াস গিনি
ইথিওপিয়া
এস্তোনিয়া
ফিজি
ফিনল্যান্ড
ফ্রান্স
গ্যাবন
জাম্বিয়া
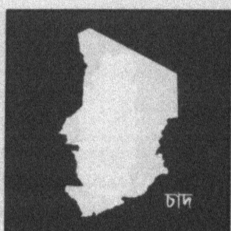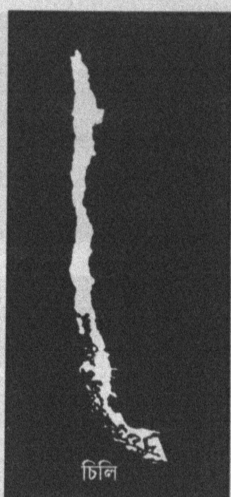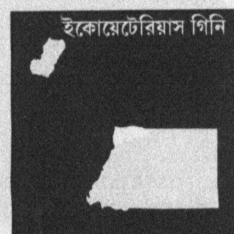
জার্মানি
ঘানা
গ্রীস
গুয়াতেমালা
গায়ানা
গিনি
হাইতি
হন্ডুরাস
হাঙ্গেরী
আইসল্যান্ড
ভারত
ইরান
ইন্দোনেশিয়া
ইরাক
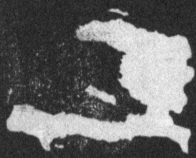
ইজরায়েল
ইটালি
আইভোরি কোস্ট
জামাইকা
জাপান
জর্ডন
কাজাকিস্তান
কেনিয়া
কুয়েত
কিরগিজিস্তান
লাওস
লাটভিয়া
লেবানন
লেসাথো
লাইবেরিয়া

লিবিয়া
লিচটেনস্টাইন
লিথুয়ানিয়া
লুক্সেমবুর্গ
মাদাগাসকার
মালাউই
মালয়েশিয়া
মাল্টা
মরিটেনিয়া
মরিশাস
মেক্সিকো
মল্ডাভিয়া
মোনাকো
মঙ্গোলিয়া
মরক্কো

মোজেম্বিক
মায়ানমার(বার্মা)
নামিবিয়া
নেপাল
নেদারল্যান্ডস
নিউজিল্যান্ড
নিকারাগুয়া
নাইজের
নাইজেরিয়া
উত্তর কোরিয়া
নরওয়ে
ওমান
পাকিস্তান
পানামা
প্যারাগুয়ে

পাপুয়া নিউগিনি
পেরু
পেরু
ফিলিপিনস
পোল্যান্ড
পর্তুগাল
কাতার
রোমানিয়া
রাশিয়া
রোয়ান্ডা
সেন্ট লুসিয়ে
সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডিন্স
স্যান ম্যারিনো
সাও তোমে এবং প্রিন্সিপ

সৌদি আরব
সেনেগাল
সেশেল্‌স
সিঙ্গাপুর
শ্লোভেকিয়া
শ্লোভেনিয়া
সোলোমান আইসল্যান্ডস
সোমালিয়া
দক্ষিণ কোরিয়া
স্পেন
শ্রীলঙ্কা
সুদান
সুরিনাম
সোয়াজিল্যান্ড
সুইডেন

সুইট্জারল্যান্ড
সিরিয়া
তাইওয়ান
তানজেনিয়া
থাইল্যান্ড
টোগো
টোঙ্গা
ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো
তুর্কমেনিস্তান
তিউনিসিয়া
তুর্কি
উগান্ডা
সংযুক্ত আরব আমীরশাহী
গ্রেট ব্রিটেন
উরুগুয়ে
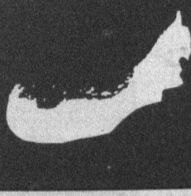
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
উজবেকিস্তান
ভানুয়াতু
ভিয়েতনাম
ভেনিজুয়েলা
যুগোস্লাভিয়া
ইয়েমেন
জাইরে
জাম্বিয়া
জিম্বাবুয়ে
জর্জিয়া
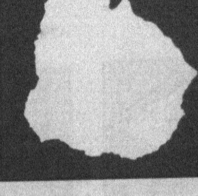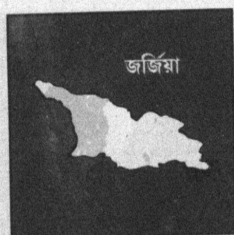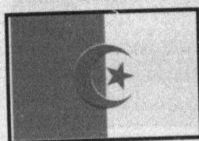
আফগানিস্তান
আলবেনিয়া
আলজেরিয়া
আনদোররা
অ্যাঙ্গোলা
অ্যান্তিগুয়া
আর্জেন্টিনা
আরমেনিয়া
অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রিয়া
আজেরবাইজান
বাহামাস
বাহারিন
বাংলাদেশ
বারবাডোস
বেলারুশ
বেলজিয়াম
বেলিজ
বেলিন
ভূটান
বলিভিয়া
বসনিয়া
বোত্স্ওয়ানা
ব্রাজিল
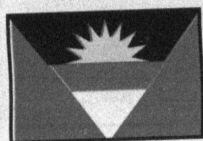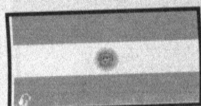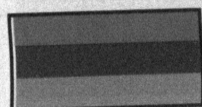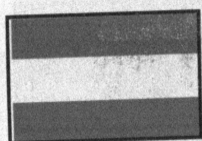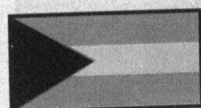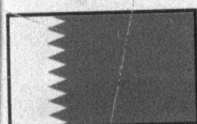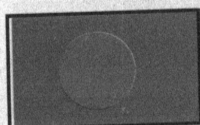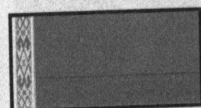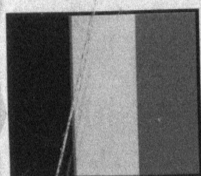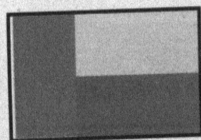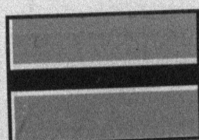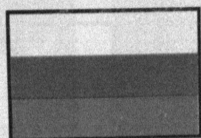
ব্রুনেই/দারুসালাম
বুলগেরিয়া
বুরকিনা ফাসো
বুরুন্দি
কাম্বোডিয়া
ক্যামেরুন
ক্যানাডা
কেপ-ভার্ডে
চাদ
চিলি
চীন
কলম্বিয়া
কমোরাস
কঙ্গো
কোস্টারিকা
ক্রোয়াসিয়া
কিউবা
সাইপ্রাস
চেক রিপাব্লিক (প্রজাতন্ত্র)
ডেনমার্ক
জিবৈতি
ডোমেনিকা
ডোমেনিকান রিপাব্লিক
ইকোয়েডর
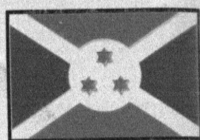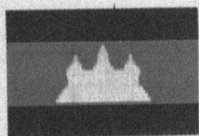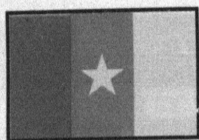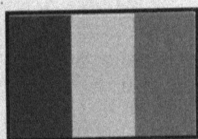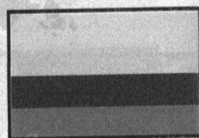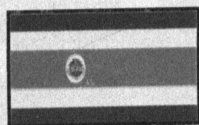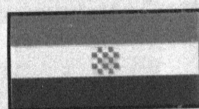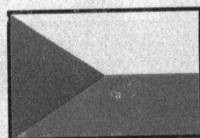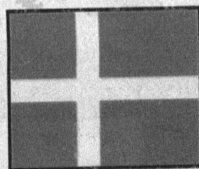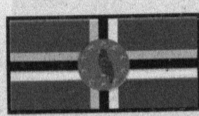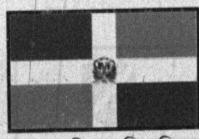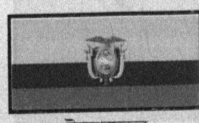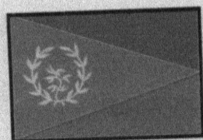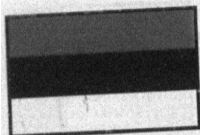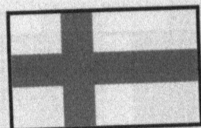
ইজিপ্ট
এল-সালভাডোর
ইকোয়েটেরিয়ান গিনি
এরিট্রেইয়া
এস্তোনিয়া
ইথিওপিয়া
ফিজি
ফিনল্যান্ড
ফ্রান্স
গ্যাবন
গাম্বিয়া
জর্জিয়া
জার্মানি
ঘানা
গ্রীস
গ্রেনেডা
গুয়েতামালা
গুয়েনা
গুয়েনা বিসাও
গায়ানা
হাইতি
হন্ডুরাস
হাঙ্গেরী
আইসল্যান্ড
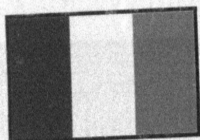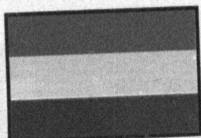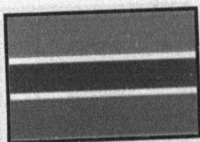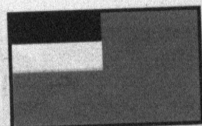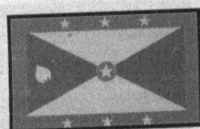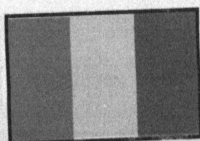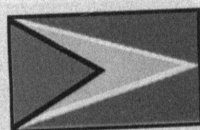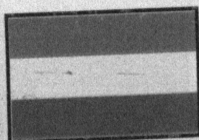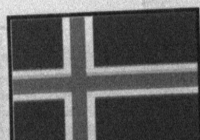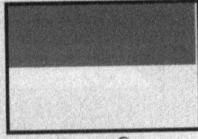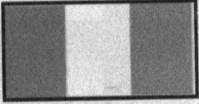
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
ইরান
ইরাক
আয়ারল্যান্ড
ইজরায়েল
ইটালি
আইভোরিকোস্ট
জামাইকা
জাপান
জর্ডন
কাজাকিস্তান
কেনিয়া
উত্তর কোরিয়া
কুয়েত
কিরগিজিস্তান
লাও পিপলস্‌স
ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিক
লাটভিয়া
লেবানন
লেসাথো
লাইবেরিয়া
লাইবিয়ান আরব
জামাহিরিয়া
লিচিয়েটস্তান
লিথুয়ানিয়া
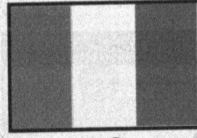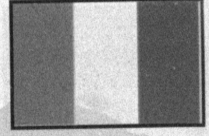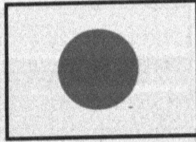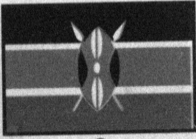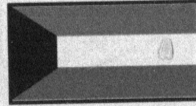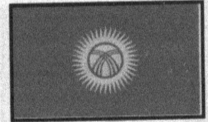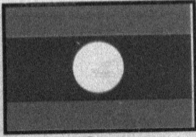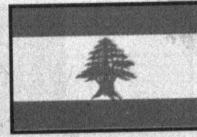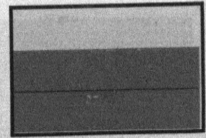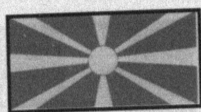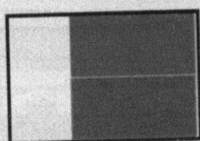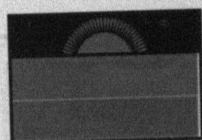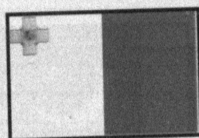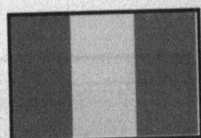
লুক্সেমবুর্গ
মেসিডোনিয়া
মাদাগাসকার
মালাউই
মালএশিয়া
মালদ্বীপ
মালি
মাল্টা
মার্শাল
মারিটেনিয়া
মরিশাস
মায়ানমার
মেক্সিকো
মাইক্রোনেশিয়া
মলডোভা
মোনাকো
মঙ্গোলিয়া
মরক্কো
মোজাম্বিক
নামিবিয়া
কুক আইল্যান্ডস
নেপাল
নেদারল্যান্ডস
নিকারাগুয়া
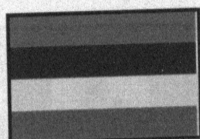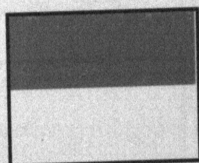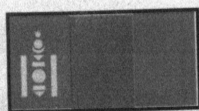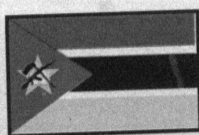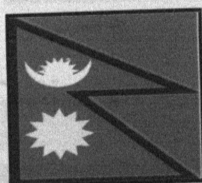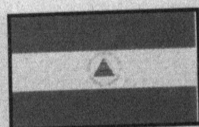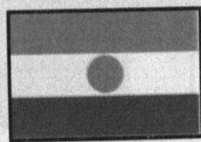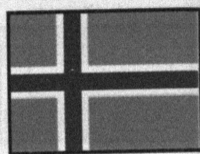
নিউজিল্যান্ড
নাইজের
নাইজেরিয়া
নরওয়ে
ওমান
পাকিস্তান
পালাউ
পানামা
পাপুয়া নিউ গিনি
প্যারাগুয়ে
পেরু
ফিলিপিনস
পোল্যান্ড
পর্তুগাল
কাতার
রোমানিয়া
রাশিয়া
R
রোয়ান্ডা
স্যান ম্যারিনো
সাও টোমে এবং প্রিন্সিপ
সৌদি আরব
সেনেগাল
সেশেল্স
সিরা লিয়েন
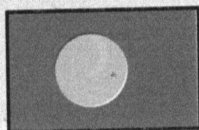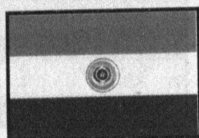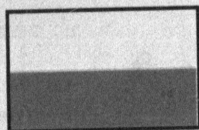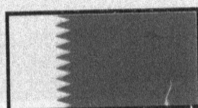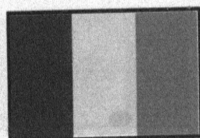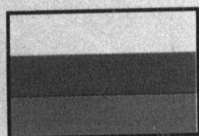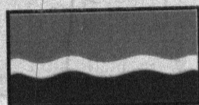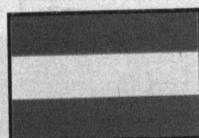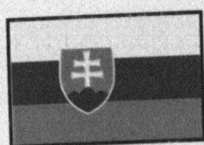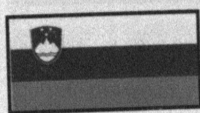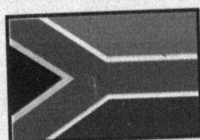
সিঙ্গাপুর
স্লোভাকিয়া
স্লোভেনিয়া
সোলামন আইসল্যান্ড
সোমালিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা
স্পেন
সিয়েরা লিয়ন
সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস
সেন্ট লুসিয়ে
সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডিনস
সুদান
সুরীনাম
সোয়াজিল্যান্ড
সুইডেন
সিরিয়ান আরব রিপাব্লিক
টোঙ্গা
তিউনিসিয়া
তুর্কী
তুর্কমেনিস্তান
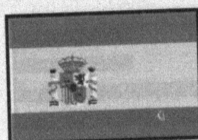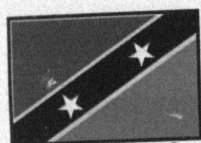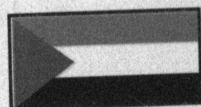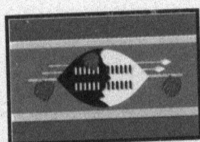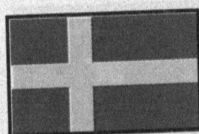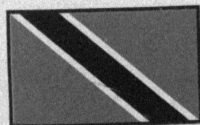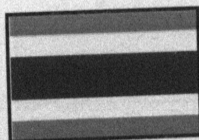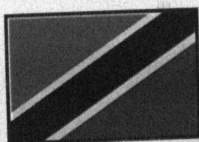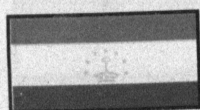
তুভালু

উগান্ডা
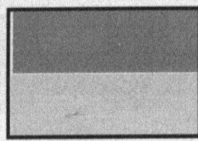
ইউক্রেন
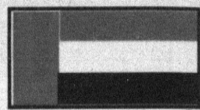
সংযুক্ত আরব আমিরশাহী

গ্রেট ব্রিটেন

উরুগুয়ে
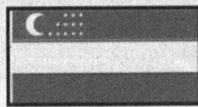
উজবেকিস্তান
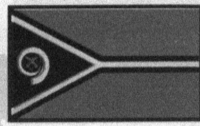
ভানুয়াতু
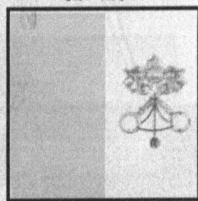
ভাটিকান
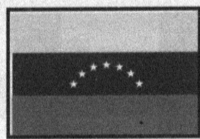
ভেনেজুয়েলা

ভিয়েৎনাম
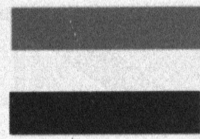
ইয়েমেন
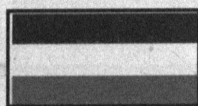
যুগস্লাভিয়া

জায়রে
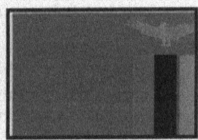
জাম্বিয়া
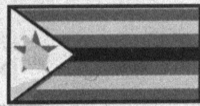
জিম্বাবোয়ে

দক্ষিণ কোরিয়া

কিরিবাতী

নাউরু

সিয়েরা লিয়ন